তসলিমা নাসরিন

ফরাসি প্রেমিক

প্রতিটি মানুষের দুটো মাতৃভূমি, একটি তার নিজের, অন্যটি ফ্রান্স।
শ্রীবোকাচন্দ্র ঠাকুর

দমদম থেকে শার্ল দ্য গোল

মেয়েটি, পরনে লাল বেনারসি, নাকে কানে গলায় হাতে সোনার অলংকার, শুকিয়ে চড়চড় ঠোঁট, উড়োজাহাজ থেকে নেমে ডানে বামে সামনে পেছনে তাকাতে তাকাতে, চলন্ত সিঁড়িতে হোঁচট খেতে খেতে, রাশি রাশি সাদা মানুষ দেখতে দেখতে হাঁটছে যেদিকে লোক হাঁটছে বেশি, যেদিকে ঢল, কলকল, সেদিকে। ঢল থেমে যায় এক কোণে, একের পেছনে আরেক করে হয়ে যায় দীর্ঘ অজগর। অনেকটা রেশন দোকানে সস্তায় ডাল দিচ্ছে গো, দাঁড়িয়ে যাও-এর মতো। লেজ ডিঙিয়ে, মেয়েটি নিজেকে গলাতে চায় পেটে। পেটের লোকেরা বলে, ও মেয়ে, ও লাল শাড়ি, লেজে যাও, লেজে যাও। মেয়েটি জিভের জলে ঠোঁট ভেজাতে ভেজাতে লেজে ফেরে, সবার পিছে সবার নীচে সবহারাদের মাঝে।

অজগর সড় সড় করে ডিঙিয়ে যাচ্ছে ঝোপঝাড়।

কেবল লেজটিই ঝোপের কাঁটায় আটকে পড়ে।

মেয়েটি, কপালে থেবড়ে যাওয়া সিঁদুরের টিপ, সিঁথিতে সিঁদুর, ভেজা ঠোঁট মুখোমুখি হয় দুজনের, কালোর আর সাদার। মেয়েটি কালো পেরিয়ে সাদার দিকে এগোয়, অমাবস্যা পায়ে দলে ধবল জ্যোৎস্নার দিকে। কালো ডাকে, ও মেয়ে, ও লাল শাড়ি, এদিকে। লাল শাড়ি কানে খাটো, হাঁক শুনেছে, ডাক বোঝেনি। সাদার সামনে ত্রিভঙ্গ দাঁড়ায় সুবিনীত সুস্মিতা। দেবী দুর্গার মতো লাগছে না কি, একবার চোখ তোলে। দেবীতে সাদার কিছু যায় আসে না, সাদা চোখ তোলে না, আঙুল তুলে কালোর দিকে ইঙ্গিত করে। লাল শাড়ি কানে খাটো হলেও চোখে খাটো নয়। দু পা বামে গেলেই কালো। বামে যেতে তার পা সরে না, মন সরে না।

কালো তো কালোই, আবার গজদন্ত। মেয়ে ফোঁসে।

পাসপোর্ট। গজদন্তের গভীর গুহা থেকে গমগম শব্দ বেরোয়।

গাঢ় নীল পাসপোর্টটি কালোর চোখের সামনে ধরে মেয়েটি, অজগরের মাথা বুক পেটের লোকেরা যেভাবে ধরে পার পেয়ে গেছে। গজদন্ত খপ করে ধরে গপ করে টোপটি গেলে। শেয়ালের কালো থাবায় ভারতীয় কুমিরের ছানা। যক্ষের ধন পেয়েছে গজদন্ত। টোপটির আগপাশতলা দেখতে দেখতে কালোর লাল টকটক জিভে, মেয়েটি দেখে, জল গড়াচ্ছে।

টিকিট। আবার গুহার গমগম।

এবার আর টোপ নয়। মেয়েটি কালো থাবায় পুরে দেয় দুপাতার টিকিট—দমদম শার্ল দ্য গোল দমদম—বাইশে ফেব্রুয়ারি, একুশে মার্চ নিরানব্বই।

কুমিরছানা চলে গেল মেশিনের তলায়, একবার দুবার তিনবার।

কী করতে এখানে এসেছ হে? গমগম।

সংসার করতে। শুকোতে থাকা ঠোঁট নড়ে।

কোন হোটেলে উঠবে, নাম কী? গমগম।

বাপের হোটেল থেকে স্বামীর হোটেলে উঠবে লাল শাড়ি। এক হোটেল থেকে আরেক হোটেলে জীবন পার।

ঠিকানা কী? গমগম।

টুকরো একটি কাগজ কালো থাবার ভেতর চালান করে, একশো বারো রু দু ফুবো সানদানি, প্যারিস সাত পাঁচ শূন্য এক শূন্য।

টাকা কত আছে? গমগম। দুশো ডলার থাবায় চলে যায়।

আর কত আছে? গমগম।

ঝোলার ভেতরে হাত আনাচ কানাচ খোঁজে, বাসি ফুল, ছেঁড়া চিঠি, দুটো বোতাম আর একটি চিনেবাদামের খোসা, আর আধখাওয়া কমলালেবুর সঙ্গে উঠে আসে বারোশো পঁচিশ টাকা।

গজদন্ত দু আঙুলে শুঁয়োপোকা ভুরু চুলকে চিকন গলায় জিজ্ঞেস করল, এগুলো কী?

মেয়েটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এগুলো টাকা।

টাকা?

হ্যাঁ টাকা। ভারতের টাকা। মেয়েটির মাস্টারি গলা।

গজদন্ত টাকার এমন চেহারা আগে দেখেনি। সাদা লোকটির চোখ পড়ে টাকায়, নাক কুঁচকে ওঠে, যেন আবর্জনার স্তূপ থেকে এক মুঠো দুর্গন্ধ বিষ্ঠা এনে সামনে রেখেছে কেউ। মেয়েটির পেছনে নতুন অজগর, অজগর লম্বা হচ্ছে, হাঁসফাঁস করছে, বুকের পেটের লোকদের গা জ্বলছে। লাল আপদটি সামনে না থাকলে অনেককাল বেড়া ডিঙিয়ে যেত ওরা। ওদের মতো নিজেকেও মেয়েটির বড় এক আপদ বলে মনে হয়।

সাদা তার সাদা চিবুক নেড়ে সাদা আঙুল তুলে বলে, এই লাল শাড়ি, তুমি ওই কোণে গিয়ে দাঁড়াও।

আপদ বিদেয় হয়। কোণে।

নতুন অজগর দ্রুত গড়িয়ে যায়। এই মাথা তো এই লেজ। কারও পাসপোর্ট মেশিনে ঢোকানো হয়নি। কারও ঝোলার ভেতর হাত ঢোকাতে হয়নি, টাকা খুঁজতে হয়নি। কাউকে কোনও কোণে পাঠানো হয়নি। মেয়েটিই একা। মেয়েটিই এক কোণে। কোণটি, মেয়েটির মনে হয়, চিড়িয়াখানার খাঁচা, যারাই পার হচ্ছে, অদৃশ্য খাঁচার ভেতর মেয়েটিকে দেখছে, কালো চোখের কালো চুলের কালচে রঙের আজব জীব দেখছে। মেয়েটি চোখ নামিয়ে রাখে মেঝেয়। অপরাধী চোখ।

অজগরের লেজের শেষ বিন্দুকে ছুটি দিয়ে গজদন্ত যখন সাদার দিকে ঝুঁকে হাসছে, মেয়েটি এক পা দু পা করে কোণের সীমানা ডিঙিয়ে সাদাকে মিনমিনে গলায়, সবাই যে চলে গেল, আমি যাব না? বলতেই সাদা ডানে বামে মাথা দোলায়। মাথা দুলতেই থাকে, এর অর্থ কি না তুমি যাবে না, না কি সাদার মনে কোনও গানের সুর জেগেছে হঠাৎ আর সে সুরে তাল না দিয়ে সে পারছে না।

সাদার মাথা দোলানো দেখে গজদন্ত বেরিয়ে আসে কাচের ঘর থেকে।

হাঁটো। গমগম।

গজদন্ত থামে। কাচের নয়, ইস্পাতের একটি ঘরে, পেছনে লাল শাড়ি। ঘরের ভেতরে দুটো চেয়ারে দুটো নীল পোশাকের সাদা লোক। একটির বেশি বয়স, আরেকটির কম। বেশি বয়সের হাতে যক্ষের ধনগুলো সঁপে দিয়ে গজদন্ত বেরিয়ে যায়। কমবয়সি হাসছিল, মেয়েটিকে দেখে হাসি গিলে ফেলে ঠোঁটে ঝুলিয়ে রাখে প্রসবযন্ত্রণা।

বেশিবয়সি আস্ত নপুংসক, প্রসবযন্ত্রণা নেই নাকে চোখে গালে। বদলে ইস্পাতের মুখ, টোকা দিলে হাড় তো ভাঙবেই, আঙুল খসে যাবে, এমন।

বেশিবয়সি ভাঙা ইংরেজিতে বলল, ফরাসি জানো?

না।

কী জানো?

ইংরেজি।

ইংরেজি চলবে না।

মেয়েটি ইস্পাতের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ায়। বিস্ময় তাকে একবার ডানে কাত করে, একবার বামে।

পৃথিবীর কোথাও ইংরেজি ভাষাটি যে অচল হতে পারে, এ তার ধারণায় ছিল না। কলকাতায় জাতে উঠতে হলে বা সভ্য হতে হলে ইংরেজি জানতে হয়। তার বিশ্বাস ছিল, সভ্য লোকেরা, সে যে দেশেরই হোক না কেন, অনর্গল চোস্ত ইংরেজি বলে।

তোমার নিজের ভাষা কী? বেশিবয়সি ধমকে ওঠে।

বাংলা। ক্ষীণ স্বর মেয়েটির।

বাংলা চলবে না, বাক্যটি শোনার জন্য মেয়েটি প্রস্তুত ছিল, মেয়েটিকে হতাশ করে বেশিবয়সি বলে,

দোভাষীর ব্যবস্থা করা হবে।

দোভাষী এলে মেয়েটিকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হবে। উত্তর সন্তোষজনক হইলে বিচারকমণ্ডলি রায় ঘোষণা করিবে মুক্তির, আর না হলে অর্ধচন্দ্র, যেখানের মাল সেখানে ফেরত পাঠানো।

ইস্পাত আর প্রসবযন্ত্রণার দু জোড়া চোখ মেয়েটির চুল থেকে পায়ের নখ অব্দি ঘুরে বেড়ায়। কপালের চোখটি সামান্য বুজে ইস্পাতি ইঙ্গিত করে কোণের চেয়ারে। বেনারসি শাড়ি, থেবড়ানো সিঁদুরের টিপ, শুকনো চড়চড়ে ঠোঁট কোণের চেয়ারে গিয়ে বসে। কোণে তিনটে চেয়ার পাতা। তিনটের একটিতে, দেয়ালের লাগোয়াটিতে, কচি কলাপাতা রঙের লম্বা আলখাল্লা পরা ঘোর কালো রঙের এক লোক বসা, লোকটির মাথা ভর্তি চুল নয়, চুলের জট। এক চেয়ারের ব্যবধান রেখে মেয়েটি বসে।

লোকটি জিরাফি গলা বাড়িয়ে খড়খড়ে গলায় বলে, আমি সেনেগালের, তুমি?

মেয়েটি কানে খাটো, কানে খাটো বলে চোখ ইস্পাতের দেয়ালে। দাঁড়কাকের কর্কশ কা কা রব থামার লক্ষণ নেই। তুমি কোন দেশের?

দেয়ালে চোখ স্থির, ঠাণ্ডা গলায় উত্তর ছুড়ে দেয় বাতাসে, আমি সেনেগালের নই।

সেনেগালের নয় বলে একটি অহংকারের চড়ুই চকিতে উড়ে এসে তার বাঁ কাঁধে বসে। বাঁ কাঁধটি মেয়েটি মোটে নড়াতে চায় না। কাঁধ না নড়িয়ে আড়চোখে দেখে দাঁড়কাকের

কদাকার পায়ের কাছে ততোধিক কদাকার বেগুনি রঙের বস্তা। বস্তাটির গলা খুলে বুনো হস্তিথাবায় একটি নোংরা বোতল বের করে পিঠের দিকে মাথা ঝুলিয়ে হিপোপটেমাসের হাঁয়ের ওপর বোতল উপুড় করে। অর্ধেক বোতল জল ঢুকে যায় হাঁয়ে। জিরাফি গলা মেয়েটির দিকে এল আবার, জল খাবে?

না।

জিরাফি গলা আবার, তোমার পাসপোর্টও কি নকল?

না। এ স্বরটি ঝাঁঝালো।

তুমি কি চিন দেশের?

না।

বুঝেছি, পাকিস্তানি।

মেয়েটি উঠে যায়, কাঁধের চড়ুই কাঁধেই থাকে। দেয়ালে হেলান দিয়ে দেয়ালের দিকেই নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকে। ঘরে আরও এক সাদা লোক ঢুকতেই মেয়েটির চোখ উতলা হয়। সাদা লোকটি সেনেগালির পাশের চেয়ারটিতে বসে। মেয়েটি কাঁধের চড়ুইকে উড়িয়ে দিয়ে সাদার পাশে, জিরাফি নাগালের বাইরে নিশ্চিন্তে এসে বসে। সাদার তেল চিটচিটে কাপড় থেকে পেচ্ছাপের ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোচ্ছে।

সেই গন্ধে স্বচ্ছন্দে নাক ডুবিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কোন দেশের?

রাশা।

আবার নাক, তোমাকে কী কারণে আটকেছে গো?

লোকটি ফ্যাক করে হলুদ দাঁতে হেসে উত্তর দেয়, মস্কো।

ও তুমি বুঝি মস্কোতে থাকো?

লোকটি মাথা নাড়ে।

জানো আমার এক কাকা মস্কোতে গিয়েছিলেন। খুব নাকি সুন্দর শহর। আমার দাদা তো সামনের বছরই সম্ভবত বেড়াতে যাবে মস্কো।

লোকটি হলুদ দাঁতে হাসে।

পেচ্ছাপের গন্ধে আবার নাক ডোবে মেয়েটির।

আমি ভারত থেকে এসেছি। তুমি গেছ কোনওদিন ভারতে?

লোকটি মাথা নাড়ে।

পেচ্ছাপের গন্ধের দিকে সরে এসে মেয়েটি বলে, বাহ্! কোন শহরে গেছ বলো তো! কলকাতা গেছ?

লোকটি উত্তর দেয়, প্যারিস।

ও তুমি প্যারিসে এসেছ আগে? আমার কিন্তু এই প্রথম।

মেয়েটি কোনও উত্তর আশা করেনি, কিন্তু উত্তর উচ্চারিত হয়, মস্কো।

মেয়েটি এবার মুখ বোজে, নাক বোজে। তার তৃতীয় প্রশ্নের উত্তর কী হবে সে অনেকটা অনুমান করে।

প্রশ্ন কতক্ষণ বসে থাকতে হবে কিছু জানো?

উত্তর ভ্লাদিমির আলেকজান্দ্রোভিচ স্তানিস্লাভস্কি।

এদিকে প্রসবযন্ত্রণা আর ইস্পাত মিলে খড়বড় ভড়বড় নড়বড় করে অনর্গল ফরাসি বলে যাচ্ছে। একটি শব্দ বোঝা মেয়েটির পক্ষে সম্ভব হয় না। এক ঘণ্টা পঁয়ত্রিশ মিনিট পার হলে কমবয়সি নীল পোশাকের লোকটি তিন আসামির দিকে চেয়ার ঘোরায়। আঙুল তুলে লাল শাড়ির দিকে, স্পষ্ট ইংরেজিতে বলে, তোমাকে ফিরে যেতে হবে, তোমার দেশে, বুঝলে? কমবয়সির মুখে প্রসবযন্ত্রণা নেই আর, কপালে একটি বাড়তি চোখ ছিল, সেটিও নিশ্চিহ্ন।

মেয়েটি ত্রস্ত উঠে দাঁড়ায়, দোভাষীর কথা বলছিলে, ওর কী হল?

দোভাষী পাওয়া যায়নি।

মেয়েটি যখন অপেক্ষা করছে তার পাসপোর্ট টিকিট ইত্যাদি যক্ষের ধন ফেরত পাবার, নীল পোশাকের বেশিবয়সি ইস্পাতমুখী আরেকটি বেশিবয়সি সাদা নিয়ে ঘরে ঢোকে, এটি চুইংগাম চিবো[illegible]টি নীলার মাথা থেকে পা অব্দি নিরীক্ষণ করে, দুচোখে কুলোয় না, কপালে একটি [illegible] চোখ, সেটি খোলা।

চুইংগাম চিবোতে চিবোতে, মেয়েটিকে, কী নাম?

কার?

তোমার।

নীলাঞ্জনা মণ্ডল।

প্যারিসে কী কারণে এসেছ?

সংসার করতে।

কার সঙ্গে?

স্বামীর সঙ্গে।

স্বামীর নাম কী?

কিষানলাল?

বয়স কত?

ঠিক জানি না। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় হবে।

তোমার বয়স কত?

সাতাশ।

কতদিন আছে সে এখানে?

কে?

তোমার স্বামী।

নীলাঞ্জনা ঘাড় চুলকে বলে, সম্ভবত পনেরো বছর।

তুমি সঠিক জানো না?

না।

সে কি এদেশের নাগরিক?

তাই তো শুনেছি।

কী করে সে?

শুনেছি ব্যবসা করে।

শুনেছ? নিশ্চিত নও?

কে বলেছে সে তোমার স্বামী? চুইংগামের ঠোঁটের কোণে ঝিলিক দেয় অবিশ্বাস।

নীলা ডানে বামে তাকিয়ে, বিব্রত বিনীত স্বরে বলে, আমি বলছি। আমাদের বিয়ে হয়েছে এক মাস হল।

পদবিই তো এক নয়। চুইংগামের ঠোঁট থেকে উড়ে অবিশ্বাস এসে বসে ডান চোখে।

তা এক নয়, কারণ...শুকনো ঢোক গেলে নীলা।

কী কারণ?

আমি ইচ্ছে করেই স্বামীর পদবি নিইনি।

নীলার বুক কাঁপে। তার স্বামীদেবতাটি কখনও বলেনি যে পদবি এক না হলে সর্বনাশ। বলেছে নাম ঠিকানা রেখো, বিয়ের কাগজ হাতে রেখো, দরকার নেই যদিও, সাবধানের মার নেই। বৈধ পাসপোর্ট, বৈধ ভিসা, আর কী!

কেউ না চাইতেই নীলা ঝোলার ভেতর হাত ঢুকিয়ে লম্বা কাগজ বের করে বলে, এই দেখো, আমাদের বিয়ের দলিল।

কার বিয়ের দলিল? ইস্পাতমুখী জিজ্ঞেস করে।

কাগজটি ইস্পাতমুখীর দিকে বাড়িয়ে নীলা বলে, আমার আর কিষানলালের।

কাগজটির দিকে এক নজর তাকায়, হাতে নেয় না, বরং কমবয়সি নেয় ছোঁ মেরে। চুইংগাম লোকটি কমবয়সির সঙ্গে কিছুক্ষণ হড়বড় করে, নিতম্ব দুলোতে দুলোতে, বেরিয়ে যায়, নিতম্বের পেছন পেছন বেশিবয়সি ইস্পাতমুখী। আর কতক্ষণ এই কোনায় বসতে হবে, উত্তরের জন্য সে কমবয়সির দিকে তাকায়। কমবয়সির নিরিন্দ্রিয় ভঙ্গি নীলাকে কোনও আশা বা হতাশার কথা শোনায় না। অতঃপর আবার সেই কোণ, সেই অপেক্ষা, এবার ভ্লাদিমির আলেক্সান্দ্রোভিচের ঝুলে থাকা মাথার তলে। নীলার মনে হয়, এই ইস্পাতের ঘরে ঠায় বসে থেকেই বাকি জীবন কাটবে তার। নিজের অস্তিত্বটি ক্রমশ দুর্বিষহ হয়ে ওঠে, না পারছে ঘর থেকে বেরোতে, না পারছে ঠায় থাকতে। উঠে দাঁড়ায় সে, ঘরময় হাঁটে, দরজায় চোখ, নিস্তার দিতে কেউ আসছে আশায় কমবয়সি ইঙ্গিত করে স্থির হতে। স্থির হয় বটে সে, স্থিরের মধ্যে অস্থিরতা দ্বিগুণ লাফায়। আপাতত এই কোণ থেকে নীলা দূরে সরতে পারলে বাঁচে। সে কলকাতা হলে, কলকাতা।

পা পা করে এগিয়ে এসে, কমবয়সিকে জিজ্ঞেস করে, আমার সুটকেসগুলো কোত্থেকে নেব? কোন বিমানে ফিরতে হবে, এ সবের কি কিছু ঠিক করছেন?

কমবয়সি, কোনও উত্তর দেয় না। যেন এ কোনও প্রশ্ন নয়। অথবা কোনও প্রশ্ন করার অধিকার আর যে কেউ রাখুক, নীলা রাখে না।

আমার স্বামীর আমাকে নিতে আসার কথা। বাইরে অপেক্ষা করছে নিশ্চয়ই। তাকে কি ডাকা যাবে এখানে?

নীলা যার উদ্দেশ্যে বলে, সে একটি কৌটোর মুখ খুব যত্ন করে খুলে, চিমটি দিয়ে কালো তামাকগুঁড়ো তুলে, বাঁ হাতে ওপরের ঠোঁটটি টেনে চিমটির গুঁড়ো গুঁজে দেয় ভেতরে, তার নাকের নীচ থাকে ফুলে, নাকের পাটাও। কোনও শব্দ নেই, কেবল স্তানিস্লাভস্কির নাক ডাকার গড়গড়, আর সেনেগালি কালোর কোমরের মড়মড়। সেনেগালি কালো পিঠ টান করে দাঁড়িয়ে আছে অনেকক্ষণ, ক্ষণে ক্ষণে পিঠটিকে ডানে বামে মোচড় দিয়ে মড়মড় করে

হাড় ফোটাচ্ছে। পিঠের সবগুলো হাড় ফুটিয়ে তবে সে পিঠকে নিস্তার দেয়, সেই সঙ্গে নীলাকেও। সেনেগালি উবু হয়ে আবার সেই নোংরা জলের বোতলে হাত দেয়, আবার হিপোপটেমাসের হাঁ, নিমেষে বোতল খালি।

জলতেষ্টা আর খিদে নীলাকে হাভাতের মতো গিলে খাচ্ছে। বন বন শন শন করে বাতাস নয়, ঘোরে মাথা।

কার কাঁধে মাথাটি রাখবে সে, স্তানিস্লাভস্কির কাঁধই তার কাঁধে এসে পিং পং বলের মতো পড়ছে বারবার, পেচ্ছাপের গন্ধ আরও তীব্র হয়ে নাক বেয়ে মাথায় উঠছে, মাথাটি ঘাড় থেকে আলতো করে তুলে নিয়ে ইচ্ছে করে কোথাও ছুড়ে দিতে। ছুড়লে কোথায় আর, ইস্পাতের দেয়ালেই। কী দরকার ছিল, নীলা ভাবে, কোথাকার কোন কিষানলাল, জানা নেই শোনা নেই, হুট করে তাকে বিয়ে করার! কলকাতা খাঁ খাঁ করছিল, কলকাতা না ছাড়লে নীলা মারা পড়ত। কিন্তু বিয়ে না করেও সে ছাড়তে পারত শহর, দিল্লি বা বোম্বে কোথাও সে চলে যেতে পারত, কোথাও খুব দূরে, সুশান্তর গন্ধ বর্ণ থেকে যোজন যোজন দূরে।

আচ্ছা কেউ কি আমাকে অন্তত এক গেলাস জল দিতে পারো? নীলা নিজেকেই প্রশ্ন করে। নিজেকেই সে উত্তর দেয়, না কেউ আমরা তোমাকে এক গেলাস জল দিতে পারি না।

এমন ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বা বসে থাকার অভ্যেস নেই নীলার, বিশেষ করে এ যদি অপেক্ষা হয়। সুশান্তর জন্যও সে এতটা সময় কখনও অপেক্ষা করেনি, আসলে প্রয়োজনও হয়নি, যেখানেই দেখা করার, সুশান্তই গিয়েছে আগে। সুশান্তই। মাথা ঘোরাটা আরও বাড়ে, যেন কেবল মাথা নয়, ভারী একটা বোঝা মাথায় তার, গোটা সুশান্ত তার মাথার ওপর জেঁকে বসছে আবার।

ভারী বোঝার মাথা বেমক্কা চক্কর খেয়ে প্রায় ছিঁড়ে পড়ে, যখন চোখের সামনে সেনেগালিটিকে মুক্তি দেওয়া হয় আর বেগুনি বস্তা কাঁধে নিয়ে পেছনে একটি ঝলক দিয়ে হাসির এবং কাশির, সেনেগালি অদৃশ্য হয়। নীলার হাত নিশপিশ করে আলখাল্লার ঝুল ধরে লোকটিকে হিড়হিড় করে টেনে এনে এই ইস্পাতের ঘরে বসিয়ে দিতে, তারপর নিজে সে অদৃশ্য হতে, কাঁধের চড়ুইটিকে কাঁধে নিয়ে।

কালো লোকটি তো দিব্যি চলে গেল! আমার দোষটা কোথায় শুনি! নীলা জিজ্ঞেস করে।

আচ্ছা, কোণ থেকেই নীলা প্রশ্ন করল, গোলটা কোথায় হচ্ছে। আমার পাসপোর্টটা কি নকল?

কমবয়সি উত্তর দিল না।

আমার ভিসাটা কি নকল?

কোনও উত্তর নেই।

টাকাগুলো নকল?

কমবয়সি চেঁচিয়ে উঠল, এই লাল শাড়ি, বেশি বকবক কোরো না।

লাল শাড়ি মুখে কুলুপ আঁটে।

যক্ষের ধন যার হাতে, সেই বেশিবয়সি, ফিরে এল। সঙ্গে চুইংগাম চিবোনো আগের

লোকটি, লোকটি এখন আর চুইংগাম চিবোচ্ছে না। লোকটির কপালের চোখটিও নিশ্চিহ্ন। নীলার হাতে ছুড়ে দেওয়া হল একটি একটি করে ধন, একটি বাড়তি কাগজও পড়ল। কাগজ মানে প্রশ্নপত্র, ইস্কুল কলেজে এমন প্রশ্নপত্র যথেষ্টই হাতে নিয়েছে সে, এ কিছু নতুন ঘটনা নয়। এবার তাকে পাচার হতে হয় কমবয়সি লোকের কাছে।

ভুরু নাচিয়ে কমবয়সি বলে, বেশ তো ছাড়া পেয়ে গেলে। ভাগ্য বলতে হবে। মসিয়ে বেস-এর করুণা না হলে বুঝতে।

কমবয়সির নাকের পাটা আর নাকের তলের মতো ঠোঁটজোড়াও ফোলে। ফোলা ঠোঁট তাকে ওই হোথা যাবার ইঙ্গিত করে। ওই হোথার হদিস পেতে পেতে হাওয়ায় উড়ে যায় আরও সময়। আবার সেই কাচের ঘর, আবার সেই গজদন্ত। গজদন্তের হাতে পূরণ করা বাড়তি কাগজটি বাড়িয়ে দেয় যেখানে অনেকটা মুচলেকা দেওয়া যাহা বলিতেছি সত্য বলিতেছি, মাস পার হইবার আগেই ভালয় ভালয় এই দেশ ত্যাগ করিব। এই দেশে বসত করিবার লোভে কোনও চাতুর্যের আশ্রয় লইব না, লইলে যে শাস্তিই দেওয়া হোক, গা পাতিয়া মন পাতিয়া বরণ করিয়া লইব ইত্যাদি।

গায়ের বাদামি রং, লাল বেনারসি, কপালের আর সিঁথির সিঁদুর, সোনার অলংকার, নীল পাসপোর্ট, খুচরো টাকা প্রাণপণ আড়াল করতে করতে বেড়া ডিঙোয় নীলা। ছাড়পত্র ভিক্ষে পেয়েছে সে, এ ভিক্ষে নাও জুটতে পারত তার। করুণা নাও হতে পারত মসিয়ে বেস-এর। সেই পুরনো কলকাতার পথে আবার একই আকাশ একই মেঘ দেখতে দেখতে ফিরতে হত তাকে একই বাড়িতে, যে বাড়ি থেকে একধরনের চিরবিদায় তাকে দেওয়া হয়েছে। ভিখিরি নীলা একলা পড়ে থাকা দুটো সুটকেস জোগাড় করে যখন বাইরে আসে, সকাল গড়িয়ে, দুপুর গড়িয়ে বিকেল গড়িয়ে, শেষ বিকেল।

কিষানলাল তখনও দাঁড়িয়ে, সুনীল আর চৈতালিও। নীলাকে দেখে তিনটি প্রায়-মৃত শরীর প্রায়-দৌড়ে প্রায় নীলার ওপর পড়ে। সুটকেসের ঠেলাগাড়িটি বেঁটে মোটা বুট পরা টাই পরা সুট পরা সুটের ওপরেও কোট পরা কিষানলাল প্রায় কেড়ে ঠেলতে ঠেলতে বলে, কী ব্যাপার, এত দেরি হল কেন? সেই ভোর থেকে বসে আছি!

সুনীল, লম্বা, ফর্সা পাতাকাঠি ঘটকমশাই একগাল হেসে বলে, আমরা প্রায় আশাই ছেড়ে দিচ্ছিলাম।

কপালের থেবড়ে থাকা সিঁদুরের টিপ দুহাতে ঘসে দিতে গিয়ে চৈতালি বলে, আহা কী ধকলটাই না গেছে।

কনকনে ঠাণ্ডার সূচ নীলার হাড়ে কেন মজ্জায় বেঁধে, বন্দর ছাড়তেই। চৈতালি তার গা থেকে বাড়তি গরম কোটটি দিয়ে নীলার গা ঢেকে দেয়। গা পোড়া গরম থেকে আসা নীলা, তীব্র এই সূচগুলোই নীলার প্রতি রোম ছুঁয়ে ছুঁয়ে অমল আনন্দের চাদর বুনে দেয়।

কলকাতায় এই তো আর দু মিনিট দেখেই ফোন করতে নিচ্ছিলাম, পরের ফ্লাইটে ফেরত পাঠাল কিনা জানতে। সুনীলের শুকনো ঠোঁটে ভেজা হাসির টুকরো।

স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর নামের পদবি মেলে না তাই ঝামেলা করেছে। মিললে আর সবার মতো সময়ে বেরোতে পারতাম। নীলা বলে।

পারতে না। পদবি মিললেও ওরা যা করেছে, তাই করত। সুনীল গাড়ির ভেতর গা

গলিয়ে দিয়ে বলে।

নীলা গা ছেড়ে দিয়ে সামনের আসনে, বলে, ডলার আরও বেশি থাকলে পারতাম।

সুনীল গলা ছেড়ে প্রথম কেশে নিয়ে তারপর হেসে নিয়ে বলে, পারতে না। এই একই হাঙ্গামা করত ওরা।

হাজার প্রশ্নের চোখ নীলার, পাসপোর্ট ভিসা কিছু তো নকল নয়। কী কারণে করত?

সুনীল হাসে, কিষানও। প্রশ্নটির যেন একটিই মাত্র উত্তর, খ্যাক খ্যাক।

খ্যাক খ্যাকে মন ভরে না নীলার। তা হলে কারণ কী অমন হেনস্থা করার?

কারণ হল তোমার গায়ের রং। যথেষ্ট সাদা নয়। সুনীলের কথা শেষ হওয়ার আগে চৈতালি বলে, আর হল পাসপোর্ট, যথেষ্ট ধনী দেশের নয়।

নিজের গায়ের রং নীলার খুব মন্দ বলে মনে হয় না। সেনেগালির বিচ্ছিরি রঙের সঙ্গে মেলালে সে রীতিমতো সোনার বরণ কন্যা। সোনার বরণ চক্ষু কর্ণ নাসিকা কুঞ্চিত করে সেনেগালির কোমরের হাড় ফোটানো আর জল খাওয়ার নিখুঁত বর্ণনা করে বলে, ও ব্যাটা তো দিব্যি পার পেয়ে গেল।

নীলার কণ্ঠে ক্ষোভের ফুলকি। ক্ষোভ সেনেগালির পার পাওয়ায়।

প্যারিসে নেমে কালো লোক দেখব আশা করিনি। নীলা গাড়ির কাচে নিজের মুখটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে বলে।

কালো দেখলে গা জ্বলে কিষানেরও, সুনীল চৈতালিরও।

যত নষ্টের গোড়া ওই কালোগুলো। বসে বসে সরকারি সাহায্য খায়, সন্ত্রাস করে বেড়ায় আর এদের দোষের কারণে দুর্ভোগ পোহাতে হয় আমাদের মতো প্রায়-সাদাদের।

সুনীলই প্রথম উত্তর দেয়, কালো লোকের জ্বালায় বাঁচার উপায় নেই।

কালোদের পিণ্ডি চটকানো চলে অনেকক্ষণ। শুদ্ধ বাংলায়।

বাঙালির ভিড়ে অবাঙালি কিষানলাল মাংসের বাটির ভেতর এক টুকরো আলুর মতো পড়ে থাকে।

আলু আড়চোখে মাংস দেখে, লাল টুকটুকে মাংস। নিরামিষাশীর মাংসে লোভ নেই, কে বলে! কিষানের আড়চোখ লক্ষ করে নীলার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় চকিতে সজাগ হয়, রাস্তার সিটি বাজানো যে কোনও কামুক পরপুরুষের সামনে যেমন হয়। খোলা বাহুটি মুহূর্তে আঁচলে ঢাকার পর তার চেতন ফেরে, লোকটি তার স্বামী, স্বামীর সামনে গুটোনোর কিছু নেই। যদিও বিয়ে হওয়ার পর সে দু সপ্তাহ মাত্র শুয়েছে স্বামীর সঙ্গে কলকাতার বাড়িতে, ও কেবল শোয়াই, রাতে সঙ্গম শেষে দুজনই দু দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুমিয়েছে। কিষানের সঙ্গে নীলার সম্পর্ক বলতে ওই শারীরিক সম্পর্কটুকুই। ভাঙা হিন্দি আর ভাঙা ইংরেজিতে দু-একটি কাজের কথা ছাড়া নীলার তেমন কোনও কথা হয়নি স্বামীর সঙ্গে। বিয়েতে নীলার মত দেওয়ার আগে মলিনা বলেছিলেন, অবাঙালি ছেলে, জানা নেই শোনা নেই, হুট করে বিয়ে করে ফেলবি, একটু দেখে শুনে কোনও বাঙালির ঘরে...

বাদ দাও মা, বাঙালি তো যথেষ্ট দেখা হল। দেখা হল না? নীলা গলায় কান্না চেপে বলেছিল।

ওই দু সপ্তাহই। ওর মধ্যে পাসপোর্ট ভিসা টিকিট এ সবের ব্যবস্থা করে, দিল্লি হয়ে প্যারিস চলে এল কিষান।

বিশ্ববিদ্যালয়ে শেষ বর্ষের পরীক্ষা শেষ হতে কিছু বাকি ছিল নীলার, শেষ করে, সেও আকাশে উড়বে, এমনই কথা। স্বামীকে তুষ্ট করার জন্য নীলার বাবা অনির্বাণ তাগাদা দিয়েছেন বিয়ের শাড়ি অলংকার পরে উড়োজাহাজে উঠতে, সম্ভবত পুরুষই ভাল জানে, পুরুষেরা কীসে তুষ্ট হয়। কিষানই এই জগৎ সংসারে তার সবচেয়ে আপন, যেহেতু সে স্বামী, স্বামীর সঙ্গে বাকি জীবন যাপন করতে হবে তার, স্বামীকে তুষ্ট করতে হবে জীবনভর, তবু কী ব্যাপার রাস্তার ডান দিক দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছ ছাড়া আর কিছু প্রশ্নের হ্যাঁ না উত্তর ছাড়া স্বামীর সঙ্গে মধুর কোনও বাক্যালাপ তো নয়ই, কোনও মিষ্টি হাসি বা দৃষ্টি বিনিময়, তাও হয় না। কথার ফুলঝুরি যা কিছু সব বাংলায়, যা বলে পেছন ফিরে।

আচ্ছা, বিমানবন্দরের ফরাসি লোকগুলো ইংরেজি জানে না নাকি! ভাল ইংরেজি বলল না তো!

জানে জানে। ইচ্ছে করে বলে না। এই তো সবে এলে, থাকো, দেখবে এদের বর্ণবাদী চরিত্র। চৈতালির চিকন গলা ভারী শোনায়।

কী ব্যাপার, এত চুপচাপ যে। কিষানের মাথায় চাঁটি মেরে বলে সুনীল।

কিষান, মোটা কালো মোচ, আঙুলে পাকাতে পাকাতে মুখ খোলে, বাঙালি বেচারাকে একটু সুযোগ দিচ্ছি কিচিরমিচির করার।

হা হা।

নীলার ক্লান্তি জলতেষ্টা খিদে মাথাধরা উবে যায় যখন প্যারিস শহরের ভেতর ঢোকে গাড়ি। নীল পোশাকের কমবয়সি, বেশিবয়সি, চুইংগাম, গজদন্তের ওপর যে অভিমান ছিল, মুহূর্তে জল হয়ে গেল। গাড়ি হোটেল দ্য ভিল ছাড়িয়ে প্যালে রয়াল ছাড়িয়ে লুভর জাদুঘরের ভেতর দিয়ে পঁ নফের ওপর দিয়ে, সেইনের পাড় ধরে বুলোভার্ড শাঁ মিশেলের দিকে যাচ্ছে যখন নীলা নিজেকে জিজ্ঞেস করে, এর নাম কি স্বর্গ? নিজেকেই উত্তর দেয়, এর নামই।

অতিথি বধূ

কিষানলালের বাড়িতে পা দিয়ে নিজেকে অতিথি-মতো লাগে নীলার। বিশাল বাড়ি, দেয়ালের মাথা থেকে মেঝে অব্দি জানালা, জানালায় ভারী পর্দা, ওপারে ফুলে ছাওয়া ঝুল বারান্দা। আকাশ রঙের নীল গালিচায় ছাওয়া মেঝে, সোফায় বসতেই নরম গদিতে পা ডুবে যায় নীলার, সামনে মদের বোতলের তাক, পাথরের নারীমূর্তি, ছাদ থেকে পাখার বদলে ঝুলছে কাচের ঝালরবাতি, দেয়ালে সাঁটা ইস্পাতের পাত উত্তাপ ছড়াচ্ছে ঘরময়। চৈতালির তাড়ায় নীলাকে বাড়ি দেখতে উঠতে হয়, এই হল বসার, এই শোবার, আর ওপাশের ঘরটি ঠিক কোনও কাজের নয়, বাড়তি মানুষ বা অকেজো জিনিসপত্র গোঁজার, আর এদিকে রান্নাঘর, ওদিকে স্নানঘর, কলঘর, মলঘর। সংসার নতুন করে সাজাবার কিছু নেই, চৈতালি বলে। এই দেখো ধুলো ঝাড়ার, কাপড় ধোবার, শুকোবার, বাসন ধোবার, এমনকী ডিম ফাটাবার, ফাটিয়ে একে নাড়বার, সেদ্ধ করবার, ফালি ফালি করে কাটবার যন্ত্র। সুশান্তর সঙ্গে টোনাটুনির সংসার করার স্বপ্ন দেখত নীলা, প্রথম গাছের তল, তারপর কুঁড়েঘর, সেই নুন আনতে পান্তা ফুরনো ঘরে কুপির আলোয় দুজনে দুজনকে ভালবাসবে, বাইরে বস্তুবাদী জগতের দিকে হো হো হাসি ছুড়ে দেবে আর যেদিন চেষ্টা চরিত্তির করে শহরতলির ইস্কুলে মাস্টারির কাজ জোটাতে পারবে সুশান্ত, যেদিন হ্যাজাকবাতি আসবে ঘরে, সারারাত ধরে উৎসব হবে গানের।

ধুত হ্যাজাকবাতি টাতি না, গানের উৎসব হবে পূর্ণিমায়। খোলা মাঠে।

ভালবাসিয়া গাছের তলে বাস করিব আবেগ নীলার কিছু কম ছিল না। বাঙালি জন্মই নেয় ওই আবেগ নিয়ে। আর সাতাশে পড়তেই কালবোশেখি ঝড়ে জীবন বদলে গেছে নীলার, গুঁড়িসুদ্ধ উড়ে গেছে শখের বটবৃক্ষ, হ্যাজাকবাতি নিবে গেছে, উৎসবে নেমে এসেছে ভুতুড়ে স্তব্ধতা, পূর্ণিমা ঢেকে গেছে এক আকাশ কালো মেঘে, আর নীলাকে উড়িয়ে নিয়ে এসেছে অদ্ভুত বিনাশী হাওয়া সুদূরপারে এক ঝকঝকে ঘরে, সব আছের সংসারে।

কাজের লোক নেই? নীলা জিজ্ঞেস করে।

কিষান আর সুনীল বসে গেছে মদের বোতল খুলে। সে আসরে নিজেকে গলিয়ে দিয়ে চৈতালি বলে, কিষানের বউ কাজের লোকের কথা জিজ্ঞেস করছে গো!

সুনীল সশব্দে হাসে, কিষানের মোচের তলেও হাসি ঝিলিক দেয়।

যে উত্তরটি পায় নীলা, তা হল এই বিদেশে কারও ঘরে কাজের লোক থাকে না, এ দেশে কোনও গরিব নেই যে লোকের বাড়িতে কাজ করবে। আরও একটি ধারণা দেওয়া হয়, আজ যদি কাউকে ঘরদোর পরিষ্কার করার চাকরি দেওয়া হয়, ঘড়ি দেখে এক ঘণ্টায় কম পক্ষে পঞ্চাশ ফ্রাঁ দিতে হবে।

নীলা আঙুলের কড়ায় হিসেব করে চোখ কপালে তোলে, তিনশো টাকা? পুরো মাস

চব্বিশ ঘণ্টা কাজ করেও তো কলকাতায় বাড়ির কাজের লোকদের তিনশো টাকা দেওয়া হয় না।

সুনীল এবং কিষান দুজনই নীলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়, এ প্যারিস, কলকাতা নয়।

লাখ টাকা বেতন দিয়ে কাজের লোক কে রাখে এখানে? মদে বরফ ঢালতে ঢালতে বলে সুনীল।

সব কি নিজের হাতে করতে হবে?

সোফার হাতলে বসে নীলা।

চৈতালির গেলাসে মদ ঢালতে ঢালতে কিষান বলে, ভয় পেলে না কি?

ভয়ের কী আছে। ঘরদোর তো সব গোছানোই দেখছি। ঘরে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলে নীলা।

গোছানোর কিছু নেই, তোমার কাজ হল, কোনও কিছু অগোছালো না করা। কিষান জোরে হাসে।

খিদে সামাল দিতে দু চাক রুটি খেয়ে, জল খেয়ে দু গেলাস, চৈতালির তাড়ায় গরম জলে স্নান করে নেয় নীলা। স্নানের জলে ধুয়ে যায় সিঁথির সিঁদুর। ধুয়ে যায় চোখের কালো কালি। নিজেকে শুদ্ধ স্নিগ্ধ করে ভেজা চুলে তোয়ালে পেঁচিয়ে, যেই না জানালায় দাঁড়িয়েছে, আকাশ বা আকাশের নীচে যে স্বর্গ, দেখতে, হই হই করে ওঠে কিষান, বউ হয়ে এ কী পোশাক পরেছ? শাড়ি পরো, গয়না পরো, সন্ধেয় লোক আসবে বউ দেখতে।

কিষানের আবদার বা আদেশ মতো নীলা জিনস ছেড়ে লাল একখানা কাতান পরে সোনার অলংকারে গা মুড়োলো, হাত ভরে সোনার চুড়ি, কানে ভারী ঝুমকা, গলায় সোনার মালা। মুখে পাউডার মেখে কাজল পরে, সিঁদুরের টিপ পরে কপালে, সিঁথিতে সিঁদুরে আঙুল টেনে এয়োতির চিহ্ন এঁকে, ঠোঁটে গাঢ় লিপস্টিক লাগিয়ে তাকাল নিজের দিকে। এ সিঁদুর তো সুশান্তর পরিয়ে দেবার কথা ছিল। নীলার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো তেতো হাসি, কোথায় এখন সুশান্ত! দিব্যি আছে নিশ্চয়। বছর ধরে প্রেম করল নীলার সঙ্গে, আজ বিয়ে হয়, কাল বিয়ে হয় এমন, শেষ অব্দি জাতে মেলে না বলে কেটে পড়ল, কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে সুশান্ত চক্রবর্তী, নমশূদ্রের মেয়ে নীলাঞ্জনা মণ্ডলের সঙ্গে প্রেম করতে পারে, কিন্তু বিয়ে নৈব নৈব চ। লেখাপড়া জানা ছেলেও যে এত জাতফাতের তোয়াক্কা করে! তোয়াক্কা সম্ভবত সুশান্ত করেনি, করেছে ওর বাবা মা, আর প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেই বা কী করে বাপ মায়ের পছন্দ করা মেয়ের সঙ্গে সাত পাকে ঘোরে, নিজের পছন্দ জলাঞ্জলি দিয়ে! নীলার কাছে ও সব কেবল অবাক করা ব্যাপার নয়। নিজের জীবনটিও তাকে অবাক করে, বিশেষ করে জেদ করে বিয়ে করার ব্যাপারটি। জীবনে আর যে দুর্ঘটনা ঘটুক এটি যে ঘটবে না, এ ব্যাপারে অনেকটাই সে নিশ্চিত ছিল। সুশান্তর বিয়ের পর, স্মৃতির ধার, দাঁতের কামড় নীলাকে রক্তাক্ত করছিল প্রতিদিন, এ ছাড়া, সে ভাবে, তার উপায়ই বা কী ছিল! নীলার হঠাৎ মনে হয়, বাঁচার জন্য কি তার কলকাতা ছাড়া, না কি এ অন্য রকম এক মৃত্যুকে বেছে নেওয়া, অথবা বিয়ে করতে হয় বলে করা, না করলে লোকে মন্দ বলে, ভুরু কুঁচকে তাকায়, তাই! নাকি কী ব্যাপার, বয়স এত হয়ে গেল, এখনও পাত্র জুটল না! এসব কূটকথা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সে

যে কালা নয়, খোঁড়া নয়, তারও যে পাত্র জুটতে পারে, তা কিষানকে বিয়ে করে আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব আর পাড়াপড়শিকে দেখিয়ে এল। তাই কি?

সন্ধেয় বাড়িতে সাতজন অতিথি এল। সাতজনের মধ্যে ছজন অবাঙালি ভারতীয়, একজন ফরাসি। অডিল। গুজরাটি তারিক ইসমাইলের বউ। বউ নিয়ে এসেছে দুজন, বাবু গোগিনি আর রাজেশ শর্মা। বউ ছাড়া সানাল এডামারুকু। ওর বউ নেই। নীলা গ্রহণ করল যে যা দিল, মীনাক্ষীর সাতরঙের ফুলের তোড়া, সাহানা গোগিনির শাড়ি, আর সানালের একটি, একটিই টকটকে লাল গোলাপ আর দুগালে অডিলের চু চু করে দুটো চুমু। যে যার মতো চেয়ার টেনে বসে গেল। সবাই এ বাড়িতে আগে এসেছে। নীলাই নবাগত। অতিথিরও অতিথি।

মোয়েট অ্যান্ড শানডন শ্যাম্পেনের বোতলের গলা ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে কিষান বলল, আমার একটি নয়, দুটি নয়, একটি মাত্র বউ। আজ না হয় ভাসলামই শ্যাম্পেনের জলে। বলে যেই না বুড়োআঙুলে ছিপির গোড়ায় চাপ দিয়েছে, ছিপি বিষম শব্দে ছাদে লাফ দিল, আর শ্যাম্পেন ফুঁসে উঠে ফোয়ারার মতো ছড়িয়ে পড়ল নীলার গায়ে। যেটুকু বোতলে ছিল তাই ঢেলে গেলাসে গেলাসে ঢেলে দিল কিষান।

গেলাস উঠিয়ে ফ্রান্সে স্বাগতম বলল বাবু গোগিনি। বাকিরা সঙ্গে সঙ্গে যার যার গেলাস উঠিয়ে পাশের গেলাসে টুং টাং শব্দ তুলে একই কথা বলল, স্বাগতম। মাতামাতি কিছুক্ষণ নীলাকে নিয়ে চলল, আহা সে কী ডাগর চোখ। চোখ তো দেখে না, যেন কথা বলে। সাহানা বাঁ কাতে নীলাকে দেখে বাবুকে খোঁচায়, দেখো দেখো ওকে একটু রেখা রেখা লাগে না? গোগিনি দম্পতির ধারালো চোখের সামনে তখন নীলা, জবুথবু নীলা, বাবু ঘাড় ডানে কাত করে ফিসফিস করে, আরে না, খানিকটা মীনাক্ষী শেষাদ্রির মতো বলতে পারো।

উহুঁ, সানাল লাফিয়ে তিন চারটে হাঁটু ডিঙিয়ে নীলার সামনে লাল গালিচায় আসন করে বসে নাহ, কে বলে রেখার মতো, মীনাক্ষীর মতো, আমাদের বউদি দেখতে, যতটা গম্ভীর হওয়া সম্ভব, হয়ে, বলে একেবারে নীলাঞ্জনা মণ্ডলের মতো।

সারা ঘর হেসে ওঠে।

সানাল পদার্থবিদ। দশ বছর এ দেশে, বিয়ে থা করেনি। নোয়াজি-তে বাড়ি কিনেছে। একা থাকে। ছ ফুট মতো লম্বা। মেদহীন শরীর। ঘাড় অব্দি লম্বা চুল। মাথা নেড়ে যখন কথা বলে সানাল, সামনে পেছনে দোল খায় তার চুল। একবার সানালকে দেখে, আরেকবার কিষানকে, নীলা মেলায়। সানালকে দেয় একশোয় পঁচাশি, আর কিষানকে পনেরো। সানালের সঙ্গে, নীলা ভাবে, যে তার তো বিয়ে হতে পারত। কিন্তু হয়নি। জীবন যে কোথায় কার সঙ্গে বাঁধা থাকে! আসলেই কি বাঁধা থাকে? সুনীল যদি সানাল এডামারুকুকে কলকাতায় পাঠাত বিয়ে করতে, তবেই তো জীবন অন্যরকম হতে পারত তার। হতে পারত কিন্তু হয়নি।

ওই লোকটি, ওই ফরাসি মেয়েটির স্বামী? উনি কী করেন? নীলা চৈতালির কানে কানে জিজ্ঞেস করে।

লেখেন। থাকতেন লন্ডনে। ফরাসি মেয়ে বিয়ে করে এ দেশে চলে এসেছেন। বেশ ভাল

একটা বই লিখেছেন জানো তো। কী নাম যেন বইটির...চৈতালি তার হাতের বুড়ো আর মধ্যমা ঘসে মনে করার চেষ্টা কার কী নাম, কী নাম...এই সুনীল তারিকের বইটির নাম যেন কী?

কেন আমি মুসলিম নই! সুনীলের ঝটপট জবাব।

হ্যাঁ, কেন আমি মুসলিম নই।

নীলা বলে, বার্টান্ড রাসেলের মতো! কেন আমি ক্রিশ্চান নই। আচ্ছা, কেউ কোনও বই লিখেছে, কেন আমি হিন্দু নই?

চৈতালি ঠোঁট উলটে মাথা নাড়ে ধীরে। না তার জানা মতে নেই।

সুনীল মগ্ন ছিল হুইস্কির গুণাগুণ বর্ণনায়, মগ্নতা থেকে মুহূর্ত ব্যয় করে বলল, হ্যাঁ লিখেছে, শ্রীসুনীল চক্রবর্তী।

হা হা।

কিষান, কী খাওয়াচ্ছ এ সব! মল্ট বের করো। মল্ট।

কিষান সুনীলের আবদার পালন করে মদের তাক থেকে এক হাতে গ্ল্যানফিডিশ, আরেক হাতে লাফ্রোওইগ নিয়ে দুলতে দুলতে আসে।

আসরে তুমুল আনন্দধ্বনি।

শেষটা হবে স্প্রিংব্যাঙ্ক দিয়ে।

ওয়াও হো। সানাল সিটি বাজায়।

ইংরেজি ফরাসি হিন্দি মিশিয়ে আড্ডা জমে ওঠে। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ করে গলার স্বর সপ্তমে ওঠে সবার। সোফার এক কোণে চৈতালির গা ঘেঁষে বসে থাকে নীলা, বউ নীলা, মুখে রং মাখা নীলা, পুতুল নীলা, অতিথি নীলা। আড্ডার লোকেরা উঠে উঠে রান্নাঘর থেকে নিজেরাই জল বা বরফ বা কমলার রস নিয়ে আসে। কমলার রস নীলার আর সাহানার গেলাসে। বাকিরা হুইস্কির সঙ্গে কেউ নেয় জল, কেউ নেয় বরফ। তারিক জল বা বরফ না মিশিয়ে খায়। খেতে খেতে অন্তত দুবার বলে ফেলেছে, হুইস্কিতে জল মেশালে এর স্বাদই নষ্ট হয়ে যায়। এই মুশকিল ভারতীয়দের, মদ খেতে জানে না, তবু খাবে।

রাজেশ বলে, আমরা কি ভাই মদ খাওয়ার জন্য মদ খাই! খাই মাতাল হবার জন্য। তা যেভাবে মাতাল হওয়া যায়।

তা বলেছ বটে ভাই! বাবু গোগিনি গলা ফাটিয়ে হাসে।

সাহানা বাবুকে কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে বলে, অমন দৈত্যের মতো হাসছ কেন? এর মধ্যে মাতাল হয়ে গেলে নাকি।

সানাল খপ করে ধরে সাহানাকে, আচ্ছা, এই যে বললেন দৈত্যের মতো, দৈত্যকে কখনও হাসতে দেখেছেন?

দেখেছি দেখেছি, অডিল মুখ খোলে, লা জকোন্দাকে হাসতে দেখেছি।

হাসির রোল। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যে হাসিটি এঁকে লা জকোন্দাকে জগৎবিখ্যাত ছেন, সেটিকে এক বাক্যে দানবীয় বলে রায় দেওয়ার পর, নীলার জানতে ইচ্ছে হয়, এ কি লোক হাসাতে, নাকি অডিল আসলেই মনে করছে হাসিটি অমন? জানার ইচ্ছেটি নীলা প্রকাশ করার সুযোগ পায় না কারণ সানাল আবার লাফিয়ে এসেছে নীলার দিকে।

তিন চারটে হাঁটু ডিঙিয়ে।

গেলাসে, যেখানে কমলার রস ছিল, খানিকটা ভদকা ঢেলে দুটো ঝাঁকানি দিয়ে সানাল গম্ভীর মুখে বলল, এই স্ক্রু ড্রাইভারটা লক্ষ্মী মেয়ের মতো গিলে ফেলো তো নতুন বউ, তোমার মাথার যে সব স্ক্রু ঢিলে আছে, কাল সকালের মধ্যে সব টাইট হয়ে যাবে।

আরও এক দফা হাসি। হাসলে কিষানের কোদালি দাঁতগুলো বেরিয়ে আসে। আর বাবু গোগিনির সোনা হাসি, ওপরের পাটির দুটো দাঁত সোনায় বাঁধানো, দুটো ঝলকায়। তারিক ইসমাইল ঠোঁট টিপে হাসে, হাসলে মাথা থেকে পা অব্দি কাঁপে। চৈতালি হাসি চাপলেই বাঁ হাতে মুখ ঢাকে। সানাল হাসে হা হা হো হো করে। আর অডিলের হাসিতে কেবল ওপরের গোলাপি মাড়ি বেরোয়, না দাঁত না শব্দ। রাজেশের মুখ ভর্তি দাড়ি, গোঁফ নেমে এসেছে ঠোঁটের ওপর, হাসলে গাল প্রসারিত হয়, এ পর্যন্তই, দাঁত ঢাকা পড়ে যায় গোঁফের আড়ালে। সুনীল হাসে দম টেনে, বাতাস বেরোয় না, ঢোকে।

ওই দমকের মধ্যে বাবু গোগিনির শখ হয় একটি প্রশ্ন করতে সবাইকে।

প্রশ্নটি হল, কেন ফরাসি পুরুষদের মুখ এত বড়, আর হাত এত ছোট?

কেউ জানে না এর উত্তর।

বাবু গোগিনি গম্ভীর মুখে উত্তর বলল, কারণ ফরাসি মেয়েদের স্তন খুব ছোট, আর স্তনবৃন্ত খুব বড়।

অডিল আর সানাল ছাড়া আর কেউ হাসল না।

মীনাক্ষী মুখ ঘোরাল।

সাহানা উঠে গেল।

প্রশ্নে প্রশ্ন বাড়ায়, সানাল বলে, আইন কী লিঙ্গ বলুন তো?

উত্তর নেই কারও মুখে।

উত্তর বলে দেয় সানাল, স্ত্রীলিঙ্গ।

উত্তর বলে দিব্যি মুখ বুজে বসে থাকে যতক্ষণ না এর কারণ জানার কৌতূহল কারও হয়। অডিলের হয়।

আইন স্ত্রীলিঙ্গ, কারণ আইনের ফাঁক আছে।

চৈতালি জিজ্ঞেস করে, কারও কি কমলার রস টস লাগবে?

প্রসঙ্গ দ্রুত ঘোরানো হচ্ছে।

আজ তোমার ছুটি, কাল থেকে সংসারধর্মে নেমে পড়তে হবে, বুঝলে। নীলার দিকে হাসিমাখা একখানা বাণী ছুড়ে দেয় কিষান।

সেই বাণীতে নীলা খুব বিদ্ধ বা রক্তিম হয় না।

চৈতালি নাক গলায়, সংসার কি আর একজনের, সংসারধর্মে নামতে হলে দুজনকেই নামতে হবে।

কিষান এক চুমুকে গেলাসের তলানিটুকু গিলে বলল, আমি অবিশ্বাসী লোক। আমার দ্বারা ধর্ম টর্ম পোষাবে না।

আর আমার বুঝি পোষাবে? নীলা প্রশ্ন করে।

তোমার পোষাতেই হবে। তুমি মেয়ে।

আসরের সবাই হেসে ওঠে, বড্ড জব্দ করা গেছে লেখাপড়া জানা মেয়েকে।

আরে কাছে এসে বসো না, বউ হয়ে এত দূরে দূরে থাকলে চলে! ঢুলু চোখে নীলার দিকে তাকিয়ে কিষান বলে।

আসরের সবাই প্রায় ঠেলে পাঠায় নীলাকে কিষানের পাশে।

কিষান গেলাসে চামচের টোকা দিয়ে সবার চোখ ওর দিকে ফিরিয়ে বলে, ভদ্রমহাশয় ভদ্রমহিলাগণ, আমার বউখানা বেশ সুন্দরী! ঠিক কি না?

নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। সমস্বরে রব ওঠে।

নীলার পিঠে বাহ বাহ বা জাতীয় চাপড় মেরে বলে কিষান, আরে দেখতে হবে তো কার বউ!

কিষানের এমন একটা বউয়ের দরকার ছিল বড়। তারিকের মত।

এমন কেমন?

এমন লক্ষ্মী, এমন সুন্দরী। আগাগোড়া ভারতীয়। ফিরিঙ্গিদের দিয়ে কি আর পোষায়! এদের সঙ্গে প্রেম করা যায়, বিয়ে করা যায় না। বিয়ে করলে ভাই ভারতীয়। তারিক বিশুদ্ধ হিন্দিতে বলে।

চৈতালি চেঁচায়, তারিক যা বলেছে, তা কি কেউ অনুগ্রহ করে অনুবাদ করে দেবেন, অডিলের জন্য?

অডিল সাহানা আর বাবুর সঙ্গে ফিসফিসে ব্যস্ত ছিল। চকিতে মুখ তোলে, কেউ কি বদনাম করছ নাকি আমার!

আরে বলছেন কী, সানাল বলে, বদনাম হবে কেন! যা বলছে সত্য বলছে, তবে সত্যটা বানিয়ে বলছে।

তারিক হেসে বলে, জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি, কিন্তু আমার বউয়ের মতো সুন্দরী আর কাউকে দেখিনি।

অডিলের গোলাপি মাড়ি অনেকক্ষণ বেরিয়ে থাকে।

আড্ডা, হঠাৎ কেউ লক্ষ করে না, টুকরো হয়ে যায়, এক দলে রাজেশ বাবু আর তারিক।

বুঝলে হে ভারতের অর্থনীতি আগামী দশ বছরে বিষম পালটে যাচ্ছে...

ধুর, ও গরিব, গরিবই থাকবে, দুর্নীতি সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে...

পুরো সিলিকন ভিলি চলে গেছে ভারতীয়দের হাতে। ইয়োরোপও এখন কমপিউটারদক্ষ লোক আনতে ভারতে ধর্না দিচ্ছে।

আরে টাকা ওই হাতে গোনা কিছু লোকের হাতে, বেশির ভাগ লোকই তো না খেয়ে মরছে।

না খেয়ে মরতে আমি পুরো ভারতে একটি লোককেও দেখিনি। সব পশ্চিমি প্রচার।

জনসংখ্যাই দেশটিকে মারছে।

তা কেন, জনতা হল শক্তি, একে কাজে লাগাও। ইয়োরোপের কলকারখানা বন্ধ হবার জোগাড় হয়েছিল, অন্য দেশ থেকে শ্রমিক না এনে এদের উপায় ছিল না।

আরেক দলে কিষান আর বাবু গোগিনি মুখে ফেনা তুলছে বলে যে

কংগ্রেস গেছে। একশো বছরেও আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না।

বিজেপির ওপরও আর ভরসা করা যাচ্ছে না। বাজপেয়ী আছে বলে বাঁচোয়া।

ডানপন্থী বামপন্থী সব দলের গোমর ফাঁস। জ্যাক শিরাখ মস্ত টাকা ঘুষ নিয়েছে দলের জন্য, সে জানো?

জসপার দলে যে চোর নেই তা না।

হোসে বোভে যে হারে জনপ্রিয় হচ্ছে, নির্বাচনে দাঁড়ালে ঠিকই পাশ করে যাবে।

আরে ধুর, এ সব হুজুগ। নিজের ব্যবসার সুবিধে হলে ম্যাগডোনাল্ডস অসুবিধে নয়। দিক না ওরকম সস্তায় খাবার, প্রতিযোগিতার নাম শুনলে বাবুদের মাথায় আকাশে ভেঙে পড়ে।

এক কোণে সানাল আর সুনীল। অনর্গল ফরাসি ভাষায় বকে যাচ্ছে। প্রসঙ্গ ক্রিকেট।

অডিল আর মীনাক্ষী একদিকে। মূলত ওদের বাচ্চাদের গল্প।

নীলা আর চৈতালির সঙ্গে যোগ হল সাহানা।

প্রসঙ্গ সংসার। নতুন সংসার। বাজার সদাই। কোথায় কোন দোকানে পাঁচফোড়নের মশলা পাওয়া যায়, দেশি মাছ কোন দোকানে ভাল। তারপর কী রাঁধতে গিয়ে কী দিলে স্বাদ হয় ভাল।

কিষানের দলে রাজনীতি সরিয়ে ঢুকল ব্যবসাপাতি।

মুরগিতে সালমোনেলা, পাগল গোরু রোগ!

যত্তসব প্রচার।

মাছ মাংসের ঢালাও আমদানি হচ্ছে, দেশি মাংসের চড়া দাম।

ধুত, এদেশে ভারতীয় রেস্তোরাঁ করে লাভ নেই, রেস্তোরাঁর ব্যবসা চলে ইংলন্ডে। অবাধ অনুপ্রবেশকারীগুলো দল বেঁধে ইতালি চলে যাচ্ছে, কাজ করাব কাকে দিয়ে। কিষান বলে। তারপর নীলার দিকে তাকিয়ে, এক চোখ ছোট করে, বউকেই নামিয়ে দেব ব্যবসায়, ও রাঁধবে, আমি বাড়ব।

কী কেমন রাঁধো তুমি? কিষান কনুই ঠেলে নীলার পেটে।

আমি রাঁধতে জানি না। নীলা নিজের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বলল।

কিষান জোরে হেসে উঠে। বলে কী মেয়ে, মেয়ে হয়েছ, রাঁধতে জানো না?

আমার রেস্তোরাঁয় গিয়ে দেখো, জীবনে যে ছেলেগুলো দেশের রান্নাঘরে উঁকি অব্দি দেয়নি, তারা কী দিব্যি রাঁধছে। তোমারও হয়ে যাবে।

সুনীল ক্রিকেট প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে বলে, এই এই এই নতুন বউকে এক্ষুনি রান্নাবান্নার কথা বলছেন, আরে যাক না কটা দিন।

অনেক তো প্যাঁচাল হল, চৈতালি আপনি একটা গান করুন। চৈতালির হাতে চাপ দিয়ে বলে নীলা।

গান? ওরে বাপ। গান হল বাঙালির আড্ডায়। অবাঙালিরা গানের বোঝে কী! যত্তসব বেরসিক।

চৈতালি বাংলায় বলে। অবাঙালির দল থেকে কারও তেড়ে আসার তাই লক্ষণ নেই।

রাত আটটায় এক কালো সুট নেকটাই ঢুকল। হাতে খাবারের প্যাকেট। কিষানের রেস্তোরাঁর খাবার। রুটি সবজি। কিষানলাল নিরামিষাশী। এ বাড়িতে মাছ মাংস চলে না।

টেবিলে খাবার রেখে কালোসুট নেকটাই মোজাম্মেল বউ দেখতে এল কিষানের। মুখে এক গাল হাসি। চোখ এমন যে মনে হয় কাজল পরে আছে।

দিদি, আমি কিষানবাবুর দোকানে কাজ করি। বাংলাদেশের ছেলে।

বাঙালি!

নীলার দু চোখে দু ফোঁটা আনন্দ।

চৈতালি টেবিল সাজিয়ে দেয়, কেউ বসে টেবিলে, কেউ সোফায়।

সুনীল খেতে খেতে বলে, মাছ ভাত খেতে ইচ্ছে হলে আমাদের বাড়ি চলে এসো নীলা। চৈতালি চমৎকার রান্না করে।

নীলা বলে, আমার তো এক্ষুনি লোভ হচ্ছে খেতে। রুটি সবজি একদিন খাওয়া যায়, দুদিন না।

মোজাম্মেল তার হাসি মুখে নিয়ে বলে ওঠে, কোনও চিন্তা নেই দিদি, তাজমহলে চলে আসবেন। মাছ মাংস বেশ ভাল রাঁধে আমাদের বাবুর্চি।

খাবার পরও আড্ডা গড়ায় অনেকক্ষণ। কিষান নতুন বোতল খুলেছে। বাড়িতে সিজোফ্রেনিক ছেলে রেখে এসেছে বলে তারিকদম্পতি আগে ভাগে চলে যায়। রাজেশ দম্পতিও। সুনীলদম্পতি তাদের টুম্পামণিকে সানদানিতে এক আত্মীয়ের বাড়িতে রেখে এসেছে, ও বাড়িতে ঘুমোবে সে। ওদের তাই তাড়া নেই ওঠার। বোতল খালি হলে সানাল ওঠে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে হুকে ঝুলিয়ে রাখা গরম জ্যাকেট পরতে পরতে সানাল সবাইকে শুনিয়ে বলে, নীলাবউদি, যাবার সময় দু গালে চুমু দিতে হয় এদেশে। আমি ইচ্ছে করেই তোমাকে দিচ্ছি না। আজ যত ইচ্ছে চুমু খাবার দায়িত্ব কিষানকে দিয়ে গেলাম। ওর প্রাপ্য। কী বলো কিষান।

কিষান তখনও সোফায় বসা, শার্টের বোতাম ফেটে পেট বেরিয়ে আছে। পেট না তো পেটের তেল।

ফ্যাক ফ্যাক করে হাসে সে। মোচের তলে কোদালি দাঁত বেরিয়ে এসেছে, পেটের তেলও সে হাসিতে আরও বেরিয়ে আসে।

সানালের প্রস্থানের পর সুনীল আর চৈতালি যাবার উদ্যোগ করে।

কী ব্যাপার সবাই চলে যাচ্ছেন! বাড়িটা ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে। থেকেই যান না আজ রাতে। চৈতালির হাতখানা নীলা ধরে রাখে নিজের শক্ত হাতের মুঠোয়।

পাগল মেয়ে। সুনীল দম টেনে হাসে।

নীলার হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে হুক থেকে নামিয়ে ওর গরম কোট পরে নেয় চৈতালি।

ওরা অদৃশ্য হতেই হঠাৎ এক স্তব্ধতা বন্ধ জানালা দরজা ভেঙে হুড়মুড় করে ঘরে ঢোকে। উৎসব শুরু হয় স্তব্ধতার মাতাল নৃত্যের।

নীলা একা বোধ করে, যদিও ঘরে সে একা নয়।

নীলা একা বোধ করে, যদিও জানে ঘরে যে মানুষটি বসে আছে, সে তার পরম আত্মীয়, তার স্বামী।

বিছানায় ওভাবেই ওরকম গা ভর্তি অলংকার আর কাতান পরেই (দ) হয়ে শুয়ে থাকে নীলা। আর কিষান সেই দ ভেঙে(।) করে বুকের আঁচল সরিয়ে ব্লাউজের বোতাম পটাপট খুলে নেয়, কাঁচুলি ঠেলে সরাতেই নীলার স্তনজোড়া লাফিয়ে ওঠে। শক্ত আঙুলে সেদ্ধ আলু ডলার মতো দুরন্ত স্তনদুটোকে ডলে নিস্তেজ করে কিষান। ফোঁস ফোঁস শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ঘরে। কিষানের লোমশ শরীরের তলে সে নিসাড় পড়ে থাকে। নিজেকে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি সুখ পাও এ সবে?

নিজেকেই উত্তর দেয়, না।

সংসারধর্ম

১

ওঠো ওঠো।

ওঠো ওঠো বেলা অনেক।

সারারাত ঘুম হয়নি তার, ভোরের দিকে ক্লান্তিতে চোখ বুজে এসেছিল। ডাক শুনে সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে, এ কোথায় নীলা, এ তার কলকাতার ঘর নয়, এ তার বিছানা বালিশ নয়। কিষানের দিকে চোখ পড়তে, কিষানের মোটা কালো মোচে, হোঁদল কুতকুতে চোখে, বসন্তের দাগ বসা গালে, তার চেতন ফেরে, এ তার স্বামীর ঘর, স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে সে এখানে, এই রু দ্য ফুবো সানদানিতে, এই ছ'তলায়, এই প্যারিসে, ধবধবে সাদা বিছানা বালিশে। কিষান কোমরে তোয়ালে পেঁচিয়ে স্নানঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, দেখো তো কাল রাতের বাসনপত্র ওভাবেই পড়ে আছে।

ওসব যে পড়ে আছে, নীলা রাতেই দেখেছে। বাসনপত্র কলকাতার বাড়িতে এরকম পড়ে থাকলে কোনওদিন সে ফিরে তাকায়নি। বাসন সরিয়ে নেবার, ধোবার, গুছিয়ে তুলবার লোক আছে। কিষান স্মরণ করিয়ে দেয়, কলকাতায় রাজার হালে বাস করা গেলেও প্যারিসে যায় না। এখানে মেথরের কাজও নিজের হাতে করতে হয়। কলকাতায় হলে নীলা অনেকক্ষণ বিছানায় শুয়েই কাটাত। চিত্রা চা আর খবরের কাগজ দিয়ে গেলে চা খেয়ে কাগজ পড়ে তবে বিছানা ছাড়ত। বিছানা ছেড়ে আরেক দফা চা। এ বাড়িতে চিত্রার বংশও নেই। নীলাকেই উঠতে হবে। উঠে কাল রাতের এঁটো বাসনপত্রের ঝামেলাও নীলাকেই ঘোচাতে হবে। ওঠে সে।

সুতি একটি শাড়ি গায়ে জড়িয়ে, চা চড়াতে রান্নাঘরে ঢুকে আঁতিপাতি করে খুঁজেও চা পাতা না পেয়ে, স্নানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, চা পাতা কোথায় রেখেছ?

কিষান স্নান সেরে দাড়ি কামাচ্ছিল, অর্ধেক গাল ফেনায় সাদা, অর্ধেক কামানো। আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে, চোখে বিস্ময়ের ফেনা তুলে বলে, চা কে খাবে, চা তো আমি খাই না!

বলো কী! চা খাও না তুমি?

নীলার নেত্রমলে সংশয়। কৈশোর পার হয়েছে, অথচ চা পান করে না, ভারতবর্ষে এমন লোক নীলা কখনও দেখেনি।

নাহ।

আবার আয়না। ফেনার গাল টান করে ধরা। ফেনার গালে ধারালো ব্লেড।

আমার চা না হলে চলে না, সকালে অন্তত দু কাপ আমার লাগেই। নীলা দরজায় দাঁড়িয়ে আঙুলে চোখের পিচুটি মুছতে মুছতে বলে। পিচুটি যায়, সংশয় লেগে থাকে। ও আঙুলে

ওঠে না।

চায়ের নেশা করো নাকি?

নেশা ঠিক না। অভ্যেস। নীলা বলে।

এই তো মুশকিলে ফেললে।

মুশকিলে?

এক বাড়িতে দুরকম অভ্যেস থাকলে মুশকিলই তো।

নীলা স্নানঘরের দরজা থেকে সরে আসতে আসতে শোনে কিষান বলছে, আমার দেরি হয়ে গেল।

পাঁউরুটি, মাখন, জেলি, কমলার রস, টেবিলে সাজিয়ে দেয় সে। স্বামী যখন সকালে আপিসে যায়, ঘরের বউদের ব্যস্তসমস্ত হয়ে এভাবেই প্রাতরাশের আয়োজন করতে হয়। বুদ্ধি হবার পর থেকে সে দেখছে, অনির্বাণের কখনও আওয়াজ দিতে হয় না যে তাঁর দেরি হচ্ছে বা কিছু, ভোরবেলা নিঃশব্দে বিছানা ছেড়ে মলিনা উঠে যান রান্নাঘরে, স্বামীর জন্য নিজে হাতে রুটি বেলে ভেজে গরম গরম আলুপুরি ডালপুরি, অনির্বাণের মুখে যা যা রোচে, ঠিক তাই তাই তৈরি করেন। সংসারধর্মে মলিনার কোনওদিন কোনও ত্রুটি হয়নি। নীলা মলিনার কন্যা, লোকে বলে মায়ের মতোই নাকি নম্র, শ্রীল, সুবোধ, শান্ত সে, মায়ের মতোই প্রিয়ংবদা, তার কেন ত্রুটি হবে স্বামীসেবায়।

গতরাতের বাসনপত্রও তড়িঘড়ি সরিয়ে নেয় নীলা।

কিষান সুটেড বুটেড সাহেব, টেবিলের সরঞ্জাম দেখে বলে, বাহ বেশ লক্ষ্মী বউ তো তুমি!

কেন লক্ষ্মী বলছ, টেবিলে খাবার এনে রেখেছি বলে?

কেবল কি তাই! কিষান চোখ ছোট করে হাসে।

অনির্বাণ এরকমও কখনও হাসেননি মলিনার দিকে চেয়ে। বরং প্রায় দিনই অনুযোগ করেছেন, সবজিটা একটু কম সেদ্ধ হয়েছে, ডিমের কুসুমটা ভেঙে গেছে, রুটির কোনাটা পুড়ে গেছে বলে। নীলা নিজের ভাগ্যকে বাহবা দেয় কিষানকে অসন্তুষ্ট তো নয়ই, বরং অল্পতে তৃপ্ত হতে দেখে।

তুমি ফিরছ কখন? নীলা জিজ্ঞেস করে।

ঠিক নেই। ঠিক নেই কারণ কিষান নটা পাঁচটা চাকরি করে না যে বলবে পাঁচটায় আপিস থেকে বেরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা দেব, রাস্তায় ট্রাফিকে নেবে পঁয়ত্রিশ মিনিট, আর ছ মিনিট যাবে নীচে রাস্তায় গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজতে, আর দু মিনিট ওপরে উঠতে, ফিরব পাঁচটা তেতাল্লিশে। দুটো রেস্তোরাঁ চালায় কিষানলাল। মঁপারনাসে তাজমহল নামে একটি, দ্বিতীয়টি লাল কিল্লা, পনেরো এরনদিসমোয়। লাল কিল্লাটি ভাল চলছে না, নাম পালটালে ভাল চলবে, কিষানের বিশ্বাস।

একটা নাম ভাবো তো! কিষান বলে।

সারাদিন আমি কী করব? নীলা কিষানের মুখোমুখি বসে গালে হাত, মাথা ঝুঁকে থাকে ডানে, চোখ কিষানে, জিজ্ঞেস করে।

বসে বসে আমার কথা ভাববে।

আর?

আর কী? এ ভেবেই কি সময় ফুরোবে না?

যদি না ফুরোয়? নীলার উদাসীন প্রশ্ন।

এও কথা বটে।

খুব শিগরি নীলাকে নিয়ে তার বাইরে যেতে হবে, গরম জামা জুতো কিনতে, শিগরিটি ঠিক কবে, তা অবশ্য সঠিক করে কিষান বলে না।

নীলার চোখ কিষান থেকে সরে গিয়ে জানালায় আটকে থাকে। বাইরের স্বর্গে।

আচ্ছা ওটা, ওটা কি রাজার বাড়ি? আঙুল তুলে জানালার ওপারে গায়ে গায়ে মূর্তি বসানো একটি বাড়ি দেখায় সে।

রেল ইশটিশন। গার দ্য নর্দ।

বলো কী? ইশটিশন এত সুন্দর হয়?

নীলা দৌড়ে যায় জানালার দিকে।

শহরটা কখন ঘুরে দেখাবে? গলায় তার শিশুর আহ্লাদ। পতিব্রতার সাধ আহ্লাদ অত থাকতে নেই, তবুও।

কাল তো শহর খানিকটা ঘুরে দেখালাম, এত অস্থির হচ্ছ কেন, সবে তো এলে, দেখার জন্য তো সারা জীবন পড়ে আছে তোমার। বলে বেরিয়ে যায় কিষান।

দেখার জন্য সারাজীবন পড়ে আছে, নীলা তা জানে। তবু প্রতি লোমকূপে অস্থিরতার উদ্বাহু নৃত্য দেখে সে। ইস্পাতের ঘরটিতে বসে ঠিক যেরকম দেখেছিল। ওই ঘরে বসেও সে অপেক্ষা করছিল ছুটি পেতে, এ ঘরেও একই রকম অপেক্ষার অনুভব নীলার। ছুটি পাবার অপেক্ষা, কোত্থেকে ছুটি, কোথায় যেতে, স্পষ্ট করে কিছু সে জানে না যদিও। এ ঘরেও একই রকম ডানা ঝাপটায় প্রাণপাখি। ইস্পাতের দেয়ালের চেয়ে কিছু কম নির্জীব নয় এ বাড়ির দেয়াল।

জানালায় উদাসীন বসে থেকে নীলা দেখে নীচের রাস্তায় মানুষ হাঁটছে, গাড়ি ছুটছে, সুনসান নিস্তব্ধতার মধ্যে সভ্য সুন্দর সুচারু ব্যস্ত জীবন মানুষের। কলকাতা বিষম চিৎকারে ফেটে পড়ে এই মাঝ দুপুরে—ভোঁ বাজার, ট্রাকের চাকা ফাটার, ঠেলাগাড়ির, ফিরিঅলার, ভিখিরির, কুকুরের ঝগড়ার, জলকলে মেয়েমানুষের চুলোচুলির তীব্র শব্দ, হল্লা হুল্লোড়ে কলকাতা এত তেতে ওঠে যে, তিষ্ঠোনো দায়। নীলার মনে হতে থাকে পৃথিবীর বাইরে কোথাও চলে এসেছে সে, যেখানে জঞ্জাল নেই, ঝঞ্ঝাট নেই, বিসদৃশ কিছু নেই, অসংবৃত, অশোভন, অকুলীন কিছু নেই।

এ শহর তেতে ওঠে না, চেঁচায় না, তা ঠিক, কিন্তু এ শহরে সবারই ব্যস্ততা আছে, কেবল তারই নেই, তারই নটা পাঁচটা নেই, এক তারই অপেক্ষা কেউ করছে না কোথাও। নীলা আনমনে তার অলস অবসর জুড়ে গাইতে থাকে ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে। গাইতে গাইতে নিজের স্বরে নিজেই চমকায় সে। গার দ্য নর্দ-কে মনে হতে থাকে ফরাসি রাজার বাড়ি, আর রাজার ছেলে সে বাড়ির জানালা খুলে দেখছে দূরে এক দৈত্যের ঘরে বন্দি এক রাজকন্যা, খোঁপা ভেঙে ঘন কালো দীঘল চুল গড়িয়ে পড়েছে তার। বুকে

পিঠে। রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে বন্দিনীকে উদ্ধার করতে ছুটে আসছে, হাতে তার জাদুর কাঠি, সে কাঠি ছোঁয়ালেই দৈত্যের ঘরের দরজা আপনাতে সিসিম ফাঁকের মতো খুলে যাবে, রাজকন্যাকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে রাজপুত্র সেই প্রাসাদের সিংহদরজায় নামবে, তারপর দুজন হাত ধরে হেঁটে যাবে অন্তঃপুরের দিকে। নিজের হাতটির দিকে তাকায় নীলা, কিষান কখনও এই হাতটি হাতে নিয়েছে বলে তার মনে পড়ে না। হাতে হাত ছুঁয়ে গেছে নিশ্চয়ই, শখ করে এই সরু সরু আঙুলের দিকে, রাঙানো নখগুলোর দিকে বাহ বেশ তো ধরনের দৃষ্টিও, নীলার মনে পড়ে না, কিষান ছুড়েছে। নীলার শরীর নিয়ে অন্ধকারে প্রমোদবিহারে যখন সে নামে, তখন তার প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ কিষানের এ তার একেবারেই মনে হয় না, বড়জোর নীলার একটি অঙ্গ লাগি ফোঁসে কিষানের একটি অঙ্গই। নীলার লাবণ্যলতা আঙুল, সুবিন্যস্ত রক্তিম নখ, ভ্রমর কালো চোখ, দীঘল ঘন চুল অন্ধকারে নমশুদ্র অস্পৃশ্যের মতো পড়ে থাকে।

জানালা থেকে সরে সারা বাড়িতে বই খোঁজে নীলা। থানইটের মতো গোটা পাঁচেক টেলিফোনের বই, একটি ইংরেজি ফরাসি অভিধান, তিনটে রান্নার বই হিন্দি ভাষায়, দু বছর আগের সাতটি ল মন্দ পত্রিকা, চারটে হেরাল্ড ট্রিবিউন, আর তিনটে পর্নো ম্যাগাজিন, এ ছাড়া পাতি পাতি করে খুঁজেও নীলা আর ছাপার অক্ষরের কিছু পায় না। হাল ছেড়ে গানের জগতে হামলে পড়ে, হিন্দি সিনেমার গান, চারটে ইংরেজি, কিছু ভাংড়া, আর একখানা এডিথ পিয়াফ, এই। রবীন্দ্রসংগীতের রও নেই, এমনকী ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ছিটেফোঁটাও ভাণ্ডারে নেই। এডিথ পিয়াফ চাপিয়ে নীলা দেখে একই সুরে কিচিরমিচির করে যাচ্ছে এ দেশের ছোট্ট চড়ুই। অচেনা জায়গায় অচেনা কিচিরমিচির শুনলে আরও একা লাগে। এডিথ পিয়াফ বন্ধ করে ঘর থেকে ঘরে হাঁটে নীলা। সঙ্গে হাঁটে তার পায়ের শব্দ শুধু। অতঃপর এক বর্ণ ফরাসি না বোঝা নীলা টেলিভিশন খুলে সাদা মানুষের হাসি ঠাট্টা দৌড় ঝাঁপ দেখতে থাকে মন দিয়ে। মগ্নতা ভাঙে ফোনের শব্দে, তখন বিকেল, ওপাশে কিষানের স্বর, কী রেঁধেছ গো গিন্নি?

গিন্নি তো কিছু রাঁধেনি।

কিষান বলে, তা হলে খাব কী গো? স্বামীকে না খাইয়ে মারবে?

নীলা ঠিক কী উত্তর দেবে বুঝে পায় না। আপাতত বিধবা হওয়ার ইচ্ছে তার নেই।

কিষানের গম্ভীর গলা, একেবারে ভুলে গেছি, বুঝলে। তোমাকে দরজার চাবি দিয়ে আসা উচিত ছিল। বাড়িতে আগুন ধরলে...

আগুন ধরবে কেন? নীলা জিজ্ঞেস করে।

আরে, দুর্ঘটনা ঘটে না? চুলো টুলো থেকে। সাবধানের মার নেই।

তা ঠিক, সাবধানের মার নেই। আগুন ধরলে সে আগুন কী করে নেভাবে সে নিয়ে ভাবছিল, এবং বুঝে পাচ্ছিল না আগুনের সঙ্গে চাবির সম্পর্ক কী হতে পারে। জিজ্ঞেস করল, কী হবে আগুন ধরলে?

তখন চাবি থাকলে বেরোতে পারবে। তেষ্টা পেলে জল পান করার মতো সোজা উত্তরটি দেয় কিষান।

ও। নীলা বোঝে উত্তরটি, ঘরে আগুন লাগলে প্রাণ বাঁচাতে ঘরের বাইরে যাবার স্বাধীনতা তার সম্পূর্ণই আছে। আগুন না লাগলে প্রাণ বাঁচানোর প্রশ্ন নেই, প্রশ্ন ওঠে না।

কিন্তু যদি ওঠে!

রান্নাঘরে এঁটো বাসন ধুতে ধুতে, ভাত ডাল আর সবজি রাঁধতে গিয়ে, বারবারই ভাবল সে, যদি ওঠে!

নীলার ভাত গেল পুড়ে, সবজি রইল অসেদ্ধ, ডাল হয়ে গেল নুনে তেতো।

সন্ধের পর বাড়ি ফিরে ভারী শরীরটিকে কিষান ছুড়ে দিল সোফায়।

কাপড় জামা খোলো! হাত মুখ ধোও, বাইরে থেকে এসেছ। নীলা বলে, বলে টের পায়, বোনের স্নেহ উপচে পড়ছে কণ্ঠে তার।

এ কি তোমার নোংরা কলকাতা পেয়েছ যে বাইরে থেকে এলে ধুলোবালি দূর করতে হাত মুখ ধুতে হবে! হা হা! কিষান বলে।

সারাদিন এমন ভারী জুতো পরে আছ, জুতোটা খোলো অন্তত! বলে নীলার মনে হয়, ঠিক এভাবে মলিনা তাঁর পুত্রধন নিখিলকে জুতো খুলতে বলেন।

খুলে দাও না। কিষান দু পা এগিয়ে দেয় নীলার দিকে।

কিষানের পায়ের কাছে বসে সরু আঙুলে জুতোর সরু ফিতে ঢিলে করে জুতো খোলে নীলা, মোজা খোলে।

নিজেকে এবার ঘরের দাসীর মতো মনে হয়, যেন চিত্রা সে, চিত্রা এরকম জুতো খুলে দেয় বাড়িসুদ্ধ লোকের।

স্নানঘরে ময়লা কাপড়ের ঝুড়ি আছে। ওতে রেখে দাও। কাল ধুয়ে দিও সব। কিষানের কণ্ঠ স্বামীর অথবা প্রভুর। বাড়ির বউকে অথবা দাসীকে যে কণ্ঠে কিছুর আদেশ করা হয়, এ ঠিক সে কণ্ঠ।

ময়লা মোজা দুটো স্নানঘরে নিতে নিতে নীলা ভাবে, রাতে বিছানায় তাকে দিব্যি পতিতা সাজতে হবে, পতিতারা যেমন করে দুটো পয়সার জন্য শরীর বিকিয়ে দেয় তেমন করে বিকোতে হবে তার নিজেকে। পতিতার খদ্দেরে এবং স্বামীতে কোনও পার্থক্য আছে কি না নীলা ভাবে। যে পার্থক্যটি সে দেখে, তা হল পতিতাকে তার পাওনা বুঝিয়ে তবে খদ্দেরকে পার পেতে হবে, কিন্তু স্ত্রীর পাওনা না মিটিয়েও স্বামী পার পেয়ে যায় বা যেতে পারে। পতিতার স্বাধীনতা স্ত্রীর চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে বেশি বলে তার মনে হয়।

নীলা ভাবে, মা বোন আর পতিতা এই তিন চরিত্রে দক্ষ অভিনয় করতে হয় স্ত্রীকে না কি এ অভিনয় নয়, এই তিন চরিত্র নিয়েই জন্ম হয় যে কোনও মেয়ের।

কী কেমন লাগছে প্যারিসে? কিষান বলে।

নীলা জানালায় উদাস তাকিয়ে উত্তর দেয়, এই প্রথম ভারতের বাইরে আসা। মাঝে কোনও সমুদ্দুর নেই, তবু মনে হয় যেন সাত সমুদ্দুর পেরিয়ে এসেছি। অন্য এক জগতে, বড় অচেনা।

কিষান ধীরে মাথা নাড়ে, ধীরে বলে, যাক না কটা বছর, দেখবে ভারতকেই অচেনা

লাগছে। জীবন এরকম নীলা, অভ্যেস, আর কিছু নয়। এখানকার জীবনে অভ্যস্ত হলে ভারতের জীবনে তুমি খাপ খাওয়াতে পারবে না, যদিও ভারতেই তোমার জন্ম, বড় হওয়া।

তা কী কী করলে সারাদিন? কিষান প্রশ্ন করে।

সারাদিন একা লেগেছে। ওদের ফোন নম্বর থাকলে কথা বলতে পারতাম...

ওদের কাদের?

ওই কাল রাতে যারা এসেছিল...

ওদের সঙ্গে খামোকা কথা বলতে যাবে কেন? কাল রাতের ব্যাপার কাল রাতেই শেষ। কাজের কাজ হল দেশে ফোন করা।

কিষান কলকাতায় ফোন করে। মধ্যরাত ওখানে, ঘুমোবার আয়োজন চলছে। নীলা পৌঁছেছে, ভাল আছে, কাল অনেকটা বিয়ের অনুষ্ঠান মতো হল এ বাড়িতে, কিষান জানাল। অনির্বাণের সঙ্গে কথা হওয়ার পর নিখিলের সঙ্গে হয়, শেষে মলিনার মলিন কণ্ঠের সঙ্গে।

কী যে ফাঁকা লাগছে বাড়ি। তুই তো কখনও দূরে যাসনি আগে। মলিনার কণ্ঠ ওপাশে কাঁদে।

ধমকে ওঠে নীলা, থামো তো! বোকার মতো কাঁদছ। ওই বাড়িতে, ওই বালিগঞ্জে আমি পচে মরলে তোমার বুঝি ভাল লাগত!

কেমন আছিস, বল আমাকে। মলিনা জিজ্ঞেস করেন।

নীলা উচ্ছ্বসিত, ভাল আছি, খুব ভাল আছি। এখানে সব কিছু খুব সুন্দর। কাল রাতে খুব মজা হল। অনেক লোক এসেছিল। চমৎকার লোক সব।

ওপাশে তবু বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদেন মলিনা।

নীলার রাগ হয় কান্না শুনলে। মা ব্যাপারটি বড় বিচ্ছিরি, মেয়ের বিয়ে না হলে কেঁদে বালিশ ভেজান, আর হলেও বুক ভাসান।

কিষান মদ নিয়ে আয়েশ করে বসে। খেতে খেতে তার রেস্তোরাঁ লাল কিল্লায় লাল বাতি জ্বলছে জানায়। শিগরি নাম পালটাতে হবে। নীলা ঠিক বুঝে পায় না, নাম পালটালে লাল থেকে বাতি সবুজে যাবার কী কারণ। প্রশ্ন করলে কিষান হাসে, বলে এ সব বুঝবে না। বুঝিয়ে দাও, বুঝব। নীলা আবদার করে। বোঝালেও নীলা বুঝবে বলে কিষানের মনে হয় না। মেয়েদের ব্যবসাবুদ্ধি সাধারণত থাকে না বলেই সে জানে।

সুরুচি, খাবার দাবার, তৃপ্তি এই নামগুলো নীলা প্রস্তাব করে রেস্তোরাঁর নামের জন্য। কিষান উড়িয়ে দেয় নামগুলো মদগন্ধ হাওয়ায়। চলবে না। কী চলবে তা হলে? চলবে গান্ধী। গান্ধীর সঙ্গে ভারতীয় খাবারের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক না থাকলেও গান্ধীর সঙ্গে ফরাসিদের সম্পর্ক আছে, ফরাসিরা গান্ধী নামটি যত জানে, লাল কিল্লা তত জানে না। রেস্তোরাঁয় খাবারের মান কতটুকু পালটাবে? সে একই থাকবে, আগের বাবুর্চিই রাঁধবে, আগের লোকরাই পরিবেশন করবে।

বোতল অর্ধেক খালি হলে কিষান খেতে বসে। স্বামীকে থালায় ভাত তরকারি বেড়ে দিয়ে চুক চুক করে দুঃখ করে নীলা, রান্না ভাল হয়নি বলে। অপরাধী মুখ করে সে বসে থাকে সামনে। খেতে খেতে কিষান বলে, শত হলেও বউয়ের হাতের রান্না।

নীলা জানে স্ত্রীর হাতের রান্না খেতে সব স্বামীই পছন্দ করে। অনির্বাণ যদিও মলিনার রান্নার ত্রুটি সকাল বিকাল আবিষ্কার করতেন, কিন্তু চিত্রার হাতে রান্না কিছুতে মুখে তুলতেন না। একবার মলিনা জ্বরে পড়ে শুয়ে রইলেন, চিত্রা রান্নাবান্না করল, নিখিল খেল, নীলা খেল, কিন্তু অনির্বাণ খাবেন না। মলিনাকে জ্বর গায়ে নিয়ে রাঁধতে হল, তবে অনির্বাণ খেলেন। এতে অনির্বাণই যে কেবল তৃপ্তি পেয়েছিলেন তা নয়, মলিনাও পেয়েছিলেন।

কিষান খাওয়া শেষে বলে আমি বাচ্চুকে, রেস্তোরাঁয় যে ছেলেটি রাঁধে, একদিন বাড়িতে পাঠিয়ে দেব রান্না শেখাতে।

নীলা হেসে বলে, রান্নাও অভ্যেসের ব্যাপার।

রান্না যেমন অভ্যেসের ব্যাপার, স্বামীর সঙ্গে এক বিছানায় ঘুমোনোও। বিয়ের পর প্রথম যখন কিষান শুয়েছিল নীলার সঙ্গে, সারারাত হাঁসফাঁস করেছে নীলা, হাত পা ছুড়ে শোয়া, এপাশ থেকে ওপাশে গড়ানো সম্ভব হচ্ছিল না বলে। ধীরে ধীরে বেশি অর্ধেক জায়গা ছেড়ে দেবার, হাত পাকে শেকলবন্দি করার এবং নাক ডাকার শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতে অভ্যস্ত হয়েছে সে, এটিকে ধাতস্থ করেছে ধীরে, এটিই মজ্জাগত হবে তার।

কিষান যখন শাড়ি সরিয়ে হাঁ মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে বুকে, আহ্লাদি গলায় বলে নীলা, আমি কিন্তু কাল একটু রাস্তায় হাঁটতে চাই।

কেন?

এমনি?

এমনি এমনি কেউ বেরোয় নাকি?

দূরে যাব না। কাছেই।

এই নোংরা এলাকায় কী হাঁটবে?

নোংরা বলছ? এমন ঝকঝকে।

একা হাঁটবে? হারিয়ে যাও যদি। সামনের শনিবার আমি সময় পাব, তখন তোমাকে ইফেল টাওয়ার দেখাতে নেব।

এদিকে ইফেল টাওয়ারের স্বপ্নে নীলা বিভোর, ওদিকে কিষান পরমানন্দে নীলার টাওয়ার এর চুড়োয়...

২

ছদিন অপেক্ষা করার পর সামনের সেই শনিবার এল। নীলাকে গরম জামা জুতো কিনে দিয়ে ইফেল টাওয়ার দেখিয়ে মঁপারনাসে তাজমহল রেস্তোরাঁয় থামে কিষান। মালিকের বউ এসেছে, ছড়িয়ে পড়ে খবর।

কালো সুট নেকটাই মোজাম্মেল এক গাল হেসে এগিয়ে আসে দিদি কী খাবেন বলুন, চা কফি, নাকি ঠাণ্ডা কিছু?

নীলা চা খাবে, কারণ তার মনে হচ্ছে বছর চলে যাচ্ছে তার চা খাওয়া হচ্ছে না। চায়ের

তৃষ্ণা চা ছাড়া আর কিছুতে মেটে না।

কী চা, ভারতীয় চা, না কি কালো চা?

নীলা অবাক হয়, ভারতীয় চা কী রকম শুনি?

দুধ দিয়ে, এলাচ লবঙ্গ দিয়ে। নীলা ওয়াক থু করে, সে চায়ে দুধই নেয় না, আবার এলাচ লবঙ্গ।

চা এল। এক দঙ্গল বাঙালি ছেলেও এল। রান্না ফেলে বাচ্চুও। এদের কারও বাড়ি যশোর, কারও রংপুর, কারও বরিশাল। হৃদয়ে নীলার খুশির জোয়ার ওঠে, বলে, আমার বাবার বাড়ি ছিল ফরিদপুর। দেশভাগের সময় বাবা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে এলেন, আর ফিরে যাননি।

ছেলেগুলোও নীলাকে, যেন ওদের পাড়াতুতো বোন, মেঘনা যমুনা পদ্মার গল্প শোনাল। দেখে কিষান ক্যাশবাক্সের সামনে থেকে চেঁচায় বাঙালির আড্ডা হচ্ছে তাই তো! এই বাঙালির মতো অলস জাতি এ জগতে নেই। কেবল খাও, ঘুমোও আর আড্ডা দাও। চলো চলো।

আরে চাটা খেতে দাও তো। নীলাও গলা তোলে। বাঙালি পেলে এই হয়, গলায় জোর বাড়ে। কেবল কি গলায়, নীলা অনুমান করে, খানিকটা মনেও।

চা খেতে খেতে নীলা জানল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞানে লেখাপড়া করেছে, সর্বোচ্চ ডিগ্রিও নিয়েছে, ঢাকায় চাকরি জোটেনি বলে উপার্জনের আশায় মোজাম্মেল ফ্রান্সে এসেছে ন্যাজ তিন বছর। গলা কাটা পাসপোর্ট নিয়ে এ দেশে এসেছে।

এ আবার কী জিনিস?

এ হচ্ছে অন্যের পাসপোর্টে ছবি থেকে গলা কেটে নিয়ে নিজের গলা বসিয়ে দেওয়া।

নীলা শিউরে ওঠে।

মোজাম্মেল বলে, কী আর করা, বিদেশের ভিসা তো পাব না...ভিসাঅলা পার্সপোর্ট কিনতে পাওয়া যায়, জমিজমা বাবার যা ছিল বিক্রি করে পাঁচ লাখ টাকায় সে পাসপোর্ট কিনে, তারপর...

নীলা উৎসুক।

তারপর ফ্রান্সে এসে কাজ শুরু করলাম।

কী কাজ?

রাস্তায় গোলাপ বিক্রি।

পদার্থবিজ্ঞান পড়ে ফুল বিক্রি?...কেন এখানে ভাল কোনও চাকরি পেলেন না? উৎকণ্ঠায় কাঁপে নীলার স্বর।

মোজাম্মেল হেসে বলল, আমাদের লেখাপড়ার কোনও মূল্য নেই এখানে। ঝাড়ুদারের চাকরিও করেছি কিছুদিন।

এই রেস্তোরাঁয় কাজ পাওয়ার আগে মোজাম্মেল কমপিউটার বাক্সবন্দি করার কাজ করত। পয়সা কম জোটে এ সব কাজে, কাবণ বৈধ কাজ নয় এ সব। কাগজ না হওয়া তক চাকরি বাকরি করার অনুমতি দেয় না এ দেশের সরকার। যা করতে হয়, লুকিয়ে। পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে। তাই অবৈধ। কাগজ সম্পর্কে কৌতূহল বাড়ে নীলার। কেবল মোজাম্মেলই নয়, জুয়েল নামের একটি বাচ্চা বাচ্চা মুখের ছেলেও এই শব্দটি উচ্চারণ

করেছে। নীলা অনুমান করে সবাই যে দুর্লভ জিনিসটির অপেক্ষা করছে রাতদিন, যেটির জন্য প্রার্থনা, যেটির জন্য প্রাণ পেতে বসে থাকা, যেটি পেলে জীবনের অন্ধকার, অসুন্দর, অবিন্যাস দূর হবে, সে হল কাগজ।

কী এই কাগজ।

এ দেশে থাকার অনুমতি।

নীলার কৌতূহল দানোর মতো বাড়ে। মোজাম্মেল অসংকোচে বলে যায়, এদেশ থেকে দুবার তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, শেষে মামলা করলাম থাকার কারণ দেখিয়ে, ঝুলে আছে মামলা, যদ্দিন ঝুলবে, তদ্দিন থাকতে পারব...

কারণটা কী?

দিদি কী বলব...এ সব বলতেও খারাপ লাগে...নতুন পাসপোর্ট করলাম হিন্দু নাম নিয়ে, বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে...আমার দেশে ফেরা নিরাপদ নয়, এই বলে...

ডাহা মিথ্যে কথা। মোজাম্মেল নিজেই স্বীকার করছে। মিথ্যে শুনলে নীলার বড় রাগ হয়, কিন্তু মোজাম্মেলের মিথ্যে শুনতে শুনতে নীলা লক্ষ করে, তার রাগ হচ্ছে না।

কী বলব দিদি, মোজাম্মেল মাথা চুলকে বলে, এ সব লুকোনোর জিনিসও নয়। সবাই জানে গরিব দেশের ছেলেরা কীভাবে আসে এ সব দেশে, কী করে থাকে...

মিথ্যে না বললে হয় না?

হয় না। মোজাম্মেল বলে সে যদি বলে যে লেখাপড়া শেষ করে বেকার বসে থাকতে হচ্ছে ঢাকায়, এ দেশে সে তার বিদ্যে খাটাতে চায়, তার শ্রম খাটাতে চায়, একটি স্বাস্থ্যকর সুন্দর জীবন যাপন করতে চায়, যে জীবনের স্বপ্ন সবাই দেখে, তবে এ দেশ থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেওয়া হবে। রাজনৈতিক আশ্রয় চাইলে দিতে পারে, অর্থনৈতিক আশ্রয় দেবে না।

ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের কী কোরে করে, নীলার সামান্য অভিজ্ঞতা হয়েছে বিমানবন্দরে। এ নিয়ে প্রশ্ন করার রুচি হয় না তার।

মোজাম্মেলের পাশে বসে জুয়েল বলে যায় যে সে মেট্রো ইশটিশনে ফল বিক্রি করত, পুলিশের জ্বালায় ও কাজও তার ছেড়ে দিতে হয়েছে।

পুলিশ জ্বালায় কেন?

মেট্রোতে ফল বিক্রি নিষিদ্ধ, তাই। থানায় ধরে নিয়ে যায় প্রায়ই, কাগজ দেখতে চায় কাগজ...

কাগজ কি কারও নেই?

আছে কারও কারও, কেউ কেউ আবার মোটা টাকার চুক্তিতে ফরাসি মেয়েদের বিয়ে করে, বিয়ে করলে থাকার অনুমতি জোটে, নাগরিকও হওয়া যায়। আর বহু বছর মাটি কামড়ে পড়ে থাকলে একসময় হয়তো বৈধ করে নেয়, একধরনের ক্ষমাঘেন্না করে থাকতে দেওয়া আর কী!

মোজাম্মেল আর জুয়েল বেলভিলের এক বাড়িতে থাকে, সঙ্গে আরও পাঁচজন বাঙালি ছেলে, গাদাগাদি করে ওই এক ঘরেই।

সাতজন? নীলা ঠাণ্ডা চায়ে শেষ চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করল।

কী করব দিদি, খরচ বাঁচাই।

কিষান রেস্তোরাঁর হিসেবপত্তর গুছিয়ে রব দেয়, চলো চলো।

নীলা বলে, কিন্তু আমি যে আরেক কাপ চা খাব!

চা তো খেলেই।

এক কাপে কী হয়! তোমাকে তো বলেছিই আমি খুব চা খোর। নীলা মাথা তুলে স্পষ্ট স্বরে বলে, অনুনাসিক অনুনয় নয়।

কিষানের চলো চলো রবে নীলাকে ঘিরে যারা বসেছিল, এক এক করে সরে যায়, মোজাম্মেল ছাড়া।

দেশে ফিরে যান না কেন? নীলা গলা চেপে প্রশ্ন করে।

দেশে? এত বছর এখানে কাটিয়ে দিলাম এখানে ভাল রোজগারের আশায়, এখন দেশে ফিরে করবটা কী, খাবটা কী, চাকরিও এই বয়সে কী করব, বয়সও চলে গেছে চাকরির। আর মুখ দেখাবই বা কী করে। খালি হাতে ফিরতে হবে সংসারে। এখান থেকে ছোট কাজ করেও অন্তত কিছু টাকা দেশে পাঠাতে পারি। ছোট ভাইটার লেখাপড়ার খরচ পাঠাচ্ছি।

জুয়েল আরেক কাপ কালো চা দিয়ে যায় নীলাকে, ওতে দ্রুত চুমুক দিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, এতকাল লেখাপড়া শিখে তা হলে আপনার লাভ হল কী?

লাভ কিছু নেই দিদি। মোজাম্মেল চেয়ার ছেড়ে ওঠে।

ওরা? এখানে আর যারা আছে, সবাই কি আপনার মতোই, মানে এভাবেই এসেছে এদেশে?

সবাই।

সবাই শিক্ষিত? নীলা উদ্‌গ্রীব জানতে।

সবাই শিক্ষিত, সবাই। বাচ্চু তো ডাক্তার।

এখানে ডাক্তারি করে না?

নাহ, চাকরি কে দেবে? দেশ থেকে ডাক্তারি পাশ করলেও এ দেশে আবার পরীক্ষায় বসতে হয়। অবৈধভাবে এ দেশে এলে সে পরীক্ষায়ও বসা যায় না। ভাষাটা বড় সমস্যা। বলতে পারলেও লিখতে পারা যায় না।

আপনার আত্মীয়রা জানে যে রেস্তোরাঁয় কাজ করছেন? নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করে।

জানাই না। লজ্জা লাগে...

মোজাম্মেল হেসে ওঠে, হাসতে হাসতে বলে, আমার আত্মীয়রা কী জানে জানেন তো? আমি ডিসি-র পদে আছি...লোকে জানে ডেপুটি কমিশনার, আমি জানি ডিস ক্লিনার।

নীলাও হেসে ওঠে। কিষান অনাহুতের মতো সে হাসিতে ঢোকে, এত হাসির হচ্ছে কী এখানে! চলো চলো।

মোজাম্মেল সরে যায়।

বাহ্‌ রান্নাঘরটা দেখে যাব না।

নীলা রান্নাঘরে ঢুকে দেখে বরিশালি সোহেল পেঁয়াজ কাটছে। বাচ্চু কড়াইয়ে তেল ঢালছে। জুয়েল থাল মাজছে।

কী ডাক্তারবাবু, কী রান্না করছেন?

ঝোল। বাচ্চু হেসে বলে।

কীসের ঝোল?

সবকিছুর।

সবকিছুর মানে? মাছ না মাংসের? কোনটার?

মুরগি গোরু ভেড়া মাছ ডাল সবজি সবকিছুরই এক ঝোল।

নীলা বলে, হায় এ কী কাণ্ড। সব রান্নার এক ঝোল হবে কেন?

হবে দিদি। এটাই নিয়ম।

এ তো সত্যিকার ভারতীয় খাবার হল না তবে!

ঠিক ভারতীয় খাবার নয়। ফরাসি স্বাদে ভারতীয় খাবার।

বাচ্চু জানাল সে জার্মানিতেও এ কাজ করেছে, ওখানে রাঁধত জার্মান স্বাদে ভারতীয় খাবার।

নীলা বলে, আমার বেশ অবাক লাগছে দেখে যে ছেলেরা পেঁয়াজ কাটছে রান্না করছে, থাল ধুচ্ছে দেখতে। এ দৃশ্য আমার জীবনে এই প্রথম দেখছি।

বাচ্চু এক বাটি পেঁয়াজ ঢেলে দিয়ে কড়াইয়ে, বলে, জীবনে কোনওদিন পানিটা গ্লাসে ঢেলে খাই নাই। জগ থেকে কেউ পানি ঢেলে দিত গ্লাসে, তারপর খেতাম। আর রান্নাঘর কাহাকে বলে এবং ইহা কী, এই বিষয়ে ধারণা আমার ছিল না। হয়েছে ইয়োরোপে এসে।

তেলে পেঁয়াজে চি চি শুরু হয়, আর গলা উঁচিয়ে নীলা বলে একরকম ভালই হয়েছে, কী বলেন। এখন বুঝতে পারছেন, মেয়েরা কী কাজটা করে রান্নাঘরে!

বাচ্চু পেঁয়াজ নাড়তে নাড়তে ধোঁয়া থেকে চোখ সরিয়ে মিষ্টি হেসে বলে দিদি, একদিন আসুন, কিছু রান্না শিখিয়ে যান।

বলে কী, আমিই কি রান্না জানি। আমিই কি গেছি রান্নাঘরে কোনওদিন। এ তো মায়েদের কাজ।

এ সব মায়েদের কাজ। মলিনার কাজ। নীলা এমনই জানে। এমনই সে দেখেছে সারা জীবন যে মলিনা রান্না করে খাবার নিয়ে আসেন টেবিলে, স্বামী সন্তানদের থালে খাবার বেড়ে দেন। স্বামী সন্তান গল্প করতে করতে খায়। মলিনা দাঁড়িয়ে থাকেন টেবিলের পাশে, কারও কিছু যদি লাগে হঠাৎ। নুন বা কিছু। ঝোল বা কিছু। জল বা কিছু। নীলা মনে করতে চেষ্টা করে মলিনাকে কখনও সে খেতে দেখেছে কি না কারও সঙ্গে বসে। না দেখেনি।

বাইরে ঝকঝকে রোদ দেখে গরম কাপড়ে গা না মুড়েই রাস্তায় বের হতে চায় নীলা। কিষান টেনে তাকে গরম ঘরে ঢুকিয়ে নবিশ বউটিকে বলে, ও রোদে তাপ নেই। তা যে নেই, তা আপাদমস্তক মোড়া লেপের পুঁটলি হয়ে রোদের তলে দাঁড়াতেই হুল ফোটানো ঠাণ্ডা গায়ে কামড় মেরে বোঝায়। মলিনাকে লেখা চিঠিটি ফেলতে নীলা একটি পোস্টাপিস খোঁজে। থিরথির করে থুতনি কাঁপছে তার, খোঁজে। এ শহরে খুঁজতে হয় না কিছু, হাতের কাছেই যেন দাঁড়িয়ে থাকে সব। চোখ মেললেই বস্তু মেলে। পোস্টাপিসে গিয়ে লম্বা লাইন দেখে লাইন না দাঁড়িয়ে সামনে এগোতে গেলেই কিষান অস্থির নীলার গরম জামার ঝুল

ধরে টেনে পেছনে এনে কানে মন্ত্র দেয়, এ দেশে যেখানেই যে লাইন দেখবে, শ্রদ্ধা করবে। এ দেশ সমতার দেশ। যে আগে, সে আগে।

নীলা এক পাক নেচে ছোটবেলার খেলার মতো বলে, আগে গেলে বাঘে খায়, মাঝে গেলে নাচে গায়, শেষে গেলে দেশে যায়...

লাইনে দাঁড়াতে হয় না। পোস্টাপিসের ভেতরেই মেশিন বোঝাই। হলুদ একটি মেশিনে চিঠিটি রাখতেই মেশিন বলে দিল, কত টাকার টিকিট লাগবে এতে, টাকা দিলে টিকিট বেরিয়ে এল। সে টিকিট চিঠির গায়ে লাগিয়ে বাক্সে ফেলে দিল, ব্যাস। এক মিনিটের কাজ। কাজ নয় তো জাদু। শহরের মোড়ে মোড়ে ম্যাজিক বাক্স। কার্ড ঢোকালে সুড়সুড় করে টাকা বেরিয়ে আসে, পয়সা ঢোকালে মেশিনের পেট থেকে চা কফি বেরোয়, ঠাণ্ডা পানীয়ের বোতল বের হয়, খেলনা গাড়ি বেরোয়, চকলেট বিস্কুট বেরোয়। আরও ম্যাজিক দেখতে নীলার এবার অনুনাসিক অনুনয়, চলো শহরটা আরও ঘুরে দেখি।

কিষান নীলার জন্য একটি উপহার কিনবে, শহর দেখার জন্য সারা জীবন পড়ে আছে।

কী সে উপহার?

বলা যাবে না।

ফুরফুরে মন নিয়ে গাড়িতে ওঠে কিষান। মোঁপারনাস থেকে রু দ্য রেনের ভেতর দিয়ে, শাঁ জার্মা দি প্রে বাঁয়ে রেখে, বুলোভার্ড শাঁ জার্মায় যেতে থাকে গাড়ি আর নীলা হাঁ হয়ে দেখতে থাকে ঝকঝকে ক্যাফে, রেস্তোরাঁ, সিনেমা। ইচ্ছে করে গাড়ি থেকে নেমে আর সব মানুষের মতো সেও হাঁটে, কোনও ক্যাফেতে থেমে আর সব মানুষের মতো বসে চা খায়, চা খায় আর মানুষ দেখে, ঝকঝকে মানুষ, ফুটফুটে মানুষ।

শাঁ মিশেলে গাড়ি রেখে জিবারে ঢোকে কিষান। বইয়ের সমুদ্র। এই সমুদ্রে নীলা ডোবে ভাসে, তল পায় না। এই সমুদ্রের জল তার চেনা নয়। চেনা জলের অন্তত একটি ছোট্ট সরোবর তার আছে, রেখে এসেছে কলকাতার বাড়িতে। বালজাক, ভিক্টর হুগো, গুস্তব ফ্লবের, মোপাসাঁ, আলবেয়ার কাম্যু, জঁ পল সার্ত্রের বইগুলো সে নেড়ে চেড়ে দেখে, বোদেলেয়র দেখে, র‍্যাঁবো দেখে, পল ভারলেইন, পল এলুয়ার দেখে, এঁদের বাংলা অনুবাদ সে কবেই পড়েছে, মূল ভাষায় বইগুলো হাতে নিয়ে নীলার অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়। মোহগ্রস্তের মতো নীলা একটির পর একটি বই হাতে নেয়, ঘোর আবেশে শোঁকে বইগুলো, বুকে চেপে ধরে। পেছনে ক্রমাগত ডেকে যায় কিষান, নীলার কানে পৌঁছে না কারও ডাক।

জিবার থেকে নীলাকে প্রায় টেনে বার করতে হয়। তখনও বিহ্বল চোখ নীলার, তখনও মোহাবিষ্ট, তখনও বিবশ অস্তিত্ব তার, ফরাসি ভাষাটা শেখা দরকার আমার।

কিষান দ্রুত গাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলে, সে তো শিখতেই হবে। যে দেশে থাকবে, সে দেশের ভাষা না জানলে চলবে কেন!

শিখতে চাই ফরাসি সাহিত্য পড়তে। নীলা বলে।

ও তুমি তো আবার বইপোকা বলে শুনেছি। কিষান খ্যাক করে হাসে। ঠোঁট বেঁকে থাকে সে হাসিতে।

কলকাতায় বইপোকা বলে নীলার দুর্নাম আছে। বই পেলে সে নাওয়া খাওয়া তো ভোলেই, নিজের নামও নাকি ভুলে যায়, বাড়ির লোকেরা তো বলেই, বাড়ির বাইরেও বলে।

কী ব্যাপার জোরে হাঁটো। কিষান তাড়া দেয়।

চলো না এই ফোয়ারাটার সামনে বসি।

না আজ নয়।

ওটা তো সেইন নদী। চলো নদীর ধারে হাঁটি।

আরেকদিন। কিষান কাটিয়ে যায়।

গাড়িতে উঠে কাগজে মোড়া একটি প্যাকেট নীলার হাতে দিয়ে কিষান বলল, বাড়িতে নিয়ে খুলবে।

প্যাকেটটি কোলের ওপর রেখে, নীলা আবার অস্থির হয়, আচ্ছা, এখানে বেশ তো সিনেমা, চলো সিনেমায় যাই।

ধুর, ও তুমি বুঝবে না, সবই ফরাসি...কিষানের ঠোঁট উলটে থাকে।

কেন ইংরেজি ছবি নেই বুঝি...

ফরাসিরা ইংরেজি জানে না, জানতে চায় না।

আচ্ছা নাটক ফাটক হয় না, যাও না তুমি নাটক দেখতে?

সময় কোথায়!

প্যারিসে তো কত জাদুঘর। চলো ল্যুভরে যাই।

আজ সময় নেই আর, বাজার করে বাড়ি ফিরতে হবে।

চলো তা হলে অন্তত কোনও ক্যাফেতে বসে চা খাই।

চা তো খেয়েই এলে তাজমহল থেকে।

নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তা ঠিক চা তো সে খেয়েই এসেছে, এক কাপ নয়, দু কাপ।

নীলার ব্যাকুল বায়না স্বচ্ছন্দে নাকচ করে দেয় কিষান। স্ত্রীলোকের এ ধরনের বিনতি মিনতিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়, এ শিক্ষা কিষান তার ছ বছর বয়সেই নাকি পেয়েছে। কিষান বলেও, অবশ্য হেসে গড়িয়ে, তার মায়ের একবার শখ হয়েছিল পাকা আম খাবে, সে আম পাড়তে গিয়ে গাছের মগডাল থেকে পড়ে পা ভেঙেছিলেন কিষানের বাবা, সেই থেকে কিষানের বাবা ছেলেদের ডেকে সাবধান করে দিয়েছেন, স্ত্রীলোকের আবদারে কান দিবি তো মরবি।

গাড়ি চোখের নিমেষে সেইন পার হয়ে যায়। শাতলের মিনিপ্রিতে ঢুকে নীলার বিস্ময় কাটে না। থরে থরে সাজানো খাবার দাবার। রান্না করা ভাত, এমনকী রান্না করা মাছ মাংস সবজি রঙিন রঙিন প্যাকেটে পোরা। বাড়ি নিয়ে গিয়ে গরম করে খেয়ে নিলেই রান্নার ঝামেলা যায়। বোতলে সিমের বিচি আর ভেড়ার মাংস রান্না করে রাখা, খাবারের নাম কাসুলে।

নীলা বলে, এরা কি রান্নাবান্না করে না? প্যাকেটের বোতলের খাবার কিনে খায়!

রান্না করে সময় নষ্ট করতে কেউ চায় না। কিষান বলে।

কৌটোর জলে মটরশুঁটি, ঢেঁড়শ, গাজর, টম্যাটো ভেজানো। ন বছর পার হলেও এগুলো তাজাই থাকবে জলে। মাছ মাংসের ঝোলের পাউডার করে রাখা প্যাকেটে, বছর কয় গেলেও ক্ষতি নেই, জলে গুলে ঝোল বানিয়ে নিতে পারে। এমনকী আলু সেদ্ধরও পাউডার। নীলা হতবুদ্ধি দাঁড়িয়ে থাকে।

ওটা কি সবুজ সবুজ, বোতলে?

জলপাই।

জলপাই? না জলপাইয়ের বাচ্চা!

সবজির এলাকায় এসে সে জিজ্ঞেস করে, পুঁইশাক নেই? ওটি আমার খুব পছন্দ।

দেশি শাক পাবে না।

লাউ কুমড়ো?

পাগল!

আচ্ছা এদের সবজি আনাজ সব এত বড় বড় কেন!

সব কৃত্রিম উপায়ে বানানো।

পাঁচটা ধনেপাতার ডাল একটি ঝলমলে প্যাকেটে পোরা দেখে নীলা লাফিয়ে ওঠে, বাহ কী চমৎকার দেখো দিকিনি। ধনেপাতা আমার খুব পছন্দ...

আরে তোমাকে কিলো কিলো ধনেপাতা এনে দেব চিনাদের দোকান থেকে। বারো ফ্রাঁ রাখছে, পাঁচটা ধনেপাতার জন্য...এগারো ফ্রাঁই প্যাকেটটির জন্য রেখেছে।

নীলা রেখে দেয় প্যাকেট, যেখানে ছিল।

চাপাতা?

ঠিক আছে চাপাতা নাও। তবে কি জানো, চায়ের নেশা বড় খারাপ নেশা।

পাঁচ[illegible] রকম পনির। সবচেয়ে দামি পনিরটি নাকের কাছে ধরে সুগন্ধ নিতে গেলেই নীলার বমি উঠে আসে, পেট থেকে গলায়। গলায় বমি আটকে নাক চোখ বন্ধ করে সে পনিরের এলাকা থেকে নিজেকে ত্বরিতে সরিয়ে নিয়ে, মাছ মাংসের এলাকায় গিয়ে শ্বাস নেয়, চোখ খোলে। টুকরো টুকরো মাংস প্যাকেটে সাজানো। ভেড়া, মুরগি, বড় মুরগি, হাঁস, খরগোশ, গোরু, শূকর। সবচেয়ে দামি মাংস গোরুর, সবচেয়ে কম দাম মুরগির। কলকাতায় সবচেয়ে সস্তা গোরু, আর চড়া দাম মুরগির। হাড় নেই কেন মাংসে? হাড়ের মাংসেই তো স্বাদ বেশি। এরা হাড় ছাড়িয়ে, তেল ছাড়িয়ে মাংস খায়। ঘটে বুদ্ধি থাকলে লোকে নাকি তাই করে। মাংসেরও ছোট জাত বড় জাত আছে, বুকের মাংস বড় জাত, দামি, পায়ের মাংস ছোট জাত, তাই দামেও কম।

কাঁটা ছাড়িয়ে আঁশ ছাড়িয়ে নানারকম মাছ রাখা প্যাকেটে।

গোলাপি সালমনের দিকে আঙুল তুলে নীলা বলে, এটি কী করে রাঁধে?

কাঁচা খায়।

আর চিংড়ি?

এও কাঁচা খায়।

নীলা ওয়াক করে। ওয়াক করেও ঘুরে ঘুরে বাজার তো নয়, জমকালো দোকানটিতে হাঁটে সে। হাজার রকম চকলেটে ছেয়ে আছে তাক, হাজার রকম ওয়াইনে। চোখ জুড়িয়ে যায়, মনও।

প্যাকেটের খাবারের ওপর কৌতূহল বাড়ে নীলার। একটি ঝলমলে প্যাকেট হাতে তুলে নিতেই কিষান বলে, করো কী করো কী এ তো কুকুরের খাবার!

আরেকটি কৌটো হাতে নিয়েও ঝামেলায় পড়ে। কিষান হাত থেকে কৌটোটি নিয়ে

তাকে রেখে দিয়ে গলা চেপে বলে, বেড়ালের খাবারে হাত দিচ্ছ কেন? ঘরে কি বেড়াল পোষো?

নীলা বোকা বনে যায়। কুকুর বেড়ালের জন্য দোকানে খাবার কিনতে পাওয়া যায়, তাও আবার মানুষের খাবারের পাশেই সে খাবার রাখা, মানুষের খাবারের প্যাকেটের মতোই প্যাকেটে, কৌটোর মতোই কৌটোয়। কলকাতার বাজারে নীলা অনেক গেছে, ধুলো কাদায়, চিৎকারে গ্যাঞ্জামে পচা মাছের বাসি খাবারের নোংরা নর্দমার গন্ধে নীল ডুমো মাছি ভনভনে দাঁড়িয়ে নেড়িকুকুরের ঘাঅলা গায়ে লাথি কষিয়ে দূরে সরিয়ে, মানুষের বগলের ঘাড়ের দুর্গন্ধ থেকে নাক বাঁচিয়ে গা বাঁচিয়ে, চেঁচিয়ে দরদাম করে খোলা মাছের মাংসের গা থেকে মাছির উৎসব সরিয়ে, চোর ছ্যাঁচড় সরিয়ে, তবে কিছু কিনতে হয়েছে তাকে।

শাক, সবজি, ময়দা, পেঁয়াজ, রসুন, আদা, দুধ ডিম ইত্যাদি আর দুটো জনি ওয়াকার দোকানের ঠেলাগাড়িতে ভরে, কিষান তাড়া দেয়, চলো চলো। দাম মেটাতে গিয়ে দেখে কিষান কোনও দরাদরিতে গেল না, প্রতিটি দ্রব্যের গা থেকে পড়ে নিয়ে মেশিনই হিসেব করে দিল কত, আর কিষান একখানা নীল কার্ড বাড়িয়ে দিল, মেশিনই সে কার্ডের নম্বর টুকে নিল, মেশিনই কিষানের ব্যাঙ্ক থেকে টাকা জোগাড় করে নেবে। বাহ।

নীলার ইচ্ছে করছিল বাজারটিতেই অন্তত আরও সময় কাটাতে। এ তো আর কলকাতার বাজার নয়। কিন্তু কিষান বাড়ি যাবে। নীলা, যেহেতু সে কিষানের বউ, তাকেও বাড়ি যেতে হয়। বাড়ি ফিরে সে প্যাকেটের বইটি খুলে দেখে, রান্নার বই, মিনা জাফরির লেখা ভারতীয় রান্নার একটি ইংরেজি বই।

কিষান যথারীতি মদের বোতল আর টেলিভিশন খুলে বসে যায়, নীলা ঠিক বোঝে, বাজার করা হয়েছে, রান্নার বইও কেনা হয়েছে, এখন তার কাজ রান্নাঘরে ঢুকে রাতের খাবারের আয়োজন করা। নীলা তাই শুরু করে, আঁচলখানা কোমরে গুঁজে। কিষান গলা উঁচু করে বলে, অনেকদিন মালাইকোফতা খাই না, আজ করো তো দেখি কেমন হয়।

আর কী?

নান করো। আর একটা সবজির কিছু থাকলে ভাল হয়, পালক পনির করো।

ও তো বাঙালির খাবার নয়। রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে, চোখে পেঁয়াজের ঝাঁজ, হাতে রসুনের গন্ধ, নীলা বলে।

আমি তো বাঙালি নই। কিষান হেসে বলে।

ও তাই তো। চোখ ঢেকে দেওয়া উড়ো চুল হাতের পিঠে সরিয়ে নীলাও হাসে।

সারা সন্ধে রান্না করে নীলা। টেবিল সাজিয়ে দিয়ে খেতে ডাকে কিষানকে। খেতে খেতে কিষান জিজ্ঞেস করে, রেস্তোরাঁয় ছেলেগুলো অমন ছেঁকে ধরেছিল কেন তোমাকে?

নীলা হেসে বলে, বাঙালি তো, তাই!

মোজাম্মেলের সঙ্গে কী এত গপ্প করলে?

কিষানের থালায় মালাইকোফতা তুলে দিয়ে নীলা বলে, কী করে এল এ দেশে, কেমন আছে এসব।

আর কী বলল?

এসবই, বলল কাগজ না হলে ভাল চাকরি জুটবে না।

আর?

আর বলল বেলভিলে থাকে।

আর?

আর বলল সাতজন ছেলে একটি ছোট্ট ঘরে থাকে।

আর?

আর বলল দেশের লোকেরা তাকে ডিসি বলে জানে।

আর?

আর বলল দেশে গেলে চাকরি পাবে না ভাল, বয়স হয়ে গেছে।

আর?

আর বলল বাচ্চু ছেলেটা ডাক্তার।

আর?

আর বলল চায়ে আরেক চামচ চিনি লাগবে কি না। না বলেছি, হ্যাঁ বললে আরেক চামচ চিনি ও এনে দিত। আরও বলল যে চায়ে চিনির বদলে নুন হলে অন্যরকম স্বাদ হয়। আমি বললাম হ্যাঁ তা হয়। ও বলল, দেব এক চিমটি নুন? আমি বললাম, না, তেতো জিনিস আমি একদম পছন্দ করি না। ও বলল, দিই একটা লেবুর টুকরো। আমি বললাম, না টক চা আমি খাই না। আরও বললাম, লেবু বেশি টিপলে কী হয় জানেন তো? ও জিজ্ঞেস করল, কী হয়? আমি বললাম, তেতো হয়।

আচ্ছা তুমি ডাল মাখানি বানাতে জানো? কিষান জিজ্ঞেস করে।

নীলা উত্তর দেয়, না।

তবে যাই বলো, আজকের রান্নাটা সেদিনের চেয়ে ভাল হয়েছে। বইটা তোমার কাজে দেবে।

নীলা খাওয়া শেষ না করেই উঠে পড়ে, তুমি তো মাছ মাংস একেবারেও খাও না। খাবে না?

সে তো তুমি জানোই যে আমি খাই না। এবং কী জানো, কখনও খাব না।

মাছ মাংস খাওয়া অভ্যেস আমার। সবসময় নিরামিষ খেতে পারি না।

আমি যে নিরামিষাশী তা জেনেই তো তুমি বিয়েতে মত দিয়েছ, দাওনি?

হ্যাঁ দিয়েছি। কিন্তু আমি তো বলিনি, আমি আমিষ খাওয়া বন্ধ করব।

এক বাড়িতে দুরকম রান্না হবে, এ তুমি ভেবেছিলে?

অত ভাবার সময় পাইনি।

নীলা এঁটো বাসন রান্নাঘরে ধুতে নিয়ে যায়। কিষান বড় একটি ঢেকুর ছেড়ে ফোলা পেটখানায় হাত বুলোতে বুলোতে বলে, এত ভাল খেলে ভুঁড়ি বাড়বে না তো কি!

নীলা রান্নাঘর থেকে জল পড়ার শব্দকে আড়াল করে উঁচু স্বরে বলে, তুমি তো ডিম খাও দুধ খাও, এ সব তো আমিষ। তবে মাছ মাংস না খাবার কারণটা কী? অভ্যেস নেই, নাকি ভাবো যে জীব হত্যা মহা পাপ!

কিষান কোনও উত্তর দেয় না।

নীলা বলে, আমি না হয় তোমার রেস্তোরাঁয় গিয়ে মাঝে মাঝে খেয়ে আসব। মোজাম্মেলও বলছিল।

কিষান এরও কোনও উত্তর দেয় না।

রাতে ঘুমোবার আগে আর দিনের মতো মহা উদ্দীপনায় কিষান যখন শাড়ি খুলতে নেয়, নীলা অপ্রসন্ন স্বরে বলে আমার ঘুম পাচ্ছে।

ঠিক আছে ঘুমিয়ে যাও। আমি আমার কাজ করছি। একটুও টের পাবে না কী করছি আমি।

নীলা জানে এ কাজটি কিষানেরই। এ কাজে তার নিজের কোনও ভূমিকা নেই।

কিষান যখন হাতের তেলোয় স্তন দলছে, নীলা পাশ ফিরে বলে, ঘুমোতে দাও।

নীলাকে ঘুমোতে দিতে কিষানের কোনও আপত্তি নেই, তবে হাত পা মুখ মাথা যেন নীলা না নাড়ে, তা হলেই কিষান তার কাজ ভালয় ভালয় সারতে পারবে। নীলার সংশয় জাগে ভোগের জন্য জীবিত নারীদেহের আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি না কিষানের। নিস্পন্দ পড়ে থাকে সে, কিষানের ভারী শরীরটি তার শরীরের ওপর কী কাজ করে যায়, কিষান ঠিকই বলেছে একটুও টের পাবে না নীলা, টের নীলা পায় না।

এর পরের ঘটনা নীলা বেশ ভাল জানে, তার শরীর থেকে নেমেই কিষান নাক ডেকে ঘুমোতে থাকবে আর সে অনেকক্ষণ একা একা জেগে থাকবে, ঘুম আসবে না সহজে। সকালবেলা ঘুমের নীলাকে ঠেলে জাগাবে কিষান ওঠো ওঠো ওঠো ওঠো বেলা অনেক। তার অত সকালে জাগতে ভাল লাগবে না, তবুও সে উঠবে, কিষানের খাবার তৈরি করবে, রুটি মাখন সাজিয়ে রাখবে টেবিলে, গেলাসে কমলার রস ঢেলে দেবে। আর নিজেব জন্য চা করবে, যখন চা পান করতে থাকবে, কিষান বলবে, চা খেলে গায়ের রং কালো হয়ে যায়।

নীলা জিজ্ঞেস করবে, কখন ফিরবে?

কিষান বলবে ঠিক নেই।

এরপর নীলা জানালায় দাঁড়াবে। জানালা থেকে মানুষ দেখবে রাস্তায়।

৩

এক শুক্রবার সুনীলের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গেল কিষানলাল, নীলাকে নিয়ে। সুনীলের বাড়ি রু দ্য রিভলিতে, ইতালির রিভলিগ্রামের নামে নাম, যেখানে ১৭৯৭ সালে অস্ট্রিয়ানদের পরাজিত করেছিলেন নেপোলিয়ন। চেকস্লোভাকিয়ার অস্তারলিৎস শহরের নামে এ শহরে একটি ইশটিশন আছে, রাস্তা আছে, সেতু আছে, কারণ অস্তারলিৎসে ১৮০৫ সালে নেপোলিয়ন রাশান ও অস্ট্রিয়ান সৈন্যদের হারিয়েছিলেন। ফ্রিডল্যান্ড বলেও রাস্তার নাম আছে, যেহেতু রাশার ফ্রিডল্যান্ডে ১৮০৭ সালে রাশানদের হারিয়েছিলেন নেপোলিয়ন। যে যুদ্ধক্ষেত্রগুলোয় নেপোলিয়ন জয়ের পতাকা গেড়েছিলেন, সেগুলোই কেবল প্যারিসে সসম্মানে অবস্থিত। প্যারিসের মানচিত্র আঁতিপাতি করে খুঁজেও ওয়াটারলু

বলে কোনও জায়গা নীলা পায়নি। বাঁয়ে হোটেল দ্য ভিল, ডানে ল্যুভর জাদুঘর, বাড়ির জানালা থেকে লুভরের কালো ছাদ স্পষ্ট চোখে পড়ে, জানালায় দাঁড়িয়ে সামনে অবাধ সুন্দরের দিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে নীলা বলে, কিষান তুমি এমন জায়গায় বাড়ি নিতে পারো না?

কিষানের মোটা ঠোঁটে মোটা হাসি, তোমার বাবার কাছ থেকে মোটা অঙ্কের পণের টাকা পেলে ঠিকই পারি। আজই পারি।

নীলা ঘাড় বাঁকায়, কেন? সুনীল কি পণের টাকায় বাড়ি নিয়েছে এ অঞ্চলে?

সুনীলের সঙ্গে আমার তুলনা! ও ডাক্তার, কোটি টাকা কামায়। আমি ভাই খেটে খাওয়া মানুষ। আমার ব্যবসায় প্রায় লালবাতি জ্বলছে।

সুনীলের বাড়িটিতে নীলার বোধ হচ্ছে না যে সে অতিথি, যেন এ তার নিজের বাড়ি অথবা আপন কারও বাড়ি। কিষানের বাড়ির চেয়ে এ বাড়িতেই, সে লক্ষ করে, সহজবোধ তার বেশি, স্বস্তিবোধ অসামান্য। দেয়ালে সোনালি ফ্রেমে ঝুলে আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজি সুভাষ বসু, স্বামী বিবেকানন্দ। তিন খ্যাতিমান বাঙালি। বিবেকানন্দ নিয়ে নীলার মনে খুঁতখুঁতি আছে, লোকটি মেয়েদের বাল্যবিবাহের পক্ষে ছিলেন, বিধবাবিবাহের বিপক্ষে ছিলেন। ছিলেন না কি? নীলা জিজ্ঞেস করে, সুনীল বলে যে সে জানে না, জানে চৈতালি, চৈতালি ব্যস্ত রান্নায়, বিবেকানন্দের বিবেক বলতে কিছু ছিল না, এ ধরণের মন্তব্য তার শোনার ইচ্ছে নেই। বইয়ের আলমারিতে একগাদা বাংলা উপন্যাস, গান বাজছে আমি হৃদয়ের কথা বলতে ব্যাকুল, শুধাইল না কেহ...ঝুঁকে বই দেখতে দেখতে গানটি গানের সঙ্গে গাইতে গাইতে রান্নাঘর থেকে আসা সর্ষে ইলিশের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়া ঘরে, নীলার ইচ্ছে করে, থেকে যায়। বইয়ের তাক থেকে তিনটে বাংলা উপন্যাস আর উনিশ শতকে ফরাসি শিল্পচেতনা হাতে নিয়ে ধার নেবার অনুমতি চাওয়ার আগেই নীলা দেখে সুনীল মাথা নাড়ছে, অর্থাৎ অনুমতির অপেক্ষা কোরো না।

আর দুটো রবীন্দ্রসংগীতের ক্যাসেট? কণিকার? এতেও কোনও বাধা নেই।

নীলা প্রফুল্লচিত্তে পায়ের ওপর পা তুলে পা নাচাতে থাকে, হাতে জর্জ পেরেকের একটি বই, নাচের পা জোড়া মেঝে থেকে সোফায় ওঠে, কুণ্ডলী থেকে ধীরে ধীরে সিধে হয়, মাথা কাত হতে হতে সোফার এক কোণে, পা ছড়াতে ছড়াতে সোফার আরেক কোণে। কলকাতার বাড়িতে সোফায় বিছানায় মাঠে উঠোনে মেঝেয় শুয়ে নীলা এরকম জগৎ ভুলে মেতে থাকত বইয়ে। সুনীল এবং কিষান দুজনই মন্তব্য করে সাহিত্যের ছাত্রী তো, বইয়ের নেশা থাকবেই।

কী ব্যাপার, বই পড়তে এখানে এসেছ নাকি?

কিষানের মন্তব্যে নীলা সোজা হয়ে বসে। বৈঠকঘরে দুটো পুরুষমানুষ বসে গল্প করছে সেখানে নীলার এরকম সোফায় শুয়ে বই পড়া মোটেই শোভন নয়, তার বরং রান্নাঘরে গিয়ে চৈতালিকে সাহায্য করা দরকার।

রান্নাঘরে না গিয়ে সে সুনীলকে একটি বাক্য তৈরি করতে বলে যেখানে কোনও আকার নেই, ইকার নেই।

সুনীল কিছুক্ষণ ছাদের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে, বাক্য তৈরি সম্ভব হয় না।

জর্জ পেরেক ইকার ছাড়া এই আজদাহা বইটি লিখেছে। ভাবা যায়! নীলা তখনও বুঁদ

হয়ে আছে, পেরেকে।

কী অসামান্য প্রতিভা! বিভোল নীলা।

তাই নাকি তাই নাকি বলে সুনীল কিছুক্ষণ আগ্রহ দেখিয়ে কিষানের রেস্তোরাঁ ব্যবসার গল্পে পরক্ষণেই মেতে ওঠে।

এই বইটিকে নীলা ধারের বইয়ের কাতারে রেখে কাঠের মেঝেয় হামাগুড়ি দিয়ে টুম্পার দিকে এগোয়। এই টুম্পামণি আমাকে খেলায় নেবে? টুম্পা আপন মনে খেলতে থাকে, ফিরে চায় না।

টুম্পামণি, ওই যে কথা বলা পুতুলটা দেবে আমাকে?

টুম্পা কথা বলে না।

সুনীল বলল, ও বাংলা জানে না।

নীলা অবাক হয়। বাঙালি মেয়ে বাংলা বলতে জানে না, জানে কেবল ফরাসি। ইস্কুলে ফরাসি বলে, ঘরেও ফরাসি। সুনীল চৈতালি নিজেদের মধ্যে বাংলায় বললেও টুম্পার সঙ্গে বলে ফরাসি।

ওকে বাংলা শেখান না কেন?

দুটো ভাষা শেখার চাপে ওর মাথাটা যাবে। এ সুনীলেরও মত, চৈতালিরও। বাংলা শিখে লাভ কী, কী কাজে লাগবে এ ভাষা!

নীলা কলকাতাতেও দেখেছে, বাঙালি বাচ্চাদের ইংরেজি ইস্কুলে পাঠানো হয়, ঘরেও তাদের সঙ্গে ইংরেজি বলা হয়, যেন বাংলা কোনও অস্পৃশ্যদের ভাষা, আর এরকম যুক্তিই দেওয়া হয় বাংলা জেনে কী লাভ! ভারতবর্ষের বাংলা মুল্লুকে অর্থনৈতিক দুরবস্থা, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় পাশ করে বড় বড় বিদ্বান বসে আছে, চাকরি জোটে না, জীবিকার তাগিদে অন্য রাজ্যে পাড়ি দিতে হয় বাঙালিদের, উত্তরপ্রদেশে, মহারাষ্ট্রে, ও সব রাজ্যে বাংলা চলে না, ইংরেজি ভাল জানলে যে কোনও রাজ্যে চাকরি পাওয়া সহজ হয়, সে কারণে বাংলার প্রতি অনীহা। নীলা সব জেনেও বাংলা সাহিত্যে লেখাপড়া করেছে, অনির্বাণ বলেছিলেন, এ পড়ার কোনও মূল্য নেই, কিন্তু প্রতিবাদ করেছে সে, পৃথিবীতে একুশ কোটি মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে, এর মূল্য থাকবে না কেন? পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম ভাষা এটি, এর লিখিত সাহিত্যই হাজার বছরেরও অধিক পুরনো, বাংলার যত গভীরে গেছে, ততই অমূল্য সম্পদের খোঁজ পেয়েছে সে, কোনও গোপন হিরের খনির সন্ধান পাওয়ার মতো। এ ভাষাটি নিয়ে অন্যভাষীরা গৌরব করলেও, নীলা দেখেছে, বাঙালিরাই এই ভাষায় কথা বলতে, লিখতে, বাংলাভাষী বলে নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত বোধ করে।

টেবিলে হরেক রকম খাবার এনে রাখে চৈতালি, খাবারের গন্ধেই জিভে জল চলে আসে নীলার। ডালের বড়া, শুক্তো, পোস্ত, বেগুনভাজা, ফুলকপিভাজা, ছোট মাছের চচ্চড়ি, রুইমাছের পাতুরি, সরষেইলিশ, চিংড়িমাছের মালাইকারি, মুরগির ঝোল, ভেড়ার মাংসের কালিয়া খেতে খেতে নীলার মনে হয়, দীর্ঘদিন সে উপোস ছিল। ভরপেট খেয়ে সোফায় গা এলিয়ে দেয়, সে জানে, জিজ্ঞেস করলে চৈতালি পই পই করে বলবে কোন দোকান থেকে কোন মাছ কিনেছে, কোন দোকান থেকে মাংস। এ সব জেনে নীলা এও জানে, তার কোনও লাভ নেই। কিষানের বাড়িতে মাছ মাংস কেন, এর গন্ধও ঢুকলে চলবে না।

খাওয়া শেষে বাটায় পান নিয়ে দিদিমা ঠাকুরমাদের মতো চৈতালি বসে সুনীলের সামনে, এই পুজোয় পবন দাস বাউলকে ডাকছ তো?

নীলা পান মুখে দিয়ে বলে, এই প্যারিসে পুজোও হয়?

কেন হবে না? রীতিমতো ঘটা করে হয়।

সুনীল মাথা চুলকোয়। পুজোকমিটির সভাপতির পদ পেয়েছে সে এ বছর, এত দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে কাঁধ ঝুলে পড়ার জোগাড়। আমার এত পোষায় না। জয়ন্তকে দেব দায়িত্ব।

জয়ন্তকে দেবে, ও তো বাংলাদেশি!

তা হোক হিন্দু তো।

তার চেয়ে অসীম রায়কে দাও। গতবার বাংলাদেশিগুলো মণ্ডপ করবে বলল টাকা নিয়ে উধাও হয়ে গেল, ভুলে গেছ? চৈতালি অদৃশ্য এক অনুযোগের বাটাও পানের বাটার সঙ্গে নিয়ে বসেছে।

সুনীল ভোলেনি।

বাঙালির মাঝখানে শক্ত এক দেয়াল, নীলা অনুমান করে। বাংলাদেশের বাঙালিরা বেশির ভাগই এ দেশে অবৈধভাবে এসেছে, থাকেও অবৈধভাবে, কাজও করে অবৈধভাবে। যতসব অবৈধ ছোটলোক। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি বাঙালি যত না, তার চেয়ে বেশি ভারতীয়। পাঞ্জাবি, মরাঠি বা গুজরাটি যাকে পাক দেশি ভাই বলে জড়িয়ে ধরে ফরাসি, হিন্দি, ইংরেজি ধুমসে বলে যাচ্ছে, কেবল পেচ্ছাপ পায়খানা চেপে রাখার মতো বাংলাটা পেটে চেপে রাখে, ব্যাস। বাংলা হচ্ছে আড়ালে আবডালে, না পারতে।

তিন বাঙালির মাঝখানে কিষানলালকে একটি রামছাগলের মতো দেখতে লাগে। রামছাগলটি, নীলা কায়মনোবাক্যে কামনা করে, একা বাড়ি ফিরে যাক, বাড়ি ফিরে একা ঘরে মদ খাক, মদ খেয়ে একা বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ুক, সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখুক সে একা, তার নাস্তা তৈরি করার কেউ নেই ঘরে, কেউ নেই তার জুতোর ফিতে বেঁধে দেবার, সন্ধে বা রাতে ফিরেও দেখুক সে একা, তার জুতো মোজা খুলে দেবার কেউ নেই, রান্না করার, টেবিলে খাবার সাজিয়ে দেবার, পরিবেশন করার কেউ নেই, একা সে কথা বলুক নিজের সঙ্গে, একা সে কাঁদুক। কিষান একা বাড়ি ফিরবে না, একা তার না ফেরায় সায় দেয় সুনীল। সুনীলের চশমাচোখের লম্বাটে মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা ভাবে, এই লোকটি প্রেসিডেন্সি কলেজে নিখিলের সঙ্গে পড়ত, লোকটি নীলাদের বালিগঞ্জের বাড়িতে অনেকদিন গিয়েছে, মলিনা যত্ন করে ছেলে আর ছেলের বন্ধুকে খাইয়েছেন। মাসিমার হাতের রান্নার তুলনা হয় না! খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে এই লোকটি অনেকদিন বলেছে। নীলা বেণী দুলিয়ে ইস্কুল থেকে ফিরলে লোকটি প্রায়ই বলত, কীরে পাগলি, এত লেখাপড়া করে কী হবে, বরের ঘরে গিয়ে তো ওই হাঁড়িই ঠেলবি! নীলা জিভ দেখিয়ে চলে যেত অন্য ঘরে। সেই জিভ দেখানো মেয়ে, পরোয়া না করা মেয়ে, দিব্যি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ডিঙিয়ে গেল তরতর করে, অশিক্ষিত গৃহবধূ না হতেই তো! হাঁড়ি ঠেলার কাজ না নিতেই তো! লেডি ব্রেবোর্ণ কলেজে নয়তো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ছাত্রী পড়াবে, এই স্বপ্ন নিয়েই তো! আর শেষ অব্দি, এই লোকটি, এই সুনীল, নিখিলের বন্ধু সুনীল, এক কদাকার ব্যবসায়ীকে পাঠিয়ে দিল নীলার স্বপ্নের বাগানে মোষ চরিয়ে দিতে, নীলাকে তুলে এনে হাঁড়ি

ঠেলার কাজে লাগাতে! ভেবে তার অবাক লাগে, নিখিলের এই বন্ধুটির হাতেই ছিল তার ভবিষ্যৎ। নিখিলের এই বন্ধুটি বিশ্বাস করত, নীলাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে যত বিদুষীই সে হোক না কেন! ঠিকই নীলা হাঁড়ি ঠেলছে। আগের মতো আর সে জিভ দেখাতে পারে না। জিভ এত ভারী আর শক্ত হয়ে আছে যে ইচ্ছে করলেও সম্ভব নয়। নীলার নিজের কোনও মাটি নেই, যেখানে সে স্বপ্ন রোপণ করবে। নীলার রাগ হতে থাকে সুনীলের ওপর।

বাড়িতে ফিরতে গিয়ে রাতের উজ্জ্বল প্যারিস দেখতে দেখতে মনে মনে ঘ্রাণ নেয় নীলা ছোটবেলার সেই সুগন্ধীর, সেই ইভনিং ইন প্যারিস নামের সুগন্ধীর। রাস্তায় ছেলে মেয়ের কোলাহল, মেয়েরা নিশ্চিন্তে হাঁটছে, শিরদাঁড়া টান করে, শক্ত করে। আতঙ্কের লেশ নেই কোথাও, পদক্ষেপে দ্বিধা নেই কোনও।

রাস্তায় এত রাতেও মেয়েরা একা একা হাঁটে? ভয় পায় না? নীলা জিজ্ঞেস করে।

কীসের ভয়? কিষান পালটা জিজ্ঞেস করে।

তাও তো কথা! নীলা ভাবে, কীসের ভয়। এ তো আর কলকাতা নয় যে ঝোপের আড়াল থেকে পাঁচটা কামুক বা ডাকাত অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বে মেয়েদের ওপর। টাকা পয়সা গয়নাগাটি মান সম্মান এমনকী জীবন, যদি ইচ্ছে হয়, ছিনিয়ে নেবে।

নীলা জিজ্ঞেস করে, আঙুল তুলে একটি মেয়েকে দেখিয়ে, এই মেয়েটি, এই ধরো ষোলো সতেরো বছরের মেয়ে, সামনের ওই বাড়ি থেকে এই বেরোল, কোথায় যাচ্ছে বলো তো এত রাতে!

কিষান উত্তর দেয়, হয়তো কোনও বারে, নয়তো ডিসকোতে, সারারাত আড্ডা দেবে, নাচবে, আনন্দ করবে।

ওর মা বাবা কিছু বলবে না? বড় বড় চোখে নীলা তাকায় কিষানের দিকে।

যদি শুক্রবার রাতে এ বয়সি মেয়েরা ঘরে বসে থাকে, যদি কোনও ছেলে বন্ধু না থাকে, যদি না শোয় কোনও ছেলের সঙ্গে, তা হলে মা বাবাই বরং বিষম ভেঙে পড়ে। ভাবে যে এ মেয়ের যৌনাঙ্গে অথবা মস্তিষ্কে দুরারোগ্য কোনও ব্যাধি আছে। মেয়েরা বেরিয়ে গেলে মা বাবা নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, আর ঘরে থাকলে বরং দুশ্চিন্তায় সারারাত না ঘুমিয়ে কাটায়। আর বেশির ভাগই তো এ বয়সে বেরিয়ে যায় বাবা মায়ের বাড়ি থেকে। নিজেরা একা থাকে নয়তো প্রেমিকের সঙ্গে থাকে।

বিয়ে ছাড়া? নীলা আবার প্রশ্ন করে।

নিশ্চয়ই। বিয়ে আজকাল কেউ করে না। আর করলেও অনেক পরে। পাঁচ ছ বছর এমনকী দশ বছর একসঙ্গে থাকার পর। বাচ্চা কাচ্চা হলে পর।

লেখাপড়া? নীলার কৌতূহল ক্রমাগত বাড়ে।

লেখাপড়া করতে এ দেশে পয়সা লাগে না। সরকারই দেয়। আর মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি ছোটখাটো কাজ করে, চলে যায়।

খুব মুক্ত জীবন। নীলা বলে।

হ্যাঁ, এদের মূল উদ্দেশ্য জীবনকে উপভোগ করা, সে যে ভাবেই হোক। কিষান বলে, ঠোঁট তার উলটে থাকে, নাক কুঁচকে থাকে।

যত্তসব। কিষান বলে, এই মেয়েরা সতীত্ব হারায় কখন জানো তো! পাঁচ ছ বছর বয়সে, ডাক্তার ডাক্তার খেলতে গিয়ে। কুড়ি বছরের আগেই একশো একটা ছেলের সঙ্গে ঘুমোনো সারা। কোনও আদর্শ নেই, মাইরি। আজ একে ভালবাসল তো কাল ছেড়ে গেল, পরশু আরেক জনের সঙ্গে, এরা কোনও স্থায়ী বন্ধনে নেই। এরা জানে না কী করে স্থির হতে হয়, কোথায় এবং কখন। এরা জানে না, পারেও না।

নীলা ছলাৎ ছলাৎ শব্দ শোনে নিজের ভেতরে কোথাও, চলো ওই সেতুতে থামি কিষান, ওই পঁনফে, একটু হাঁটি। চলো সেইন নদীটি দেখি ঝুঁকে, ঢেউ কী করে ফুলে ফুলে আসছে দেখি, দূর থেকে নতরদামের চুড়োর আলো ঢেউগুলোর মাথায় কেমন সোনার মুকুট পরাচ্ছে দেখি।

কিষান গাড়ি থামায় না। হাতে স্টিয়ারিং তার, হাতে যার স্টিয়ারিং, তার ক্ষমতা অনেক, নীলা জানে। তবে কিষানকে থামতে হয় রিপাবলিকের মোড় থেকে যখন শাঁ শাঁ শব্দ তুলে ধেয়ে আসে হাজার হাজার রোলার স্কেটার, হাজার প্রজাপতির মতো উড়ে, তখন। নীলা দুচোখে রাজ্যির বিস্ময় নিয়ে দেখে তরুণ তরুণীর জুতোয় চাকা লাগানো, চাকা চলছে, জুতো চলছে, ওরাও চলছে। তারুণ্যের এমন বিচ্ছুরণ, নবীন প্রাণের জাগরী নিনাদ এর আগে এত কাছ থেকে নীলা দেখেনি, শোনেনি।

এ সব করছে কেন এরা?

কিষান বলে, আনন্দ করতে।

কী করতে?

আনন্দ। আনন্দ। কিষানকে চেঁচাতে হয়।

কেবলই আনন্দ?

কেবলই।

নীলা বেরিয়ে আসে বাইরে, দু চোখ মেলে দেখে গতিময় মানুষ, নীলাকে পেছনে রেখে চলে যাচ্ছে, চোখের পলকে যাচ্ছে, হাওয়ার গতিতে যাচ্ছে, জীবনের গতিতে যাচ্ছে আর গতিহীন নীলা, স্থবির নীলা দাঁড়িয়ে থাকে একা, দুচোখে বিস্ময় তার, দুচোখ জুড়ে মুগ্ধতা।

কিষান তাড়া দিলে গাড়ির ভেতরের অন্ধকারে ঢুকতে হয় নীলাকে, যদিও তার ইচ্ছে করছিল রাস্তায় হাঁটতে, দৌড়োতে, চাইছিল শরীরে মনে নির্ঝরের গতি, চাইছিল সারারাত তারুণ্যের উল্লাসে মেতে উঠতে, কিন্তু কিষান, যেহেতু কিষান তার স্বামী, আর যেহেতু স্বামীর আদেশ অমান্য করা অন্যায়, যেহেতু স্বামী ছাড়া সে চলৎশক্তিহীন, ডাকলে তার ইচ্ছের পায়ে শেকল পরাতে হয়।

কী অপূর্ব! অন্ধকার বলে কিছু নেই এখানে। সবই উজ্জ্বল, আলোকিত, সবই জীবন্ত। বার বার বলে নীলা।

বাড়ির কাছে পৌঁছে গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজতে বড় রাস্তার এ মাথা থেকে ও মাথা, এক গলি থেকে আরেক গলিতে কলুর বলদের মতো ঘোরে কিষান। জায়গা ঘণ্টাখানেক পর মেলে।

গাড়ি গ্যারেজে না রেখে রাস্তায় রাখছ যে? নীলা বেরিয়ে বলে।

কারও গ্যারেজ আছে নাকি, সব্বাই তো রাস্তাতেই রাখে।

কলকাতায় রাস্তায় এরকম গাড়ি পড়ে থাকতে নীলা দেখেনি। অনির্বাণের অ্যামবেসেডার

গাড়িটির লেজের দিকটা ডেবে গেছে, দরজায় জং ধরেছে, তারপরও ওটি রাখা হয় গ্যারেজে, রেখে আবার শক্ত তালাও লাগানো হয় গ্যারেজের দরজায়।

এই যে রাস্তার দুপাশে সারি সারি গাড়ি দাঁড়ানো, সারারাত এখানেই থাকবে গাড়ি?

কিষান মাথা নাড়ে। থাকবে। থাকে। থেকে আসছে।

চুরি হয় না?

চুরি হবে কেন?

নীলা ভাবে, তাই তো চুরি হবে কেন? এ তো চোর ডাকাতের দেশ নয়।

বাড়ি থেকে গাড়ি দূরে রাখাতে নীলার একরকম ভালই লাগে, অনেকটা পথ এখন সে হেঁটে যাবে, অনেকটা পথ সে দেখে দেখে যাবে পথের চরিত্র। আলোর প্লাবন বইছে বন্ধ দোকানগুলোয়, ইটের নয় কাঠের নয় পাথরের নয়, কাচের দেয়াল দোকানগুলোর। নীলা কাচের ওপারে দেখে সারি সারি অলংকার সাজানো, দামি পাথরের, সোনার রুপোর মুক্তোর হিরের। যে কেউ ইচ্ছে করলে কাচ ভেঙে ভেতরে ঢুকে অনায়াসে হাতিয়ে নিতে পারে অমূল্য সব মণিমুক্তো।

চুরি হয় না?

কিষানের কণ্ঠস্বরে এক রাশ বিস্ময়, চুরি হবে কেন?

নীলার চেতন ফেরে, তাই তো, চুরি হবে কেন? এ তো কলকাতা নয়।

৪

কোনও ঘটনা না ঘটলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কাও থাকে কম, কিন্তু নীলার সাদামাটা ঘটনাবিহীন জীবনে হঠাৎ এক দুর্ঘটনা ঘটে যায়। স্নানঘরে পা পিছলে কপাল ফাটে তার। ফাটা কপালের কপাল ফাটা বড় ভয়ানক, নীলার ধারণা। মাথা গিয়ে পড়েছিল বাথটাবের কোণে, স্রোতের মতো রক্ত বয়ে গেছে। কিষানকে ফোনে খবর দেওয়ার শক্তিটুকু শেষ অব্দি ছিল, ভাগ্য। তড়িঘড়ি বাড়ি পৌঁছে নীলাকে নিয়ে কিষান দৌড়োল লারিবুয়াসিয়ের হাসপাতালে, গার দ্য নর্দের কাছেই সে হাসপাতাল। কলকাতার হাসপাতালে শত রোগীর উপচে পড়া ভিড় দেখে নীলা অভ্যস্ত, আর এ হাসপাতালের অপেক্ষাঘরে পাঁচ কি ছ জন রোগী বসে আছে, ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরা, দেখে রোগী বলে বিশ্বাস হয় না, যেন বাড়িটির ভোজসভার নিমন্ত্রিত অতিথি এরা। নীলার গায়ে রক্তমাখা শাড়ি, পাতলা তোয়ালেয় পেঁচানো মাথা, নীলরতন-বর্হিবিভাগের জলজ্যান্ত রূপ। একজন একজন করে ডাক পড়ছে ভেতরে। ডাক পড়লে নীলাকে ভেতরে যেতে হয়, নার্স বলে, গায়ের সব কাপড় চোপড় খুলে পাতলা একটি বুক খোলা জামা পরে পরীক্ষা করার বিছানাটিতে শুয়ে পড়তে। মাথা পরীক্ষা হলে পরনের সব কাপড় খুলতে হবে কেন, নীলা বুঝে পায় না, দ্বিধায় দাঁড়িয়ে থাকে। নার্সকে ডেকে স্মরণ করিয়ে দেয়, মাথা ছাড়া আর কোথাও তার কোনও অসুবিধে নেই। নার্স বলে, মাথা হোক, পায়ের আঙুল হোক, কাপড় খুলতেই হবে। এরকমই নিয়ম? এরকমই নিয়ম। শাড়ি ব্লাউজ পেটিকোট খুলে হাসপাতালের সাদা জামাটি পরে নেয় নীলা। নার্স দেখে বলে, জামার তলে কোনও সুতো থাকলেও চলবে না। ব্রাও

খুলতে হবে? ব্রাও। প্যান্টিও? প্যান্টিও। নীলা খোলে, শোয়, ডাক্তার এসে নাড়ি দেখে, মাথা টেপে, পাঠিয়ে দেয় এক্সরে করতে। এক্সরে করতে গিয়ে মহা বিপদ, পুরো উলঙ্গ হয়ে এক্সরে টেবিলে শুতে হবে। নীলা জিজ্ঞেস করল মাথার এক্সরে হলে উলঙ্গ হতে হবে কেন? ওরা বলে হতে হবে। বুকের এক্সরেও হবে, বুকের এক্সরে হলেই বা উলঙ্গ হওয়ার দরকার কী? ওরা বলে দরকার আছে। মাথা হোক, বুক হোক, পেট হোক, পা হোক, পায়ের আঙুল হোক, এক্সরে করতে হলে পুরো উলঙ্গ হতেই হবে। এরকমই নিয়ম? এরকমই নিয়ম। নীলার বাবা অনির্বাণ নিজে ডাক্তার, নীলা নিজে বহুবার হাসপাতালে গেছে, ঘুরে ঘুরে হাসপাতালের নানা বিভাগ দেখেছে সে, নিজের বুকের এক্সরে একবার করতে হয়েছিল, পরনের কোনও কাপড় খুলতে হয়নি। এখানে উলঙ্গ হওয়ার প্রস্তাব শুনে নীলা লজ্জায় মাটির সঙ্গে কেবল মিশে যায় না, মাটির তলেও ঢুকে যায় মনে মনে। তার পক্ষে পুরো ন্যাংটো হয়ে ড্যাং ড্যাং করে স্তন দেখিয়ে নিতম্ব দেখিয়ে নার্স ডাক্তারের সামনে হেঁটে যাওয়া সম্ভব হয় না। সম্ভব না হলে চিকিৎসাও হবে না জানিয়ে দেওয়া হয়। নার্স এবং ডাক্তার ঠিক বুঝে পায় না নীলা চিকিৎসা নাকচ করে দিচ্ছে কী কারণে। লজ্জায় শেষ পর্যন্ত তাকে উচ্চারণ করতে হয়েছে লজ্জা শব্দটি। সে যে লজ্জা করছে এ সহজ ব্যাপারটি তবুও কারও বোঝার ক্ষমতা নেই। দুবার বলার পর নার্স আর ডাক্তার দুজনের চোখ কপালে ওঠে।

লজ্জা, কাকে?

তোমাকে। তাকে।

কেন?

কেনর উত্তর না দিয়ে নীলা তার শাড়িকাপড় পরে নিয়ে সোজা বেরিয়ে গিয়ে, কিষানকে জানায় তার পক্ষে হাসপাতালের অসভ্য প্রস্তাব মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

কিষান কোদালি হাসি হেসে নীলাকে ঠেলে দেয় এক্সরে করার ঘরে, উলঙ্গ হতে বললে উলঙ্গ যেন হয় নীলা, পরামর্শ দেয়।

তুমি রাগ করবে না? নীলা জিজ্ঞেস করল।

মহানুভবতার চূড়ান্ত উদাহরণ দেখিয়ে কিষান বলে ডাক্তারের সামনে উলঙ্গ হওয়া কোনও অন্যায় নয়।

নীলা লজ্জার মাথা খেয়ে মাথার এক্সরে করে।

দুটো সেলাই নেয় ফাটা বা কাটা কপালে, সেলাই নেওয়ার পর ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রও নেয়, সে নিতে গিয়ে অবশ্য তাকে উলঙ্গ হতে হয়নি।

৫

কিষানের থুতনির কাছে কাটা দাগের একটি চিহ্ন আছে, এ কারণে, নীলা কখনও বলেনি যে কিষানের রূপের বারোটা বেজেছে কিন্তু তার কপালের ছোট্ট দাগটির জন্য যেটি চুলের তলে ঢাকা পড়ে থাকে, কিষান প্রায়ই মুখ মলিন করে বলে যে নীলার আগের সেই আগুন

রূপটি আর নেই।

কাটা ঘা সারার পর ওষুধ খেয়ে চাঙা হতে কদিন পেরোয়, রান্না করার আর ঘর গোছানোর পর যে অবসর জোটে, বই পড়ে কাটায় নীলা। এরপর মুখ থুবড়ে পড়া দিনগুলোকে টেনে হিঁচড়ে যেমন তেমন পার করছিল, তেমনই এক দিনে গান্ধী নামকরণের পর রেস্তোরাঁর ব্যবসা ভাল জমে ওঠায় কিষানের শখ হয় নীলাকে নিয়ে গ্যালারি লাফায়েতে যেতে।

বুলোভার্ড হুসমানের চোখকাড়া বাড়ি দেখতে দেখতে গ্যালারি লাফায়েতে এক বিকেলে থামা হয়। ভেতরে ঢোকাও হয়। চমকানোও হয়।

ও মা, আমি তো ভেবেছিলাম এ একটা গ্যালারি, ছবি টবি থাকে।

এ দোকান, এক দোকানের ভেতরে একশো দোকান। আকাশছোঁয়া রঙিন ছাদে চোখ যায় তার, চোখ সরতে চায় না সেই অসম্ভব সুন্দর থেকে। কিষানের গুঁতো খেয়ে ঘাড় সোজা করতে হয়।

এ দোকান, না কি সোনায় মুড়োনো প্রাসাদ!

নীলা এর আগে এত সুন্দর কোনও দোকান কেন, প্রাসাদও দেখেনি।

এটা কেনো, ওটা কেনো, জুতো কেনো, জামা কেনো, কিষান বলেই যাচ্ছে। কপালের দাগটি সত্ত্বেও নীলা রূপসি রয়ে গেছে, তার হাতের রান্নাও দিন দিন সুস্বাদু হচ্ছে, আর নীলা যেহেতু তারই বউ, তারই সম্পদ, তারই সম্পত্তি, তারই হাতের মুঠোয় নীলার জীবন, নীলাকে আরও সুন্দরী দেখালে লোকে তারই প্রশংসা করে বলবে যে কিষান বড় সুন্দরী বউ পেয়েছে, নীলা ভাল জামা জুতো পরলে এ প্রশংসাও কিষানের, নীলা অসুখ থেকে সেরে উঠলে লোকে বলেছে কিষান তার বউকে সারিয়ে তুলেছে, নীলার কিছুতে যেহেতু নীলার কিছু নয়, সবই কিষানের, নীলার প্রতি উদারতা তাই উথলে উঠেছে তার, এ আসলে কিষানের নিজেকেই নিজের ভালবাসা, নীলা অনুমান করে।

জুতোর দোকানে ঢুকলে দোকানি নীলার পায়ের মাপ জিজ্ঞেস করে। মাপ তো দাদা জানি না! নীলা মাপ জানবে কেন, কলকাতার জুতোর দোকানে ঢুকে যে জুতো বা স্যান্ডেল পায়ে আঁটে, তা কিনে অভ্যেস তার। এ মাসে আট নম্বর জুতো আঁটসাঁট হল, পরের মাসে দেখা যায় সাত নম্বরই বড় হচ্ছে। তবে কি পা কুঁকড়ে যাচ্ছে, না পা কুঁকড়োচ্ছে না, জুতোর মাপের ঠিক নেই। জুতোঅলারা যার যা পছন্দ নম্বর বসিয়ে দেয়, যার পায়ে জুতো দরকার দোকানে এসে একটি পর একটি জুতো পরে পরখ করে তবে কেনে। এরকমই নিয়ম।

কিষান জুতোর তাক থেকে একজোড়া বুটজুতো নিয়ে বলে, পরে দেখো তো।

ও মা এ তো ছেলেদের জুতো। নীলা জিভে কামড় দেয়।

এ মেয়েদের।

কিষান বলে, দোকানিও বলে এ মেয়েদের।

জুতো কিনে জামা কাপড়ের দোকানে এসে নীলা ঝামেলায় জড়ায় আবার। পান্তলুনে হাত রাখতেই কিষান সরিয়ে নেয় নীলাকে, ও সব ছেলেদের।

তা হলে এই শার্ট!

এও ছেলেদের!

কী তফাত গো ছেলেদের মেয়েদের পোশাকে? নীলা উৎসুক জানতে। কলকাতায় মেয়েদের ছেলেদের জামা কাপড় জুতোয় আকাশ পাতাল তফাত। শাড়ি, সালোয়ার কামিজ, ফিতেঅলা চটি মেয়েদের আর ছেলেদের ধুতি, ফতুয়া, স্যান্ডো গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, টাই, জুতো, মোজা। তফাত স্পষ্ট। এ দেশে একই রকম পোশাক ছেলে মেয়েরা পরছে, দু পোশাকে তফাত বোঝা কঠিন। বোতামের ঘর এদিক না হয়ে ওদিক, কোমরের কাছটা সামান্য চাপা, বুকের কাছে একটি বাড়তি সেলাই, খুব মন দিয়ে না দেখলে কোনটি কার তা বোঝা যায় না। কিষানের মতে প্রচুর তফাত, কোমরে তফাত, নিতম্বে তফাত, দৈর্ঘে তফাত, প্রস্থে তফাত।

তোমার মাপ কী?

মাপ তো জানি না! নীলা তার মাপ জানবে কেন, মাপ জানে পাড়ার দরজি।

আর ওই লাল সোয়েটার, ওটি বেশ সুন্দর তো।

হাত দিয়ো না। ও ছেলেদের।

মেয়েদের সোয়েটারের সঙ্গে এটির তফাত কোথায়?

আছে। ঘাড়ে, গলায়, কোমরে, বুকে।

বুকে শব্দটি বলে কিষান কনুইয়ে আলতো চাপ দেয় নীলার বুকে।

কমলা রঙের একটি মেয়েদের সোয়েটার কিনে কিষান যখন দাম দিতে যায়, নীলা বলে পাঁচশো ফ্রাঁ-এর দাম, তার মানে সাড়ে তিন হাজার টাকা?

এরকমই দাম এ সবের। কিষান হাসে।

কিছু কম করে দিতে বলো। দুশো ফ্রাঁ-এ দেবে কি না জিজ্ঞেস করো।

এ দেশে দরাদরি নেই। দাম যা লেখা আছে, তাই।

যে দোকানে কোনও ভিড় নেই সে সোনার দোকান। আর এ দোকানেই নীলা আটকে যায়। সোনায় বানানো নানান অলংকার।

সোনার এমন লালচে রং কেন?

আঠারো ক্যারেটের সোনা এরকমই দেখতে হয়।

আঠারো ক্যারেট মাত্র! কেন গো! আমরা তো বাইশ ক্যারেট পরি।

এরা সোনা তেমন পরে না। পছন্দও করে না। কেনে পাথরের অলংকার।

এরা ধনী হয়েও সোনার অলংকার কেনে না আর গরিব দেশ ভারতে সোনা না হলে চলে না। সোনা না পরলে মান যায় জাত যায়। সোনা না হলে বিয়ে হয় না, বিয়ে হলেও সুখ হয় না। নীলার বিয়েতেই অনির্বাণ আট ভরি সোনা দিয়েছেন, চকচকে সোনা। অনির্বাণের ধারণা সোনা থেকে সুখের প্রপাত বইয়ে কন্যার সংসার ভাসিয়ে দিচ্ছে। সোনার প্রতি লোভ ভারতীয় মেয়ে মাত্রই থাকে, নীলারও আছে। কিন্তু আঠারো ক্যারেটের লালচে সোনা কিনতে মোটে তার আগ্রহ জন্মায় না।

আগ্রহ তার সুগন্ধী কেনায়। সুগন্ধীর রাজ্যে ঢুকে নীলা বিবশ হয়ে থাকে। এত সুগন্ধীও জগতে আছে! এ তো সুগন্ধীরই দেশ। এটি পছন্দ হয় তো ওটিও পছন্দ হয়। নীলা পছন্দ করে জিভাঁসির অরগানজা, কিষানের পছন্দ ক্রিশ্চান ডিওরের পয়জন। তা হলে কোনটা

কেনা হবে? একেবারে সোজা। কেনা হবে পয়জন।

পয়জনের এত দাম এখানে? কলকাতায় তো অনেক কম।

হ্যাঁ অনেক কম, কারণ ওখানে যা পাওয়া যায়, সব নকল। এখানে আসল, বুঝলে হে, সব আসল।

নীলা সব আসলের ভিড়ে খাবি খায়। সবই আসল, সবই ভাল, সবই সুন্দর।

সুগন্ধী কেনা হলেও সুগন্ধীর এলাকা থেকে মোটে সরতে চায় না সে। একটি সুগন্ধী সে খুঁজছে, খুঁজছে ইভনিং ইন প্যারিস। পাতি পাতি করে খুঁজেও সেই নীল রঙের ছোট্ট শিশি, সেই ইভনিং ইন প্যারিস কোথাও পেল না। চোখ গেল শ্যানেল নং ফাইভে। শ্যানেলই কিনবে সে, নিজের টাকায় কিনবে।

কিষান চমকায়, কার জন্য?

দাদার জন্য।

সুনীলের এক বন্ধু কলকাতা যাচ্ছে, তার হাতে কিছু জিনিস পাঠানো যেতে পারে, সুনীল নিজে বলেছে।

নিখিলের জন্য তো। অনেক অল্প দামের সুগন্ধী আছে, ওগুলো কেনো। কিষান বলে।

না এটিই কিনব। শ্যানেল নং ফাইভ দাদার খুব পছন্দ। নীলা গোঁ ধরে।

কিষান নীলার হাত থেকে শ্যানেলটি দোকানিকে ফেরত দিয়ে নীলাকে টেনে সরাল দোকান থেকে, গলা চেপে বলল, তোমার কাণ্ডজ্ঞান একেবারে নেই।

নীলা শান্ত গলায় বলে, আসলে কী জানো দাদা আমাকে দুশো ডলার দিয়েছে যেন ঠিক এই সুগন্ধীটিই কিনে তাকে পাঠাই।

ঠিক এটিই?

হ্যাঁ ঠিক এটিই।

নীলা ডলার ভাঙিয়ে শ্যানেল নং ফাইভ কিনল। কিনে, দেখল, তার একরকম আনন্দ হচ্ছে নিজের টাকায় কিছু কিনে। কিষানের কাছ থেকে ব্যাগ ভরে জিনিসপত্র উপহার পাওয়ার চেয়ে বেশি আনন্দ।

বাড়ি ফিরে, কিষান মদ নিয়ে বসল, আর নীলা আমি জেনে শুনে বিষ করেছি পান, প্রাণের আশা ছেড়ে সপেঁছি প্রাণ গাইতে গাইতে পয়জন মাখল গায়ে। কিষান জিজ্ঞেস করল, কী গান এটি?

রবীন্দ্রসংগীত।

ওই বাঙালিব্যাটা তো যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিল, তার গান?

হ্যাঁ ওই বাঙালিব্যাটার গান। ওই বাঙালিব্যাটা এই পয়জন সুগন্ধী নিয়ে চমৎকার একটা গান লিখেছে, সেটিই গাইছি।

এই পয়জন?

হ্যাঁ এই পয়জন।

ঠিক এটিই।

হ্যাঁ ঠিক এটিই।

অনুবাদ করে শোনাও তো।

নীলা হেসে বলল, কিছু কিছু গান আছে, যার অনুবাদ হয় না।

কিছু কিছু মানুষ আছে, যার অনুবাদ হয় না। কিষান দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে।

আর কিছু কিছু মানুষের অনুবাদ খুব সহজ। নীলা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরময় সুগন্ধ ছড়িয়ে বলে।

কিষান খেয়ে শুয়ে পড়ার পর নীলা চিঠি লিখতে বসে মলিনাকে।

তুমি যে বলেছিলে, এখানে একা একা কী করে সংসার করব আমি! তুমি একবার এসে দেখে যাও। কাজের লোক নেই, তা ঠিক। কোনও প্রয়োজনও নেই। মেশিনে বাড়ি ভর্তি, এখানে কাজ বলতে সুইচ টেপা। জানো মা, আমি আজকাল রান্না করছি। রান্নায়, আবার ভেবো না, কষ্ট হচ্ছে কিছু। একেবারেই না। কিষান আজ আমাকে অনেক জিনিস কিনে দিল। বারবার বুঝিয়ে দিল সে কিনে দিয়েছে। জীবন তো এরকমই মা, তাই না! স্বামী স্ত্রীকে জিনিসপত্র কিনে দেবে, আর স্বামীর আদেশ মতো স্ত্রী চলবে। জিনিসপত্রের কাছে আমরা একরকম বন্দি। আমাদের হাত পা বাঁধা। তোমাকেও দেখেছি, বাবা দুটো শাড়ি কিনে আনলে কী বিষম খুশি হতে তুমি। বাবাকে খাওয়াতে মাছের মুড়ো দিয়ে, পাশে বসে হাতপাখায় বাতাস করতে। ভালবেসে করতে হয়তো। জিনিসপত্র দিয়ে কি ভালবাসা কেনা যায়? কী জানি! যায় হয়তো। আজ রাতে কিষানের জন্য ডাল মাখানি রান্না করলাম, ও খুব পছন্দ করে খেল।

প্যারিস আশ্চর্য সুন্দর একটি শহর। আজ অপেরার পাশ দিয়ে আসার সময় আমার মনে হয়েছে, কিষানের সঙ্গে বিয়ে হয়ে একরকম ভালই হয়েছে আমার, না হলে এ শহর দেখা হত না। আর এ শহর না দেখে মৃত্যু হলে, জীবন পূর্ণ হত না।

সারাজীবন কেবল অন্যকে আনন্দ দেবার জন্য নিজের জীবন খরচ করলে মা। এবার নিজের কথা ভাবো। নিজে আনন্দ করো। দাদু মারা যাবার পর সম্পত্তি তো ভাগ হয়েছে, তোমার নিজের ভাগ বিক্রি করে টাকা তো পেয়েছ অনেক, কার জন্য জমিয়ে রাখছ সে সব? খরচ করো। নিজের জন্য করো। জীবন আর কদিনের বলো! দেখো, এখানকার লোকেদের ভাত কাপড়ের ভাবনা নেই। এরা জীবনকে ভীষণ রকম উপভোগ করে। এরা প্রাণ খুলে হাসে। আর আমরা হাসি না, ভয়ে হাসি না, কারণ রামশর্মা নামে এক বদমাশ লোক বলে গেছে, যত হাসি তত কান্না।

এটুকু লিখে থেমে পুনশ্চ দিয়ে লেখে দাদার জন্য শ্যানেল নং ফাইভ পাঠালাম, খুব দামি সুগন্ধী। এটি কিষানের টাকায় কেনা না, আমার টাকায়, যে টাকা জমিয়েছিলাম টিউশনি করে।

৬

আমাকে কিছু টাকা দেবে, তোমার তো সময় হয় না, আমি একা না হয় বেরোই।

একা?

হ্যাঁ একা।

পাগল হয়েছ?

কেন একা বুঝি আমি বেরোতে পারি না? আমি কি ছোট্ট বাচ্চা?

আমার কাছে অবশ্য তুমি ছোট্ট বাচ্চাই। কিষান নীলার গালে আঙুল বুলিয়ে বলে।

নীলা হাসে। বলে, কিন্তু আমার কাছে তো আমি ছোট্ট বাচ্চা নই।

তবে কি বড় বাচ্চা? কিষানও হাসে, কোদালি হাসি।

আমার সাতাশ বছর বয়স। আমি প্রাপ্তবয়স্ক।

প্রাপ্তবয়স্ক হলে বুঝি বেরোতে হয় রাস্তায়?

রাস্তায় যে হতে হবে তা নয়। ধরো সুনীলের বাড়ি গেলাম কি কোনও ক্যাফেতে বসে চা খেলাম, ধরো কোনও জাদুঘরে গেলাম, অথবা বইয়ের দোকানে। ধরো অপেরার ভেতরটা দেখতে গেলাম। প্যারিসে আসব বলে প্যারিসের ওপর কিছু বই পড়েছি, দেখতে ইচ্ছে করে জায়গাগুলো। নীলা জানালায় উদাস তাকিয়ে বলে।

একা একা এ সব করতে চাও তুমি? কিষানের ছোট ছোট চোখ দুটো গোল আলুর মতো বড় হয়ে ওঠে।

তুমি তো সময় পাও না তাই। ভাবছিলাম, একটু না হয় হাঁটিই রাস্তায়, কোথাও যদি নাও যাই। নীলার উদাস স্বর।

হাঁটবে? কেন?

কোনও কারণ নেই। এমনি।

এমনি এমনি হাঁটে কেউ রাস্তায়! দেখো তো এই দেখো, কিষান হেঁচকা টেনে নীলাকে জানালার কাছে নিয়ে বলে, ওই যে লোকগুলো হাঁটছে, কেউ কি অকারণে হাঁটছে বলে মনে হয় তোমার! সকলেই কিছু না কিছু কারণে হাঁটে। সকলেই ব্যস্ত। আমিও ব্যস্ত। কাজে ব্যস্ত না হলে উনুন জ্বলবে না। মাথার ওপর ছাদ থাকবে না নীলা, তোমাকে একদিন দেখাতে নেব কী করে উদ্বাস্তুগুলো রাস্তায় কাটায়, শীতের রাতেও। তখন বুঝবে, খামোখা সময় নষ্ট করার মানে হয় না।

নীলা শাড়িতে আঙুল পেঁচাতে পেঁচাতে বলে, আসলে কী জানো, আমার মোটে সময় কাটে না। লেখাপড়া করেছি কি ঘরে বসে থাকার জন্য? কোনও চাকরি বাকরি করলেও না হয়...

চাকরি? চাকরি বা করতে হবে কেন? আমি কি টাকা রোজগার করছি না? কিষান তাজ্জব হয়ে প্রশ্ন করে।

তা করছ।

আর এই যে আমি ব্যস্ত থাকি, সে তো এ সংসারের জন্যই। আমি কাজ না করলে তুমি থাকবে কোথায়, খাবে কী! পরবে কী? গলার স্বর ক্রমে উঁচুতে উঠছে কিষানের।

সে কি কেবল আমার জন্যই করছ! বিয়ের আগেও তুমি এ কাজই করতে। আমাকে ভরণ পোষণ করতে হবে বলে কি কাজ নিয়েছ? তা তো না। নীলার অদ্ভুত শান্ত গলা।

ওহ নীলা, কিষান সোফায় ধপাস করে বসে বলে, তুমি তো বেশ কথা বলতে জানো! এত কথা শিখলে কোথায়।

কোথাও তো শিখিনি। এ তো সবাই বলতে পারে।

কিষান সজোরে মাথা নেড়ে বলে, না না না, ভারতীয় বউরা এমন বলে না।

নীলা আবারও আগের সেই শান্ত গলায় বলে, ভারতীয় বউ কারা এমন বলে না। তোমার দিদিমা বলে না, তোমার ঠাকুরমা বলে না। এই তো!

কেউ বলে না। কিষান চেঁচাল।

আসলে কী জানো, তোমার এক বোবা মেয়ে বিয়ে করা উচিত ছিল। মুখ বুজে সংসারের কাজ করবে, এমন এক মেয়ে। সাত চড়ে রা করবে না এমন এক মেয়ে। তিন কুলে যার কেউ নেই, এমন মেয়ে। লেখাপড়া না জানা মেয়ে। মাথায় গোবর ছাড়া কিছু নেই, এমন মেয়ে। সাধ নেই স্বপ্ন নেই এমন মেয়ে। নীলা চিবিয়ে চিবিয়ে বলে।

কিষানের গলার স্বর সপ্তম থেকে নবমে, লেখাপড়ার বড়াই করছ কেন? এমন তো নয় যে ডাক্তার হয়েছ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়েছ। তোমার ওই বাংলাসাহিত্যের লেখাপড়া দিয়ে কী করতে পারো তুমি। এক ফ্রাঁ উপার্জন করতে পারবে? পারবে না। তোমার সারাজীবনই আমার ওপর নির্ভর করতে হবে, এ ছাড়া তোমার উপায় নেই। সুতরাং দেমাক কমাও, এত দেমাক দেখিয়ে তোমার যে কোনও লাভ হবে না মাথায় সামান্য ঘিলু থাকলে বুঝতে পারতে।

কিষান উঠে দাঁড়ায়। হাঁটে, কোনও কারণ ছাড়াই ঘরময় হাঁটে। ভারী শরীরের ধপ ধপ শব্দ তুলে মেঝেয়, হাঁটে। জল খায়। এক গেলাস। দু গেলাস। হাঁটে। এরপর ভারী কণ্ঠে বলে, শোনো, সুনীল চৈতালি দুজনই চাকরি করে, ওরা দিনের বেলা বাড়ি থাকে না। আর ক্যাফেতে যাবে কেন, ঘরে চা আছে, সে বানিয়ে খাও। বাইরে খামোখা পয়সা খরচার দরকার কী! জাদুঘর, সিনেমা থিয়েটার, এ সবে আমি যাই না, কিন্তু তোমার যদি এতই যাবার ইচ্ছে, তা হলে ঠিক আছে, আমার সময় হলে আমি নিয়ে যাব।

কিষান বেরিয়ে যায়। সিঁড়িতে শব্দ হয় ধপ ধপ, নামার।

টেবিলে চাবির গোছা। নীলা সারাদিনই ঘুরে ফিরে চাবিটি হাতে নেয়, ঘরে আগুন না লাগলে এ চাবি ব্যবহারের কোনও পরামর্শ কিষান দেয়নি।

৭

কবে তোমার সময় হবে গো?

শনিবার সকালে কিষানের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে নীলা।

নীলার দিকে আরও সরে এসে কিষান তার ডান বাহুটি নীলার শরীরে ছড়িয়ে দিয়ে বলে তোমাকে সময় দেবার সময় তো এই শনি রোববার। সপ্তাহগুলো ব্যস্ততায় কাটে, ঘরে শুয়ে বসে থাকার দুটো কেবল দিন। বউয়ের নরম হাতের স্পর্শ সারাদিন ধরে নেব।

কোদালি দাঁত যতটা সম্ভব আড়াল করে হাসে কিষান। এ হাসিটি তার যে কোনও হাসির চেয়ে ভাল। কিষান সম্ভবত ভাবে এ হাসিটি প্রেমিকের হাসি। প্রথম প্রেমে পড়লে প্রেমিকার সঙ্গে এমনই কায়দায় হাসে প্রেমিককুল।

সারাদিন শুয়ে বসে থাকবে? আর কিছু না? নীলা জিজ্ঞেস করে। মন তার উড়ছে খোলা হাওয়ায়।

কিষান মাথা নাড়ে। আর কিছু না।

আগে একদিন বলেছিলে শনি রোববার হল ঘর পরিষ্কার করার, কাপড় ধোবার।

তাও ঠিক। কিষান ঘুম ঘুম স্বরে বলে।

নীলা সারাদিন নিপুণ হাতে ঘর ঝাড়ু দিল, কাপড় কাচল, ফুলগাছের গোড়ায় জল ঢালল, রান্না করল। এ সব করে নীলার অভ্যেস নেই যদিও, করল। করতে করতে নীলা ভাবে, সে কি এ সব কিষানকে ভালবেসে করছে না কি ওকে খুশি করার জন্য করছে যেন অন্তত এ কারণে নীলাকে সে ভালবাসে, ভালবাসার তো কোনও একটি কারণ থাকতে হবে, কিছু গুণ না থাকলে তো জোর করে ভালবাসা যায় না। গুণ বলতে তো রান্নাবান্না করা, ঘর গোছানো, এ সব। বউ হয়েছে বলেই যে আকাশ থেকে বউয়ের জন্য ভালবাসা জলের ফোঁটার মতো বুকের ওপর পড়বে তা তো নয়! নীলা ভাল গান গায়, সাহিত্যের ভাল খবর রাখে, এ সব কিষানের মনে ভালবাসা জাগাবার কোনও কারণ নয়, কারণ কিষান বাংলা ভাষা বোঝে না। এ ভাষায় শুয়োরের বাচ্চা বলে গাল দিলেও কিষান বুঝবে না যে এ গাল, না বুঝে মিষ্টি মিষ্টি হাসবে। এ ভাষায় কবিতা আবৃত্তি করলেও কিষান ভাবলেশহীন মুখে বসে থাকবে সামনে। এ ভাষা, এ বাড়িতে ভাঙা কাচের মতো মূল্যহীন। ভাঙা কাচ গা কাটা ছাড়া আর কোনও কাজে আসে না। এ অচল ভাষাও তেমন। শরীর না কাটলেও মন কাটে। এ ভাষার অসম্ভব সুন্দর শব্দাবলী নীলার ভেতরে গুমরে মরে আর যখন একা একা নীলা নিজের সঙ্গে এ ভাষায় কথা বলে বা গেয়ে ওঠে আমি কান পেতে রই, ও আমার আপন হৃদয় গহন দ্বারে, কোন গোপন বাঁশির কান্না হাসির গোপন কথা শুনিবারে, ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে, কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে...নীলা লক্ষ করে চোখে জল তার, আসলে জল নয়, নীলা ভাবে, এ হৃদয় কাটা রক্ত।

সারা সকাল বিছানায় গড়িয়ে কিষান টেলিভিশনের সামনে সোফায় আসে দ্বিতীয় দফা গড়াতে, ভিডিওতে কেয়ামত সে কেয়ামত চালিয়ে। নীলা তখন কার্পেট ঝাড়ু দিয়ে জানালার কাছে কাচ মুছছে। কাচ মুছে, রান্না সেরে, স্নান সেরে, কেবল গুণ নয়, রূপও যেহেতু চাই কিষানের, মুখে তাই ক্রিম মেখে, পাউডার মেখে, চোখে কাজল পরে, ঢাকাই শাড়ি পরে সামনে এসে বসে নীলা। বউ নীলা। লক্ষ্মী নীলা। ঘরণী নীলা।

কেমন লাগছে দেখো দিকিনি! কিষানের পাশে ঘন হয়ে বসে জিজ্ঞেস করে।

বেশ।

এই ওদের একবার নেমন্তন্ন করবে না?

কাদের?

সুনীলদের।

সময় কোথায়।

আজ সন্ধেয় না হয় ডাকো।

এভাবে ডাকা যায় নাকি! অন্তত দু সপ্তা আগে থেকে জানাতে হবে তো!

ও।

কেন, হঠাৎ ওদের কথা কেন!

অনেকদিন বাংলায় কথা বলি না তো!

হুম তাও কথা। তোমার সঙ্গে কোনও এক বাঙালির বিয়ে হলে ভাল হত।

বাঙালির সঙ্গে বিয়ে না হয়ে ঢের ভাল হয়েছে। বাঙালিকে বিশ্বাস নেই।

কিষান তার না কোদালে হাসিটি হাসে।

আচ্ছা, তুমি ঘরে বসে পাঞ্জাবি ভাষাটা শিখলেও তো পারো!

কী করে?

পাঞ্জাবি গান শোনো। ছবি দেখো। আমার সঙ্গে একটু একটু বলো। হয়ে যাবে।

তার চেয়ে ফরাসি ভাষাটা শেখা ভাল না?

মাথায় যদি কুলোয়, তা হলে শেখো।

ফরাসি ভাষা যে ঘরে বসে থেকে আর কিষানের সঙ্গে গাড়িতে হঠাৎ হঠাৎ এদিক ওদিক ঘুরে এলে শেখা হবে না, তা নীলা যেমন জানে, কিষানও জানে। এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সে বলে আচ্ছা সানালের বাড়ির নেমন্তন্নে তো গেলে না, কাটিয়ে দিলে, ওকেই না হয় আজ খেতে ডাকো!

নাহ। ও ছেলের মুখের লাগাম নেই! দেখলে না তোমার সঙ্গে কী রকম রং তামাশা করল সেদিন।

রং তামাশা?

তাই তো। এ নিয়ে পরে রাজেশ বলেছেও যে সানালের এ সব করা মোটেও ঠিক হয়নি। অন্যের বউয়ের দিকে নজর দেওয়া ওর চিরকালের স্বভাব। ভারতীয় বউগুলো এলেই সানাল ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেন রে বাবা নিজে একটা জোগাড় করে নিলেই তো পারিস, অন্যের সম্পদে চোখ দিস কেন!

কিষানের সারা মুখে ঈর্ষা চমকাচ্ছে, নীলা স্পষ্ট দেখে। সানাল গত রবিবার নীলা আর কিষানকে নেমন্তন্ন করার পর, কিষান প্রথম বলেছে নিশ্চয়ই যাব, তারপর বলেছে দেখি, তারপর বলেছে, মনে হচ্ছে না হয়ে উঠবে, একেবারে শেষে বলেছে, ভাই খুবই দুঃখিত, বিষম এক কাজ পড়ে গেছে, জরুরি কাজে আমাকে লিওঁ যেতে হচ্ছে। কিষান লিওঁ যায়নি সেদিন, প্যারিসেই ছিল।

সে রাতে ওর তো তোমাকে স্ক্রু ড্রাইভার বানিয়ে দেওয়া উচিত হয়নি। কিছু বানাতে হলে সে আমি বানাব। আমার বউ আমি দেখব তার কী লাগবে না লাগবে। কিষানের ঘাড়ের রোঁয়া ফুলে ওঠে বলতে গিয়ে।

ধুর কী যে বলো। তোমারই তো বন্ধু। বউদির সঙ্গে মজা করেছে এই যা। নীলা বলে।

তুমি বুঝবে না, এ সব মজা না। এই পনেরো বছরে প্যারিসের ভারতীয় ছেলেদের কাণ্ড কম শুনিনি, অন্যের বউ ভাগিয়ে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করে, নয়তো অবৈধ সম্পর্ক করে।

কিষান নাক কুঁচকোলো। কপাল কুঁচকোলো। ঠোঁট কুঁচকোলো।

নীলা কুঁচকোনো কিষানের সামনে থেকে সরে জানালায় গিয়ে দাঁড়ায়। আচ্ছা, আজ চলো না তোমার রেস্তোরাঁয় রাতের খাবার সারি।

কী যে বলো, পুরো সপ্তাহটা কাটে ওই রেস্তোরাঁয়। আজ যাব না! অবশ্য...সামনের

সপ্তাহে তোমায় নিয়ে যাব, রেস্তোরাঁয় মাছ মাংস খাওয়াতে...

নীলা ঘুরে দাঁড়ায়। কিষানের দিকে পায়ে পায়ে যেতে যেতে বলে, ঠিক বলছ তো!

ঠিক বলছি, ঠিক।

কিষান নীলার ডান হাত টেনে নিয়ে নিজের চুলে বসিয়ে দিয়ে বলে, দেশি মেয়ের হাতের স্পর্শই অন্যরকম, দেশি মেয়ের স্বাদই আলাদা!

কিষানের চুলে এবং টাকে দুটোতেই হাত বুলিয়ে দিতে দিতে চাপা হাসি ঠোঁটে, নীলা বলে, বিদেশি মেয়ের স্বাদ কেমন?

ধুর। কিষান ঠোঁট ওলটায়।

কেউ কি হাত বুলিয়ে দিয়েছে চুলে? কিষানের মুখের ওপর ঝুঁকে বলে নীলা।

কিষান চোখ বোজে। হুলো বেড়াল চোখ বোজে। গড়গড়।

বলছ না যে, কেউ হাত বুলোয়নি?

ওরা এ সবের বোঝেই না, কী বুলোবে!

কী করে জানো যে বোঝেই না?

বোজা চোখ বুজেই থাকে। জানি জানি। কে না জানে!

৮

সোমবার সকালে নীলাকে নিয়ে ইল দ্য লা সিতের পুলিশঅফিসে গিয়ে নীলার নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করল কিষান। ঘণ্টা দুয়েক কাটানোর পর যখন বেরিয়ে এল, নীলার ইচ্ছে করে নতরদামে যেতে, কিষানের ইচ্ছে করে না। নীলার ইচ্ছে করে সেইনের পাড় ধরে হাঁটতে, কিষানের ইচ্ছে করে না। এই দ্বীপটিতে, এই ইল দ্য লা সিতের ছিল সবচেয়ে পুরনো বসতি, এখানেই এক উপজাতি জেলেদলের নাম ছিল পারিসি। রোমানরা এসে পরে এ জায়গা দখল করে নিয়ে সেইনের ধারে বাড়ি ঘর তুলেছিল, রোমান শহরের চিহ্ন কিছু আছে ওপারে। জানো, ওই পারিসি উপজাতির নামেই এ শহরের নাম প্যারিস হল। আগে নাম ছিল লুতেসিয়া। কিষান জানে না, জানার কোনও ইচ্ছে তার নেই। তার তাড়া রেস্তোরাঁয় যাবার। নীলাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে সে চলে গেল। ওই তাড়ায় কিষান ভুলে গেছে তার ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর লেখা নোটবইটি সঙ্গে নিতে। কিষানের ছোট্ট নীল নোটবইটি হাতে নিয়ে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখা নামগুলো দেখে নীলা। বেশির ভাগ নামই সে চেনে না। নীলার নাম নেই, বদলে নিখিলের নাম, পাশে বালিগঞ্জের বাড়ির নম্বর। সুনীলের নামের পাশে পাঁচটা ফোন নম্বর, একটি প্যারিসের বাড়ির, দুটো ক্লিনিকের, একটি মোবাইলের, আর একটি কলকাতার বাড়ির।

নীলা শুয়ে নোটবইটি কোলের ওপর নিয়ে সুনীলের আপিসের একটিতে ফোন করল।

ফরাসি ভাষায় একটি মেয়েকণ্ঠ তড়বড় করে কিছু বলল, নীলা কেবল জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ইংরেজি জানো?

মেয়েটি সাফ বলে দিল, না। বলে ফোন রেখে দিল। খটাস।

সুনীলের আপিসে আরেকটি নম্বরে ফোন করে এবারও একই কণ্ঠ পেল। খটাস।

সুনীলের নাম থেকে ওপরে চোখ পড়তেই দেখে সানাল।

নম্বরটি নীলা টুকে রাখে। সানালেরও দুটো নম্বর, আপিসের নম্বরে খটাসের ভয়ে নীলা ফোন করে না।

শেষে তাজমহলে, কিযানকে বলতে যে টেলিফোনের নোটবইটি বাড়িতে পড়ে আছে। কিষান নেই, এখনও রেস্তোরাঁয় পৌঁছোয়নি, সবে রেস্তোরাঁ খোলা হল, থাল বাটি সাজানো হচ্ছে, গেলাসে ন্যাপকিন পোরা হচ্ছে। লোবানের গন্ধ ছড়ানো হচ্ছে রেস্তোরাঁয়।

গন্ধটা বিচ্ছিরি লাগে না? নীলা বলে।

এ দেশি লোকেরা আবার এ গন্ধ পছন্দ করে। আমার সহ্য হয় না, মনে হয় কেউ যেন মারা গেছে। মোজাম্মেল বলে।

দুপুরে কী রান্না হচ্ছে ওখানে?

রান্না নতুন করে কিছু হয় না। সেদ্ধ খাবার থাকেই ফ্রিজে, বের করে তেলে ভেজে দাও, বারোয়ারি মশলায় ছেড়ে দাও। তবে তন্দুরি চিকেন আর নানরুটিতে মন ঢালতে হয়। এ দেশিরা এটিই খায় বেশি।

ও।

এদিকে যে অনেকদিন আসেন না!

যাব একদিন, খেতে যাব। মাছ মাংসের স্বাদই ভুলে যেতে বসেছি। ছাগলের মতো ঘাসপাতা চিবোতে হয় শুধু।

মোজাম্মেল হাসে। বলে, যাই বলুন দিদি, শাক সবজিতে ভিটামিন আছে।

তা আছে। এ থেকে জেড পর্যন্ত ভিটামিন টলটল করছে। বলে নীলা নিজেই হাসে।

দিদি আপনি কি লেখাপড়া করছেন না কি চাকরি করছেন?

লেখাপড়া করছি না। তবে চাকরি করছি। ঘর সংসারের চাকরি। বেতন ছাড়া চাকরি।

মোজাম্মেল হাসে, নীলাও।

আচ্ছা মোজাম্মেল, আপনি তো অনেক জায়গায় কাজ টাজ করেছেন, আমার জন্য একটা কাজ খুঁজে দেখবেন।

নীলার কণ্ঠস্বরে মোটেও মনে হয় না, সে কথার কথা বলছে।

আপনি চাকরি করবেন? তো কিষানবাবুকে বলুন না, ওঁর তো অনেক চেনা আছে। আমি তো ছোট চাকরি করি...আমি কী করে বড় চাকরির খোঁজ দেব বলুন।

মোজাম্মেলের কথা শেষ না হতেই নীলা বলে, ছোট চাকরিই করব। আপনি পদার্থ বিজ্ঞানে মাস্টার্স করে থাল মাজেন, আমি বাংলা সাহিত্যে মাস্টার্স করে না হয় ঘরই ঝাড়ু দিলাম। নীলা বলে। নীলার কণ্ঠস্বর শুনে আবারও কেউ বলবে না যে সে মজা করছে।

ছি ছি কী বলছেন দিদি। আমি তো করি আর কোনও উপায় নেই বলে।

আর আমার বুঝি খুব উপায় আছে?

নীলা হাসে, মোজাম্মেলও।

কিষানবাবু তো ভাল টাকা রোজগার করেন।

তো?

কেন, ওতে তো চলছে ভাল।

মোজাম্মেল, কিষান রোজগার করে, ও তো ওর টাকা, আমার তো নয়।

মোজাম্মেল অপ্রস্তুত। থেমে থেমে বলে, আপনি কিষানবাবুকে বললে নিশ্চয়ই..

ও বউদের চাকরি করা পছন্দ করে না...

কেন কিষানবাবুর আগের স্ত্রী তো চাকরি করতেন!

আগের স্ত্রী?

মোজাম্মেল অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে, কেন দিদি, আপনি জানেন না?

না তো...

মোজাম্মেল খদ্দেরের দোহাই দিয়ে ফোন রেখে দেয়।

সেদিন বিকেলেই নীলা সুনীলের বাড়িতে ফোন করে কিষানের আগের বিয়ের ঘটনাটি সত্য কি না জানতে চায়।

কেন তুমি জানো না?

নাহ।

হ্যাঁ, ওর তো ফরাসি বউ ছিল। ইমানুয়েল। কিষান বলেনি?

নাহ।

বলো কী, আমি তো জানি, তুমি জেনেই বিয়েতে রাজি হয়েছ।

নীলা অনুভব করতে চেষ্টা করে, কিষানের আগে একটি বউ ছিল বলে তার কষ্ট হচ্ছে কিনা। কোনও যন্ত্রণা তার শরীর থেকে মনে ছড়াচ্ছে কি না, আশ্চর্য, না। ছড়াচ্ছে না।

৯

কী ব্যাপার এই সন্ধেবেলা ঘুমোচ্ছ? কিষান ঘুমের নীলাকে ডেকে প্রশ্ন করল।

আড়মোড়া ভেঙে নীলা বলল, সময় খুব বড় শত্রু আমার, তাই সময়কে হত্যা করছি একরকম, ঘুমিয়ে।

রাতে দুজন লোক আসবে, বেশ কিছু পদ রান্না করতে হবে। শুরু করে দাও এক্ষুনি।

নীলা হেসে বলল, এই তো ব্যস্ত বানিয়ে দিলে। কারা আসবে শুনি?

এক পাঞ্জাবি দম্পতি। তুমি চেনো না।

কেবলই দেশি বন্ধু, তোমার বিদেশি বন্ধু নেই?

আছে, তবে বাইরে, ঘরের বন্ধু দেশিই হয়।

ইমানুয়েলও কি বাইরের বন্ধু ছিল?

ইমানুয়েল কে?

তোমার স্ত্রী।

ও তা খবর দিল কে?

যেই দিক না।

মনে হয় তুমি খুব ভেঙে পড়লে?

মোটেই না! এত সহজে ভাঙলে চলবে!

ইমানুয়েলকে বিয়ে না করলে আমার ফরাসি নাগরিক হওয়া হত না, আর সে সুবাদে যে তোমারও হচ্ছে, সেটিও হত না।

তুমি তো আগে বলনি ইমানুয়েলের কথা।

কেন, আগে জানালে বুঝি এ বিয়েতে রাজি হতে না?

হয়তো না।

হতে হতে।

কী করে জানো হতাম?

হতে কারণ প্রেমিকপ্রবর সুশান্ত তোমাকে ছেড়ে যেভাবে পালিয়েছে, আমি না বিয়ে করলে তোমাকে কেউ বিয়ে করত না, খবর তো আর কম রটেনি। শুয়েছও তো ও ছেলের সঙ্গে, শোওনি?

নীলার বুকের ভেতর এক কলস ঠাণ্ডা জল উপুড় হয়ে পড়ল।

কী শুয়েই থাকবে নাকি? রান্না করতে হবে তো! কিষান টাই ঢিলে করতে করতে গলা চড়ায়।

১০

সকালে কিষান বেরিয়ে যাবার পর নীলা অলস শুয়ে রইল। শুয়ে শুয়ে ভাবছিল গত রাতে পাঞ্জাবি বন্ধুদম্পতি নিয়ে মধ্যরাত অব্দি কিষানের হইচই এর কথা। নীলা শোবার ঘর থেকে শুনেছে, তিন মাতালের উচ্ছ্বাস। যা রান্না করেছিল, কিষান বারবারই বলেছে, মোটে ভাল হয়নি। নান পুড়ে গেছে, ডালমাখানিতে কিছু একটা কম হয়েছে, কী কম হয়েছে তা অবশ্য বলেনি আর ফুলকপির তরকারি, পাঞ্জাবি বউটি যদিও বলেছে ভাল, জিভে চুক চুক শব্দ করে কিষান বলেছে আরও ভাল হতে পারত। নিজেকে নীলার মনে হয়েছে, সে তার মা, সে মলিনা। অনির্বাণ এমন আচমকা বলে বসতেন, রাঁধো তো, বন্ধুরা খেতে আসছে। মলিনা রান্নাঘরে ঘেমে নেয়ে রাঁধতেন। খেতে গিয়ে অনির্বাণ সব সময়ই এটা ওরকম হলে ভাল হত আর এটা না হয়ে ওটা হলে স্বাদ হত এ সব বলতেনই। মলিনা স্বামীকে যত তুষ্ট করতে চাইতেন, তত ব্যর্থ হতেন।

নীলা সানালকে ফোন করে।

ওপাশে সানাল গলা শুনে চিনতে পারেনি, চিনতে পারার কোনও কারণও নেই।

নীলা। নীলাঞ্জনা মণ্ডল।

ও মিসেস কিষানলাল!

হ্যাঁ মিসেস কিষানলাল।

তা কী খবর মিসেস লাল। হঠাৎ?

নীলা টের পায় সানাল আশা করছে কোনও জরুরি খবরের।

না এমনি। এমনি ফোন করলাম। নম্বরটা পেলাম। ভাবলাম জিজ্ঞেস করি কেমন আছেন।

আমি ভাল আছি। বেশ ভাল। হা হা। তা আপনি কেমন আছেন! সানালের সেই উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর।

আমার আর থাকা! তা আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। অনেকদিন আপনাকে দেখি না। নীলার গলায় ব্যাকুলতা।

তা স্বামী দেবতাটি কোথায়? ঘরে আছে?

নেই। ওর তো দিনরাত ব্যস্ততা।

হুম। বিদেশে ব্যস্ত না থাকলে চলেও না...তা ভাবীজি আমারও ব্যস্ততা ভীষণ। এই তো ছুটতে হবে কাজে।

সানালের ব্যস্ত কণ্ঠ।

ও। ঠিক আছে। আমি বোধহয় অসময় ফোন করলাম।

নীলা ফোন রাখে। নিজের ওপর রাগ হয় তার। কেন এই ফোনটি সে করেছে, কেন সে শুনতে গেছে যে সানাল খুব ব্যস্ত, এত ব্যস্ত যে নীলা যেচে ফোন করার পরও তার যেহেতু এখন সময় নেই, কখন সময় হবে কথা বলার, সকালে না হলে দুপুরে, দুপুরে না হলে রাতে, আজ না হলে কাল তা বলেনি। এত ব্যস্ত যে নীলা যে ভাল নেই তার ইঙ্গিত দেবার পরও সানালের এতটুকু উৎসাহ হয়নি জানতে কেন নীলা ভাল নেই, কী ঘটেছে বা কী ঘটছে।

সানালের সঙ্গে সে কেন কথা বলছে চেয়েছে! এ কি কেবল কারও সঙ্গে কথা বলার জন্যই! কারও সঙ্গে কথা বলার জন্য এমনই যদি আকুতি, তবে সে মলিনার সঙ্গে বলতে পারত অথবা কলকাতার পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে। কলকাতা যেহেতু দূরে, যেহেতু কিষান বলেছে, ঘন ঘন বিদেশে ফোন করলে ফ্রান্স টেলেকমের ধারালো ছুরিতে গলাটা কাটা পড়বে, সে প্যারিসেই সুনীল বা চৈতালির সঙ্গে বলতে পারত যত কথা আছে মনে। বলেনি কারণ নীলা সানালের সঙ্গেই চেয়েছে বলতে, যে সানালের দুর্নাম আছে অন্যের বউয়ের সঙ্গে রং তামাশা করার, যে সানালের দুর্নাম আছে অন্যের বউয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার, অন্যের বউকে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার, সেই সানালকেই নীলা চেয়েছিল তাকেও যেন ভাগিয়ে নেয় এ বাড়ি থেকে, যে করে হোক। নীলা নিজেকে প্রশ্ন করে, এই কি কারণ? নীলা কারণ জানে না। আজকাল নীলার মনে হয় অনেক কিছু সে জানে না। কেন সে সারাদিন শুয়ে থাকছে সে জানে না। কেন সে উঠে চা পর্যন্ত খায়নি, সে জানে না। কেন সে স্নান করতে ওঠেনি, দুপুরের খাবার খেতে না, এমনকী জানালায় দাঁড়িয়ে রাস্তার কোলাহল দেখতেও না, সে জানে না। কেন সে সুনীলের বাড়ি থেকে আনা বইগুলো পড়তে নিয়েও রেখে দিয়েছে, সে জানে না।

বিকেলে ফোন বাজে, নীলা ফোনের দিকে পিঠ ফিরে শোয়, কেউ হবে হয়তো, কিষান কিংবা রেস্তোরাঁর কোনও লোক তাকে খুঁজছে, অথবা কোনও পাঞ্জাবি কারবারি।

শ্রুতিযন্ত্রে সুনীলের কণ্ঠ শুনে নীলা রিসিভার তোলে, কী ব্যাপার নীলা, ফোন ধরছ না।

শুয়েছিলাম। ক্লান্ত স্বর নীলার।

এই অসময়ে? তা আছ কেমন?

এই তো।
কিষান বাড়িতে?
না।
কী ব্যাপার ও রেস্তোরাঁয় নেই। মোবাইলও ধরছে না, ভাবলাম বাড়ি আছে বুঝি।
নেই।
তা কী করে সময় কাটাচ্ছ? কী কী দেখলে প্যারিসে?
ইফেল টাওয়ার দেখেছি।
আর?
আর কিছু দোকান।
ল্যুভরে যাওনি?
না।
মিউজি দর্সে?
না।
পিকাসো, রোদ্যাঁ কিচ্ছু না?
না।
কিষানকে একদিন বলেছিলাম আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেন বেরোতে দেয়, তা হলে প্রদর্শনীগুলোয় নিয়ে যেতে পারতাম, আর দেখার এত কিছু আছে এ শহরে, ও বলল ও নিজেই নাকি তোমাকে নেবে, আর বিয়ের পর পর কেউ কি বউ ছাড়তে চায়, স্ত্রৈন হয়ে থাকে তো অন্তত ক'মাস।
বলে সুনীল হাসে দম টানা হাসি। হেসে আবার বলে, আমি নিজেকে দিয়ে বুঝি, চৈতালিকে বিয়ে করার পর তো কাজেই যাইনি পুরো দু মাস। চব্বিশঘণ্টা আঠার মতো লেগে ছিলাম দুজনে।
আচ্ছা, সুনীলদা, আপনার হাতে কোনও চাকরি টাকরি আছে? নীলা আচমকা প্রশ্ন করে।
চাকরি? কেন? কার জন্য?
আমার জন্য।
তুমি চাকরি করবে?
করব।
কিষানকে বলেছ? ও কী বলে?
ওকে বলিনি।
ওকে বলনি? তা হলে হবে কী করে?
কিষান কিষান কিষান, কিষান ছাড়া যেন আমার জীবনে কিছু হবার নয়।
না সে কথা বলছি না। কাজ করার আগে ভাষাটা তো শিখতে হবে...
ভাষা শিখব কোথায়?
আলিয়ঁস ফ্রসেজে যাও না কেন! কিষানকে বলো...
আমাকে ঠিকানা দিন, কী করে যেতে হয় বলুন, আমি একাই যেতে পারব।
কিষান তো রাগ করবে...

[illegible] ফেলে।

ওপাশ থেকে সুনীল বলে, কিষান বাড়ি এলে বোলো বাড়িতে আমাকে একবার ফোন করতে।

কোনও জরুরি ব্যাপার?

আরে ওই পুজোকমিটির ব্যাপার। ও কিছু চাঁদা দেবার লোক জোগাড় করে দেবে বলেছিল।

ও।

১১

যে চাবি ঘরে আগুন না লাগলে ব্যবহারের পরামর্শ কিষান দেয়নি, সে চাবি ঘরে আগুন লাগেনি, অথচ নীলা ব্যবহার করে। বাইরে বেরোয় সে। বেরিয়ে রাস্তায় এলোপাতাড়ি হাঁটে। পকেটে শহরের একটি মানচিত্র আর কিছু ফ্রাঁ। গার দ্য নর্দ নামের সেই প্রাসাদের ভেতর ঢুকে দেখে, মানুষ ঢুকছে, বেরোচ্ছে, রেলগাড়ি থামছে, ছাড়ছে। নীলা একটি থামে হেলান দিয়ে রেলগাড়ি দেখে, ইচ্ছে করে দূরে কোথাও যেতে। রাজপুত্রের মতো দেখতে নীল চোখের সোনালি চোখের যুবকেরা রেলগাড়িতে চড়ে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে, নীলাকে কেউ নিচ্ছে না, নীলার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। তার হঠাৎ মনে হয় সে দৃশ্যমান তো! নিজের দিকে তাকায়, পাট ভাঙা কালো জিনস, তার ওপর সাদা একটি সিলকের শার্ট, শার্টের ওপর গোলাপি একটি কার্ডিগ্যান, পায়ে পালিশ করা কালো জুতো, নীলাকে নীলা নিজেই বোঝে মোটেও কুৎসিত লাগছে না। তবু কেন তার দিকে কারও তাকাবার রুচি হয় না! কলকাতার রাস্তায় হাঁটলে সে নিশ্চিত যে কোনও পুরুষই তাকে ফিরে ফিরে দেখত। প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আবারও নীলা উদ্দেশ্যহীন হাঁটে, হেঁটে হেঁটে একটি বাসস্টপে দাঁড়াতেই মুহুর্মুহু বাস আসছে, একটিতে চড়ে বসে। কোন বাস, কী বাস, কোথায় যাচ্ছে কিছু না জেনেই সে চড়ে। কিষান একবার বলেছিল, নীলা হারিয়ে যেতে পারে একা বেরোলে। তার মনে হয়, সে যদি হারিয়ে যায়, যাক, ক্ষতি কী। নীলা নিজেকে হারাতে চায়। এমন কোথাও চলে যেতে চায় যেখান থেকে বাড়ির পথ আর সে চিনবে না। বাস যতদূর তাকে নেয়, সে যায়। এক বাস থেকে নেমে কিছুক্ষণ এদিক ওদিক হেঁটে আবার সে নতুন বাসে চড়ে। কখনও উদাস, কখনও ঔৎসুক্য চোখে। কলকাতার বাসে গাদাগাদি ভিড়, ভ্যাপসা গরম, জানালায় বসলে ধুলোয় চোখ মুখ চুল ভেসে যায়। আর এখানকার শীতাতপনিয়ন্ত্রিত বাসের চারদিকটা প্রশস্ত জানালায় মোড়া, ধুলোর বংশও নেই। সামনের দরজা দিয়ে ওঠো, কমলা রঙের টিকিট, মাসের টিকিট, ওঠার সময় ড্রাইভারের সামনে কেবল উঁচিয়ে ধরো, ঢুকে যাও, আর কমলা টিকিট না থাকলে ড্রাইভারের কাছ থেকে সবুজ টিকিট কিনে নাও আট ফ্রাঁ দিয়ে, ছোট মেশিনে সে টিকিট ঢোকালে কড় কড় শব্দ করে সময় তারিখ বসিয়ে দেবে। নিয়ে গদিঅলা চেয়ারে বসে যাও। কোনও চিৎকার নেই, চেঁচামেচি নেই, রাজনীতির গল্প নেই, মাছের বাজারের আলাপ নেই, ঘর সংসারের বর্ণনা নেই। সকলেই শান্ত,

সকলেরই সুখী মুখ, কারও ব্যাপারে কেউ নাক গলাচ্ছে না। সাদা সব মানুষের মধ্যে বাদামি রঙের এক মেয়ে বসে আছে, কেউ এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করছে না তুমি কোত্থেকে এসেছ, কোথায় দেশ, কোথায় বাড়ি। নীলা বাসের ভেতরের বাইরের সুখী মুখগুলো দেখে, দেখে এক যুবক যুবতী উঠল বাসে, প্যারামবুলেটরে বাচ্চা ঠেলে। বাচ্চা ঘুমিয়ে আছে আর যুবক যুবতী এক বাস লোকের সামনে দাঁড়িয়ে চুমু খাচ্ছে। গভীর চুমু। ফরাসি চুমু। নীলার কান লাল হয়ে ওঠে লজ্জায়। নীলা দেখে বাসের আর কেউ তাকাচ্ছে না চুমুখাওয়া জোড়ার দিকে। কলকাতায় এ ঘটনাটি ঘটতে পারত না, বাসে কেউ যদি চুমু খায়, অশালীন কর্ম করার দায়ে বাসের লোকেরা ধাক্কা দিয়ে জোড়া ফেলে দেবে বাইরে। রাস্তায় অশালীন কর্মটি করলে রীতিমতো ঢিল ছুড়বে লোকে। নীলা ভাবে, এই যে চুমু খাচ্ছে এরা, খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বলে খাচ্ছে, চুমুটাকে বাড়ির শোবার ঘরের জন্য রেখে দিচ্ছে না, আড়াল খুঁজছে না, অন্ধকার খুঁজছে না, এর মতো শালীন এবং সুন্দর ব্যাপার আর হয় না। কলকাতার রাস্তায় হাঁটতে গিয়ে কোনওদিন সুশান্তর হাতে হাত রেখে হাঁটতে পারেনি সে, লোকে কী বলবে বলে। লোকে কী বলবে বলে সন্ধের পর চারদিক কালো হলে শহর থেকে চার মাইল দূরে গিয়ে অন্ধকার ঝুপড়ির আড়ালে কোথাও কেউ নেই, এমন জনমনুষ্যহীন জায়গায় এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে একটি কি দুটি চুমু খেয়েছে। নীলার আর সুশান্তর সবচেয়ে বেশি ভয় ছিল মানুষের। শেয়াল ডাকছে ঝুপড়ির পেছনের জঙ্গলে, সে ক্ষতি নেই, মানুষ ডাকলেই সর্বনাশ।

নীলা দেখছে যুবকটি একটির পর একটি চুমু খাচ্ছে আর যুবতীটির পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করছে। এক শরীরের সঙ্গে আরেক শরীর মিশে একাকার। নীলার ইচ্ছে করে মেয়েটির মতো আদর পেতে, ইচ্ছে করে এমন এক সুদর্শন যুবক তাকে এমন করে ভালবাসুক, এমন করে জড়িয়ে থাকুক, এমন গভীর করে চুমু খাক। সেইন নদীর কাছাকাছি এলে নীলা নামে বাস থেকে, সেইনের পাড় ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফুটপাতের সারি বাঁধা সবুজ বাক্স বইয়ের দোকানগুলো দেখে। পর্যটকের ভিড় দোকানের সামনে, বই কেনার নয়, ভিড় ছবি তোলার। হাঁটতে হাঁটতে চোখের সামনে দেখে ল্যুভর জাদুঘর। অপ্রকৃতিস্থের মতো সে দৌড়ে যায় জাদুঘরে। জাদুঘরের সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়েসম যদিও মনে হয় তার, বিশালতার কাছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নিজেকে নির্দ্বিধায় সমর্পণ করে। ল্যুভরের বিশাল জগতে নীলা হারিয়ে যায়, সত্যিকার হারানো যাকে বলে। তার আর মনে থাকে না সে কলকাতার কোনও এক অনির্বাণ মণ্ডলের কন্যা নীলাঞ্জনা মণ্ডল, নিজের কোনও অস্তিত্ব সে অনুভব করে না, ভিড়ের মধ্যে কারও কাঁধ কারও হাত নীলার গায়ে ধাক্কা খায়, নীলা অনুভব করে না। রসোলিও থেকে সুলি, সুলি থেকে দেনোতে সে গ্রস্তের মতো হেঁটে যায়, অনুভব করে না সে হাঁটছে, মনে হয় কেউ তাকে নিয়ে যাচ্ছে, কোনও দেবদূত পাখায় করে তাকে এক কোঠা থেকে আরেক কোঠায় নিচ্ছে। দুপুর গড়িয়ে যায় নীলার খিদে পায় না, খিদে পাবে কেন, তেষ্টাই বা পাবে কেন, নীলা এই জগৎ সংসার থেকে অনেক দূরে। এক অসাধারণ আচ্ছন্নতার মধ্যে নীলার বিকেল পার হয়ে যায়। ল্যুভর থেকে বেরিয়ে আসার পরও তার আচ্ছন্নতা কাটে না, কাচের পিরামিডের পাশে পাথরের মূর্তির মতো বসে থাকে। নীলা ভুলে যায়

যে তার বাড়ি ফিরতে হবে, ভুলে যায় যে তার একটিই পরিচয় সে মিসেস লাল, মিসেস কিষানলাল।

বাড়ি ফিরে দেখে কিষান তখনও ফেরেনি। বাথটাবের গরমজলে নিজেকে ডুবিয়ে শুয়ে থাকে। তার উঠতে ইচ্ছে করে না, রাঁধতে ইচ্ছে করে না। কিষান যখন ফেরে তখনও নীলা সাদা ফেনায় ঢাকা। স্নানঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে কিষান বলে, কী ব্যাপার, এই অসময়ে স্নান করছ?

ওঠো ওঠো। তাড়া দেয় সে।

কেন? নীলার ঠাণ্ডা স্বর।

কেন মানে? আমি এসেছি না?

তো?

তো উঠতে হবে। সেদিন কুমড়োর কথা বলেছিলে, দেখো কুমড়ো এনেছি। এ দিয়ে কিছু একটা করো তো। শুনেছি কুমড়োর নাকি মোরব্বা হয়, জানো করতে?

সাদা ফেনায় নিজেকে আরও ঢাকতে ঢাকতে বলে সে, না।

তা হলে বুদ্ধি করে কিছু একটা করো এটি দিয়ে।

তুমি করো না! তোমার তো অনেক বুদ্ধি।

আমি রান্না করতে জানি নাকি!

নীলা বেশ ভাল জানে যে কিষান রান্না করতে জানে, সে এ বাড়িতে আসার আগে কিষান নিজের জন্য রান্না করত। নীলা বেশ ভাল জানে যে তার ইচ্ছে না করলেও এই ফেনা সরিয়ে তাকে উঠতে হবে। মোরব্বা বানাতে না জানলেও, তাকে মোরব্বা বানাতে হবে।

নীলা যখন স্নানঘর থেকে এল, কিষান মীনাক্ষীর সঙ্গে কথা বলছে ফোনে। জানতে চাইছে, কুমড়োর মোরব্বা কী করে বানায়। ধুতে হবে, চামড়া ছাড়াতে হবে, টুকরো করতে হবে, ছিদ্র করতে হবে, চিনির সিরা বানাতে হবে, সে সিরায় কুমড়োর টুকরো ছাড়তে হবে...চারটে লবঙ্গ ছাড়তে হবে, পাঁচটা এলাচ ছাড়তে হবে, কম আঁচে অনেকক্ষণ রাখতে হবে ইত্যাদি।

ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে রাতে কুমড়োর মোরব্বা বানিয়ে কিষানকে তুষ্ট করার পর নীলা চিঠি লেখে মলিনাকে,

আমার যদি টাকা থাকত মা, আমি বেশ ভাল বেঁচে থাকতে পারতাম। নিজের টাকা মা, নিজের টাকা না হলে, যার টাকা আছে তার কথায় কথায় সারাজীবন কেবল উঠবে বসবে, তুমি ডানে যেতে চাইলে টাকাঅলা বলবে বামে, তোমাকে বামে যেতে হবে। ইচ্ছের কোনও মূল্য নেই, তুমি যদি কপর্দকহীন হও। অন্যের পয়সায় খাব, আর স্বাধীনতা চাইব, এটি হয় না। তুমি কী আমাকে, কাউকে জানিয়ো না, কিছু টাকা পাঠাতে পারো? যে টাকা এনেছিলাম দেশ থেকে, প্রায় শেষ। নিজের হাতখরচের জন্য কিছু থাকা ভাল।

১২

সকালে মলিনাকে লেখা চিঠিটি দুবার পড়ে ছিঁড়ে ফেলে নীলা, ছিঁড়ে মোজাম্মেলকে ফোন করে।

যেমন তেমন একটা চাকরি আমাকে খুঁজে দেবেন, যেখানে ভাষাটা খুব দরকার হয় না!
দিদি, সে পারি, পরে না আবার আমার অসুবিধে হয়। মোজাম্মেল অসহজ কণ্ঠে বলে।
ব্যগ্র নীলা, সে বুঝতে পারছি, আমি কাউকে বলব না।
দিদি আমার চাকরিটা থাকবে না...
নীলা কথা দিল কিষানকে সে কিছুতে জানতে দেবে না যে মোজাম্মেলের কোনওরকম ভূমিকা আছে তার চাকরির ব্যাপারে। দোষ সব নিজের ঘাড়ে নীলা নেবে।

নীলা সেদিনও বেরোল। সারাদিন ঘুরে ফিরে সন্ধের মুখে বাড়ি ফিরল।
কিষান ঘরে ফিরে, এক থোকা উৎকণ্ঠা তার স্বরে, জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলে, ফোন ধরোনি কেন?
কখন ফোন করেছিলে?
দুপুরে করেছি, বিকেলেও।
নীলা একবার ভাবে বলবে সে ঘুমিয়েছিল। আরেকবার ভাবে, না ঘুমিয়ে না, স্নান করছিল। ধুত, স্নান না, টেলিভিশন দেখছিল, ফোনের শব্দ শোনেনি। নীলা যখন যে কোনও একটি বলার, যেটি বললে কিষান স্বস্তি পাবে, খুঁজছিল, আর কিষান দাঁড়িয়েছিল নীলার উত্তরের অপেক্ষায়, তার চোখের সামনে, নাকের সামনে, ঠোঁটের সামনে, নীলা বলল, সে বাড়ি ছিল না। ছিটকে পড়ল কিষান। বাড়ি ছিল না নীলা। বাড়ি ছিল না, তো কোথায় ছিল? বাড়িতে আগুন ধরেছিল? না ধরেনি। ভূমিকম্প হয়েছিল, যা হলে দরদালান থেকে লাফিয়ে নামতে হয়! না হয়নি। কিছুই হয়নি, কিন্তু নীলা বেরিয়েছিল। বেরিয়েছিল, কারণ তার ইচ্ছে করছিল বেরোতে। কিষান তাকে নিয়ে বেরোতে পারত সে নীলা জানে, জেনেও সে একা বেরিয়েছে। কারণ তার একা বেরোতে ইচ্ছে করছিল।
কিষান টাই ঢিলে করে মদের তাকের দিকে যায়, একটি কথা না বলে।
মদের তাক থেকে বোতল হাতে সোফার দিকে যায়, একটি কথা না বলে।
রান্নাঘর থেকে মদের গেলাস আনে, একটি কথা না বলে।
গেলাসে মদ ঢেলে পান করতে থাকে, একটিও কথা না বলে।

নীলা ফ্রিজের খাবার গরম করে টেবিলে এনে রাখে, একটি কথা না বলে।
একটি থালা রেখে যায় টেবিলে, কথা না বলে।

১৩

রাতে কিষান বাড়ি ফিরে দেখে নীলা সোফায় বসে সামনে টেবিলের ওপর পা তুলে টেলিভিশন দেখছে, টেলিভিশনে কোনও ছবি নয়, নাটক নয়, রীতিমতো ফরাসি খবর। কিষান ঘরে ঢোকে, নীলা যেমন বসেছিল, তেমন বসে থেকেই বলে, আজ ফোন করেছিলে বাড়িতে?

কেন?

বাড়ি ছিলাম না তো, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

কিষান জিজ্ঞেস করে, কোথায় গিয়েছিলে?

বিশেষ কোথাও না। আটচল্লিশ নম্বর বাসে চড়ে শাঁ জার্মা দি প্রেতে গেলাম, ক্যাফে দ্য ফ্লোরে বসে চা খেলাম। তারপর বুলোভার্ড শাঁ জার্মায় হাঁটলাম। কত মানুষ হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে দেখি অদ্ভুত সুন্দর এক বাগান, লুক্সেমবার্গ বাগান। সেখানে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। তারপর...কার্তে লাতার এক ব্রাসারিতে দুপুরে খেলাম, তারপর, তারপর কী করলাম, ও তারপর

কিষান দাঁতে দাঁত চাপে। নীলা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে স্পষ্ট সে দেখছে। কিষানকে দেখেও সে টেবিল থেকে পা নামায়নি বরং জিজ্ঞেস করার আগেই নিঃসংকোচে, নির্ভয়ে, নিরুদ্বেগে, নির্বিকারে, নিশ্চিত নির্লিপ্তিতে বর্ণনা দিচ্ছে নিজের নিন্দনীয় নিষিদ্ধ আচরণ। নিশপিশ করা দুটো হাত কিষান মুঠো করে রাখে, মুঠো না করলে সে দুটো হাত নীলার চুলের মুঠি ধরে সোফা থেকে উঠিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরে ফেলত, দরজার বাইরে।

যাও, এবার তোমার শখের ঘুরে বেড়ানোর সাধ মেটাও।

গা এলিয়ে, কেলিয়ে, নীলা বলে দেখলে তো দিব্যি ঘুরে এলাম, কোনও অসুবিধে হয়নি, রাস্তায় দু একজনকে অবশ্য জিজ্ঞেস করতে হয়েছে কোথাকার বাস এ সব। আমি কচি খুকি নই তা দেখলে তো!

তুমি যে কচি খুকি নও, সে বেশ আন্দাজ করতে পারছি। দাঁতে দাঁত। এরকম ব্যাটাছেলেদের মতো পা তুলে বসেছ কেন?

কে বলেছে ব্যাটাছেলেদের মতো! আমি তো একেবারে খাঁটি মেয়েদের মতো পা তুলে বসেছি। নীলা খিলখিল হাসে।

পা নামাও।

কেন? তোমার বসতে অসুবিধে হচ্ছে? নীলার সরল প্রশ্ন।

আমার চোখে অসুবিধে হচ্ছে। তোমার ওই উরু ফাঁক করে বসাটা দেখতে বিচ্ছিরি লাগছে। আবারও দাঁতে দাঁত।

তা হলে দেখো না। মিটে গেল। সরল উত্তর।

ঠিক আছে দেখব না। দূরে যাও তুমি। কিষানের তপ্ত স্বর।

আমি কেন, তুমি দূরে যাও। বলে নীলা পা নামায়। পা নামায় এ কারণে যে কিষান খুব স্বাভাবিক ভাবে খুব শান্ত গলায় একটি খুব সত্যি কথা এখন বলতে পারে, বলতে পারে যে এটা আমার বাড়ি, আমি কোথায় বসব না বসব তা তুমি বলে দিতে পারো না।

খাবার দাও টেবিলে। দাঁত খিঁচিয়ে বলে কিষান।

খাবার কেন? মদ খাও। নীলা বলে।

মদ খাব কি খাব না, সে তোমার বলে দিতে হবে না। খেতে ইচ্ছে করলে আমি নিজেই খাব।

আবারও সেই আদেশ, খাবার দাও টেবিলে।

খাবার তো রাঁধিনি। নীলার শান্ত স্বর।

কেন?

সময় পাইনি।

তোমার নাকি সময়ের অভাব নেই। সময় নিয়ে কী করবে তাই ভেবে পাও না! বলতে গিয়ে ছোট চোখ আরও ছোট হয় কিষানের।

সে তো অকাজে ঘরে বসে থাকলে। নীলা দাঁতে নখ খুঁটতে খুঁটতে, বলে, এবারে পায়ের ওপর পা তুলে, কাল বেরোবার আগে আমাকে কিছু টাকা দিয়ে যেয়ো তো।

কেন?

কিছু বই কিনব।

কী বই?

আজ সেইনের ধারে হাঁটতে গিয়ে দেখলাম ইংরেজি বইয়ের এক দোকান। আসলে এ শহরে একটি নয়, বেশ কটি ইংরেজি বইয়ের দোকান আছে। কিছু বই কিনলে সময় কাটবে।

আমার খুব হিসেব করে চলতে হয় নীলা। কিষান উঠে দাঁড়ায়, টাই ঢিলে করতে।

আচ্ছা আমি চাকরি বাকরি কিছু করলে তো পারি...এভাবে বসে থাকার চেয়ে...নীলা তাকায় কিষানের দিকে নরম চোখে।

তোমার তর সয় না নীলা, বড় অস্থির তুমি। বড় খাই খাই তোমার। বড় চাই চাই তোমার। ক'দিন হল এসেছ? দু মাস, তিন মাস...এরই মধ্যে তুমি ছটফট করছ!

আমি জীবনে কখনও এরকম বসে কাটাইনি। কলকাতায় লেখাপড়া করতাম, সঙ্গে টিউশনিও। নিজের হাতখরচটা হত।

তোমার হাতখরচ, পাখরচ, মাথাখরচ, যা যা খরচ আছে, আমি কি দেব না বলেছি? দিচ্ছি না?

নীলা হেসে বলল, তাহলে দাও, আমার হাতখরচ দাও। পা মাথার খরচ তো চাইছি না।

হাতখরচের দরকারটা কী, আমি বুঝতে পারছি না। তোমার যা দরকার সব আছে এ বাড়িতে। যা যা দরকার, সব পাচ্ছও। মদের তাকের দিকে যেতে যেতে বলে কিষান।

আমার আইসক্রিম খাবার দরকার। বাড়িতে কোনও আইসক্রিম নেই।

ঠিক আছে কাল আমি দশ প্যাকেট আইসক্রিম কিনে আনব, যত ইচ্ছে খেয়ো।

নীলা দাঁত থেকে নখ নামিয়ে জোরে হেসে বলে, আমার মাংস খাবার দরকার।

কে বলল দরকার? মাংস ছাড়া মানুষ বেঁচে আছে না? আমি বেঁচে নেই।

মদের বোতল টেবিলে শব্দ করে রেখে কিষান বলে।

হ্যাঁ আছো, বেঁচে থাকাটাই তো কেবল আমার উদ্দেশ্য নয়। আরও কিছু দরকার।

কী দরকার?

নীলা কিষানের চোখে চোখ রেখে ধীরে, শান্ত গলায় বলে, তুমি রুটির কথা বলছ, কেবল রুটি দিয়ে সব হয় না, গোলাপও দরকার হয়।

ঠিক আছে, কাল একশো গোলাপ কিনে তোমাকে দেব।

তুমি দেবে। কিষান, তুমি দিতে চাও আমাকে। কিন্তু আমি যে আমাকে কিছু দিতে চাই।

কম্পিউটার বাক্সবন্দি করার চাকরি পেল নীলা। সপ্তাহে দেড় হাজার ফ্রাঁ। এই বা কম কীসে, নীলার কাছে এ অনেক। সকালে কিষান যখন ঘুম থেকে ওঠে, পেছন পেছন নীলাও ওঠে, কিষানের মতো নীলাও বাইরে বেরোয়, কিষান গাড়িতে, নীলা মেট্রোয়, গার্দ দ্য নর্দ থেকে দু নম্বর লাইন ধরে বেলভিল, বেলভিল থেকে এগারো নম্বরে উঠে মেট্রো টেলিগ্রাফ। মেট্রো থেকে নেমে রু পেলপোর্ত ধরে হাঁটলেই রাস্তার ওপর কারখানা। চাকরিতে ঢুকেছে এই খবরটি নীলা প্রথম দেয়নি কিষানকে। বাড়িতে কুরুক্ষেত্র বাধাক কিষান, সে চায়নি।

কিষান চণ্ডিগড়ের লোক, কুরুক্ষেত্রেই জন্ম, রক্তের টান বলে কথা। পাণ্ডবে কৌরবে যুদ্ধ বেধে গেল, আর কিষান তো ভগবানেরই সন্তান, ফাঁক পেলেই কৃষ্ণনাম জপে। নীলাকে বেশ অনেকদিন বলেছে, জন্মাষ্টমীর আগে আগে তাকে নিয়ে সে চণ্ডিগড় যাবে, কী ঘটা করেই যে কৃষ্ণের জন্ম উৎসব হয় চণ্ডিগড়ে তাকে দেখাবে সে। হোলি উৎসবও দেখাবে, রঙে ডুবতে চাইলে নীলাকে এমন রঙে ডোবাতে পারে কিষান যে নীলার জীবন ফুরিয়ে যেতে পারে কিন্তু রং ফুরোবে না। নীলা প্যারিসের স্থাপত্য দেখে হাঁ হয়েছে আর কত, চণ্ডীগড় দেখলেও তেমনই হবে, চণ্ডিগড় তো ফরাসি স্থপতি লা করবুসিয়ের করা। মসিয়ে হুসমান থেকে করবুসিয়ে কম কীসে! জারদা দ্য লুক্সেমবার্গ বা জারদা দ্য প্লানত দেখে নীলা উচ্ছ্বসিত হয়, চণ্ডিগড়ের পিঞ্জরবাগান, শুখনালেক, শান্তিকুঞ্জ দেখলেও কম হবে না। কিষানের বর্ণনাতেও নীলা আগ্রহ দেখায়নি চণ্ডিগড় যেতে। কলকাতায় বিয়ের অনুষ্ঠানে নীলা চণ্ডিগড় থেকে আসা কিষানের যে ক'জন আত্মীয়কে দেখেছে, তাতে তার মনে হয়নি চণ্ডিগড়ে এদের সঙ্গ সে সামান্যও উপভোগ করবে।

খবর লুকিয়ে রাখা যায় না। কিষান জেনে যায় নীলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে কোনও এক বাক্সবন্দির দোকানে কাজ করে। যেদিন জানল কিষান, সেদিনই বাড়িতে ডাকল সুনীলকে।

সুনীল বাড়ি ঢুকে এ ঘর ও ঘর হেঁটে কিষানের মুখোমুখি বসে বলল, কী ব্যাপার, জরুরি তলব কেন, হয়েছে কী?

নীলা ফরাসি ভাষা শেখার বই পড়ছিল শুয়ে। সুনীলকে দেখে বই রেখে, ক্যাসেটেও বাজছিল ফরাসি উচ্চারণ শেখানো, বন্ধ করে, উঠে এল।

বাহ্, ভদ্রলোক কি পথ ভুলে? নীলার মুখে মিষ্টি হাসি।

সুনীলের গম্ভীর মুখ, উত্তর নেই। তলবের কারণ সে তখনও বুঝে উঠতে পারছে না।

এ কেমন মেয়ে তুমি বিয়ে করালে সুনীল, এ তো কথা শোনে না, যা ইচ্ছে, তাই করছে। অভিবাদনের আগে আগে অভিযোগ জানায় কিষান। নীলা সোফায় নয়, খাবার টেবিলের একটি চেয়ার টেনে সামনে বসে।

কী করছে? ঘটকচূড়ামণি এখন বিচারকের আসনে।

ওকেই জিজ্ঞেস করো কী করছে। কিষান কাটা দাগের থুতনি তুলে নীলাকে দেখায়।

সুনীল মুখ খোলার আগেই নীলা বলে, খারাপ কিছু করছি না।

কত বড় স্পর্ধা দেখো আমাকে না জিজ্ঞেস করে ও নিজে চাকরি নিয়েছে।

তাই নাকি? সুনীল সুতীক্ষ্ণ চোখে তাকায় নীলার দিকে জানতে যে কিষান যা বলছে তা

সত্যি কি না, নীলা সত্যি সত্যি কিষানকে না জানিয়ে কোনও চাকরি নিয়েছে কি না।

নীলা মাথা নাড়ে, নিয়েছে।

কত ফ্রাঁ পায় ওখানে, ও কটা ফ্রাঁ কি আমার কাছে চাইলে পারে না? ওর জন্য ঘর সংসার ফেলে এভাবে আজেবাজে যতসব কালো লোকদের সঙ্গে কাজ করতে হবে! কিষান এক দমে বলে নিয়ে দম ছাড়ে, সেই ছাড়া দমের সঙ্গে সঙ্গে পেটের তেল চায় শার্টের বোতাম ফেটে বেরোতে।

তুমি বুঝি সাদা? বলে নীলা রান্নাঘরে চপ্পলের চটাস চটাস শব্দ তুলে গেল চায়ের জল চড়াতে।

আমার মান সম্মান সব গেল সুনীল। কিষান বড় শ্বাস ফেলে।

সামনে মদ নেই। টেলিভিশন খোলা নেই। শুকনো স্তব্ধতা সামনে নিয়ে দুজন বসে থাকে।

অনেকক্ষণ বাদে কিষান মলিন স্বরে বলে, সুনীল কিছু বলছ না যে! এর তো একটা বিহিত করতে হবে।

সাদা দেয়ালের দিকে উদাস তাকিয়ে সুনীল বলে, আমি কী বলব, তোমরা স্বামী স্ত্রী, তোমরা এর মীমাংসা করো।

ওকে চাকরি ছাড়তে বলো। কিষানের গলায় বাঘের জোর। অস্থির আঙুলগুলো মুঠোর ভেতর।

এবার দেয়াল থেকে চোখ সরিয়ে সুনীল কিষানে চোখ ফেলে, আমি বলব কেন, তুমি বলো।

খানিক বিরতি দিয়ে সুনীল থেমে থেমে বলে, বিদেশ বিভুঁয়ে আমার মনে হয় দুজনের কাজ করাই ভাল, একজনের টাকায় তো পোষায়ও না। আমি আর চৈতালি দুজন চাকরি করছি, আমাদের বেশ ভাল চলে যায়। তুমি যদি মনে করো, তোমার টাকা পয়সা খুব বেশি...বউকে পালঙ্কে শুইয়ে রাখবে, সে তোমার ব্যাপার।

কিষান উঠে এক গেলাস জল খায়, আবার ফিরে আসে সোফায়, বলতে বলতে যে হ্যাঁ আমি জানি, দুজনের উপার্জন করা ভাল। এতে সংসারে সচ্ছলতা আসে। কিন্তু কী কাজ ওর করতে হবে, কী করলে ভাল, কী করলে মান সম্মানও থাকে, টাকা পয়সাও আসে, তা আমার চেয়ে ও ভাল বুঝবে?

সুনীল মাথা নাড়ে, না, নীলা কিষানের চেয়ে ভাল বুঝবে না।

সুনীলের এমন গম্ভীর মুখ নীলা এর আগে দেখেনি, যে ভাষায় বৈঠক চলছে, ইংরেজি, সে ভাষাতেই বলে সুনীল, তুমি যা করবে কিষানের সঙ্গে পরামর্শ করে করো। ও তোমার স্বামী, ও তো তোমার কোনও খারাপ চায় না।

দুজনে নীলার উত্তর আশা করছে, আশা করছে নীলা বলবে যে ঠিক আছে, মেনে নিচ্ছি, অন্যায় করেছি, কাল থেকে ওই চাকরিতে আমি আর যাচ্ছি না। এখন থেকে আমার স্বামীর আদেশ মতো চলব। ও যেদিন চাকরি করতে বলবে, সেদিন করব। যে চাকরি করতে বলে, সে চাকরি করব, কারণ ও আমার চেয়ে ভাল বোঝে কোন চাকরি ভাল, কোন চাকরি মন্দ। আমার ভাল ওর চেয়ে বেশি তো আর কেউ চায় না। ইত্যাদি ইত্যাদি...

নীলা নীরব থাকে।

নীরবতা ভাঙে সুনীল, বলে, এরকমও হয়, এখানকার বাঙালির বাচ্চাদের ও বাংলা শেখাল, ঘরেই একটা ইস্কুল খুলে নিতে পারে।

কিষান ঠোঁট বাঁকায়, বলো যে সরবনে বাংলার প্রফেসর হতে। এত কি সোজা এসব নাকি! একটা রেস্তোরাঁ খুলতে আমাকে বারো বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে।

নীলা বলে, তোমার মতো গাধার তো বারো বছর লাগবেই। বাংলায় বলে।

যেন কিষান বলে কেউ এখানে উপস্থিত নেই, যেন মান সম্মান ফিরে পেতে কিষান, তার স্বামী কোনও জরুরি বৈঠকে বসেনি, নীলা সুনীলের দিকে মুখ করে বলে যায়, প্যারিসের ক্যাফে সংস্কৃতি আমাকে খুব মুগ্ধ করেছে। লোকেরা বসে আছে, খবরের কাগজ পড়ছে, বই পড়ছে, লিখছে, আবার সাহিত্যের আসরও বসছে ক্যাফেতে, কী চমৎকার তাই না? আচ্ছা, জঁ পল সার্ত্র নাকি ক্যাফে দ্য ফ্লোরে আড্ডা দিতেন, সিমোন দ্য বোভোয়াও? নতরদামের উলটোদিকে একটা বইয়ের দোকান আছে না, শেকসপিয়র অ্যান্ড কোম্পানি! ওখান থেকে জেমস জয়েসের ইউলিসিস প্রথম বেরিয়েছে, জানেন সুনীলদা?

জেমস জয়েস কে? কিষান নীলাকে নয়, শুধোয় সুনীলকে।

নীলা উত্তর দেয়, আইরিশ লেখক।

কলকল করে বইছে নীলা, হেমিংওয়েও আড্ডা দিতেন বইয়ের দোকানটায়। টাকা ছিল না বলে দোকানটি থেকে পড়ার জন্য বই ধার নিতেন।

বলে নীলার আশঙ্কা হয় কিষান জিজ্ঞেস করবে, হেমিংওয়ে কে? ভাল যে করেনি, কারণ নীলা মনে একটি উত্তর তৈরি করেছিল ওই প্রশ্নের, হেমিংওয়ে আমার পিসতুতো দাদা হয় গো পিসতুতো দাদা।

সে রাতের বৈঠকে কিছু এগোল না। নীলার ব্যাপারটি অমীমাংসিত রেখেই সুনীল পুজোর চাঁদা নিয়ে পড়ল। ট্রেতে করে চা বিস্কুট আনল নীলা। চা খেতে খেতে সুনীলকে সেই বাঙালি লোকটির কথা জিজ্ঞেস করল, যার যাবার কথা ছিল কলকাতা। সেই লোক কলকাতা পৌঁছেছে, সেই লোক নীলার বাড়িতে শ্যানেল পৌঁছেও দিয়েছে, সেই লোক ফিরেও আসবে শিগরি। সেই লোক আবার কবে যাবে, নীলা জানতে উৎসুক। সেই লোক এ বছর আর যাবে না তবে এ বছর কে যাবে কলকাতা? এ বছর সুনীল নিজেই যাবে, পুজোর পর। আর নীলা কোন বছর যাবে? নীলা কোন বছর যাবে, সে কিষান জানবে।

রাতে ঘুমিয়েপড়া নীলাকে জাগায় কিষান, জামার বোতাম খুলতে মোটা লোমশ হাত বাড়ায়। নীলা সরিয়ে দেয় কিষানের হাত। কিষান শক্ত হাতে নীলার হাত চেপে চাপা কণ্ঠে বলে, আমি একটা বাচ্চা চাই নীলা।

নীলা বলে, আমাকে ঘুমোতে দাও।

প্রায় সে বলতে নিচ্ছিল, কেন, ইমানুয়েল তোমাকে বাচ্চা দেয়নি? কিন্তু উচ্চারণ করে না ও নামটি। করলেই, নীলার আশঙ্কা হয়, কিষান সুশান্তর প্রসঙ্গ ওঠাবে। শুয়েছে কিনা সুশান্তর সঙ্গে। হ্যাঁ শুয়েছে। নীলা নিজে কুমারী নয় বলে যে নিজেকে তার অপরাধী মনে হত, ইমানুয়েলের ঘটনা জানার পর তার সে বোধটুকু নেই, সেই অপরাধবোধ। নীলা বরং অনেক স্বস্তি বোধ করে আগের চেয়ে। ইমানুয়েল তাকে একরকম বাঁচিয়েছে।

১৪

চাকরি করতে গিয়ে নীলা দেখে বেশির ভাগই কালো, বাদামি আর হলুদ রঙের লোক বাক্সবন্দির কাজ করে। হাতে গোনা ক'জন কেবল সাদা। প্রথম দিনই মসিয়ে গিগু নীলাকে কী কাজ করতে হবে এবং কী করে, তার নিখুঁত বর্ণনা করলেন ফরাসি ভাষায়। নীলা মসিয়ে গিগুর কথা পুরোটাই শুনে গেছে একটি অক্ষর না বুঝে। গিগু ঘর থেকে বেরোলে ওই হাতে গোনা সাদার দল থেকে একটি মেয়ে, দানিয়েল, এগিয়ে এসে নীলাকে জিজ্ঞেস করে কিছু বুঝলে, কী বলে গেল?

নীলা মুখ মলিন করে বসেছিল। কিছুই বোঝেনি সে।

দানিয়েলে বুঝিয়ে বলল।

সেই থেকে দানিয়েলই ফরাসি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেয়, যা কিছু বেরোয় গিগুর মুখ থেকে।

সেই থেকে দানিয়েলই নীলাকে চা খেতে নিয়ে যায় কাছের ক্যাফেতে।

সেই থেকে দানিয়েলকেই অল্প অল্প করে নীলা তার প্যারিসে আসার গল্প করে, কিষানের সঙ্গে তার জীবনযাপনের গল্প করে।

ক্যাথারিন, আরেকটি সাদা মেয়ে, ভাঙা ইংরেজিতে একদিন বলে, তুমি ভারত থেকে এসেছ তাই না?

নীলা হ্যাঁ বলার আগেই ক্যাথারিন বলেছে কিছু টাকা জমলেই সে ভারত যাবে। এই বাক্সবন্দির কাজ করে সে যা পায় তা জমিয়ে দুরের কোনও দেশে চলে যায়। গত বছর গিয়েছিল মালটায়। তার আগের বছর মার্টিনিতে। ক্যাথারিন কলেজ দ্য ফ্রান্সে ইন্ডোলজি পড়েছে, তার থিসিসের বিষয় বাউল। থিসিস লেখার শুরুতে, সে পশ্চিমবঙ্গের অজ পাড়াগাঁয়ে এক বাউলের বাড়ি মাস দুয়েক থেকেও এসেছে। থিসিস তার এখনও জমা দেওয়া হয়নি, আবার সে যাবে, সেই গ্রামে।

বাউলের প্রসঙ্গ আনায় ক্যাথারিনকে মুহূর্তে খুব আপন মনে হয় নীলার। সেদিন দুপুরে একসঙ্গে ব্রাসারিতে খেতে গেল দুজন। খেতে খেতে ক্যাথারিন বর্ণনা করল, কী করে সে হাতে ভাত খেয়েছে বাউলের বাড়িতে, কী করে মাইলের পর মাইল হেঁটেছে কাদাজলে। না কলকাতায় সে থাকেনি, ইচ্ছেও করেনি, ওই গ্রামে গ্রামে বাউলের জীবন দেখতেই তার ভাল লেগেছে। আর সবচেয়ে ভাল লেগেছে যা, যা সে নিয়েও এসেছে একগাদা, তা হল...

নীলার মুখে খাবার, শুনবে বলে সে চিবোনো বন্ধ রাখল।

বিড়ি।

নীলা অনেকক্ষণ ভুলে ছিল মুখের খাবার চিবোতে।

খাওয়া শেষ করে ক্যাথারিন তার পকেট থেকে খুব যত্ন করে একটি বিড়ির প্যাকেট বের করে, দু আঙুলে আরও যত্ন করে একটি বিড়ি তুলে নিয়ে, টানে।

নীলা তার জীবনে কখনও এত কাছ থেকে বিড়ির গন্ধ পায়নি আগে। বিড়ি খাওয়া দেখেছে দূর থেকে, রাস্তার শ্রমিক বা ভিখিরিদের। আগে নীলার এমন জানাও ছিল না যে কোনও গন্ধ এত বিশ্রী হতে পারে।

বিড়ির সৌন্দর্য এবং স্বাদ যে অকল্পনীয় রকমের ভাল, ক্যাথারিন তা হাত পা মুখ মাথা নেড়ে বোঝাতে থাকে আর নীলা নির্বাক বসে বিড়ির বিশ্রী গন্ধ সইতে সইতে শুনতে থাকে এর অসামান্য গুণের কথা।

নীলা সেই বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে দানিয়েল আর ক্যাথারিনের সঙ্গে কারখানার পাশেই এক ক্যাফেতে ঢুকল। ওরা কফি খাবে, নীলা চা। চা কফি এলে নীলা বলে, চলো চেয়ার খালি আছে বসি গিয়ে।

দানিয়েল বলল, না এ দাঁড়িয়ে খাবার চা কফি।

নীলা জানত না, ক্যাফেতে তিন রকম দাম আছে খাবারের। ধরা যাক চা, দাঁড়িয়ে খেলে সাত ফ্রাঁ, বসে খেলে আঠারো ফ্রাঁ, আর বাইরের তেরাসে বসে খেলে তিরিশ ফ্রাঁ। দানিয়েল কাগজে তামাক মুড়ে সিগারেট বানায়। সিগারেট ফুঁকে ছাই ফেলে মেঝেয়। এও নাকি নিয়ম, কাউন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কফি খাওয়া লোকেরা কোনও ছাইদানি পাবে না সামনে, যা ফেলবে মেঝেয়।

তোমরা বাঙালি খাবার পছন্দ করো। নীলা জিজ্ঞেস করে।

নিশ্চয়ই। ক্যাথারিন বলে।

দানিয়েল খায়নি কোনওদিন বাঙালি খাবার। লাফিয়ে ওঠে সে প্রস্তাব শুনে।

নীলা ওই তখনই চা খেতে খেতে ক্যাফেতে, নেমন্তন্ন করে বসে দুজনকে। আগামীকাল সপ্তাহের মাইনে নেবে সে, নিয়ে সোজা বাড়ি, বাড়িতে রান্না করবে, কাজ শেষে দানিয়েল আর ক্যাথারিন সন্ধের দিকে চলে যাবে নীলার বাড়িতে, এরকম কথা হল। নীলা ঠিকানা আর ফোন নম্বর লিখে দিল।

পরদিন ঠিক ঠিক তাই করল নীলা। বেলভিল থেকে মাছ মাংস কিনে বাড়ি ফিরল। সারা বিকেল রান্না করল।

সন্ধেয় দানিয়েল আর ক্যাথারিন দুজনই এল। দানিয়েল ওয়াইন এনেছে দু বোতল।

টেবিলে নরকমের খাবার এনে রাখল যখন নীলা, দানিয়েল আর ক্যাথারিন দুজনই প্রথম উ লা লা, উ লা লা করল, তারপর মনে তাদের প্রশ্ন, নীলা আর কাকে কাকে নেমন্তন্ন করেছে। আর কাউকে না, কেবল ওদের দুজনকেই। দানিয়েল আর ক্যাথারিন পরস্পরের দিকে চেয়ে বিস্ময় বিনিময় করল।

নীলা, তোমার মাথার ঠিক আছে তো!

নীলা বলল, না ঠিক নেই। তার মন খারাপ।

কেন খারাপ।

আরও দুটো পদ রান্না করতে চেয়েছিল, কিন্তু সময়ের অভাবে হল না।

দানিয়েল ওয়াইন খুলে তিনটে গেলাসে ঢালল।

সঁতে।

বোনা পিতি।

নীলা ওদের থালায় খাবার বেড়ে দিল। কিন্তু নীলার পরিবেশন ওদের ঠিক মনমতো হয় না। নীলা দিতে চায়, প্রথম শাক ভাত, শাক শেষ হলে দিতে চায় নিরামিষ, নিরামিষ ফুরোলে মাছ ভাজা, তারপর মাছ ভাজা, তারপর মাছের ঝোল, তারপর মাংস...কারণ

আলাদা আলাদা করে খেলে সব কিছুর আলাদা স্বাদ পাওয়া যায়, এ যুক্তি দানিয়েলের পছন্দ হয় না, একবারেই সে নপদের কিছু কিছুটা করে নিজের থালায় নেয়। বিয়েবাড়ির রেখে দেওয়া থালার খাবার ছুড়ে ফেললে ঠিক এরকমই জগাখিচুড়ি দেখতে লাগে, দেখে নীলার অস্বস্তি হয়। তার ধারণা, ওরা মোটেও এক একেকটি পদের স্বাদ আলাদা করে পাচ্ছে না। মাছ ভাজার সঙ্গে মাংসের ঝোল মেলাচ্ছে। নীলা আহা আহা করে ওঠে, তার আহা আহা বোঝা ওদের পক্ষে সম্ভব হয় না। খেতে খেতে দানিয়েল আর ক্যাথারিন উমমম উমমম শব্দ করে। এই শব্দের অর্থ, খুব স্বাদ।

মাছের ঝোল মুখে পড়তে দানিয়েলের চোখ মুখ কান লাল হয়ে ওঠে। ক্যাথারিন বাউলের বাড়িতে ঝাল খেয়েছে, সুতরাং তার, সে বলল, অসুবিধে হচ্ছে না। দানিয়েল ঝালের তরকারি ফেলে দিয়ে অঝালের দিকে মন দিল। খেতে খেতে দানিয়েল বারবারই বলল, ক্যাথারিনও, কখনও তারা এত পদ দিয়ে খায়নি।

কলকাতায় লোককে নেমন্তন্ন করলে আমরা তো এরকমই করি, এ এমন কোনও আহামরি ব্যাপার নয়।

অতিথির থালায় মাছের টুকরো শেষ হতে, আরেকটি টুকরো তুলে দেয় নীলা। আরেক চামচ ভাত। আরও একটু মাংস নাও। ওরা না বলে। তারপরও নীলা, হাতের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দেয়। ওরা অতিথি, ওরা তো না বলবেই, কিন্তু দিতে তো হবে। এরকম নিয়ম, এরকম নিয়ম দেখেই নীলা বড় হয়েছে কলকাতায়। দানিয়েল হেসে বলে, আশ্চর্য, তুমি ঠাকুরমাদের মতো করছ কেন!

ঠাকুরমার মতো নয়। নীলা ওদের বোঝাতে পারে না অতিথি হল নারায়ণ, অতিথি হল ভগবান, বাঙালির বিশ্বাস এই। ভগবান না মানলেও বাঙালি অতিথি মানে। বাঙালির ঘরে অতিথি এলে সবচেয়ে বড় আসনটি দেওয়া হয়, বড় বিছানাটি দেওয়া হয়, সবচেয়ে ভাল খাবারের আয়োজন করা হয়। ভালবাসি, এ কথাটি মুখে বলা শক্ত বাঙালির পক্ষে, খাইয়ে এবং দিয়ে ভালবাসা বোঝায় বাঙালি।

দানিয়েল আর ক্যাথারিন খেতে খেতে ওয়াইন পান করে, নীলা ওয়াইনে এক কি দু চুমুক দিয়েই রেখে দেয়। ওয়াইনে ওর অভ্যেস নেই।

মহাভোজ তখনও শেষ হয়নি, অতিথিরা বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে খাচ্ছে, খাওয়া স্থগিত রেখে দুবার সিগারেট ফুঁকেছে দানিয়েল, ক্যাথারিন বিড়ি, এর মধ্যে কিষান এল। এক বোতল দুধের মধ্যে দুফোঁটা চোনা।

দানিয়েল আর ক্যাথারিন দুজনই বঁজু বলল, কিষান বঁজু বলে শোবার ঘরে চলে গেল।

এই বুঝি তোমার স্বামী!

নীলা মাথা নাড়ে, এই তার স্বামী।

নীলা ফ্যাকাশে মুখে শোবার ঘরে এসে গলা চেপে বলল, তুমি এমন কথা না বলে চলে এলে যে ওরা কী মনে করবে বলো তো।

ওরা কারা?

আমার সঙ্গে চাকরি করে। দয়া করে ওদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করো। এসো।

কেন?

ওরা তো সাদা। দেখছ না? কালো নয়। বাদামিও নয়। হলুদও নয়।

তো?

এসো, তুমিও খেতে বসো। অনেক রেঁধেছি আজ।

কী রেঁধেছ?

এখানেই নীলা গেল ফেঁসে।

কী রেঁধেছ? মাছ মাংসের গন্ধ পাচ্ছি কেন?

ওরা তো মাছ মাংস ছাড়া খায় না।

ওরা খায় না তো আমার কী? আমার বাড়িতে তো মাছ মাংস রাঁধার কথা না। কিষানের বিস্ফারিত চোখের সামনে নীলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

এই শেষ, আর রাঁধব না। কথা দিচ্ছি। অনুনয়ের স্বর নীলার। অন্তত অতিথি সামনে রেখে বাড়িতে গুমোট হাওয়া বওয়াতে চায় না সে।

তোমার আর রাঁধার দরকারও নেই। সামনে থেকে সরো। আমাকে আর জ্বালিয়ো না।

নীলা সরে এল।

দানিয়েল আর ক্যাথারিন যতক্ষণ ছিল বাড়িতে, কিষান শুয়ে ছিল শোবার ঘরের দরজা বন্ধ করে।

ধুৎ

গার দ্য নর্দ থেকে গার দ্য অস্তারলিজ

ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসছ না কেন?
বেরিয়ে যাব কোথায়?
আপাতত আমার বাড়িতে এসো। তারপর দেখা যাক।

এই তোমার চাবি, সব রইল, আমি কেবল আমার জিনিসপত্র নিয়ে গেলাম। বাড়িঘর যেমন ছিল, আছে। বাড়ি ছাড়ার একটি কারণ, আমাদের মিলছে না, এ কথা কিষান তুমিও ভাল জানো। এই বিদেশ বিভুঁইয়ে জীবনযাপন যে সহজ নয়, সে আমি জানি। চাকরি নেবার পরই তোমার অন্য রূপ দেখতে পাচ্ছি, তুমি আমাকে প্রতিটি মুহূর্তে অসম্মান করছ। কিন্তু একবারও ভেবে দেখতে চাওনি, ওই বাক্সবন্দির কাজ করে আমি কি খুব আনন্দ পাই, ও করব বলে কি লেখাপড়া করেছিলাম! আমি যে কারণে ও কাজটি নিয়েছি, তা হল, তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আমার ভাল লাগে না। জানি, তুমি একে ভিক্ষে মনে করো না, তুমি মনে করো, তুমি তোমার স্ত্রীর ভরণ পোষণ করছ, দায়িত্ব পালন করছ, এ করলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই তুমি বিনিময় দাবি করো, বিনিময়টি হচ্ছে, তোমার আদেশ মতো আমাকে প্রতিটি কাজ করতে হবে, তুমি ডানে যেতে বললে আমাকে ডানে যেতে হবে, বামে বললে বামে যেতে হবে, কারণ তুমি কর্তা, তুমি প্রভু, তুমি না হলে আমার জীবন চলবে না, আমি হলাম নেহাতই এক দাসী তোমার, তোমার ঘরদোর সামলে রাখার, রান্নাবান্না করার, পরিবেশন করার, আর রাতে বিছানায় তোমাকে যৌনানন্দ দেবার। এ ছাড়া আর কোনও ভূমিকায় আমাকে দেখো কি? অবশ্য দেখো, সেদিন বললে তোমার সন্তান দরকার। তোমাকে সন্তান দিতে হবে আমার। এ যেন আমার ব্যাপার নয়, কেবলই তোমার ব্যাপার। তুমি চাও বলে আমাকে দিতে হবে। এরকম তো হতে পারত যে আমরা চাইব।

সে রাতে আমার দুজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আমি বুঝলাম, এ বাড়িতে কাউকে নিমন্ত্রণ করার আমার কোনও অধিকার নেই। সম্ভবত কোনও বন্ধু থাকার অধিকারও আমার নেই। মাছ মাংসের গন্ধ নিয়ে তোমার ঢং অনেক দেখেছি, সারাদিন রেস্তোরাঁয় ওই গন্ধের মধ্যে থেকে এসে বাড়িতে সে গন্ধ আর চাও না। কী কারণ, কারণ আমাকে যে করেই হোক নিরামিষাশী বানাবে তুমি। এতকাল ধরে গড়ে ওঠা আমি, আমার অভ্যেস, আমার ভাষা, আমার স্বভাব, আমার রুচি সব জলাঞ্জলি দিয়ে আমাকে তোমার মনোমতো হয়ে উঠতে হবে। আমি অন্যায় কিছু করিনি, সে তুমি জানো। আমার ওপর তোমার রাগের মূল কারণ, তোমার আদেশ আমি অমান্য করেছি। এত বাধা নিষেধের মধ্যে আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়।

আমি এ বাড়ি থেকে গেলে আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচো।

অনিশ্চিতের পথে পা বাড়ালাম। আপাতত এক বান্ধবীর বাড়িতে।
আমার খোঁজ কোরো না।
নীলা।

চিঠিটি খাবার টেবিলের ওপর রেখে, তার ওপর চাবির গোছা, দানিয়েলের সঙ্গে নীলা বেরিয়ে এল পরদিন বিকেলে। গার দ্য নর্দ থেকে গার দ্য অস্তারলিজ। আগের রাতের এঁটো বাসনপত্র ওভাবেই রান্নাঘরে পড়েছিল। থাকুক, নীলা মনে মনে বলেছে।

গার দ্য অস্তারলিজের ঠিক পেছনের পাঁচতলা একটি বাড়ির সারি সারি চিলেকোঠার একটি কোঠায় থাকে দানিয়েল, এককালে বড়লোকের বাড়ির চাকরানিরা থাকত ও সবে। বড়লোকেরা থাকত নীচতলায় আর চাকরানিরা ঠিক ছাদের তলায়, ছোট একটি চৌকি আর ছোট একটি টেবিল রাখার জায়গা ধরে এমন সব কোঠা, সাকুল্যে আট বর্গমিটার জায়গা। স্নানঘর নেই, করিডোরের এক কোণে একটি শুধু মলমূত্র ত্যাগের ঘর। দেশ থেকে শ্রেণীভেদ দূর হল, প্রভু-ভৃত্যের আমল গেল, চিলেকোঠাগুলোও খালি হল। খালিই পড়ে ছিল, আজকাল ছাত্রছাত্রীরা, নয়তো অল্প রোজগার যাদের, ভাড়া নেয়। দানিয়েল আটশো ফ্রাঁ দেয় মাসে ঘরটির ভাড়া। গত দু বছর সে এই চিলেকোঠাটিতেই আছে। টাকা পয়সা খুব একটা নেই, মাঝে মধ্যে এদিক ওদিক ছোটখাটো কাজ করে, আর করে লেখাপড়া, মেয়েদের পত্রিকায় লেখে, লেখা বলতে বইয়ের আলোচনা, তাও আবার যে কোনও বইয়ের নয়, মেয়েদের লেখা বইয়ের। দানিয়েল কানাডার মেয়ে, ফরাসি ওরও ভাষা, ওর মা অবশ্য আইরিশ। উনিশ শতকে আলুর দুর্ভিক্ষের সময় দানিয়েলের দাদু দিদিমা জাহাজে করে আয়ারল্যান্ড ছেড়ে উত্তর আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন। দানিয়েলের বাবার যদিও কানাডায় জন্ম, ফরাসি আর আদি আমেরিকানের রক্ত শরীরে, ওর ঠাকুরদাই ছিলেন সম্ভবত আদি আমেরিকান, যদিও দানিয়েল তাঁকে দেখেনি কোনওদিন, ঠাকুরদা প্রসঙ্গে কিছুই ওর বাবা ওকে বলেওনি, ব্যাপারটি দানিয়েলের বাবাকে এমনই অপ্রতিভ করত যে এ ব্যাপারে কোনও প্রশ্ন উঠলে বাবা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত, নয়তো চেঁচিয়ে প্রসঙ্গ থামাত। দানিয়েলের ভাই ফিলিপের মধ্যে একফোঁটা চিহ্ন নেই, কিন্তু দানিয়েলের নাকে, চোখে সেই পূর্বপুরুষের চিহ্ন, খানিকটা চিবুকেও, যদিও রং সাদাদের মতোই সাদা।

দানিয়েলের আট বর্গমিটার জায়গার ঘরটিতে একটি বিছানা, একটি টেবিল, তার ওপর ছোট একটি কম্পিউটার, এক কোণে ছোট একটি রেফ্রিজারেটর, তার ওপর একটি চুলো, চুলোর পাশে জলের কল, বেসিন, দেয়ালে বইয়ের তাক, বইয়ের ঘাড়ে বই, মাথায় বই আর একটি হাতলঅলা চেয়ার, একটিই চেয়ার।

আমার কিন্তু একটি বিছানা। দুটো বিছানা পাতার জায়গাও নেই। আর আমার দুটো তোশক নেই, দুটো লেপও নেই যে মেঝেয় বিছানা পাতব!

চাপাচাপি করে শোয়া যাবে, যাবে না! নিশ্চয়ই যাবে। নীলা বলে।

চাপাচাপি করে নীলা আগে অনেক শুয়েছে। গ্রামের কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ে হলে শহর থেকে রাজ্যির লোক নেমন্তন্নে যায়, বিয়েবাড়ির মেঝেতে টানা বিছানা পেতে সাত আটজন করে ঘুমোয় রাত্তিরে। অভ্যেস যে তার একবারেই নেই, তা নয়। আর

বালিগঞ্জের বাড়িতেও কোনও মাসি বা পিসি এলে তার বিছানাতেই শোবার জায়গা করা হত। মাসি পিসিদের গায়ে গা ঘেঁসে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যেতে তার আনন্দও তো কম হয়নি, মঞ্জুষামাসির গা কাঁটা দেওয়া ভূতের গল্প তার এখনও মনে আছে।

রাতে, দানিয়েল বলল নীলাকে খুব ভাল এক রেস্তোরাঁয় খাওয়াবে।

তাহলে আমি ড্রেস পরে নিই কী বলো!

দানিয়েল দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। নীলা পরনের কাপড় পালটে নীল জিনসের সঙ্গে লাল একটি শার্ট পরল, আর ওপরে জিনসের জ্যাকেট। হয়ে গেছে জানালে দানিয়েল ঘরে ঢুকে চোখ কপালে তুলল, কই তুমি না ড্রেস পরবে বললে।

তা তো পরলামই। নীলা হেসে বলে।

এ তো জিনস পরলে। ড্রেস তো পরলে না!

নীলা ঠিক বুঝে পেল না দানিয়েল কী বলতে চাচ্ছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় দাঁড়িয়ে চিকন গলায় বলে, দেখতে কি খুব খারাপ লাগছে?

রায় দিয়ে দিলে, মোটে তাকে দেখতে খারাপ লাগছে না। বাইরের হাওয়ায় এসে নীলার ধিন তা তা ধিন তা তা ছন্দ ওঠে শরীরে। এমন সুখ তার প্যারিসে হয়নি কখনও, নিজেকে কখনও সে এত স্বাধীনতা পেতে দেখেনি। শূন্যে দু হাত ছুড়ে বলে, ভারতের দাসী পোষার শখ হয়েছিল কিষানলালের! কোথায় তোমার সেই দাসী এখন, কিষানবাবু?

সখেদে বলে, আহা আরও আগে কেন পায়ের শেকল ছিঁড়িনি।

দু বাহুতে দানিয়েলকে জড়িয়ে সে সুখোচিৎকার করে, তুমি আমাকে বাঁচালে।

তুমি একদিন না একদিন ওখান থেকে বেরোতেই নীলা। ওভাবে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে নাকি!

নীলা প্রাণ খুলে হাসে। তাকে হাসিতে পায়। তাকে খুশিতে পায়। তার সারা শরীরে আনন্দ। সারা মনে স্ফূর্তি। রাতের রাস্তায় ছেলে মেয়েরা আনন্দ করতে নামে, নীলা দেখেছে। রাত বলে, অন্ধকার বলে যে কিছু নেই সে দেখেছে। তার সামনে আলোয় ঝলমল একটি জগৎ। এই জগতের প্রতি তীব্র আকর্ষণে নীলা লক্ষ করে গা কাঁপছে তার। দানিয়েলের কাঁধে হাত রেখে নীলা হাঁটে, নীলা হাঁটে না তো নীলা ওড়ে। দানিয়েলের হাত টেনে নেয়, হাতে হাত রেখে হাঁটে, আর সব মুক্ত মানুষের মতো হাঁটে। নীলা হাঁটে না তো নীলা ওড়ে।

কী যে ভাল লাগছে তোমাকে দেখে নীলা। এ সত্যিকার তুমি। এ তুমি। মাদাম কিষানলালের মুখোশ পরিয়ে তোমার ভেতরের তুমিকে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। আর এখন, দেখো কী জীবন্ত তুমি! কী অসম্ভব সুন্দর তুমি! দেখো, দুশ্চিন্তার লেশমাত্র নেই তোমার মুখে। গোপন কোনও কষ্ট লুকিয়ে রাখার কোনও চিহ্ন নেই কোথাও। এ তুমি অন্যরকম। দানিয়েল মুগ্ধ চোখে নীলাকে দেখে আর বলে। নীলার হাতের মুঠোর ভেতর ওর হাতখানা কাঁপে, ঘামে।

শাতলের ক্যাফে জিমমারে ঢুকে দানিয়েল মেনু খুঁটিয়ে পড়ে স্পাগেটি বোলোনেস আর আর লাল ওয়াইন চাইল। মেনুতে স্যান্ডুইচ ছাড়া আর বাকি খাবার যেহেতু জানে না কী,

দানিয়েলকেই বলল নীলা, তার জন্য একটি বেছে দিতে। একই খাবার হোক না, স্পাগেটি বোলোনেস।

ওয়াইন কোনটা নেবে সাদা না লাল? অবশ্য, দানিয়েলের মতে, এ খাবারের সঙ্গে লালই যায়।

লালই যায় তো লালই।

কাঁটা চামচে স্পাগেটি যতবারই তুলতে নেয় নীলা, পিছলে পড়ে যায়। হাল ছেড়ে দেয় সে, স্পাগেটি কাঁটায় তোলাও অসম্ভব আর মুখে নিলেও আটাগোলার স্বাদ। বরং সে জমজমাট ক্যাফের ভেতরের মানুষ দেখে, পাশের টেবিলে একটি একুশ বাইশ বছর বয়সি ছেলেকে দেখে, ছেলেটির কানে দুল, ছেলেটির সঙ্গে যে মেয়ে তার কানে তো আছেই, একটি নয়, এক কানেই ছটি, নাকেও, কেবল নাকে নয়, চোখের ভুরুতে, ঠোঁটে, আর মেয়েটি হা হা করে হেসে উঠলে নীলা দেখে, মেয়েটির জিভে দুল।

এ কী কাণ্ড, মেয়েটির চোখের ভুরু ফুটো করেছে? ঠোঁট, জিভ?

ঘটনাটি যেন ডাল ভাত, দানিয়েল বলে, হ্যাঁ করেছে, ইচ্ছে করেছে তাই করেছে।

নীলা ভাবে, এরা ইচ্ছে যা করে, তাই করতে পারে। আর সে, নিজের জীবনের কথা খানিক ভাবে, ইচ্ছে যা করে, তা কখনই করতে পারেনি। করলে, বলা হত, যাচ্ছেতাই কাণ্ড করছে। শার্ট প্যান্ট পরে বাড়ি থেকে বেরোতে গেলেই অনির্বাণ তেড়ে আসতেন, কী পরেছিস কী! রাস্তায় তো লোকেরা ঢিল ছুড়বে। ঢিল থেকে বাঁচার কারণেই হোক, আর অনির্বাণের আদেশেই হোক নীলাকে পুরুষের পোশাক খুলে মেয়েদের পোশাক পরতে হত, সালোয়ার কামিজ নয়তো শাড়ি।

ক্যাফে জিমমার থেকে বেরিয়ে লে আলের দিকে হেঁটে যেতে যেতে নীলা দেখে কিছু ছেলে মেয়ের চুল খাড়া হয়ে আছে ওপরের দিকে, মোরগের ঝুঁটির মতো, শজারুর কাঁটার মতো। চুলগুলো কালো নয়, বাদামি নয়, লাল নয়, সোনালি নয়, রাঙিয়ে হলুদ করেছে, সবুজ করেছে, গোলাপি করেছে। ও মা কী কাণ্ড।

দানিয়েল এসবকেও বলে, ইচ্ছে করেছে তাই করেছে।

কেন ইচ্ছে করেছে, জানার জন্য নীলার মন আঁকুপাকু করে।

সমাজের নিয়ম কানুন ওদের ভাল লাগে না, তাই করেছে। এক ধরনের প্রতিবাদ।

সমাজের অনেক নিয়ম নীলারও ভাল লাগে না। কিন্তু কখনও তার চুল রাঙানোর ইচ্ছে হয়নি। অত তাকত তার নেই। এত সুন্দর সুস্থ সমাজ এদের, এত চমৎকার নিয়ম কানুন, ভাল না লাগার মতো কী পেয়েছে রঙিনচুলো ছেলেমেয়েগুলো, জানার জন্য দানিয়েলের দিকে প্রশ্নচোখে তাকায় সে। দানিয়েলের দৃষ্টি তখন পমপিডুর উঁচু চুড়োয়, ওই চুড়ো থেকে প্যারিস দেখতে কেমন দেখায় তাই সে ভাবছে। নীলা এই এলাকায় আসেনি এর আগে। পমপিডু কি তেলের কারখানা? শুনে দানিয়েল এমন জোরে হাসে যে নীলা লজ্জায় মুখে হাত চাপা দেয়। হাসতে হাসতে দানিয়েল নীলার হাত ধরে ক্যাফে বো বোর ভেতর ঢোকে। ক্যাফেতে ভিড় উপচে পড়ছে, লোকের বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু আছে, বেরিয়ে যাচ্ছে না, দাঁড়িয়েই ওয়াইন পান করছে। দানিয়েলের পেছনে জড়সড় দাঁড়িয়ে নীলা দেখে, তার ঠিক পাশেই এমনিতে বাঁশের মতো লম্বা তার ওপর উঁচু জুতো পরে আরও লম্বা

হওয়া একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াইন খাচ্ছে, আর হেলেদুলে দুটো যুবকের সঙ্গে কথা বলছে। মেয়েটি বেশ সুন্দরী, পরনে লাল ফ্রক, ঠোঁটে লাল লিপস্টিক, জুতোর রংও লাল, মাথায় একটি টুপি পরা, সেটিও লাল। লাল ঠোঁটজোড়া পাখির ঠোঁটের মতো সরু করে যুবকদ্বয়ের একটিকে চুমু খায় মেয়েটি। চাপাচাপি ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছে বলেই চুমু খাওয়া বড় কাছ থেকে দেখার সুযোগ হয় নীলার। মেয়েটি যখন অন্য যুবকের ঠোঁটে চুমু খায়, দানিয়েলের কানে কানে বলে সে, দেখো দেখো, মেয়েটি দুটো যুবককেই চুমু খেয়েছে। কোনটি তার প্রেমিক তবে?

দানিয়েল নিস্পৃহ কণ্ঠে বলে, ও মেয়ে নয়। ও ছেলে।

নীলা অনেকক্ষণ কোনও শব্দ পায় না উচ্চারণ করার।

ছেলে হলে, মেয়ের মতো সেজেছে কেন?

ইচ্ছে, তাই।

ঠিক আছে, নীলা মেনে নিল ও ছেলে, কিন্তু সে ছেলেদের চুমু খাবে কেন?

নীলার গা শিউরে ওঠে যখন দানিয়েল বলে, ওরা সমকামী।

জীবনে এই প্রথম নীলার কোনও সমকামী দেখা। যখন যাকে জড়িয়ে ধরতে বা চুমু খেতে ইচ্ছে, এরা খায়। যখন যে পোশাক পরতে ইচ্ছে করে, এরা পরে। মানুষের এই অবাধ স্বাধীনতা নীলাকে মোহিত করে।

বসার জায়গা জোটে, ওয়াইনও আসে। দানিয়েল খেয়ে যায়, নীলা হঠাৎ হঠাৎ এক কি দু চুমুক।

কী ব্যাপার খাচ্ছ না যে!

ওয়াইন খেয়ে আমার অভ্যেস নেই।

অভ্যেস নেই? তোমাদের দেশের লোকেরা কী পান করে তবে?

হুইস্কি।

ও তো খাবারের আগে খেতে হয়। খাবার খেতে গিয়ে কী পান করো?

জল।

তোমার দেশের আর লোকেরা?

সবাই জল।

সবাই জল?

হ্যাঁ সবাই জল।

সবাই জল হলেও নীলা একটু একটু করে খেতে শিখছে ওয়াইন। একটি ব্যাপার সে চোখ কান নাক খুলে লক্ষ করে, সকাল সন্ধে ওয়াইন পান করা ফরাসিদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। কলকাতায় সে দেখেছে, লোকেরা মদ কিনে কাগজে মুড়িয়ে নেয়, যেন বাইরে থেকে দেখে কেউ বুঝতে না পারে বোতলটি মদের, যেন ভাবা হয় তেলের বা ফলের রসের বা ওষুধের বোতল। নিখিল যখন মদ খায়, নিজের ঘরে বসে খায়, ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে, তবে। বাড়িতে অতিথি এলে মুখ সাতবার ধুয়ে মদের গন্ধ দূর করে তবে অতিথির সামনে আসে। মলিনা চিরকালই জানে, মদ খায় মন্দ লোকে। নীলাও তাই জানত, কিন্তু সুশান্তকে

যখন মদ খেতে দেখল দু একদিন, মন্দ লোকে মদ খায় এ ধারণাটি দূর হল বটে, কিন্তু খেলে সুশান্তর মতো লুকিয়ে চুরিয়ে খাওয়াই নীলা মনে করত শোভন। এখন, এই আশ্চর্য স্বাধীন শহরে এসে নীলার বোধোদয় হয়, যদি কিছু করিই, তবে লুকিয়ে কেন গো! এ শহরে সে আরও লক্ষ করে, মদ না খাওয়াই বরং অন্যায়। লোকে খারাপ চোখে দেখে, ভাবে এর বুঝি কোনও সংস্কৃতি নেই, এসেছে কোনও ঝোপ জঙ্গল থেকে।

যেহেতু স্পাগেটি জিনিসটি নীলার পেটে ঢোকেনি, নীলা ক্যাফে বো বো-তে, মাংস খাওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করে, গোরু খাবে না, ভেড়ায় গন্ধ, গ্রিল করা মুরগি আছে, চলবে? চলবে। এর সঙ্গে পান করবে কী? কোকোকোলা। কোকোকোলা? বো বো-র যে লোক খাবার দিয়ে যায়, সে হেসে কুটিকুটি। এ কোন আজব জীব এসেছে, যে মাংসের সঙ্গে কোকোকোলা পান করে! নীলা লক্ষ করে লজ্জায় দানিয়েলের মাথা নিচু হচ্ছে।

এ লজ্জা। এ স্রেফ লজ্জা। ওয়াইন না খাওয়া। এ অন্যায়। → strange fact!

নীলা সিদ্ধান্ত নেয়, ওয়াইন পান করা দ্রুত করতে হবে তার, এই লজ্জা থেকে বাঁচতে তাকে হবেই।

বো বো থেকে বেরিয়ে নীলাকে আরও এক ক্যাফেতে নিয়ে গেল দানিয়েল, ওখান থেকে এক আইরিশ পাবে, আইরিশ পাব থেকে ডিসকোটেকে, আলো নিবছে জ্বলছে আর বিষম জোরে গান বাজছে, তালে তালে লোকেরা নাচছে। দানিয়েল ধুন্ধুমার উল্লাসে নীলার হাত ধরে টানে, চলো নাচব। নীলা না না করে ওঠে, সে যাবে না, সে নাচতে জানে না।

নাচতে না জানাও সে লক্ষ করে বিষম লজ্জার ব্যাপার। এক আজব জীবেরাই নাচতে জানে না। নাচ বলতে এখানে, নীলা লক্ষ করে সুরের তালে গা নাড়ানো। কেউ পা নাড়ছে, কেউ হাত, কেউ পিঠ, কেউ মাথা, কারও সঙ্গে কারও মিলছে না, তালে তালে শরীরের কিছু একটা নাড়ানোই নাচ। → defination of 'Dance'.

দানিয়েল একাই নেচে এল। এসে মুখ ভার করে বলল, তুমি আমাকে এত অপছন্দ করো?

কেন?

আমার সঙ্গে নাচলে না যে।

নীলা লজ্জায় কুণ্ঠায় মাথা নিচু করে বলল, আমি যে নাচতে জানি না।

এ আবার না জানার কী আছে।

ছোটবেলা থেকে না নাচলে নাচ হয় না, তাই নীলা জানে। তার খুব নাচের শখ ছিল, অনির্বাণ মেয়েকে নাচ শেখাতে রাজি হননি বলে নীলার নাচও হয়নি। হারমোনিয়াম কিনে দিয়ে নাচের বদলে গান শিখতে বলেছিলেন। ওস্তাদ রেখে দিয়েছিলেন, বড় গাইয়ে হয়নি নীলা, তবে ভাল গাইতে জানে, ছোটখাটো আসরে আবদার করলে নীলা শরম না করে গেয়ে দেয়। ভারতে যারা নাচে, ভরতনাট্যম, কথক বা মণিপুরি, তারা সেই ছোটবেলা থেকেই নেচে আসছে। শরীর ওদের একতাল কাদার মতো, বেঁকে ধনুকের মতো হতে পারে।

দানিয়েল পথে বেরিয়ে বলে, তুমি যে আমাকে অপমান করেছ, তা আমি আগেই বুঝতে পেরেছি অবশ্য।

নীলা চমকে ওঠে, কখন? কখন আমি তোমাকে অপমান করলাম। বলছ কী দানিয়েল!

আমি তোমার গেলাসে ওয়াইন ঢেলে দিলাম, আর তুমি কোনও ধন্যবাদ বলোনি। দানিয়েল বলে।

বলে কী মেয়ে। দানিয়েলকে ইতিমধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করছে নীলা। বন্ধুরা কখনও বন্ধুকে কোনও কারণে ধন্যবাদ বলে! নীলা অন্তত এ শিক্ষা পায়নি। কলকাতায় কোনও বন্ধু তার গেলাসে ওয়াইন ঢেলে দিলে, নীলা যদি ধন্যবাদ বলত, তা হলে সে বন্ধু নির্ঘাত একে অপমান বলে ভাবত। বাংলায় একটি কথাই আছে, ধন্যবাদ জানিয়ে আমাকে খাটো কোরো না।

ঠিক আছে, বন্ধুকে যদি ধন্যবাদ না বলো, তবে কাকে ধন্যবাদ বলো?

নীলা অপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, অপরিচিত কেউ যদি হয়। আর সে যদি কিছু দেয় আমাকে বা কিছু করে আমার জন্য, তবে।

ক্যাফে জিমমারের লোকটি তো তোমার বন্ধু ছিল না, তাকেও তো ধন্যবাদ বলোনি।

তাকে কেন ধন্যবাদ বলব?

তুমি জল চাইলে, সে তোমাকে জল এনে দিল। সে কারণে তাকে ধন্যবাদ দেবে। আদেশ, বুঝলে নীলা, লোকটিকে তুমি আদেশ করেছ জল আনতে, অনুরোধ করোনি। ও লোক তো তোমার ক্রীতদাস নয়। ও ওখানে চাকরি করে। দানিয়েল এক দমে বলে যায়।

নীলা ঠিক বুঝে পায় না কী বলবে। সে সাধারণত যেভাবে রেস্তোরাঁয় কিছু চায়, এক গেলাস জল দিন তো, সেভাবেই চেয়েছে। আদেশ করলে স্বরটি রুক্ষ হয়, অনুরোধ হলে স্বরটি নরম, ঠোঁটে এক চিলতে হাসি দোলে, এই পার্থক্য। দানিয়েলের আপত্তি নীলা দয়া করে শব্দদুটো বলেনি। আপনি কি দয়া করে আমাকে এক গেলাস জল দিতে পারেন এভাবে চাইতে হত।

আসলে কী জানো দানিয়েল, নীলা ধীরে বলে, স্বরটি ভাঙা, ধন্যবাদ দেবার অভ্যেস নেই বলে সম্ভবত দিইনি, তবে ওই লোককে আমি মোটেও ছোট করে দেখিনি।

অভ্যেস নেই? কেন অভ্যেস নেই? অভ্যেস নেই, কারণ তোমরা মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করো না। দানিয়েল বলে।

তাই কি!

তাই।

নীলা মনে মনে শক্ত চাবুকে নিজেকে চাবকায় নিজের এই অসভ্যতার জন্য, মানুষকে মানুষ না ভাবার জন্য। এই সমতার দেশে, কোনও মানুষই বড় নয়, কোনও মানুষ ছোট নয়, সবাই সমান। কেউ ছোট কাজ করে, কেউ বড় কাজ করে, কিন্তু সবাই মানুষের মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে। নীলা মনে মনে বলে, তাই তো হওয়া উচিত। শ্রেণীবিদ্বেষ নেই তার, তাই সে জানত। দানিয়েল আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল, আছে।

বোধোদয় হয় নীলার। নিজেকে সে ঘৃণা করতে থাকে। দাঁতে ঠোঁট কামড়ায়। চোখ জ্বালা করে।

নীলা ছোটবেলায় দেখত, নিখিল রাত জেগে লাল বই পড়ছে। কী লেখা লাল বইয়ে? শ্রেণীসংগ্রামের কথা লেখা। নীলা তার উনিশ বছর বয়সেই মার্কস এঙ্গেলস পড়ে অনুপ্রাণিত

হয়েছে, কলেজে কমুনিস্ট দলে ভিড়েছে, মিটিং মিছিল করেছে, আর আজ কিনা সে নিজেই প্রমাণ করল সে শ্রেণীভেদ মানে, সে মানে যে লোকটি খাবার এনে দেবে ক্যাফে রেস্তোরাঁয়, সে ছোটলোক! এই সভ্য সমাজে এসে, এই সাম্যের দেশে এসে এই লিবার্তে, ইগালিতে আর ফ্র্যাতারনিতের দেশে, যেখানে নারী পুরুষে ভেদ নেই, ধনী গরিবে ভেদ নেই, সেখানে এসে নীলার শ্রেণীবিদ্বেষী মন এমনই প্রকট হয়ে উঠেছে যে দাঁতকপাটি মেলে নীলার দিকে তেড়ে আসছে। ছি!

দানিয়েল, আমি জানি আমি অন্যায় করেছি। এরকম ভুল আর হবে না। আমাকে ক্ষমা করে দাও। বিনত স্বর নীলার।

দানিয়েল শোনে, শুনে স্বস্তি পায়।

দানিয়েলকে আরও স্বস্তি দিতে নীলা বলে, আমাদের পশ্চিমবঙ্গে তিরিশ বছর ধরে কোন দল ক্ষমতায়, জানো? কমুনিস্ট। জ্যোতি বসুর নাম শুনেছ? তাঁর মতো জনপ্রিয় নেতা ভারতবর্ষে আর একজনও নেই।

দানিয়েল হাঁটা বন্ধ করে দাঁড়ায়।

মুখ হাঁ।

চোখ হাঁ।

দম নাও মেয়ে, দম নাও। বানের জলে ভেসে এসেছি ঠিকই, সাম্যের অঞ্চল থেকেই এসেছি।

তিরিশ বছর? হাঁ মুখ থেকে বেরিয়ে আসে দুটো কেবল শব্দ আর সাদা ধোঁয়া।

হ্যাঁ তিরিশ বছর!

কেন?

কেন মানে, ভাল বলে। আমরা ভোট দিই বলে!

কমুনিস্টকে ভোট দাও?

নিশ্চয়ই।

ছি ছি।

দানিয়েল সারা পথ ছি ছি করল।

সারা পথ দানিয়েল বলতে বলতে এল, স্তালিন যত লোক খুন করেছে, হিটলার তার চেয়ে অনেক কম করেছে। বলতে বলতে এল, মার্কস ভুল, এঙ্গেলস ভুল। বলতে বলতে এল, লেনিন ছিল আপাদমস্তক ভণ্ড। আস্ত সন্ত্রাসী।

নেমন্তন্ন

নিকল নেমেরের বাড়িতে সন্ধেয় নেমন্তন্ন দানিয়েলের আর দানিয়েল যে ভারতীয় মেয়েটিকে আশ্রয় দিয়েছে, তার। নতুন এক পত্রিকার সাংবাদিকের সঙ্গে বিকেলে দানিয়েলের ক্যাফে কায়রোতে রাদেভুঁ, সেই রাদেভুঁতে যাবার আগে সে বলে যায় নীলা যেন নেমন্তন্নে যাবার জন্য তৈরি হয়ে থাকে, সন্ধে সাতটায়।

ও যখন ফিরে এল ঘরে, নীলা তখনও শুয়ে, এ মুভেবল ফিস্ট পড়ছে।

কী ব্যাপার তুমি এখনও তৈরি হওনি? দানিয়েল বোকা বনে যায় ঘরে ঢুকে।

নীলা আড়মোড়া ভেঙে বলে, এখনই? বাজে কটা?

সাতটা।

এ আর এমন কী!

আমি তোমাকে সাতটায় তৈরি হয়ে থাকতে বলেছি।

আমার তো এখনও স্নান করাই হয়নি। নীলা উঠে বসে।

বলো কী? দানিয়েলের ছোট চোখে ছোট চিবুকে দু টুকরো বিস্ময় এসে বসে।

আমার তো কাপড় ইস্ত্রি করাই হয়নি।

দানিয়েল ধুপ করে শরীর ছেড়ে দিল চেয়ারে। ঠিক সাড়ে সাতটায় আমাদের পৌঁছতে হবে নিকলের বাড়িতে। তোমাকে তো আগেই বলেছি।

সাড়ে সাতটার জায়গায় আটটা বা সাড়ে আটটা হলে কী ক্ষতি নীলা বুঝে উঠতে পারে না। কলকাতায় কোথাও নেমন্তন্ন থাকলে ঘণ্টা দেড়ঘণ্টা দেরি করেই সে যায়, সে কেন, সবাই যায়। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় পৌঁছোনো কেমন অস্বস্তিকর. দানিয়েলের কাছে অবশ্য কাঁটায় কাঁটায় না পৌঁছোনোই অস্বস্তির ব্যাপার। স্নান করতে আবার কাছের গণ স্নানাগারে যেতে হবে নীলার, ও সেরে আসতে গেলে দানিয়েল আত্মহত্যা করবে। দানিয়েলের স্নানের ঝামেলা নেই, ও মাসে একবার যায় স্নানাগারে, আর সপ্তাহে সপ্তাহে ঘরের তোলা জল মুখে গলায় ঘাড়ে হাতে ছিটিয়ে স্নান সারে।

পরনে ওর কালো লম্বা জামা, আর নীলা তড়িঘড়ি হাতের কাছে যা পায়, ইস্ত্রি ছাড়াই, পরে নেয়। নীলা লক্ষ করেছে, ইস্ত্রি করা কাপড় জামা খুব কম লোকেই পরে। শীতের দেশ, বছরের বেশির ভাগ সময়ই সোয়েটার বা কোটের তলায় ঢাকা পড়ে থাকে না-ইস্ত্রি জামা।

জিনস পরলে? নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছ।

খারাপ দেখাচ্ছে?

জিনস তো দিনের বেলায়। কাজের জায়গায়।

দানিয়েল সময়ের অভাবে নীলার জিনস মেনে নেয়। নীলা তড়িঘড়ি একটি লাল টিপ পরে নেয় কপালে, অন্তত এ যদি কিছু সৌন্দর্য রক্ষায় সাহায্য করে।

দানিয়েলের ঘর থেকে গার দ্য অস্তারলিজ মেট্রোতে যেতে আড়াই মিনিট, গার দ্য অস্তারলিজ থেকে নিকলের বাড়ির কাছের মেট্রোতে পৌঁছোতে লাগে বাইশ মিনিট, আর সেই মেট্রো থেকে হেঁটে নিকলের বাড়িতে যেতে পাঁচ মিনিট। হাতে দেড় মিনিট থাকে। এক মিনিট হাতে রাখো, রাস্তা পার হওয়ার সময় যদি ট্রাফিকের লাল বাতি জ্বলে, তবে গেল এক, আর নিকলের বাড়ির লিফটে যদি লোকের ভিড় থাকে, তবে সিঁড়ি পেরোতে হবে, সিঁড়িতে যাবে আধ মিনিট। নীলার কারণে দানিয়েলের এই হিসেবে গোল বাধে। লাল বাতির ঝামেলা ছিল না, লিফটেও কোনও লোকের ভিড় ছিল না, তার পরও নিকলের বাড়িতে ঢুকতে বাজল সাতটা সাঁইত্রিশ।

দানিয়েল প্রথমেই এই দেরির জন্য ক্ষমা চেয়ে নিল।

নিকল, তারও পরনে লম্বা কালো জামা, লাল চুলের সবুজ চোখের মেয়ে, নীলার চেয়ে লম্বায় দুবিঘত, বয়সে দুবিঘত বড়, দানিয়েলকে ক্ষমা করল।

বাড়িতে আরও তিনজন অতিথি, মারিয়া সুয়েনসন, মিশেল কজ আর রিতা সিকসুস। সবাই দাঁড়িয়ে, সবার হাতে সরু শ্যাম্পেনের গেলাস, এক মারিয়া ছাড়া, তার গেলাসে কমলার রস। সবার পরনে কালো লম্বা জামা, নেমন্তন্নের সঙ্গে কালো লম্বা জামার একটি অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক আছে, নীলা অনুমান করে। ঢোকার পরই নিকল সহ অতিথি তিনজন নীলা আর দানিয়েলের দুগালে চকাস চকাস চুমু খেল।

মারিয়া সুইডেনের মেয়ে, ফ্রেডরিকা ব্রেমের ফরবুনডেট নামের একটি নারী সংগঠনের নেত্রী, প্যারিসে এসেছে মেয়েদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বিষয়ে একটি সভা হচ্ছে, ওতে বক্তৃতা করতে, মিশেল কজ প্যারিসের নয়, থাকে ফ্রান্সের দক্ষিণে, ফিজাক নামের এক শহরে, প্যারিসে এসেছে এই সভা শুনতে আর রিতা সিকসুসের কোনও সভা সমিতি নেই, জন্মেছে আলজেরায়, ইহুদি পরিবারে, প্যারিসেই বাস, ছবি পরিচালনা করে, নিকলের দীর্ঘদিনের বন্ধু, এ বাড়ির যে কোনও আড্ডায়, বিশেষ করে শনি রোববারে রিতার উপস্থিতি অনেকটা মাছের ঝোলে নুনের মতো, থাকা চাই। আর নিকল, মাস্টারি করে কলেজ দ্য ফ্রান্সে, দানিয়েলেরও পরিচয় আছে বলার, সে সাংবাদিক। নীলার পরিচয় সে ভারতের মেয়ে। কী করো? কিছু না। ভেরেন্ডা ভাজি।

তাই তো নীলা ভাবে, এই প্যারিসে তার পরিচয় হয় কিষানলালের বউ নয়তো নীলাঞ্জনা মণ্ডল, শ্রমিক।

ভেরেন্ডাভাজনেঅলা। দানিয়েল করুণা করে নীলার আরও এক পরিচয় উল্লেখ করল, তার বন্ধু।

নীলা হাঁফ ছাড়ল।

হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই দুটো বীভৎস কুকুর নীলার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ও মাগো বাবাগো বলে তারস্বরে চিৎকার জুড়ল নীলা, আর হাসির রোল উঠল ঘরে। দানিয়েল ফ্লুন ফ্লুন বলে ভোঁতা নাকের একটিকে কোলে তুলে নিয়ে মাথাখারাপের মতো চুমু খেতে লাগল, আরেকটিকে নিকল তুলল কোলে, বাচ্চাদের মতো না কাঁদে না না কাঁদে না ভঙ্গিতে দুলতে লাগল।

তুমি কুকুরকে ভয় পাও? মারিয়া ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে।

নীলাকে ভয় পাচ্ছে মারিয়া, কারণ কুকুরকে জড়িয়ে ধরার বদলে নীলা চিৎকার করেছে। এরকম অদ্ভুত কাণ্ড মারিয়া কেন, এ বাড়ির কেউ দেখেনি এর আগে। নীলার আশঙ্কা হয়, পাঁচ জোড়া চোখ যেভাবে তাকে দেখছে, নিশ্চয় এদের সন্দেহ হচ্ছে যে তার মাথায় কোনও রোগ আছে।

রিতা জিজ্ঞেসও করল, খুব কোমল কণ্ঠে যদিও, আচ্ছা তোমার কি কোনও অসুখ টসুখ আছে। এরকম হয়, কিছু অসুখ থাকলে বিশেষ করে কুকুর দেখলে...

নীলাকে মানসিক রোগী হওয়ার যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার করে দানিয়েল বলল, সম্ভবত ও আগে কুকুর দেখেনি। ওদের দেশে কুকুর নেই।

নীলা পাঁচ জোড়া চোখের সামনে যদি বলতে পারত যে ঠিক তাই, নেই, তবে একরকম বাঁচত। বলল, আছে।

আছে?

নিকল চমকাল।

থাকলে ভয় পেলে কেন? পাঁচজোড়া চোখে একটিই প্রশ্ন।

নীলা উত্তর দেবার সাহস পেল না।

পাঁচ মানুষের চোখ এবার অন্যদিকে ফিরল। ফ্লুনের চোখও। নিকলের কোলেরটিরও, ফিফিরও। কালো চারটে বেড়ালেরও।

এরপরের দীর্ঘ আলোচনায় নীলার অংশগ্রহণ মোটে জরুরি নয়। শ্যাম্পেন পান করতে করতে যে আলোচনাটি চলে, তা কুকুর বেড়াল বিষয়ে, সকালে চোখ মেলতেই কাকে নিকল দেখেছে তখনও ঘুমোচ্ছে, আর কোনটি লাফিয়ে তার বুকের ওপর বসেছে, কে ঘাড় কাত করে নিকলকে একবার দেখে সরে গেছে অন্য ঘরে, সকালের কোন খাবার কার পছন্দ হয়নি, কে সোফায় শুয়ে টেলিভিশন দেখতে দেখতে খাবার খেতে ভুলে গেছে, আর খেতে গিয়ে কোনটির কোন খাবার পছন্দ হয়নি, কোনটি অভিমান করে লেপের তলায় সারা বিকেল শুয়ে ছিল, কার আজ দুদিন ধরে মন খারাপ এসব। নীলা লক্ষ করে, সবাই বিষম আগ্রহ নিয়ে শুনছে এসব, মাঝে মাঝে আহা আহা করছে, মাঝে মাঝে হাসতে হাসতে বেড়াল বা কুকুর কোনও একটিকে বুকে জাপটে ধরে নাক মুখ ডুবিয়ে দিচ্ছে লোমে। বেড়ালের গায়ের বোটকা গন্ধে নীলা প্রথম থেকেই নাক চেপে আছে, হঠাৎ হঠাৎ শ্বাস নিয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারটি নিশ্চিত করে বাকি সময় শ্বাস বন্ধই করে রাখছে। একটি ব্যাপার সে লক্ষ করছে, এত সোফা চেয়ার খালি পড়ে আছে, তবু দাঁড়িয়ে পান করছে সবাই। কী জানি, কার শরীরের মাপ কী, কে কার চেয়ে কত উঁচু, কার জুতো কোথা থেকে কেনা নাকি কার জামাটি দেখতে কত চমৎকার তা বোঝাতেই। নীলা তার জিনস, তার কড়া হলুদ রঙের একটি না-ইস্ত্রি শার্ট, তার সবুজ রঙের জ্যাকেটের দিকে তাকিয়ে টের পায় তাকে উৎকট লাগছে দেখতে, অন্য কারও যেন চক্ষুপীড়া, নাসিকাপীড়া না হয় তাকে দেখে, আলগোছে সে বৃত্ত ভেঙে সোফার একটি কোণে গিয়ে জবুথবু বসে, বসে টের পায় এ নিয়ম নয়, নিয়ম দাঁড়িয়ে থাকা। বৃত্তে দাঁড়িয়ে থাকো, যতক্ষণ না তোমাকে বসতে বলা হচ্ছে, বৃত্তে দাঁড়িয়ে, তুমি যদি জংলি কিছু পরা থাকো, তাই দেখাও, তুমি যে গেঁয়ো ভূত, তুমি যে সংস্কৃতির স-ও জানো না, কোথায় কোন পোশাক পরতে হয়, কী করে মেরুদণ্ড লোহার মতো শক্ত করে দাঁড়াতে হয় তা জানো

না, তা বোঝাও। নীলা বসেই থাকে, কুলকুল করে ঘামে, লক্ষ করে কারও গায়ে কোনও গরম কাপড় নেই, দরজার কাছে হুকে ঝুলিয়ে তবে ঘরে ঢুকেছে সবাই, কারণ ঘরের ভেতরটা ঠাণ্ডা নয়, ঘরের ভেতর ওম আছে, মানুষের ওম, কুকুর বেড়ালের ওম, উষ্ণ সংস্কৃতির ওম, দম্ভের ওম।

এক কোণে ফায়ারপ্লেসে কাঠ পুড়ছে, আরেক পাশে বড় এক পিয়ানো। ধনীর বাড়িতে এ দুটো জিনিস না থাকলে চলে না। ঘর গরম করার যন্ত্র থাকলেও ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরিয়ে ঘর গরম করার মধ্যে আভিজাত্য আছে, আর পিয়ানো কেউ বাজাক না বাজাক, এটি থাকলে সম্ভ্রম থাকে। সবুজ জ্যাকেটখানা খুলে ঝুলিয়ে আসে হুকে, কারও যেন চোখ না পড়ে তার দিকে, এমন সন্তর্পণে। ও খুলেও সংস্কৃতি রক্ষা তার পক্ষে সম্ভব হয় না, কারণ তার কড়া হলুদ শার্ট থেকে অসংস্কৃতির আলো ছিটকে বেরোচ্ছে, সে আলো অন্যের চোখকে আঘাত তো করেই, অন্ধ করতেও ছাড়ে না।

ফ্লুন বসন্তকালটা আবার খুব পছন্দ করে, বলতে বলতে নিকল সোফার দিকে এগোল। পেছন পেছন বাকিরা। বাকিদের বসতে অনুরোধ করে নিকল নিজেও বসল।

বসন্তের ঘ্রাণ পাচ্ছ বাতাসে?

সবাই এক বাক্যে সায় দেয়, ঘ্রাণ পাচ্ছে, নতুন পাতার ঘ্রাণ, নতুন কুঁড়ির ঘ্রাণ। জানালা সামান্য খোলা, ওতেই হুড়মুড় করে ঢুকছে বসন্তের ঘ্রাণ। নীলাও সে ঘ্রাণ পেতে শ্বাস নেয় লম্বা করে, তার ওই শ্বাসে বেড়ালের গায়ের ওই বোটকা গন্ধ ছাড়া কিছু ঢোকে না। বেচারা নীলা।

কী ভীষণ ঠাণ্ডাই না গেছে এবারের শীতে! রিতা বলল।

খুব ঠাণ্ডা গেছে বলে মারিয়া আর দানিয়েল মানল না, থাকতে মন্ট্রিয়ালে, থাকতে উপসালায়, দেখতে ঠাণ্ডা কাকে বলে।.দানিয়েল ছ বছর আগে কানাডা ছেড়ে এসেছে, ওই ঠাণ্ডা দেশে তার আর ফেরার শখও নেই, আর সে দেশের নামও সে নিতে চায় না, নাম নিলেই নাকি স্মৃতির এক পাহাড় বরফ তার গায়ের ওপর ধসে পড়ে। রীতিমতো আভালাঞ্জ।

শীতকালের প্রসঙ্গ যে যত দ্রুত সম্ভব দূর করে। যে বিষয়টির দিকে মারিয়া হাত বাড়িয়ে আছে, সে সূর্য। কী অভাবনীয় এর কিরণ, কী মধুর এর তাপ, কী যে আশ্চর্য জাদু এর আলোয়। নীলা শ্বাস বন্ধ করতে ভুলে যায়, বেড়ালের বোটকা গন্ধও যেন নিমেষে উবে গেছে, বসন্তের এমন রূপ বর্ণনা শুনে। নীলা বরং ঘন ঘন শ্বাস নেয়। শ্বাস নেয়, কারণ স্মৃতিতে এখন তার চাঁদি ফাটানো সূর্য। সূর্যের কোনও মোহনীয় রূপ তার কোনওকালে দেখা হয়নি, দেখা হয়েছে এর রুক্ষতা, তিক্ততা, এর রোষ, ক্ষোভ, এর গা পোড়ানো চরিত্র। ভ্যাপসা বিচ্ছিরি গরমে নীলার বরাবরই ঘন ঘন শ্বাস পড়ে, এখনও তাই পড়ছে। জল তেষ্টাও পায়, এখনও তাই পাচ্ছে। জলতেষ্টাকে সে দাবিয়ে রাখে, যতটা অপাঙ্‌ক্তেয় অবজ্ঞাত হওয়া যায়, সে হতে চায় এ আলোচনায়। কারণ, কোনও কারণে কেউ যেন আবার না ভাবে, নীলা কুকুরকেই নয় কেবল, সূর্যকেও ভয় পায়। আর তা শুনে দানিয়েলকে যেন এগিয়ে আসতে না হয় নীলাকে উদ্ধার করতে এই বলে যে ও সম্ভবত সূর্য দেখেনি বা ওদের দেশে সূর্য ওঠে না।

চোখ আছে যেমন ওদের, চোখের লজ্জাও আছে। আর সে চোখের লজ্জার কারণে, ওরা

বলে, সোফার এককোণে বসে খুব গভীর মনোযোগ দিয়ে নখ খুঁটতে থাকা নীলাকে, আচ্ছা তোমাদের ভারতে এখন কী কাল?

দানিয়েলই জিজ্ঞেস করে। তার বন্ধুটি যে একেবারে ফেলনা নয়, ভারতে কী কাল চলছে, শীতকাল না গ্রীষ্মকাল এই সহজ প্রশ্নটির উত্তর অন্তত দিতে পারবে, সে ব্যাপারে অনেকটা নিশ্চিত হয়েই দানিয়েল প্রশ্ন করল, আর নীলাকে একাকিত্ব থেকে উদ্ধার করতেও।

নীলা আসলে একা বোধ করছিল না, এখনই বরং সে একা বোধ করে।

ম্লান কণ্ঠে উত্তর দেয়, বসন্তকাল।

বসন্তকাল?

নিকলের ভুরুতে অবিশ্বাস।

ভারত কি বিষুবরেখার উত্তরে না দক্ষিণে? প্রশ্ন।

রিতা বলে, উত্তরে।

নিকল বলে না না দক্ষিণে।

দানিয়েল বলে, বসন্তকাল হলে এ নিশ্চয়ই উত্তরে।

নিকল উঠে গেল, ফিরে এল হাতে একটি ঢাউস বই নিয়ে। পাঁচটা মাথা পৃথিবীর মানচিত্রে উপুড় হয়ে আছে। লাল (নিকলের), সোনালি (মারিয়ার), কালো (রিতার), বাদামি (মিশেলের), গাঢ় বাদামি (দানিয়েলের)।

মাথাগুলো দূর থেকে দেখে নীলা।

এবার রিতা, সঠিক উত্তরের রিতা, নীলার দিকে ঝুঁকে বলে, কী নাম ওই পরিচালকের? ওই স্যালন দ্য মুজিক যে বানিয়েছে...সত্যজিৎ রায়। ওর ছবি দেখেছি আমি। আকর্ণবিস্তৃত হাসি রিতার মুখে।

নীলার মুখে হাসি ফোটে। কথা ফোটে।

ওঁর আর কী ছবি দেখেছ?

প্রায় সব ছবিই।

পথের পাঁচালি দেখেছ? নীলা উদগ্রীব।

দেখেছি। তত ভাল লাগেনি।

ভাল লাগেনি? নীলা অবাক।

চারুলতা?

তাও দেখেছি। ওর সবচেয়ে ভাল ছবি হল স্যালন দ্য মুজিক, জলসাঘর।

রিতার রায় শুনে নীলা, যেহেতু তার মতে পথের পাঁচালিই সত্যজিৎ রায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি, দমে যেতে গিয়েও যায় না, কারণ এক রিতাই একজন ভারতীয় তার ওপর বাঙালি সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান ধারণ করে আছে।

জলসাঘর কেন, রিতা যদি মহাপুরুষ বা কাপুরুষও পছন্দ করে, নীলার মনে হয় না সে এতটুকু চুক চুক করবে।

রিতাই আসলে একরকম নীলাকে উদ্ধার করে, নত মস্তক থেকে নখ খোঁটা থেকে সত্যিকার মুক্তি দেয়। নীলার কণ্ঠ থেকে কুণ্ঠা বিদেয় করে।

আর কোনও ভারতীয় পরিচালকের ছবি দেখেছ? নীলা জিজ্ঞেস করে।

দেখেছি আর দুএকটা। তবে তোমাদের ছবিতে খুব নাচ গান থাকে।

তা থাকে, সস্তা মারদাঙ্গা, রুচির ছিটেফোঁটা নেই। হিন্দি ছবিগুলোকে নীলার অস্বীকার করার উপায় নেই যে এ তার বা তাদের ছবি নয়।

ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন, অপর্ণা সেন, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত এদের ছবি দেখেছ? না দেখেনি। নাম শুনেছ? শোনেনি।

রিতা নিজে এখনও কোনও বড় ছবি, যাকে বলে পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, বানায়নি। এ অব্দি যা করেছে, সব ছোট। ছোট বলতে দু মিনিটের, পাঁচ মিনিটের, পনেরো মিনিটের। তিনটে তথ্যচিত্র করেছে কুর্দ মেয়েদের জীবন নিয়ে, আর একটি করেছে তুরস্কে রুশ মেয়েদের পতিতাবৃত্তি নিয়ে। পূর্ণদৈর্ঘ্য? ও বানানো সহজ, কিন্তু সহজ নয় প্রযোজক পাওয়া।

দানিয়েল বলে, মেয়েদের পণ্য করে আজ বানাতে চাও কোনও ছবি, দেখবে প্রযোজকেরা লম্ফ দিয়ে আসবে ছবির খরচ দিতে।

নিকল সংশোধন করে দেয়, পুরুষ প্রযোজক।

টেবিলে বিভিন্ন মদের বোতল। শ্যাম্পেন আছে, পরতো আছে, মার্টিনি, ভদকা, হুইস্কি আছে, যে যা পান করো।

নিকল গেলাসে ঢেলে দেয়, যে যা চাচ্ছে। মারিয়া সবেগে মাথা নাড়ে, সে মদ্যপান করবে না আগেই বলেছে, কারণ সে গাড়ি চালাবে।

প্যারিসে এ দুদিনের জন্য গাড়ি?

দুদিন পর সে যাচ্ছে দক্ষিণে, কান-এ।

ওখানেও বক্তৃতা?

না, ওখানে সমুদ্র। দক্ষিণী উষ্ণতা।

ও সুইডিশ, আর কিছু না জানলেও আইন মানতে জানে, মিশেল কজ চোখ টিপল বোলে। আমরা ফরাসিরা দুএক গেলাস পেটে না ফেলে স্টিয়ারিঙে হাত দিই না। নাকি এবসলুত লাগবে?

এবসুলেটলি নট।

নীলা পরতো নেবে বলল। নেবে কারণ বোতলটি দেখতে অন্য বোতলের চেয়ে ভাল। আর পান করতে যেহেতু হবেই, যেহেতু পান না করলে ভাবা হবে সে এক গেঁয়ো ভূত। আর নিকল যখন হাতে দেয় গেলাস, নীলা ধন্যবাদ বলে।

ম্যা(গ)সি বকু।

এটির উচ্চারণ শিখতেই তার অনেকদিন লেগেছে। এম ই আর সি আই মেরসি, বি ই এ সি ও ইউ পি বিয়াকুপ। মেরসি বিয়াকুপ। তাই বলত। যেরকম বানান সেরকম উচ্চারণ। কিন্তু শুনে লোকে অবাক হয়, এ আবার কী আজব ভাষায় কথা বলছে এ মেয়ে! ফরাসিরা র উচ্চারণ করতে গেলে গ-এর মতো এক শব্দ বেরোয়, আর শব্দের লেজ বেশির ভাগ সময়ই এরা উচ্চারণ করে না। এ দেখে নীলার বদ্ধ ধারণা, বই পড়ে আর যে ভাষাই শেখা যাক, ফরাসি ভাষা নয়।

নীলার মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয় যখন দেখে ফরাসি সব জিনিসেরই, সব পদেরই

লিঙ্গ আছে। বড় লিঙ্গপ্রেমী এরা। টেবিল চেয়ার দরজা জানালা খাতা কলম থাল বাসন সবকিছুরই লিঙ্গ আছে। টেবিল পুংলিঙ্গ তো চেয়ার স্ত্রীলিঙ্গ, বই পুংলিঙ্গ তো কলম স্ত্রীলিঙ্গ। দরজা কি পুংলিঙ্গ না স্ত্রীলিঙ্গ? স্ত্রীলিঙ্গ। কী কারণ? কোনও কারণ নেই। ব্রেসিয়ার কী লিঙ্গ। পুংলিঙ্গ। এ মেয়েদের জিনিস, এ পুংলিঙ্গ কেন? কারণ নেই। প্যান্টি? পুংলিঙ্গ, লিপস্টিক? এও পুংলিঙ্গ। মন্ত্রী কী লিঙ্গ? মন্ত্রী পুংলিঙ্গ। তবে মেয়ে মন্ত্রীদের উপায় কী? পুংলিঙ্গই ব্যবহার করছে, কেউ আবার দাবি তুলছে শব্দ বদলাবার। নীলার জানতে ইচ্ছে করে, পুংলিঙ্গটি কোন লিঙ্গ, পুংলিঙ্গ তো? না কি স্ত্রীলিঙ্গ!

নীলা অনেকটা আশা ছেড়েই দেয়, এ ভাষা শেখা তার দ্বারা হবে না। এত লিঙ্গ সামলাবার ক্ষমতা ওর নেই। আপাতত ম্যা(গ)সি বকু বলতে পেরে সে স্বস্তি পায়। অন্তত তাকে অসভ্য বলে এখন আর কেউ গাল দেবে না। অতি সতর্ক সে, চোখ কান নাক মুখ সব খোলা, কোনও কারণেই যেন ধন্যবাদ বলতে ভুল না হয়।

আলোচনা গড়িয়ে যাচ্ছে পুরুষ প্রযোজক থেকে নারী প্রযোজকে, নারী প্রযোজক থেকে নারী পরিচালকে, এরপর ব্যাক গিয়ারে একশো বছর পিছিয়ে যায়, সুসান বি এনথনি, এলিজাবেথ, কেডি স্ট্যানটন—ভোটের আন্দোলন। ভোট থেকে লাফিয়ে নারী শ্রমিক আন্দোলনে, ক্লারা জেটকিনের সভায়। সেই সভা থেকে আরও একটি লম্বা লাফে জন্মনিয়ন্ত্রণ। সেটির ফয়সালা হল। এখন কী? এই ফ্রান্সে, এই ইগালিতের সংসদে শতকরা দশজনও মেয়ে নেই। কী লজ্জা কী লজ্জা। সিমোন ভেইল, কী করেছে সংসদে বসে? কিচ্ছু না। আউসউইৎস থেকে বেঁচে এসে ডানপন্থী দলে ভিড়েছে, বোকামো ছাড়া আর কী! ক্যাথারিন ত্রতমেন? স্টারসবুর্গের মেয়র থাকাই ওর ভাল ছিল, সংস্কৃতিমন্ত্রী হয়ে কাজের কাজ কিচ্ছু করেনি। এলিজাবেথ গিগুকে বরং বাহবা দিতে হয়, পঞ্চাশ ভাগ মেয়েদের নাম থাকতে হবে দলের নমিনেশনে, এ একটা ঘটনা বটে। নমিনেশন পাওয়া মানে তো আর সংসদে বসা নয়। ভোটে আর কজন জিতবে!

মারিয়া তার উঁচু নাক আরও খানিকটা উঁচুতে তুলে বলে, অবশ্য আমাদের দেশে এই ঝামেলাটা নেই। সংসদে মেয়েরা চল্লিশের ওপর।

যা হবার ওই স্ক্যানডিনেভিয়াতেই হচ্ছে। নিকল বলে, মুখ মলিন তার।

মারিয়া পরক্ষণেই ঝাঁজালো করে স্বর, ছাই হচ্ছে। একাডেমিক পদগুলোয় দেখো গিয়ে, বড় পদে কারা আছে, সব পুরুষ।

মন দিয়ে বরফের দেশ থেকে আসা মেয়ে মারিয়াকে শোনে বাকিরা। বরফের দেশটি ছিল ভাইকিং জলদস্যুদের দেশ, জলদস্যুরা বিভিন্ন দেশে অতর্কিতে হামলা করত, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিত, শহর গুঁড়িয়ে দিত, দেদারসে মানুষ খুন করে রত্নরাজি ধনদৌলত লুট করত। জলদস্যুর উত্তরপুরুষ এবং উত্তরনারীরা এখন পৃথিবীর অন্যতম সভ্য পুরুষ এবং সভ্য নারী বলে পরিচিত, জলদস্যুর দেশ এখন সমতা সাম্য সুখ আর সমৃদ্ধির দেশ।

মারিয়া বলে, মোনা সালিনের ব্যাপারট। জানো তো? ও তো প্রধানমন্ত্রী হয় হয় করেও হচ্ছে না।

কারণ?

সরকারি ক্রেডিট কার্ডে কবে নাকি চকোলেট কিনেছিল, গেছে ফেঁসে। হত পুরুষ,

দেখতে ক্রেডিট কার্ডের ব্যাপারটি নেহাতই তুচ্ছ।

নীলা প্রায় বলতে নেয়, মেয়েরা রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী হলেই কি সব সমস্যা ঘুচে যায়। কই, ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশে তো মেয়েরা পেয়েওছে ও পদ, কিন্তু সমাজে মেয়েদের অবস্থা যা ছিল, তাই তো আছে। কিন্তু বলে না, বরং গিলে ফেলে, পরতোর মতো গেলে। নীলার ধারণা, এ বাক্যও গর্দভের মন্তব্য বলে বিবেচিত হতে পারে। পারেই তো, নীলা ভাবে, বাপ স্বামীর লেজ ধরে ওসব দেশে মেয়েরা ক্ষমতায় আসে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নয়।

ভারত হল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র। নীলা মনে মনে বলে।

বোলে, নীলা, মনে মনে শোনে ওরা বলছে, তোমার ওই সবচেয়ে বড় গণতন্ত্র ধুয়ে খাও। নীলা ধুয়ে খেল। ফরাসি বরদিওক্স ওয়াইনে ধুয়ে ইয়া বড় গণতন্ত্র গিলল। বরদিওক্স, ভুল। দানিয়েল শুধরে দেবে, বরদো। নীলা ভারতের নিচু জাতের মেয়ে, বড় জাতে ওঠার কোনও সম্ভাবনা নেই তার। তবে ফরাসি জাতে উঠতে হলে কিছু জিনিস মকসো করলেই চলে। এদেশে জাতে ওঠার ব্যাপারটি অন্যরকম, জন্মপরিচয় তত দরকার হয় না, বরদো পান করাটা ভাল শিখে গেলে অনেকটা কাজ হয়, পান করা মানে যে গিলতে পারা তা নয়, গেলাস কী করে দু আঙুলে ধরতে হয়, কী করে প্রথম ছোট্ট চুমুকে জিভাগ্রে ভিজিয়ে মাথা ডানে কাত করতে হয়, তারপর সামনে পেছনে আলতো করে কী করে মাথা ঝাঁকাতে হয়, চুমুকে চুমুকে ছন্দময় বিরতি, এসব হচ্ছে শিল্প, এ শিল্প করায়ত্ত করতে পারলেই জাতে আশি ভাগ উঠে যাওয়া যায়, মই ছাড়াই।

মিশেল কজ অম্লান বদনে বলে, যাই বলো বাপু, জগৎ বদলাচ্ছে। মেয়েরা কী অবস্থায় ছিল, এই ইয়োরোপের কথাই ভাবো না কেন! গির্জার লোকেরা মেয়েদের জ্যান্ত পুড়িয়ে মারেনি? মেরেছে।

নিকল হাত তুলে থামতে বলল সবাইকে। থামলে, ধীরে সে বলল, কিন্তু প্রতিটি শব্দে জোর দিয়ে, বদলাচ্ছে ওপরে ওপরে, ভেতরে ঠিক তাই আছে, যা বরাবরই ছিল। নারীর ওপর পুরুষের শোষণ। শোষণের কাঠামোর কিন্তু কোনও বদল হচ্ছে না।

বরাবরই ছিল বলছ কী নিকল, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা তো এককালে ছিল। নারীর হাত থেকে পুরুষ তো ক্ষমতা নিল অস্ত্রের জোরে।

নিকল জোর গলায় বলে, মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কোথাও কোনও কালেই ছিল না। ছিল যা, তা হল মাতৃলোকাল আর মাতৃলিনিয়ার সমাজ। সম্পত্তি মেয়েদের নামে হত, আর মেয়েদের পদবি বংশানুক্রমে গ্রহণ করা হত, এই যা। এ মাতৃতন্ত্র নয়।

যদিও দানিয়েল বলেছিল তোমার আর মারিয়ার কারণে, যেহেতু তোমরা ফরাসি জানো না, আমরা ইংরেজিতে কথা বলব, যা কথা, যা আলোচনা ইংরেজিতেই হচ্ছে, আর নীলা বেশ ভাল বুঝতে পাচ্ছে, হচ্ছে মারিয়ার কারণেই, নীলার কারণে এ আলোচনা ইংরেজিতে হওয়ার কোনও কারণ নেই, কারণ সে অংশগ্রহণ করছে না এতে, তার পক্ষে সম্ভবও নয়। এক গেলাস পরতো শেষ করে, অপাঙক্তেয় নীলা, নারী আন্দোলনে না পারুক, ফরাসি ভাষায় দক্ষতা দেখাতে বলল, জে পুর আভোইর দু ভিন রোগি সিল ভোউস প্লেইট!

নীলা কী বলছে তা বোঝার ক্ষমতা কারও নেই। তাকে ইংরেজিতে বলতে হল সে কী

বলতে চাচ্ছে। আমি লাল ওয়াইন খেতে চাই।

উথলে ওঠে হাস্যরসফেনা। দানিয়েল শুধরে দেয় জ পু আভোয়া দু ভা রুজ সিল ভু প্লে।

ঠোঁট বিযুক্ত করলেই গোল বাঁধছে। ঠোঁট জোড়া চেপে রাখে নীলা। নিকল ভাল ইংরেজি জানে না বলে নীলা ভেবেছিল, এ কদিনে শেখা তার ফরাসি যথাসম্ভব আওড়াবে সে। অন্তত ঘরে ঢুকেই নিকলের দিকে হাত মেলাতে মেলাতে, কমেন্ট তালেজ ভাউজ? আর তাকে একই প্রশ্ন করলে, উত্তর, এত্রে বিয়েন। ভাল যে কুকুরের ঝাঁপিয়ে পড়া নীলাকে ফরাসি বলতে বিরত করেছিল।

ওই হাসির স্রোতে সীল মাছের মতো মাথা ভেসে ওঠে নিকলের। আজ রাতে ভোজের আয়োজন নিয়ে তার যে পরিকল্পনা আছে, তার বর্ণনা। রেফ্রিজারেটরে শুয়োরের মাংস আছে, সে চাচ্ছে, একে রসুন দিয়ে রান্না করতে।

মমমম মমমম শব্দ উঠল।

আলু সেদ্ধ। আর হল সালাদ। আর পনির। আর আছে তার্ত। নিকল।

মমমম মমমম। বাকিরা।

শেষে কফি। নিকল।

মমমমম। বাকিরা।

নিকল রান্নাঘরে চলে গেল রেফ্রিজারেটর থেকে শুয়োর বের করতে। পেছন পেছন দানিয়েল, দানিয়েলের পেছন পেছন রিতা। দেখে নীলা নিশ্চিত যে রান্না শেষ হতে রাত পার হবে। কিন্তু পাঁচ কি ছ মিনিটের মতো পার হয়েছে কি হয়নি, টেবিলে রান্না করা শুয়োর এনে রাখে নিকল, এত শিগরি কী করে শুয়োর গলেছে, তা আর সবার মাথায় ঢুকলেও, নীলার মাথায় ঢোকে না। নিকল ঝটপট বলে দেয় কে কোন চেয়ারে বসবে। যার যার পানীয়ের গেলাস হাতে নিয়ে টেবিলে চলে এসো। আলুসেদ্ধ তুলে নাও, আর শুয়োরের টুকরো।

কী করে রান্না হয়েছে এটি?

মাখনে ভাজা হয়েছে, ভাজার সময় এক কোয়া রসুন চটকে দেওয়া হয়েছে, ব্যাস।

এটির নাম, রসুনে শুয়োর।

ডান হাতে ভাত ডলে খাওয়ার মেয়ে নীলার হাতে কাঁটা চামচ আর ছুরি। ডান হাতে কাঁটা চামচ, বাঁ হাতে ছুরি নিয়ে মাংস কাটতে গিয়ে ছিটকে পড়ে ছুরি, ছুরি তুলে আবার কাটতে গিয়ে ছিটকে পড়ে কাঁটা। এবার তুলে আর কাটাকাটিতে যায় না, শক্ত হাতে কাঁটা ছুরি ধরে রাখে, ভয় হয় মাংসে ছোঁয়ালেই হাত থেকে খসে পড়বে সব। আড়চোখে অন্য হাতগুলো দেখে সে, ডান হাতে ছুরি, বাঁ হাতে কাঁটা। কেউ যেন না দেখে, লুকিয়ে নিজের কাঁটা ছুরির হাত বদল করে নীলা। ছুরি বাঁ হাত থেকে ডানে নেয়, আর কাঁটা ডান থেকে বাঁয়ে। হাত বদলের পর নির্ভাবনায় ছুরি কাঁটা ফের মাংসে ছোঁয়াতেই পড়ল হাত খসে আবার।

নীলার দিকে কেউ তাকাচ্ছে না নীলা লজ্জা পাবে বলেই সম্ভবত, তার চেয়ে যদি হইরই করে উঠত সব, বলত কী ঘটনা কী, তুমি বুঝি কাঁটা ছুরি ধরতে জানো না? মুঠো করে নয়, কাঁটার গায়ে তর্জনী রাখো, ছুরির গায়েও, কাঁটা ঢুকিয়ে দাও মাংসের পেটে, তারপর ডান হাতের ছুরিতে কাটো, বাঁ হাতের কাঁটায় তুলে নাও টুকরো। নীলা অন্তত হেসে বলতে পারত, কী জানো, আমাদের হাতে খেয়ে অভ্যেস। হাতে খাওয়ার স্বাদই আলাদা। হাতে

খাবার ছুঁলে খাবারের সঙ্গে একরকম ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হয়, আত্মীয়তামতো। টেবিলের নীরবতা, নীলার ছুরিপতন, কাঁটাপতন দেখেও না দেখা, তাকে দ্বিগুণ লজ্জায় ফেলে। লজ্জা থেকে নীলার মুক্তি নেই।

দানিয়েলের দিকে আড়চোখে তাকায় সে, নীলার হাতখসা কাঁটা ছুরির শব্দ ওকে কতটা অস্বস্তিতে ফেলছে, অনুমান করার চেষ্টা করে। সম্ভব হয় না। নীলার পক্ষে সম্ভব হয় না মশলাহীন মাংস চিবোতে। আর সবার মতো নুন আর কালো লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়েও নীলা লক্ষ করে কাজ হচ্ছে না। মাংস বিস্বাদই লাগছে তার জিভে। শুয়োরের শরীরের গন্ধ পাচ্ছে সে মাংসে। সারা টেবিল তখন উমমমমম উমমমমম করছে, নীলা একটি আলুসেদ্ধর কণা মুখে দিয়ে সালাদের আধখানা পাতা চিবিয়ে মুখের শুয়োরের গন্ধ দূর করল খানিক। তারপর পনির এসে মুখকে আবার বিনাশ করে দিল। এদিকে বড় বাগেত রুটি ছিঁড়ে যে যার থালার পাশে টেবিলের ওপর রেখেছে, দ্রুত, অভ্যস্ত এবং অবশ্যই সভ্য হাতে ছুরির মাথায় পনির নিয়ে রুটির ওপর লাগিয়ে রুটিপনির সোজা মুখের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। বাগেত গড়াচ্ছে টেবিলের ছাইয়ে ধুলোয়। ও খাওয়া নীলার পক্ষে সম্ভব হয় না, পনিরের দুর্গন্ধ দূর করতে তার্তের আশ্রয় নিতে হল তাকে। তার্ত তাঁতা, সাদামাটা আপেল পাইএর নাম। কোনও এক বাড়ির কোনও এক দুবোন আপেল পাই বানিয়ে ভুল করে উপুড় করে ঢেলেছিল থালায়। তলার আপেল উঠে এল ওপরে, আর ওপরের আটাগোলা ভাজা চলে গেল তলে, তাই মনে ধরল লোকের, সেই থেকে আপেল পাইএর নাম গেল বদলে, তার্ত পম(আপেল) না হয়ে তার্ত তাঁতা। তাঁতা ছিল দুবোনের পদবি।

নীলা কফি খাবে না। চা আছে? না চা নেই। সুতরাং জল গিলতে হয় নীলাকে। খাওয়া শেষ হয়ে যাওয়ার পরও খাবার টেবিলে বসে থাকার অভ্যেস নীলার নেই। ছটফট করে সে, কিন্তু উঠে ওই সোফায় গিয়ে বসতে পারে না, কারণ নিয়ম নেই। নিয়ম খাওয়া শেষে খাওয়ার টেবিলেই সময় কাটানো। অভিজাত ইংরেজ অবশ্য এক ঘরে মূল খাবারটি খায়, তারপর হাতে ন্যাপকিন নিয়ে উঠে যায় অন্য ঘরে মণ্ডা মিঠাই খেতে, খেয়ে আরেক ঘরে যায় চা বা কফি খেতে। রীতিমতো দৌড়োদৌড়ি করে খাওয়া। নীলা হিসেব করে দেখে নিকলের বাড়িতে খাবার টেবিলেই পার হয়েছে পুরো পাঁচ ঘণ্টা। বাঙালি আর ফরাসিতে পাঁচের একটি মিল লক্ষ করে সে। বাঙালির খাবার বানাতে সময় খরচা হয় পাঁচ ঘণ্টা, আর খাওয়া শেষ হয় পাঁচ মিনিটে। আর ফরাসিরা খাবার বানাতে সময় নেয় পাঁচ মিনিট, আর খায় সে খাবার পাঁচ ঘণ্টায়।

নীলার ওই অস্থিরতা গুঁড়িয়ে দিয়ে নিকল গেলাস উঁচিয়ে ধরে, নীলার উদ্দেশ্যে। কী ঘটনা? আরতে টেলিভিশনে ভারতের ওপর এক্ষুনি একটি তথ্যচিত্র দেখানো হবে। ব্যাস চেয়ার ঘুরিয়ে বসল সবাই। নীলাকে ঠেলে দেওয়া হল সবার সামনে, পিয়ানোর পাশে, কুকুর বেড়াল সোফায়, ওদের চোখও তথ্যচিত্রে।

টেলিভিশনের পর্দা জুড়ে শূন্য একটি টিনের থালা, ফুটো থালা। ক্যামেরা পেছন দিকে সরছে, থালা ছোট হচ্ছে, পর্দা জুড়ে খালি পা, হাঁটছে। এবার ক্যামেরা আরও দূরে সরল, খালি পায়ে, খালি গায়ে, মাথায় রুক্ষ চুল, নাকে সর্দি ঝুলছে এক আট বছরের ছেলে হাঁটছে রাস্তায়। হাতের ফুটো থালা এগিয়ে ধরছে রাস্তার লোকের দিকে, ভিক্ষে চাইছে। কেবল

একটি ভিখিরিই নয়, এক ভিখিরির পেছনে আরও ভিখিরি। আর রাস্তায় মানুষের গিজগিজ ভিড়, ভাঙা ট্রাম ঘটঘট শব্দ করে এগোচ্ছে, আধভাঙা বাস ট্রাক ভিড়ের মধ্যে গলা ঢুকিয়ে দিচ্ছে ভয়াবহ শব্দে ভোঁ বাজাতে বাজাতে, আর এর মধ্যে শীর্ণ কটি গোরু হাঁটছে, ভিড়ের রাস্তায় কিছু গোরু বসে জাবর কাটছে, কিছু গোরুরগাড়ি হেই হেই করতে করতে ছুটছে। ভিখিরিতে উপচে গেছে ফুটপাত। আর সেই ছেলেটিই ফুটো থালা হাতে ঘরে ফিরছে, ঘর বলতে একটি ভাঙা ঝুপড়ি। ঝুপড়িটি একটি জলাশয়ের ওপর, সরু বাঁশে হেঁটে তবে ঢুকতে হয় ঝুপড়িতে, শুকনো পাতায় বানানো ঝুপড়িতে। ভেতরে এক দঙ্গল ভাইবোনের কিচির মিচির। ভাইবোনগুলো ভাতের হাঁড়ির ওপর হামলে পড়ছে।

নীলা এক ঘর স্তব্ধতা ভেঙে বলল, নিশ্চয়ই খুব গরিব ঘরের কাহিনী দেখাচ্ছে।

শশশশশ। নীলাকে ঠোঁট যুক্ত করতে বলা হচ্ছে।

পর্দায় তখন ভাতের হাঁড়ি, শূন্য হাঁড়ি। সাঁকো পেরিয়ে মা যাচ্ছে কলসি ভরে জল আনতে নীচের জলাশয়টি থেকে। জল এনে চুলো ধরালো রেললাইনের ধারে। রেলগাড়ি যায়, আর চুলোর আগুন যায় নিভে। ধোঁয়ায় চোখ ঢাকতে ঢাকতে মা ভাত ফুটোচ্ছে। ক্যামেরায় আবার ভাতের হাঁড়ি। হাঁড়ির ওপর হামলে পড়ছে ছেলেমেয়েগুলো। মা ঠেলে সরাচ্ছে ওদের। এর পরের দৃশ্য, সেই ভিখিরি বালক বাইরে সাঁকোয় বসে খোলা আকাশের নীচে বসে মলত্যাগ করছে, নীচে বদ্ধ জলাশয়।

তথ্যচিত্র শেষ হতেই রিতা প্রথম মুখ খুলল, আহ, কী চমৎকার ক্যামেরার কাজ।

নীলা সোফার পাশ-টেবিল থেকে একটি ম্যাগাজিন টেনে ঝুঁকে রইল তার ওপর, যেন খুব মন দিয়ে সে পড়ছে ওটি। নীলা জানে, নীলা মুখ লুকোচ্ছে। কান খোলা, সে কানে ঢুকছে রিতার উচ্ছ্বাস।

মিশেলের কণ্ঠ, আরতের তথ্যচিত্রের মতো তথ্যচিত্র হয় না।

আর ক্যামেরা যখন জুম করল হাঁড়িতে, নেপথ্যসংগীতটা খেয়াল করেছ? এডিথ পিয়াফের ওই গানটার সুরটা না?

কোনটা, লা ভি লামোর...?

না না, দ লর বেইসের...।

নীলার চোখ ভোগ ম্যাগাজিনের ছবিতে স্থির হয়ে থাকে। এক সুন্দরী দুচোখে থই থই কামনা নিয়ে সমুদ্রতীরে উলঙ্গ শুয়ে আছে, আর পায়ের কাছে বালুতে পড়ে আছে একটি সুগন্ধীর শিশি, অপিয়াম।

ম্যাগাজিন থেকে নীলা চোখ সরাল, অথবা মুখের সামনে থেকে ম্যাগাজিন সরাল যখন চেয়ার সরানোর শব্দ পেল কারও। ওঠার উদ্যোগ। ঠিক এটিই প্রাণপণ চাইছিল সে, উঠতে। প্রায় লাফিয়ে উঠে সবুজ জ্যাকেটখানা পরে নিল। দানিয়েল আবার অসভ্যতার দোষ না দেয়, মাথা নিচু, কিন্তু মুখে বলল, এ বিয়েনটট।

ও বললেই বিদায়ের পাট শেষ হবে, তা নয়। নিকল, মিশেল আর রিতার গালে তিন দুগুণে ছটি চুমু খেতে হল নীলাকে। মারিয়াকে খেতে হল না কারণ নীলা আর দানিয়েলকে সে গাড়িতে অনেকটা পথ পৌঁছে দেবে, পথে নেমে যাবে দুজন, মারিয়ার সঙ্গে তখন হবে চুমোচুমি।

দানিয়েলও তিনজনকে চুমু খেয়ে বলল, আবিয়াঁতো।

রিতা বলল, এ আমার সৌভাগ্য ভারতের ওপর তথ্যচিত্র দেখলাম একজন ভারতীয়কে সঙ্গে নিয়ে।

নীলা হাসল, হাসতে হয় বলে হাসল। তা না হলে অবিনয়ী অথবা ধৃষ্ট বলে তার দুর্নাম হবে।

মারিয়ার গাড়িতে নীলা পেছনে বসল, সামনে দানিয়েল। মারিয়া মন্দ্রগম্ভীর স্বরে বলল, সিটবেল্ট। সিটবেল্ট।

সুইডিশ কানুন। পেছনের অন্ধকারে হাতড়ে সিটবেল্ট পেল বটে নীলা, তা বাঁধার কোনও উপায় পেল না।

যখন ঘরে পৌঁছল, অনেক রাত। দানিয়েল জামা কাপড় খুলে সোজা বিছানায়।

নীলার ঘুম পাচ্ছে না। তবু সে শুয়ে রইল, জামা কাপড় না পালটেই।

দানিয়েল বলে, কী দীর্ঘশ্বাস ফেলছ যে! কী হয়েছে?

না কিছু না।

কথা বলছ না যে।

কী বলব, বলো!

কেন কিছু কি বলার নেই! দানিয়েল নীলার কাঁধে হাত রেখে বলল। কেমন লেগেছে নিকলকে, নিকলের আর বন্ধুদের?

ভাল।

উহুঁ, তোমার মন ভাল নেই নীলা। স্পষ্ট বুঝতে পারছি।

আসলে কী জানো, আমার নিজের ওপর খুব রাগ হচ্ছে।

এবার দানিয়েল নীলাকে নিজের দিকে ফেরাল।

কেন রাগ হচ্ছে?

নিকলের বাড়িতে আমার যাওয়াই উচিত হয়নি।

কেন উচিত হয়নি?

দানিয়েলের প্রশ্নের উত্তরে অনেকক্ষণ নৈঃশব্দ্যের জলে নীলা ডুবে থাকে, প্রশ্নটি বারবার যখন তার কানের কাছে ঝিঁঝি পোকার মতো ডাকতে থাকে, নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, দেখলে না কেমন গাধার মতো সারাক্ষণ ছিলাম। আমাকে এসব জায়গায় মানায় না। কিষানের ঘরের বউ হয়ে থাকাই বোধহয় ভাল ছিল, আপাদমস্তক গৃহবধূ। রাঁধব বাড়ব, ভারতীয় দু একজনের সঙ্গে কথা বলব, ব্যাস। আমি আসলে এই সমাজে চলার উপযুক্ত নই।

দানিয়েল উঠে বসল, কী হচ্ছে কী? একটা ভাল জায়গায় গেলে, কোথায় তোমার মন ভাল হবে, আর তুমি কিনা অনুযোগ করছ!

নীলা তেমন বিষণ্ণ গলায় বলে, আচ্ছা, তোমার কি ওই তথ্যচিত্রটা ভাল লেগেছে?

নিশ্চয়ই। তোমার লাগেনি?

নাহ্।

বাহ আরতের মতো এত ভাল একটা চ্যানেল ভারতের ওপর ছবি দেখাচ্ছে, এর মূল্য অনেক, সে জানো?

দানিয়েল, নীলা ধরা গলায় বলে, ভারতে ওরকম দারিদ্র্যই কেবল আছে তা নয়। প্রচুর ধনী লোক আছে ওখানে, প্রচুর মধ্যবিত্ত...

দানিয়েল সশব্দে হেসে উঠে বলল, আরতে টেলিভিশন কি ভারতের ধনীদের ছবি তুলতে যাবে! ধন দেখালে বিল গেইটসের ধন দেখাবে। আর দারিদ্র্য দেখানোই তো ভাল। ভারতের জন্য লাভ, আর্থিক সাহায্য পাবে।

দানিয়েল পিঠের পেছনে দুটো বালিশ রেখে আরাম করে বসে গুলোয়াজের গুঁড়ো পাতলা কাগজে পুরে সিগারেট বানিয়ে ধরাল। লম্বা একটি টান দিয়ে ধোঁয়া ছড়িয়ে ঘরে, নীলার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, এ তো তুমি অস্বীকার করতে পারো না যে ভারত একটি গরিব দেশ। এ কি তুমি অস্বীকার করতে পারো যে পরিবারটিকে দেখাল আজ, সেরকম পরিবার নেই ভারতে? আছে। নিশ্চয়ই আছে। পৃথিবীর কত কোথাও মানুষ এমন মানবেতর জীবন যাপন করছে নীলা! এদের জন্য কিছু করা দরকার সবার। বিশেষ করে এই ধনী দেশগুলোর। ভারতে ধনী আছে, ঠিক আছে। কিন্তু ধনীদের জীবনযাপন তো আমরা জানিই। বরং এসব দরিদ্রের জীবন দেখলে আমরা উঠে বসি, ভাবি। সবাই না, যারা ভাবার, তারা ভাবে। যাদের হৃদয় আছে, তারা। এ অনেকটা, জানো নীলা, চাবুকের মতো আমাদের পিঠে পড়ে।

নীলার কুণ্ঠিত কুঞ্চিত মন হঠাৎ ভিখিরির ভাঙা ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। দানিয়েলের হাতটি টেনে নিয়ে বলল, তুমি কী যে ভাল! তোমাকে যত দেখি, মুগ্ধ হই।

দানিয়েল নীলার হাতটি আঙুলে বুলোতে থাকে।

নীলার ভাল লাগে।

এই, এত কাপড় চোপড় পরে ঘুমোতে এসেছ যে, আরামে ঘুমোতে পারবে না।

পাশ ফিরে বলে নীলা, ন্যাংটো ঘুমোনোয় আমার অভ্যেস নেই।

গায়ে লেপ টেনে গুটিসুটি শুয়ে থাকে সে। দানিয়েলের আঙুল নীলার বাহু থেকে ঘাড়ে, ঘাড় থেকে চুলে পৌঁছে। মাথায় কোনও নরম আঙুল ঘুরে বেড়ালে, নীলার ঘুম নেমে আসে চোখে। মলিনা প্রায়ই চুলে বিলি কেটে দিতেন, নীলা ঘুমোত। এই মা-হীন দেশে, দানিয়েল অনেকটা মায়ের মতো। নীলার ঘুম ছুটে যায় যখন দানিয়েলের আঙুল ওর বুকের ওপর হেঁটে বেড়ায়।

ওর হাত সরিয়ে দিয়ে হেসে ওঠে, কাতুকুতু, না?

না। না স্বরটি বেশ গম্ভীর।

নীলা ঘাড় ফিরে তাকায় দানিয়েলের দিকে। বাদামি চোখদুটোয় কাতুকুতুর দুষ্টুমি নেই।

জানো, আমার মা এরকম চুলে হাত বুলিয়ে দিতেন, আমার কী যে ভাল লাগে কেউ এরকম দিলে।

তোমার ভাল লাগে? এই দেখো দিচ্ছি। কী সুন্দর কালো চুল তোমার। কী সুন্দর, তোমার গায়ের রং।

গায়ের রং সুন্দর হবে কেন! সাদা না তো! নীলা ভেংচি কাটে নিজেকে।

সাদা না বলেই তো সুন্দর।

তোমার বাদামি রং পছন্দ?

খুব। খুব।

দানিয়েল হাত বুলিয়ে দিতে থাকে নীলার চুলে, ওর দিকে ফিরে, ওকে জড়িয়ে শিশুর মতো শুয়ে থাকে নীলা। মলিনার বুকে মুখ লুকিয়ে নীলা এমন করে রাতের পর রাত ঘুমিয়েছে। নীলার অতীত হঠাৎ এই চিলেকোঠার খোলা জানালা দিয়ে এক ঝাঁক আলোর মতো ঢোকে।

কিন্তু আমার যে কোনও গুণ নেই দানিয়েল! নীলার ভাঙা স্বর।

কে বলল নেই। আমার সবচেয়ে ভাল লাগে তোমার সারল্য।

দানিয়েলের আঙুল নীলার চুল থেকে কপাল, কপাল থেকে নাক বেয়ে ঠোঁটে নামে।

তোমার ঠোঁট এত সুন্দর, বড় চুমু খেতে ইচ্ছে করে।

চুমু? ঠোঁটে?

নয় কেন?

উহুঁ।

উহু মানে? চাও না?

নীলা মাথা নাড়ে। চায় না।

তোমার পা দুটো কী বিষম ঠাণ্ডা হয়ে আছে। দানিয়েল তার পা বাড়িয়ে নীলার দু পায় বুলোতে বুলোতে বলে।

দানিয়েলের আঙুল নীলার শরীর থেকে সরে না। দানিয়েলের পা নীলার পা থেকে সরে না।

নীলা আবার পাশ ফেরে। ঘুমকণ্ঠে বলে চলো ঘুমোই। অনেক রাত হয়েছে।

তাতে কী, কাল রোববার।

কাল কাজ নেই, সকালে ওঠার তাড়া নেই। তাই দানিয়েলের আঙুল ঘোরে নীলার শরীরে। আঙুল শরীরের অলি গলি ঘুরে উরুর ফাঁকে যায়। নীলা যতই উরু যুক্ত করে, দানিয়েল তা বিযুক্ত করে দেয়।

এবার সে এক লাফে বিছানা থেকে নেমে গিয়ে চেয়ারে বসে।

দানিয়েল এ কী করছ তুমি?

কেন! তুমি কি চাও না? দানিয়েলের কণ্ঠে বিস্ময়।

কী চাই না?

সঙ্গম।

মানে?

আমি তো জানি তুমি চাও।

কী করে জানো?

দানিয়েল বলে, কেন, তুমি আমার হাত ধরে রাস্তায় হাঁটোনি?

তো?

তুমি আমাকে পছন্দ করো, তাই বুঝেছি।

নীলা অবাক চোখে বলে, পছন্দ করি বলেই তো হাতে হাত ধরে হেঁটেছি। আর সঙ্গম... এসব কী বলছ, মেয়েতে মেয়েতে আবার ওসব হয় না কি?

দানিয়েল ঠোঁট চেপে হাসে, হয় না তোমাকে কে বলেছে?

আমি কখনও শুনিনি!

নীলা কেবল শোনেনি যে তা নয়, তার নিজের কল্পনাকে যতদূর বিস্তৃত করা যায় করে সে কোনও আবছা ছবিও খুঁজে পায় না, যা দেখে অন্তত অনুমান করবে যে মেয়েদের মধ্যে কোনও যৌনসম্পর্ক হয় বা হতে পারে।

দানিয়েল বলে, অবাক সেও, আমি যে সমকামী তা তুমি বোঝোনি?

কী করে বুঝবে নীলা দানিয়েল সমকামী। সমকামীরা দেখতে কেমন হয়। মানুষের মতোই তো। দানিয়েল দেখতে আর যে কোনও মেয়ের মতোই।

কেন আমাকে দেখে বোঝোনি?

নাহ।

ধাঁধা কাটে না নীলার। চোখের সামনে ঘরটি পাক দিয়ে ঘুরতে থাকে, ঘরটি শূন্যে ভাসে, ঘরটি ওড়ে। বিছানায় ফিরে এলে, দানিয়েলের আগ্রাসী জিভ নীলাকে লেহন করে বাকি রাত। নীলা বাকরুদ্ধ শ্বাসরুদ্ধ পড়ে থাকে বিছানায়।

এক লজ্জায় শত লজ্জা ঢাকে নীলা।

প্যারিসে স্বপ্নের ঘোরে

নীলার বিশ্বাস হয় না এ জীবন সে যাপন করছে। যেন স্বপ্নের ভেতর ঘটে যাচ্ছে এক এক করে ঘটনাগুলো। স্বপ্ন ভাঙলেই সে দেখবে কলকাতায় সে তার নিজের ঘরে, সেই বিছানায়, জানালায় বসে ভোরের আলো খুঁটে খাচ্ছে দুটো চড়ুই, চড়ুই দুটোর সঙ্গে তার মনে মনে কথা হবে। সুশান্তর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হবার পর নীলা নিদ্রাহীন রাত পার করত, আর দিনের বেলা ঝিমোত, কখনও আবার পুরো দিন জুড়ে ঘুমোত, অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে জেগে উঠত। একবার দেখল, কোনও এক জঙ্গলে হাঁটছে সে, আর তার দিকে দৌড়ে আসছে একটি সিংহ, দৌড়োচ্ছে সে, হঠাৎ পেছন ফিরে দেখে যে সিংহ নয়, একশো সাপ আসছে ধেয়ে, দৌড়োতে দৌড়োতে বিশাল এক সমুদ্রের মধ্যে পড়ে নীলা, একেবারে তলে গিয়ে দেখে সেই সিংহটি বসে আছে। নীলাকে কিছু বলল না, খেতে এল না। সিংহের পেছনে একটি গাছ, সেই গাছের ওপর একটি বাড়ি। বাড়িতে ঢুকে দেখে মলিনা ঘুমোচ্ছেন। মলিনার ঘরের বন্ধ জানালা খুলে দিতেই সামনে রোদে ফাটা চৌরঙ্গির ব্যস্ত রাস্তা। সেই রাস্তায় ত্রস্ত পায়ে নেমে দেখে রাস্তার ওপর একশো সাপ ফণা তুলে আছে। মুহূর্তে কোনও আর মানুষ নেই সে রাস্তায়। কেবল সাপ, আর একা নীলা। নীলা সে দিন ঘুম থেকে জেগে লক্ষ করে তার সারা গা ঘামে ভিজে গেছে, আর বুকের ভেতর ধুকপুক। জেগে ওঠার দু এক মুহূর্ত অব্দি ভয়ে সে নীল হয়েই ছিল। স্বপ্নটির কথা যখনই পরে তার মনে হয়েছে, বুক ধুকপুক করেছে।

রোববার সকালে ঘুম থেকে জেগে নীলা দেখে গায়ে কোনও জামা নেই, দানিয়েল দাঁত মাজছে বেসিনের সামনে দাঁড়িয়ে। শুয়ে শুয়ে দানিয়েলের শরীরটি দেখে মনে হয় তার, রোদ্যাঁর জীবন্ত ভাস্কর্য। এরকম শরীর হাতের কাছে পেলে যে কোনও পুরুষই উতলা হবে। কিন্তু দানিয়েল কোনও পুরুষের হাতে তার শরীর কোনওদিন দেয়নি, দেবেও না। পুরুষের শরীর, ও বলে, বড় কুৎসিত, ওকে মোটেও উত্তেজিত করে না। নারীর শরীর করে। নীলার শরীর করে। দানিয়েলের শরীরের দিকে তাকিয়ে নীলার মনে হয় না এই শরীরটিকে সে কাছে পেতে চায়, চুমু খেতে চায়। দাঁত মেজে যখন ও দাঁতন রাখে বেসিনের কিনারে, নীলা দেখে মাজনটি গোলাপি রঙের। তার মাজনের রং।

দানিয়েল, তোমারও একই রঙের মাজন? গোলাপি?

আমার মাজন নেই। দানিয়েলের সরল উত্তর।

তবে কী দিয়ে দাঁত মাজো তুমি?

মাজি না।

এটি কার মাজন তবে?

এটি তোমার।

নীলা উঠে বসে।

তুমি আমার মাজন ব্যবহার করেছ?

দানিয়েল কলের তলে মাথা ঢুকিয়ে মুখ হাঁ করে, সেই হাঁয়ের ওপর জল পড়ে।

মুখের জল ফেলে বলে, হ্যাঁ, তোমার মাজন। অসম্ভব নির্লিপ্ত স্বরে।

তুমি অন্যের মাজন দিয়ে দাঁত মেজেছ? জেনেই মেজেছ? নাকি ভুল করে?

জেনে। দানিয়েলের কণ্ঠ শান্ত। যেন এ খুবই স্বাভাবিক এক ঘটনা। বরং তার অবাক লাগে, নীলা এ নিয়ে এত প্রশ্ন করছে কেন!

জানো, দানিয়েল, আমার জীবনে এই প্রথম দেখলাম, অন্যের দাঁতন কেউ ব্যবহার করে।

বলে নীলা আবার ঢুকে যায় লেপের তলে, গা মাথা ঢেকে।

দানিয়েল কফির জল বসায় চুলোয়।

দানিয়েল যখন কফি বানিয়ে, গায়ে একটি টিশার্ট চড়িয়ে, চেয়ারে বসে কফি খাচ্ছে, নীলা লেপের তল থেকে মুখ বের করে বলে, তুমি কি কোনওদিন দাঁত মাজো না?

দানিয়েলের আবারও শান্ত গলা, মাজি হঠাৎ হঠাৎ। ইচ্ছে হলে।

শেষ কবে মেজেছিলে?

মনে নেই।

নীলার একবার ইচ্ছে হয়, হাসে। আরেকবার ইচ্ছে করে লেপের তলে ঢুকে সে অনেকক্ষণ কাঁদে। নিজের জন্য কাঁদে। নীলার হাসাও হয় না, কাঁদাও হয় না। দানিয়েল বাইরে গেল, লিবারেশন পত্রিকা আর চারটে কোয়াসাঁ কিনে ফিরল। নীলা তখনও শুয়ে। কফি আর কোয়াসাঁ খেতে পত্রিকা পড়ছে যখন দানিয়েল, নীলা বলল, চা খাব।

খাও।

দাও।

কেন দেব, করে নাও।

উঠতে ইচ্ছে করছে না যে! নীলা আহ্লাদি ঠোঁট ফোলায়।

নীলার আহ্লাদ বোঝার ক্ষমতা দানিয়েলের নেই। নীলাকে উঠতে হয়, চা বানাতে হয়, চা পান করতে করতে ছোট জানালার বাইরে যেটুকু আকাশ, সেটুকু দেখতে হয় আর চা শেষ করে বাইরে বেরিয়ে দুটো মাজন কিনে আনতে হয়, একটি দানিয়েলের জন্য, একটি নিজের, আর পুরনোটিকে ময়লার ঝুড়িতে ফেলে, নিজেরটি দিয়ে দাঁত মাজতে হয়, আর দানিয়েল যখন বলে, পোর্ত দ্য সিনেকোর্তে বড় বাজার বসে রোববারে, যাবে নাকি? সেটি শুনতে হয়, এবং বলতে হয়, সে যাবে।

দানিয়েল বলে, ও জায়গাটা তোমার ভাল লাগবে।

কেন?

ওখানে অনেক কালো লোক বাদামি লোক আছে।

সস্তা, দু নম্বর, পুরনো জিনিসপত্রের খোলা বাজারে এসে লক্ষ করে নীলা, নানা রঙের লোকদের এই ভিড় মোটেও তার ভাল লাগছে না বরং বিষম অস্বস্তি হচ্ছে। নীলার চোখের সামনে এক কালো ছেলে একটি ঘড়ির দোকান থেকে একটি ঘড়ি উঠিয়ে পকেটে ভরে নিয়ে সোজা চলে গেল হেঁটে। আরেকটি ছেলে একটি রোদচশমা নিয়ে চোখে পরে আয়নায়

কেমন দেখাচ্ছে দেখে ওটি ফেরত না দিয়ে, দাম না দিয়ে দিব্যি চলে গেল।

দানিয়েল পুরনো কাপড়ের স্তূপ খুঁজে দুটো জামা কেনে আর নীলা অবাক তাকিয়ে এই বিচিত্র জগৎ দেখে। কালো চশমায় ঢাকা মুখের কিছু লোক, সেতুর তলায় দাঁড়িয়ে আছে, পায়ের কাছে কালো ব্যাগ তাদের, ব্যাগের ভেতর জিনিসপত্র, পুলিশ আসছে, এরকম একটি রব শুনে ব্যাগ গুটিয়ে মুহূর্তে সব সরে গেল সেতুর তল থেকে। নীলা জিজ্ঞেস করে দানিয়েলকে, এসব কী হচ্ছে ওখানে?

অবৈধ ব্যাবসা।

নীলা বুঝে পায় না এই চমৎকার সাজানো গোছানো সব ভালর শহরে অবৈধ ব্যবসা করে কেন লোকেরা। তার উৎসুক চোখ ভিড়ের দিকে যায়। ভিড় ঠেলে খেলা দেখানো লোকটির দিকে, কালো মাথার লোকটি ম্যাচবাক্সের মতো ছোট্ট দুটো বাক্সে ছোট্ট একটি বল নাড়ছে, খুব দ্রুত নাড়ছে, নাড়তে নাড়তে বাক্সে বলটি ঢেকে ফেলল, এবার বলতে হবে কোন বাক্সের নীচে বলটি। বাজি খেলা। একশো ফ্রাঁ হাতে দাও কালো মাথার, উত্তর সঠিক হলে একশো ফ্রাঁ সে দিয়ে দেবে, সঙ্গে আরও একশো ফ্রাঁ, দুশো। আর উত্তর বেঠিক হলে কালো মাথা সেই একশো ফ্রাঁ নিয়ে নেবে। দাঁড়িয়ে থাকতেই দুটো বাজি হয়ে গেল, দুজন পেল একশো ফ্রাঁ করে, একজন হারল। কালো বল যখন নড়ছে, নীলা স্পষ্ট দেখতে পেল বলটি কোন বাক্সের নীচে কালো মাথা ঢুকিয়েছে, নীলা চেঁচিয়ে ওঠে, ওই বাক্সে বল, আমি জানি। ঠিক আছে বাজি ধরো। দানিয়েল বলল, বাজি ধোরো না নীলা, হারবে।

হারব কেন, আমি দেখেছি কোথায় বল। জিতবই।

নীলা একশো ফ্রাঁ দিল কালো মাথাকে, লোকটি বাক্স ওঠাল, বাক্সের তলে কালো বল নেই। কালো বল অন্য বাক্সের তলে। আবার সে বাজি ধরল, আবার হারল। আবার ধরল, আবার হারল। দু মিনিটে চারশো ফ্রাঁ ফুরিয়ে নীলা যখন ভিড়ের বাইরে এল, দানিয়েল একটি দোকানের দেয়ালে হেলান দিয়ে সিগারেট খাচ্ছে।

বলল, হেরেছ, ঠিক না?

করুণ চোখে তাকাল নীলা।

আমি জানতাম।

কী করে?

কারণ এরা সব ভণ্ড। লোক ঠকানোর ব্যবসা করে এরা। অবৈধ ব্যবসা।

হঠাৎ বাজিখেলার ভিড় থেকে কিছু লোক চোখের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেল। ভিড় ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

দানিয়েল বলল, দেখো, পুলিশের ভয়ে কেমন পালিয়ে গেল।

তা ঠিক, পালিয়েছে। ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর মধ্যে কালো মাথার সঙ্গী ব্যবসায়ীরা ছিল, যখন কেউ জেতে, ওরা জেতে। যখন কেউ হেরে যায়, হারে নীলার মতো মানুষ, লোভী তো বটেই, বোকাও, যারা জানে না, প্রতারক তার জাল কী করে ছড়িয়ে বসে।

নীলা দেখে, বাদামি আর কালো রঙের লোকেরা লোক ঠকাচ্ছে, পুলিশের ভয়ে দৌড়োচ্ছে, দোকানের জিনিস চুরি করছে।

কোন দেশের লোক এরা? নীলা নাক কুঁচকোয়।

আফ্রিকার। এশিয়ার। দক্ষিণ আমেরিকার।

ভারতের কেউ আছে বলে আমার মনে হল না। নীলা বলে।

বেশির ভাগই মধ্যপ্রাচ্যের।

তাই হবে।

তাই হবে।

নীলা স্বস্তি পায়। স্বস্তি পায় বলে মনে করে, আসলে পায় না। নীলা জানে, বেশ ভাল করেই জানে যে ভারতে প্রতারকের অভাব নেই, রাস্তাঘাটে, আপিসে আদালতে, এমনকী সংসদেও বসে লোকেরা লোক ঠকাচ্ছে।

রোববার, প্যারিসের নানা ফুটপাত ভরে ওঠে বাজারে। মাছ মাংস থেকে শুরু করে কাপড় চোপড়, থাল বাসন, এমনকী খাট পালঙ্ক। চারশো ফ্রাঁ গচ্চা দেওয়ার পর, ও এলাকা যত শিগরি সম্ভব ত্যাগ করে দুজন।

মোঁপারনাসের এক গলিতে, দানিয়েলের ইচ্ছে, ছবি বিক্রি করতে লোক বসে প্রতি রোববার, দেখবে। রাস্তার দুপাশে ছোট ছোট তাঁবু ফেলে নিজের আঁকা ছবি নিয়ে বসে আছে তত বেশি না বিক্রি হওয়া চিত্রকরেরা। ছবি দেখতে দেখতে নীলা অতীতে ফেরে, সেও শখের ছবি আঁকত এককালে।

দানিয়েল নীলার উদাস চোখে তাকিয়ে সস্নেহে বলে, আবার রং তুলি হাতে নাও।

ধুৎ। খামোকা।

চেষ্টা তো করো। প্যারিসে কি শ্রমিকের জীবন কাটাতে এসেছ? এ ছবির শহর তোমাকে যদি শিল্পী না করে তবে পৃথিবীর আর কোন শহর করবে?

শিল্পী হবার কোনও গুণ আমার নেই দানিয়েল।

কী করে জানো যে নেই?

জানি।

কার যে গুণ আছে, কার যে নেই, নীলা। কার ভেতরে কোন সম্পদ লুকিয়ে আছে, তার আমরা কতটুকু জানি। ভ্যানগগের ছবি আজকাল কোটি ফ্রাঁয়ে বিক্রি হয়, বেঁচে থাকতে তার ছবি কেউ কেনেনি। অভাবে অসুখে লোকটা আত্মহত্যা করেছে।

মিউজি দর্সের দিকে হাঁটতে হাঁটতে দানিয়েল নিজের জীবনের কথা বলে। মন্ট্রিয়ালে সে আইন পড়তে শুরু করেছিল, ফেলে ঘোড়ার পেছনে দৌড়োল। ঘোড়া চালাত, আর অবসরে লোকদের ঘোড়া চালানো শেখাত। সেও একসময় আর ভাল লাগেনি। সব ছেড়ে, প্যারিস চলে এল, প্যারিসে এসে লেভাই কাপড়ের কারখানায় প্রথম চাকরি নিয়েছিল, তারপর লেভাই যখন এ দেশের শ্রমিকদের তত বেশি শোষণ করতে পারে না বলে চলে গেল গরিব দেশে গরিবদের শোষণ করতে, দানিয়েল ফুটপাতে পা ছড়িয়ে বসে প্যারিসের আশ্চর্য রূপ দেখত প্রতিদিন আর শহরে ঘুরে পুরনো বইয়ের দোকান থেকে সস্তায় বই কিনে মাঠে রোদের তলে শুয়ে শুয়ে পড়ত। বই পড়তে পড়তেই তার লেখার ইচ্ছে হয়। লিখতে লিখতেই এখন লেখা ছাপা হয়। আর ছাপা যেহেতু হয়, দানিয়েল একটি বইও লিখে

ফেলেছে। বইটি তার বাবাকে নিয়ে। বাবা পিয়ের লরু। পাণ্ডুলিপি কিছু প্রকাশকের কাছে ডাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একজন প্রকাশকের উত্তর এসেছে, লিখেছে এদিক ওদিক খানিকটা বদলালে বইটি ছাপা যায়।

মিউজে দর্সেতে পুরো দিন কাটিয়ে বাড়ি ফেরার পথে দানিয়েল টাকা ধার দেয়, নীলা ইজেল কেনে, রং তুলি কেনে। নীলা ওড়ে, হঠাৎই ওড়ে, প্যারিসে স্বপ্নের ঘোরে।

নীলা তখনও ঘোরে, আর তার নিখুঁত শরীর জুড়ে দানিয়েলের তৃষ্ণার্ত আঙুল আর জিভ খেলা করে। আঙুলগুলো শরীরের সব আনাচ কানাচ চেনে। কোথায় কোন ঠোঁট, সেই ঠোঁটের আড়ালে আরেক ঠোঁট, আর সেই ঠোঁটের গায়ে ভ্রমর ঘুমোয়, জাদুর ভ্রমর, ভ্রমর ছুঁলেই ফোয়ারায় জল ওঠে, সেই জলে ভেসে যায় সব। সব।

নীলা সাঁতার জানে না। তুখোড় সাঁতারু দানিয়েলকে আঁকড়ে ধরে সে উতল নদী পার হয়।

দানিয়েল পাড়ে উঠে নীলার কানে কানে বলে, আমার জাদুর ভ্রমরকে জাগিয়ে দাও।

নীলা জাগায় না, ভ্রমরে বড় ভয় নীলার। ঘেন্না নীলার।

নীলার খুব জানতে ইচ্ছে করে দানিয়েল কবে নিজেকে বুঝল যে সে সমকামী। দানিয়েল বলে যখন সে ইস্কুলে পড়ত, বারো বছর বয়স, ইস্কুলের এক মেয়েমাস্টারের প্রেমে পড়েছিল প্রথম। ক্লাসে বসে হাঁ করে মাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

তারপর?

জোসেলিনের স্বামী ছিল, তিনটে বাচ্চা ছিল। ইস্কুলের পর প্রতিদিনই দানিয়েল চলে যেত জোসেলিনের বাড়ি। পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকত আর জানালা দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখত জোসেলিনকে।

তারপর?

একদিন জোসেলিন টের পেল জানালায় দুটো ব্যাকুল চোখ। সেদিন বাড়িতে সে ছাড়া আর কেউ ছিল না। দানিয়েলকে ভেতরে ডেকে আনে জোসেলিন। সারা গা তার কাঁপে যখন জোসেলিন তাকে স্পর্শ করে। সারা গা কাঁপে যখন জোসেলিন তাকে চুমু খায়। সারা গা কাঁপে যখন জোসেলিন তার গায়ের জামা খুলে দেয়, নিজেরটিও খোলে।

তারপর?

তারপর কী ঘটেছে দানিয়েলের মনে নেই। কেবল মনে আছে অসম্ভব এক আনন্দে সে জোসেলিনের বিছানায় গড়াগড়ি খেয়েছে। হাত পা ছুড়েছে আনন্দে।

ইস্কুল ছাড়ার পর জোসেলিনের সঙ্গে সম্পর্কটিও যায়। চৌদ্দ বছর বয়সে দানিয়েল বাড়ি ছেড়ে এক কমিউনে থাকতে শুরু করে। কমিউনে ছিল পাঁচটি মেয়ে আর দুটি ছেলে। সম্মিলিত সংসার যাকে বলে। পাঁচটির মধ্যে দুটি মেয়ের সঙ্গে তার যৌনসম্পর্ক ছিল। কমিউনে থাকাকালীনই দানিয়েল সমকামীদের বারে যেত, মদ খেতে খেতে যার সঙ্গে চোখাচোখি হত, ইঙ্গিত হত, তার সঙ্গে চলে যেত তার বাড়িতে অথবা নিয়ে আসত তাকে কমিউনে। রাত শেষ, সম্পর্ক শেষ। সকালে আবার যে যার জীবনে। পরদিন দেখা হলে, এমনও হত যে সে মনে করতে পারত না যে গতরাতে এর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে।

তারপর?

পিয়ের লরু মারা গেল। দুমাস পর ক্লারা, দানিয়েলের মা। বাপ মায়ের টাকা দু ভাই বোনে ভাগ হল, নিজের ভাগের টাকায় সে বাড়ি কিনল মন্ট্রিয়ালে। একা জীবন। পরিবারের কারও সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক থাকেনি। নিজের দাদা ফিলিপের সঙ্গেও না।

তারপর?

তারপর প্রেম হল গোটা চারেক। একসঙ্গে থাকাও হল, ছাড়াছাড়ি হল। আবার প্রেম হল, আবার থাকা হল। আবার ছাড়াছাড়ি। আর প্রেমিকার যখন অভাব, তখন বার থেকে রাতের সঙ্গী তুলে আনা। এভাবেই জীবন চলছিল দানিয়েলের। ব্যক্তিগত জীবন। আর বাইরের জীবনে ছিল ছোট চাকরি ছোট বেতন, কিন্তু অন্য উত্তেজনা, আন্দোলনের উত্তেজনা। সমকামীদের অধিকার আন্দোলনে নানা সভা সমিতি করে বেড়াত। মিছিলে গলা ফাটাত।

তারপর?

তারপর নিকল। ও কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিল মেয়েদের সামাজিক ইতিহাস সম্পর্কে বক্তৃতা করতে। কদিন ছিল। আর ও কদিনের মধ্যে দানিয়েলের সঙ্গে সখ্য, সঙ্গম সবই হয়। নিকল প্যারিসে চলে আসার পর দানিয়েলের মন পড়ে থাকে নিকলে। বুঝল এ কেবল যৌন সম্পর্ক নয়, এ প্রেম। সেই প্রেমেরই আকর্ষণে প্যারিস আসা। নিকলের বাড়িতেই ছিল পুরো চার বছর। চার বছরে প্রেমও গেছে, যৌনসম্পর্কও গেছে। কিন্তু বন্ধুত্ব রয়ে গেছে।

গুলোয়াজের কড়া ধোঁয়া ছড়িয়ে দানিয়েল আরেকটি সিগারেট ধরায়। বলে, তোমার কি কখনও এমন হয়েছে, স্মৃতি থেকে মুছে যাওয়া কোনও ঘটনা, ধরো কুড়ি বছর আগে ঘটে যাওয়া কোনও ঘটনা, আচমকা একদিন মনে পড়ে?

নীলা মাথা নাড়ে, এরকম হয়নি তার।

আমার যখন ছবছর বয়স, আমার বাবা আমাকে ধর্ষণ করেছিল। ঘটনাটি, এই আট বছর আগে, মন্ট্রিয়ালে, একা বসে আছি ঘরে, বরফের ঝড় হচ্ছে, দেখছি, আলটপকা মনে পড়ল।

নীলা চকিতে উঠে বসে। চোখের মণিতে, চোখের পাতায় অবিশ্বাস।

আসলেই ঘটেছিল না কি অন্য কারও গল্প শুনে তোমার মনে হয়েছে, এ তোমার নিজের জীবনে ঘটেছে। নীলা দানিয়েলের কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলে।

আসলেই ঘটেছিল। আমার স্পষ্ট মনে পড়েছে, মা গেছে বাইরে কাজে, একা বাড়িতে আমি, কুকুরকে নিয়ে খেলছি, বাবা আমাকে কোলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। তারপর ধর্ষণ করল। আমার মুখের ভেতর তার পরনের শার্ট গুঁজে দিয়ে আমার চিৎকার বন্ধ করেছিল।

তোমার আপন বাবা?

আমার আপন বাবা।

প্যারিসে স্বপ্নের ঘোরে নীলা ঠিকই একদিন ছবি আঁকতে শুরু করল। তেলরঙে। এক দল মেয়ে সবুজ মাঠে নাচছে, আকাশ জুড়ে মেঘ। পশ্চিমে কালো মেঘ।

দানিয়েল ছবিটিকে বসে দাঁড়িয়ে শুয়ে ডানে হেলে বাঁয়ে হেলে দেখে বলল, বড়

মাতিসের প্রভাব।

মোটেই না, মাতিস কাগজ কেটে সেঁটেছেন, আর এ আঁকা। আর এরা হাতে হাত ধরেও নাচছে না।

বড় মন খারাপ করা ব্যাপার আছে।

এ তো খুশির দিন। খুশিতে ময়ূরের মতো নাচছে মেয়েরা।

দানিয়েল ভুরু কোঁচকায়, তা হলে মেঘলা কেন? ঝকঝকে রোদ দাও। মেঘলা দিন তো মন খারাপ করা দিন।

ছবিটির দিকে নেশাগ্রস্তের মতো তাকিয়ে নীলা বলে যায়, মেঘ দেখলে ময়ূর যেমন আকাশে পেখম মেলে নাচে, মেয়েরা তেমন নাচছে। খরায় পোড়া শরীর তাদের। অনেকদিন পর আকাশে মেঘ জমেছে, বৃষ্টি হবে। মেয়েরা খুশিতে ছুটে এসেছে বন্ধ ঘরের বাইরে, বাইরের ঝিরঝিরে হাওয়ায়। বৃষ্টিতে ভিজবে, গা শীতল হবে এদের, গায়ের ধুলোকালি দূর হবে।

ছবি আঁকার নেশায় নীলা বাক্সবন্দির কাজে অনিয়ম করতে লাগল।

দানিয়েল ও চাকরি ছেড়ে, যে প্রকাশনী তাকে চিঠি লিখেছিল যে তার বই ছাপা যেতে পারে, সেখানেই একটি চাকরি জুটিয়ে নিয়েছে, বই পড়ার চাকরি। বই পড়ে মন্তব্য করার।

অভাবের মুখে নীলা একদিন সুটকেসে তার অলংকার খুঁজল, ইচ্ছে, বিক্রি করে দেবে। অলংকার নেই, কিষানলালের বাড়ি থেকে সব এনেছে, অলংকার আনতেই কেবল ভুলেছে।

দানিয়েল বলেছে শুনে, এত উদাসীন হলে চলে না নীলা। টাকা পয়সা, আমি দেখেছি, হাতে থাকলে বেহিসেবি খরচা করো। তারপর ফুরিয়ে গেলে অন্যের কাঁধে চড়ো।

তোমার কাঁধ থেকে নামাতে চাইছ আমাকে? দাও নামিয়ে?

আমি চাইছি না। যে চাকরি আছে, তাই করতে থাকো আপাতত।

এসব ছোট চাকরি আমার ভাল লাগে না।

কার ভাল লাগে! কিন্তু থাকা খাওয়ার খরচা আছে না! সে তো জোগাতেই হবে। ছোট চাকরি ভাল লাগে না, তো বড় চাকরি খোঁজো, খুঁজতে তো হবে।

নীলা এক সকালে বড় চাকরি এবং ভাল চাকরি খুঁজতে বেরোল, চাকরি খোঁজা বলতে পত্রিকা কিনে বিজ্ঞাপন দেখো, দু একটা ফোন নম্বর টোকো। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে পত্রিকা কেনা হয় নীলার, বিজ্ঞাপন দেখা হয় না, ফোন নম্বরও টোকা হয় না। সে হারিয়ে যায় বিশাল এক স্রোতে। একটি আনন্দস্রোত যাচ্ছে প্যারিসের রাস্তায়। লাল নীল বেলুন উড়ছে। আর সেই স্রোত নীলাকে নিতে নিতে জনদার্ক অব্দি নেয়। নীলা কলকাতায় অনেক মিছিল দেখেছে, এমন চমৎকার কোনও মিছিল দেখেনি। অভিভূত মুগ্ধ মোহিত নীলা আর সবার মতো জনদার্কের মূর্তির সামনে মাথা নোয়ায়, পায়ে ফুল দেয়।

বাড়ি ফিরে যখন সে দানিয়েলকে তার এই চমৎকার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করে, দানিয়েল চমকে তাকায়, সব্বনাশ করেছ।

সব্বনাশের কী হল?

বেঁচে যে ফিরেছ এই বেশি।

নীলা বোকা বনে যায়। তাকে আরও বোকা করে দিয়ে দানিয়েল বলে, এরা বর্ণবাদী লিপেনের দল। এরা এ দেশ থেকে যত অসাদা আছে, এদের তাড়াতে চায়। জনদার্ক হচ্ছে এদের দেবী। আর তুমি কিনা এই চরম ডানপন্থীর সঙ্গে মিছিল করেছ?

মিছিলে লোকদের পাশাপাশি হেঁটেছে নীলা। কই তাকে তো কেউ কিছু আঘাত করেনি, কিছু বলেনি।

পাশাপাশি হেঁটে নীলা জনদার্কে ফুল দিয়েছে, ওদের কেউ তো বিষচোখে নীলার দিকে তাকায়নি।

ফরাসি গৌরব, ফরাসি সংস্কৃতি রক্ষা করতে লিপেন রাজনীতিতে নেমেছে। ফরাসি ছাড়া, সাদা ছাড়া অন্য কোনও জাতি, অন্য কোনও রং এ দেশে আসুক বা থাকুক লিপেন চায় না। লিপেনের ভয়, কালোয় ছেয়ে যাবে এ দেশ, সাদার হাত থেকে সাদার দেশ চলে যাবে কালোর হাতে, সাদাদের বংশবৃদ্ধি হচ্ছে না, সাদা মেয়েরা বিয়ে না করার, সন্তান জন্ম না দেবার স্বাধীনতা পেয়ে গেছে, কিন্তু ওদিকে কালো মেয়েরা বছর বছর জন্ম দিয়ে যাচ্ছে। কালোরা গ্রাস করে ফেলবে এ দেশ, সাদা সংস্কৃতি বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকবে না। সাদা ফুরোতে ফুরোতে একসময় নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তাই এ দেশ থেকে যত অসাদা আছে সময় থাকতে তাড়িয়ে দেশটির পুরনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে, সার দিয়ে সাদার উৎপাদন বাড়াতে হবে, উঁচু জাতের মানুষ তৈরি করতে হবে। লিপেনের আবেগকে নীলা যুক্তি দিয়ে দেখে। আজ যদি, নীলা ভাবে, ভারত ভরে যেত আফ্রিকার জঙ্গল থেকে আসা লোকে, লুটপাট চালাত, ভারতীয়দের সব সুবিধেয় ভাগ বসাত, ভারতীয়দের করের টাকায় বসে খেত, আর নিজেদের অসভ্যতায় সংক্রামিত করতে শুরু করত সমাজ, তবে নীলা বেশ জানে, ভারতেও এমন বিদেশি তাড়াও আন্দোলন হত। যেভাবে ইংরেজ তাড়াতে হয়েছে, দেশের স্বার্থে, সংস্কৃতির স্বার্থে এদেরও তাড়াতে হত। হত না কি? হত। ঔপনিবেশিক শক্তি ছাড়াও তো অন্য কোনও শক্তি হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে। পারে না কি? নিশ্চয়ই পারে।

দানিয়েল বলে, হিটলারের জন্যও সম্ভবত তোমার এক ধরনের মমতা আছে।

আছে, নীলা হেসে বলে, তার কাকা সিদ্ধার্থর আছে, কেবল সিদ্ধার্থ নয়, ভারতের অনেক লোকেরই আছে। তারা বলে, অমন মহাশক্তিমান কারও শৌর্যে বীর্যে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না।

দানিয়েল দম বন্ধ করে শোনে নীলার যুক্তি।

আবার নীলার বাবার যুক্তি অন্য, অনির্বাণ বিশ্বাস করেন শত্রুর শত্রু হল বন্ধু। হিটলার সুভাষ বসুকে সমর্থন জুগিয়েছেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করতে। সুভাষ বসু বাঙালির গর্ব, কেবল বাঙালির নয়, পুরো ভারতবর্ষের গর্ব, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে মানুষ প্রাণপণ লড়েছেন। যে মানুষ কোনও আপসের মধ্যে ছিলেন না। গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলনে যাঁর বিশ্বাস ছিল না, যিনি শত্রুর বন্দুকের সামনে খালি হাতে দাঁড়াতে রাজি হননি। গুলির বিনিময়ে গুলি। তাই তো হয়। তা না হলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রশক্তি তো গান্ধীর আদর্শ মানত। তারা তো গুলির বিনিময়ে গুলিই করেছে। পশ্চিমের এই গান্ধীপ্রীতি

অনির্বাণকে হাসায়। গান্ধী কিন্তু তাঁর কাহাকেও মারিব না, কেবল মার খাইব নীতি দিয়ে ইংরেজ তাড়াননি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংরেজের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙেছিল বলেই ভারতের পাট গুটিয়ে নিয়েছিল।

দানিয়েল জিভে কামড় দেয়। হিটলারের সঙ্গে যে লোক বন্ধুত্ব করেছে, তাকে নিয়ে বাঙালির গৌরব?

নীলা হেসে বলে, গুন্টার গ্রাসও এভাবে জিভ কেটেছিলেন লজ্জায়। কলকাতায় সুভাষ বসুর মূর্তিতে মানুষের ফুল দেওয়া দেখে।

ওরই মধ্যে এক মন উদাস করা বিকেলে নীলা বেরিয়ে পড়ে, এলোমেলো হেঁটে বেড়িয়ে পের লাসেজের দক্ষিণ দরজার উলটোদিকে ছত্রিশ নম্বর বাড়িতে ঢোকে, ক্যাথারিনের বাড়ি। ক্যাথারিনের সঙ্গে চা খেতে খেতে বাউলের গল্প করবে, আর ও চাপাচাপি করলে দুটো বাউলসংগীতও ওকে শুনিয়ে দেবে, এরকম ইচ্ছে।

দরজায় কড়া নাড়লে ক্যাথারিন বেরিয়ে আসে। নীলাকে দেখে চমকে ওঠে, তুমি?

অপ্রস্তুত হেসে নীলা বলে, একা লাগছিল খুব। ভাবলাম তোমার বাড়ি বেড়াতে যাই।

ক্যাথারিন দরজা ধরে দাঁড়িয়ে, অবাক, বলে, কিন্তু তোমার তো আসার কথা ছিল না।

না ছিল না।

কোনও জরুরি দরকার আছে আমার কাছে?

না তা নেই।

তবে?

নীলা লজ্জায় চোখ নামিয়ে বলে, আসলে পের লাসেজের কবরগুলো দেখার ইচ্ছে ছিল তো...।

ও তাই বুঝি, ক্যাথারিন শুকনো মুখে বলে, তা কবরখানা তো একেবারে কাছে। নেমে হাতের বাঁদিকে সোজা চলে যাবে। তারপর একটু ডানে ঘুরতেই দেখবে বড় দরজা।

শুনে, যত দ্রুত সম্ভব হয় নীলা সরে যায় ক্যাথারিনের দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকা থেকে, ওর শুকনো মুখ থেকে, ওর কপালে ওঠা দুচোখ থেকে। নীলা যেতে যেতে পেছনে শোনে দরজা বন্ধ হবার খটাস শব্দ। নীলার জীবনে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। কলকাতায় বিকেলবেলা সে বন্ধুদের বাড়ি বেড়াতে চলে যেত, কোনও জরুরি কাজে নয়, আগে থেকে বলে রাখা নয়, এমনি। নীলার বাড়িতেও যে কেউ ওভাবেই আসে। অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত অতিথির মুখোমুখি নীলাকে হতে হয়েছে, তার পরও তো ঘরে এনে বসিয়েছে, চা বিস্কুট দিয়েছে, খেতে খেতে গল্প করেছে। শত্রুও যদি বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে, তাকেও ফেরাতে হয় না, এরকমই নিয়ম বলে জানে নীলা। মলিনা প্রবাদ আওড়ান প্রায়ই, শত্রুকে সবসময় বড় পিঁড়িটা দিতে হয় বসতে।

বড় বড় পায়ে সিঁড়ি নেমে যায় নীলা, পেছনের খটাস শব্দ পেছনেই পড়ে থাকে না, এটি নীলার সঙ্গে সঙ্গে যায়। গার দ্য অস্তারলিজ অব্দি যায়।

পরদিন নীলাকে অবাক করে ক্যাথারিন সেই বাক্সবন্দির কারখানায় আকর্ণবিস্তৃত হাসি উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করে, পের ল্যাসেজেয় গিয়েছিলে?

নীলা বলে, গিয়েছিল।

কার কার কবর দেখলে, টিম মরিসনের কবর দেখলে তো? অস্কার ওয়াইল্ডের? বালজাক, শঁপা, এডিথ পিয়াফ, খুব মলিন একটি কবর পল এলুয়ারের, দেখেছ?

সেই পল এলুয়ার যে লিখেছিল, ইল প্ল দ মা কর, কম ইল প্ল দ্য লা ভিল?

সেই পল এলুয়ার যে লিখেছিল জা ক্রি ত নম, লিবার্তে।

ক্যাথারিনকে দেখে একেবারে মনে হয় না, সে আদৌ মনে করছে গতকাল তার ব্যবহার মোটে অসুন্দর ছিল। ও নিয়ে একটি শব্দ সে উচ্চারণ করল না, বলল না, অন্তত এরকম যে কাল আমার ব্যস্ততা ছিল, বা আমার কোথাও যাবার ছিল। যেন ব্যাপারটিই খুব স্বাভাবিক যে, আমার বাড়ি যাবার তোমার কথা ছিল না, তুমি যাবে কেন, আমি যেদিন বলব, সেদিন যাবে।

ক্যাথারিনের অশালীন ব্যবহারে ক্যাথারিনের লজ্জা হয় না, লজ্জা হয় নীলার।

লজ্জায় নীলা ক্যাথারিনের চোখের দিকে তাকায় না। লজ্জায় সে বলে না, তোমার ব্যবহারে কাল আমি খুব কষ্ট পেয়েছি, পের লাসেজ দেখার কোনও ইচ্ছে আমার ছিল না, ও আমি আগেই দেখেছি, বরং হেসে, যেন গতকাল বলে কোনও কাল আসলে আসেনি, যেন ক্যাথারিনের বাড়ির দরজায় নীলা আচমকা উপস্থিত হয়নি, ক্যাথারিন তাকে তাড়িয়ে দেয়নি, দুজনের শেষ স্মৃতি কিষানলালের বাড়িতে যে আমোদটুকু হয়েছিল ওটুকুই।

বোদেলেয়ারের কবরটা কোথায়, পের লাসেজে? কিছুই ঘটেনি স্বরে নীলা বলে।

সে দেখতে তোমাকে যেতে হবে মোপারনাস কবরখানায়। কিছুই ঘটেনি স্বর ক্যাথারিনেরও।

ও আচ্ছা, ধন্যবাদ। নীলা মনে করে ধন্যবাদ বলে।

নীলা ধন্যবাদ বলে না, ব্যবহার জানে না, কথা বললে নীলা অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে, দেয়াল বা চেয়ার টেবিলের দিকে, যে বলছে তার মুখের দিকে বা চোখের দিকে তাকায় না। নীলা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এসব কথা কারখানার লোকের মুখে মুখে কানে কানে ঘোরে, নীলা টের পায়।

নীলা ধন্যবাদ বললে ক্যাথারিনের মুখে চমৎকার একটি হাসি ফোটে। এরকম হাসি ফুটেছিল প্রথম যেদিন ক্যাথারিন তাকে বিস্ত্রো রোমায় নিয়ে গিয়েছিল খেতে। দুজন মুখোমুখি বসে এস্ত্রোকত খেল, পান করার জন্য লাল ওয়াইন থাকতে হয়, ছিল। খাওয়া শেষ হলে রেস্তোরাঁর লোক লাদেসিঁয়ো রেখে গেল, একশো বিরানব্বই ফ্রাঁ। ক্যাথারিন পঁচানব্বই ফ্রাঁ টেবিলে রেখে বলেছিল, আমার ভাগেরটা, এস্ত্রোকত আর কফি।

ঠিক বুঝিনি, তোমার ভাগেরটা মানে?

আমি তো তাই খেলাম। তোমার দিতে হবে সাতানব্বই, এস্ত্রোকত আর চা।

ক্যাথারিনের পঁচানব্বই ক্যাথারিনের দিকে ঠেলে দিয়ে দুশো ফ্রাঁর একটি নোট বের করে রেস্তোরাঁর লোকের হাতে দিয়ে নীলা বলেছিল, দুটোর দাম রাখুন।

ক্যাথারিনের ভুরুতে সংশয় কাঁপে, কী ব্যাপার দুটোর দাম দিচ্ছ যে!

ওর ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকিয়ে নীলার নিজেকে এক দাগি আসামির মতো মনে হল, যেন গুরুতর এক অন্যায় কাজ সে করতে যাচ্ছে, আর এ কাজের পেছনে তার বদ উদ্দেশ্য

আছে।

নীলাকে বুঝিয়ে বলতে হল, আমাদের দেশে আমরা এরকম ভাগ করে দাম দিই না, খেতে গেলে যে কোনও একজন মেটায় দাম। মানে, হয় আমি দেব, নয় তুমি দেবে।

ক্যাথারিনের ভুরুতে সংশয় তখনও লেগে আছে দেখে নীলা ওর কাঁধে হাত রেখে হেসে বলেছিল, চলো উঠি।

তুমি যে দাম দিলে, তোমাকে আমি বিনিময়ে কী দিতে পারি? ক্যাথারিন কাঁপা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করেছিল।

আমাকে কিছু দিতে হবে না। দিতে হবে কেন! তুমি এমন বিনিময়ের কথা ভাবো কেন বলো দেখি!

ক্যাথারিনের ভুরু থেকে সংশয় নামে, মুখে হাসি ফোটে, চমৎকার হাসি। ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে।

নীলার মনে হয়েছিল, বিনিময়ের দায়িত্ব কাঁধ থেকে নেমেছে বলেই সম্ভবত ক্যাথারিনের সারা মুখে প্রশান্তি ছড়াল।

ওরকমই চমৎকার একটি হাসি এখন ক্যাথারিনের ঠোঁটে।

নীলা এত চমৎকার হাসতে জানে না। হাসলে ওর ভাঙা দাঁতটি বেরিয়ে আসে, ছোটবেলায় কলতলায় পড়ে ভাঙা।

লা ফামেলিয়া

কিষানের কাছ থেকে ঠিকানা পাওয়া যায়নি বাক্সবন্দির কারখানার, মোজাম্মেলের কাছে ধরনা দিয়ে ঠিকানা জোগাড় করে দুদিন ফোন করে একদিন নিজে কারখানায় এসেও নীলার সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি সুনীলের। অতঃপর এই ডাকের চিঠি, তোমার মা খুব অসুস্থ, কলকাতা চলে যাও যত শীঘ্র পারো।

সুনীলের এই পরামর্শে নীলা হেসে ওঠে। নীলা হাসে কারণ তার কিছুতে মনে হয় না মলিনার অসুখ করেছে, যদি করেই থাকে, সে সর্দিজ্বর, আর সুনীল পরামর্শ দিচ্ছে নীলাকে কলকাতা যাওয়ার এ মলিনার কোনও অসুখের কারণে নয়, নীলার স্পর্ধার কারণে যে স্পর্ধায় সে কিষানের বাড়ি ত্যাগ করেছে, সুনীলকে যে কারণে বেকায়দায় পড়তে হয়েছে, যেহেতু কিষান সুনীলকেই দোষ দিচ্ছে নীলার এই ধৃষ্টতার জন্য, আর প্যারিসের ভারতীয় মহলে নীলা যেহেতু মুখরোচক আড্ডার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিষানের বউ পালিয়েছে গো, পালিয়েছে! আর সুনীলের যেহেতু ইচ্ছে হয় না এসব শুনতে, স্বামীর সংসার করতে নীলা প্যারিসে এসেছে, তার যদি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে, সে বাপের বাড়ি চলে যাক, যা নিয়ম।

নীলা প্রথম দানিয়েলকে খবরটি দেয়।

শুনে দানিয়েল বলে, পরিষ্কার ষড়যন্ত্র। দেখো গিয়ে কিষান জড়িত আছে এর মধ্যে। আর, তোমার মার যদি অসুখ হয়েই থাকে তো তুমি গিয়ে অসুখ সারাবে নাকি? তোমাদের দেশে কি ডাক্তার নেই?

তাই তো! নীলা বলে।

তাই তো। দানিয়েলও।

তারপর দুজন এক বোতল সাদা ওয়াইন শেষ করে। সাদা ওয়াইন, কারণ দানিয়েল এক থালা শামুক আর এক বাটি ঝিনুক শেষ করেছে। ওর রাতের খাবার। ওসবের সঙ্গে লাল ওয়াইন যায় না, যায় সাদা।

নীলার শামুক ঝিনুক পোষায় না। ভেতো বাঙালি ভাত খেয়েছে। সবজি খেয়ে তার অভ্যেস হয়েছে। মাছ মাংস না হলেও আজকাল চলে তার।

শুতে যাবার আগে দানিয়েল দুটো সুখবর দেয়, প্রথম—রিতা সিকসুস একটি ছবি বানাচ্ছে প্যারিসে বিদেশি মেয়েদের অবস্থা নিয়ে। এতে নীলার একটি সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। পাঁচশো ফ্রাঁও দেবে।

দ্বিতীয়—দানিয়েল তার তিনজন বন্ধুকে বলেছে নীলার জন্য ভাল একটি চাকরি খোঁজ করতে।

দানিয়েলকে জড়িয়ে ধরে নীলা নাচে।

এই তো নাচলে!

পেটে কিছু পড়লে নাচা যায়। হাত পা ছুড়ে ডিসকোটেকের নাচ নাচা যায়। ভরতনাট্যম নয়।

দেখলে তো, যোগাযোগ থাকলে কী হয়! সেদিন নিকলের বাড়িতে যাওয়ার উপকারটা পেলে তো!

নীলা অস্বীকার করতে পারে না।

রাতে তার ভাল ঘুম হয় না। সারারাত উঠে উঠে পেচ্ছাপ করে, রাতের পেচ্ছাপ জমা করতে হয় ঘরের বালতিতে, সকালে ভরা বালতি করিডরের কোণে বারোয়ারি পেচ্ছাপখানায় ঢেলে দিতে হয়। এ কাজটি নীলা নাক চোখ মুখ বন্ধ কোরে করে, করতে হয়। দানিয়েলই করত প্রথম প্রথম। কিন্তু একসময় অতিষ্ঠ হয়ে আদরের দুলালিকে বলল, এই মেয়ে, তুমি কি আমাকে তোমার চাকর পেয়েছ? না, নীলা দানিয়েলকে চাকর পায়নি মোটে, চাকর যে পায়নি তা প্রমাণ করতেই সপ্তাহে তিনদিনের জায়গায় পাঁচদিনই বালতি পরিষ্কার করে সে।

সকালবেলা ছতলার করিডরের কোণে তয়লেতে যাবার লাইন লাগে, নীলা লাইন ভেঙে তয়লেতে ঢুকতে চেয়েছে কদিন, দানিয়েল বলেছে, এই মেয়ে, যে আগে সে আগে। যে আগে সে আগে, কনুই ঠেলে লাইন ভেঙে গা গলিয়ে আগে যাওয়ার বদঅভ্যেস নীলাকে ত্যাগ করতে হয়েছে। রোববার সকালে বুলানজেরিতে লাইন, বাসে উঠতে লাইন, নামতে লাইন, মেট্রোয় টিকিট কেনার লাইন, যেদিকে যায় সেদিকে লাইন, লাইনের শহর এটি, নীলার চোখ মুখ নাক বন্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে লাইন রক্ষা করতে হয়। যে আগে সে আগে, যে পেছনে, সে পেছনে। নীলা বরাবরই পেছনে। সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।

ভোরের আলো ফুটতেই নীলা তৈরি হয়।

দানিয়েল জিজ্ঞেস করে, এত সকালে নীলা যাচ্ছে কোথায়। এত সকালে নীলা ভোরের হাওয়ায় হেঁটে বেড়াবে, ক্যাফেতে ঢুকে চা আর কোয়াসাঁ খাবে, এত সকালে নীলা সকাল দেখবে শহরের।

কুয়াশায় ঢাকা রাস্তায় নীলা একা হাঁটে। দুতিনটে মাতাল রাস্তায় কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। মাথার কাছে খালি মদের বোতল। দুতিনটে লোক কুকুর নিয়ে বেরিয়েছে, কুকুরের হাওয়া খাওয়া আর প্রাতঃক্রিয়া দুটোই সারতে। কুকুরমূত্রে পথচারীর কোনও অসুবিধে হয় না, হয় মলে। শহরের ফুটপাতে কুকুরের মলের পাহাড় গড়ে উঠত, যদি না মল তোলার সরকারি এক সবুজ বাহিনী থাকত। সবুজ বাহিনীর চাকরিই হচ্ছে মটরসাইকেলে ঘুরে ঘুরে শহরের যত জায়গায় যত কুকুরনির্যাস আছে, তুলে সাইকেলের পেছনে বড় সবুজ বাক্সে ভরে শহরের বাইরে চলে যাওয়া।

অত সকালেই রাস্তার ধারে এক সাদা ভিখিরি বসে গেছে, হাতে বড় একটি কাগজ ধরে রেখেছে, আমরা ক্ষুধার্ত। লোকটির পাশে বসে আছে লোকটির চেয়ে দ্বিগুণ বড় একটি কুকুর। দানিয়েল এ দৃশ্য দেখলে, নীলা জানে, কুকুরটির জন্য আহা আহা করবে, লোকটির

সামনে রাখা টুপির ওপর দশ ফ্রাঁ রেখে তবে যাবে। কেবল দানিয়েলই নয়, এই ভিখিরি লোকটিকে যে লোকই পয়সা দেবে, দেবে কুকুরটির প্রতি মায়ায়। লোকের প্রতি নয়। নীলা মেট্রো ইশটিশনের ভেতরে দেখেছে, মেক্সিকান ছেলেরা সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আদি মেক্সিকান সংগীত বাজায়, অদ্ভুত এক ধরনের বাঁশি ওদের মূল বাদ্যযন্ত্র, সামনে টুপি থাকে, গিটারের খোল পড়ে থাকে, লোক যেন পয়সা ফেলে ওতে, লোকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে শোনে, শুনে বেশির ভাগই চলে যায়, পয়সা ফেলে না। মেট্রোয় বাজনা বাজিয়ে ভিক্ষে করা অবশ্য বেশ পুরনো ব্যাপার, কেউ কেউ জগৎবিখ্যাত সংগীতশিল্পী হয়েছে, জীবন শুরু করেছিল প্যারিসের মেট্রোয়। নীলার ধারণা, মেক্সিকান ছেলেরা যদি সংগীতে না যেয়ে কুকুরের খেলা দেখাত, ভাল পয়সা পেত। আমি ক্ষুধার্ত লেখা কাগজ নিয়ে আর হাতে একটি জলের গেলাস নিয়ে আজকাল অনেক মেয়েরাও বসে মেট্রোতে। সাদা মেয়ে। দানিয়েল বলেছে এরা কসোভা থেকে আসা, পূর্ব ইয়োরোপের গরিব দেশ থেকে আসা।

পূর্ব ইয়োরোপের গরিব দেশ থেকে লোকেরা এখন ভিক্ষে করতে আসছে এখানে? কমুনিজম ভেঙে তা হলে ওদের লাভটা হয়েছে কী, যদি ভিক্ষেই করতে হয়!

দানিয়েল বলেছে, কম্যুনিজম থাকাকালীন ওদের কোনও স্বাধীনতা ছিল না।

কী স্বাধীনতা ছিল না?

স্বাধীনতা ছিল না দেশের বাইরে যাবার।

নীলা প্রশ্ন করেছে, হেসে, দেশের বাইরে গিয়ে ভিক্ষে করার?

কেবল তো ভিক্ষেই নয়, ওসব দেশের শিক্ষিত মেয়েরা, যারা একসময় ইস্কুলের মাস্টার ছিল, অথবা বড় কোম্পানিতে বড় পদে চাকরি করত, কমিউনিজম ঝরে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে, ইস্কুল বন্ধ হল, কোম্পানির দরজায় তালা পড়ল, কাজ কর্ম চাকরি বাকরিও ঝরে পড়ল, ঝাঁকে ঝাঁকে পতিতা হতে পশ্চিমে ধাইছে। এ নিয়ে দানিয়েল কোনও মন্তব্য করতে চায়নি।

পৃথিবীর সব দেশ থেকে লেনিন স্তালিনের মূর্তি উপড়ে ফেললেও, শহরের নাম বা রাস্তার নাম থেকে লেনিন স্তালিন দূর করলেও এই প্যারিসে কেন একটি জায়গার নাম এখনও স্তালিনগ্রাদ, তা জিজ্ঞেস করলেও দানিয়েল উত্তর দেয়নি, বিরক্ত হয়েছে।

নীলা হেঁটে হেঁটে ল্যুভর জাদুঘরের পেছনে যায়, পেছনে রু দ্য রিভলি, পেছনে সুনীলের বাড়ি।

সুনীল নীলাকে দেখে অবাক, এই সকালে তুমি কোত্থেকে? কোথায় থাকো! কী করো! চিঠি পেয়েছ! একটা খবর দেবে না! এদিকে কী রকম দুশ্চিন্তায় আছি, সে জানো?

একসঙ্গে অনেক প্রশ্ন। নীলা একটিরও উত্তর দেয় না। জিজ্ঞেস করে, কী অসুখ হয়েছে মার?

সে জানি না। নারায়ণ, যে শ্যানেল পৌঁছে দিয়েছিল তোমাদের বাড়িতে, কলকাতা থেকে ফিরে এসেছে, সেই বলেছে যে মাসিমার অসুখ। নিখিল ফোন করেছিল দুদিন, বলেছে তোমাকে কলকাতা যেতে। পারো তো আজই।

এ কথা সে কথার পর নীলা আসল কথা পাড়ে। সোনার অলংকার।

কিষানের সঙ্গে অনেকদিন যোগাযোগ নেই সুনীলের। শেষ কথা হয়েছে ফোনে, সুনীল

ফোন করেছিল, নীলার কোনও খবর পেয়েছে কি না জানতে, কিষান বলেছে আমার কাছে জিজ্ঞেস করো কেন, নীলার খবর তুমিই তো ভাল জানো।

আমি জানব কী করে? সুনীল অবাক।

আমার বউকে ভাগিয়ে নিয়ে গেছ, তুমি জানবে না তো কে জানবে। এই হল কিষানের উত্তর।

কিষান বিশ্বাস করে, সুনীলের আশকারা পেয়ে নীলার এমন বাড় বেড়েছিল। কিষানের বিশ্বাস সুনীলের সঙ্গে শলা পরামর্শ করেই নীলা বাড়ি ছেড়েছে।

ওই বেশ্যার নাম আমার সামনে আর নেবে না। বলে কিষান ফোন রেখে দিয়েছে।

এরপর সুনীল আর কিষানের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। কিষানের তো প্রশ্ন ওঠে না।

সুতরাং অলংকারের কথা জিজ্ঞেস করা সুনীলের নিজের পক্ষে সম্ভব হবে না, তবে কিষাণের বন্ধুদের সে জানাতে পারে। সুনীলের ধারণা, কিষান সে অলংকার ফেরত দেবে না।

নীলারও ইচ্ছে করে সব দুর্ঘটনার জন্য সুনীলকে দায়ী করতে। দায়ী করে কিষানলালের সঙ্গে তার বিয়ে ঘটানোর জন্য। কিন্তু নীলা আবারও ভাবে, আজ যদি কিষানলাল না হয়ে অন্য এক ভারতীয় হত তার স্বামী, খুব একটা পার্থক্য হত কি! হত না, সে ওই বসে থেকেই দেখছে, চৈতালি সকালের খাবার তৈরি করে টেবিলে রাখছে, সুনীল খেতে বসছে। সুনীল ক্লিনিকে চলে গেলে টুম্পাকে ইস্কুলে ওই চৈতালিই দিয়ে আসবে, তারপর যাবে নিজের আপিসে। আপিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে টুম্পাকে ইস্কুল থেকে নেবে। বাচ্চাকে স্নান করানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানো সব চৈতালিই করবে। ঘরদোর ঝাড়মোছ চৈতালিই করবে, রাতের রান্না, চৈতালিই। সংসারে সময় বেশি দিতে হয় বলে, চৈতালি চাকরি নিয়েছে কম সময়ের, আট ঘণ্টার জায়গায় চার ঘণ্টার।

দানিয়েলের সঙ্গে নীলার যে সংসার, এতে কোনও বৈষম্যের ব্যাপার নেই। নীলা রান্না করল তো দানিয়েল বাসন ধুল। নীলা বাজার করল তো দানিয়েল রান্না করল। সে এ মাসে বাড়ি ভাড়া দিল তো পরের মাসে দানিয়েল দিল। নীলার হাতে টাকা নেই তো দানিয়েল সংসার চালাচ্ছে, হাতে টাকা এলে সে তা শোধ করে দেবে।

নীলা চা খেল কেবল। চা খেয়ে বলল উঠি।

উঠি মানে? কোথায় যাবে?

কাজে। তারপর কাজ থেকে বাড়ি।

বাড়িটা কোথায় শুনি।

এক বান্ধবীর বাড়ি।

বান্ধবীর বাড়িতে কদিন থাকবে?

যতদিন ইচ্ছে।

এভাবে হয় না, বুঝলে নীলা। একটা কিছু সিদ্ধান্ত নাও।

কী সিদ্ধান্ত?

হয় কিষানের কাছে ফেরো, নয় কলকাতা ফেরো।

নীলা এরকমই একটা উত্তর মনে মনে জানত, যে সুনীল দেবে।

সুনীল নাগাড়ে বলে গেল, নীলা যা ইচ্ছে তাই করছে। এভাবে যা ইচ্ছে তাই করে জীবন চলে না। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরকম মনোমালিন্য হয়ই। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়। কিষান এখনও নীলার জন্য অপেক্ষা করছে, সুনীলের তাই মনে হয়। আর যদি চেষ্টা করে ব্যর্থ হতে হয়, দেখা যায়, সম্পর্ক কিছুতে টিকবে না, তবে কিষানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুক নীলা, পাকাপাকি ভাবে ছাড়াছাড়ির ব্যবস্থা হোক। তারপর সে অন্য কাউকে বিয়ে করুক, যার সঙ্গে জীবন যাপন সম্ভব হবে।

কী অন্যায় করেছিল কিষান? তোমাকে মেরেছিল?

না।

বাইরে অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে ওর সম্পর্ক ছিল?

না।

তবে কি ইমানুয়েলের ঘটনা?

না।

তবে কী?

নীলা ম্লান হাসল।

নীলা কুয়াশায় বেরিয়ে পড়ল।

কিষানের কাছ থেকে অলংকার উদ্ধারের পথ কী আছে সামনে ভাবতে ভাবতে নীলা কুয়াশার ভেতর হাঁটে। মেট্রোয় চড়ে না। কারখানার কাজে যাওয়ার ইচ্ছেকে বাতিল করে ক্যাফে রিভলিতে বসে পর পর দুকাপ চা খায়। চা খেয়ে সে বাসে চড়ে, আগের মতো বাসে, নিরুদ্দেশ যাত্রায়।

বাসে যা কখনও ঘটতে দেখেনি নীলা, ঘটে সেদিন। দুজন ইনস্পেক্টর টিকিট দেখতে উঠেছে যাত্রীদের। নীলা বসেছিল বাসের পেছনের দিকে, সাদা ইন্সপেক্টর সব লোক রেখে নীলার কাছে এল টিকিট চাইতে। প্যান্টের না কি জ্যাকেটের পকেটে টিকিট রেখেছে মনে করতে না পেরে সে এক এক করে পকেট খুঁজতে থাকে, টিকিটও বেরোতে থাকে একাধিক, যে টিকিটই ইনস্পেক্টরের হাতে দেয়, নাকচ করে দেয় পুরনো বলে। তাকে নতুন টিকিট দেখাতে হবে। এ পকেট, ও পকেট, হাতব্যাগ তন্ন তন্ন করে খোঁজে, চুপসে যায়, ঘামে, আর টের পায়, বাসের লোকগুলোর চোখ তার দিকে। পেছন ফিরে সবাই তাকে দেখছে। অসংখ্য সাদার মধ্যে নীলা এক অসাদা, অদ্ভুতুড়ে এক জীব, নীলা অন্যরকম, আর সব বাসযাত্রীর মতো সে দেখতে নয়। দাঁড়ালে, তার সন্দেহ হয়, লোকেরা তার পেছনদিকটায় তাকাবে লেজ আছে কি না দেখতে। নীলা টিকিট না নিয়ে বাসে চড়ে, দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজায়, সাদাদের নিজেদের জন্য করা সুযোগ সুবিধে বহিরাগত হয়ে দেদারসে ভোগ করে। ইন্সপেক্টরের ঠোঁটের কোণে দেখলে তো, অপরাধীকে চিনতে আমাদের ভুল হয় না। রং দেখলেই বুঝি কে টিকিট করেছে কে না করেছে ধরনের হাসি।

হাতব্যাগের কাগজের আড়ালে লুকিয়ে ছিল নতুন টিকিটটি, শেষ অব্দি খুঁজে পায় সে। ইন্সপেক্টরের হাতে দিলে টিকিটের সময় মিলিয়ে নীলাকে ছাড়ল। তার মনে হয়, অনেকটা আশাহত হয়েই ছাড়ল। বাসের আর কারও কাছে ইন্সপেক্টর টিকিট দেখতেও চাইল না। আর কারও রং, সে লক্ষ করে, তার রঙের মতো নয়।

হোটেল দ্য ভিলের সামনে বাস থামলে নীলা নেমে পড়ে। এই দালানটি সে বরাবরই মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখে, এত দেখে তবু দেখা ফুরোয় না। যেন অনন্তকাল সে এটির সামনে বসে বিমুগ্ধ নয়নে দেখতে পারবে এর স্থাপত্য, এতটুকু ক্লান্ত হবে না। নেমে সে দানিয়েলকে ফোন করে বলে দেয় সে কাজে যায়নি, তার ইচ্ছে করেনি। কেন ইচ্ছে করেনি, সে জানে না কেন ইচ্ছে করেনি। কী করছে নীলা? কিছুই করছে না। কোথায়? হোটেল দ্য ভিলের সামনে। কেন ওখানে গেছে, সে জানে না কেন। কখন বাড়ি ফিরবে, তাও সে জানে না।

দানিয়েল বলে, ওখানেই থেকো। আমি আসছি।

নীলা চায়নি দানিয়েল আসুক। ওভাবেই সে কাটাতে চেয়েছিল একা। তার আরও একটি ফোন করতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু সে হাত গুটিয়ে রাখে। ফোনটি সে করে না, করে না কারণ তার ইচ্ছে করে না সে কোথায় থাকে কার সঙ্গে থাকে, আর কেনই বা কিষানের বাড়ি থেকে সে বেরিয়েছে এরকম প্রশ্নের সামনে পড়তে। নীলার ভয় হয়, পাছে সে শোনে সে বেশ্যা।

•

দানিয়েল এসে নীলাকে নিয়ে কাছের এক ক্যাফেতে ঢোকে।

কী হয়েছে।

নীলা হেসে বলে, কিছু হয়নি তো।

মন ভাল নেই তোমার নীলা, হয়েছে কী বলো?

কিছু হয়নি।

কী করলে সকাল থেকে?

সুনীলের বাড়ি গিয়েছিলাম। অলংকারের কথা জিজ্ঞেস করলাম। ফেরত পাবার কোনও সম্ভাবনা দেখছি না।

দানিয়েল জিজ্ঞেস করে, সে কারণেই কি এত ভেঙে পড়েছ?

নীলাও হাসে, আমাকে দেখে তাই কি মনে হচ্ছে তোমার?

না নীলাকে দেখে তা মনে হচ্ছে না। নীলাকে দেখে কিছুই অনুমান করতে পারে না দানিয়েল।

আমি তোমাকে ভালবাসি নীলা, আমার কাছে সব খুলে বলো না কেন! কাতরতা দানিয়েলের কণ্ঠে।

ভালবাসি শব্দটি নীলা দানিয়েলের মুখে আগেও শুনেছে। ঘরে। শব্দটি কখনও নীলাকে ফাঁপরে ফেলেনি, এখন ফেলছে। নীলার আশঙ্কা হয়, যে কেউ দানিয়েলের মুখে ভালবাসি শব্দটি শুনলেই বুঝে নেবে মেয়েটি সমকামী, আর ওর সঙ্গী, স্বাভাবিকভাবেই সমকামী। মেয়েতে মেয়েতে প্রেম কী করে হয়, নীলা বুঝে পায় না। আর মেয়েতে মেয়েতে কী করেই বা সত্যিকার সঙ্গম সম্ভব, যদিও প্রায় রাতেই দানিয়েলের পাশে শুয়ে ভোগ করে শীর্ষসুখ, বুঝে পায় না। এরকম সুখ সে নিজেই অবশ্য দিতে পারে নিজেকে, দানিয়েলের যে খুব একটা প্রয়োজন এ সুখ পেতে, নীলার মনে হয় না। নিজের শরীর নিয়ে সে নিজে কখনও খেলেনি, খেলা যে যায়, তাই সে কখনও জানত না। দানিয়েল বলেছে, যখন প্রেমিকার অভাব, তখন সে নিজেই নিজেকে যা সুখ প্রয়োজন, দেয়। শুনে নীলা অবাক হয়েছে। কত

যে অবাক করা ব্যাপার চারদিকে। যৌনতা বিষয়ে বিষম লজ্জা ছিল নীলার, কেবল নীলার কেন, ভারতীয় মেয়ে মাত্রই থাকে, আর যে কথাই বলো যৌনতা বিষয়ে কোনও কথা নয়, এ লজ্জার জিনিস, এ লুকোনোর ব্যাপার, এ ঢেকে রাখার বিষয়। সুশান্তর সঙ্গে দু বছরে বড়জোর ছবার চুমু খেয়েছে দুজন। আর সেই ছটি চুমু খেতে কত না অপেক্ষা গেছে, কত না আড়াল তৈরি করতে হয়েছে। আর এখানে, নীলার ভাল লাগে আবার রাগও হয়, দেখে যে, ছেলেমেয়েরা দিব্যি রেলে বাসে, রাস্তায় বাগানে যেখানে ইচ্ছে চুমু খাচ্ছে একশো লোকের সামনে। ভাল লাগে ভালবাসা এরা লুকোয় না বলে, এদের ভেতর রাখঢাক বলে কিছু নেই বলে, এরকম হওয়াই তো উচিত, আর রাগ হয় এ কারণে কী রক্ষণশীলতার মধ্যে থেকে নীলা কত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। নীলা তো এদেশে জন্ম নিতে পারত, নীলা তো পুরো কৈশোর, যখন তাকে ঘরে বসে থাকতে হয়েছে, ঘুরে বেড়াতে পারত বন্ধুদের সঙ্গে, প্রেমিকের কোমর জড়িয়ে হাঁটতে পারত যেখানে সেখানে, থাকতে পারত তার যা খুশি করার স্বাধীনতা। নীলার অনেকটা বয়স অব্দি যা খুশি করা হয়ে ওঠেনি, পারেনি সে। এই এখন, কিষানের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে অনেকটা যা খুশিই করছে সে, একটি মেয়ের সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করা নিশ্চয়ই যা খুশি করা, নীলা অবশ্য এটিকে যা খুশি বলে না, এ সঙ্গম তার ইচ্ছেয় নয়, দানিয়েলের ইচ্ছেয়। সে দিব্যি ভেবে নিয়েছে নীলা তাকে ভালবাসে। দানিয়েল অবশ্য লক্ষ করে মাঝে মধ্যে, যে রাস্তায় হাঁটলে, রেস্তোরাঁ বা ক্যাফেয় বসলে নীলা তৃষ্ণার্ত চোখে তাকিয়ে থাকে সুদর্শন ফরাসি যুবকদের দিকে। এই ক্যাফেতেও, দানিয়েল যখন বকে চলছে, ঘণ্টাখানেক পর দানিয়েলকে উঠতে হবে, নিকলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে সে, নীলার চোখ অন্যদিকে।

কী ব্যাপার আমার কথা শুনছ না?

শুনছি।

মোটেও শুনছ না।

শুনছি।

তবে যে অন্যদিকে তাকিয়ে আছো!

এখানেই ভুল করছ। যখন আমি মন দিয়ে কথা শুনি, তখন মুখের দিকে তাকাই না। তাকালে মনোযোগ নষ্ট হয় আমার।

তা তাকাও কোথায়?

তাকাই চেয়ার টেবিলের দিকে, দেয়ালের দিকে। যেসব পদার্থ মনকে অন্যদিকে ফেরায় না।

আর মুখ বুঝি অন্যদিকে ফেরায়?

তা ফেরায়। নাক ভোঁতা না টিকোলো, চোখ কালো না বাদামি, হাসলে কি গালে টোল পড়ে, কথা বললে মুখের কোন কোন পেশি নড়ছে, কপালে ভাঁজ পড়ছে কিনা কোনও কারণে, আর যদি পড়েই কটি ভাঁজ পড়ে...এসব দিকে মন চলে যায়।

দানিয়েল বলে, আমি কী বলেছি বলো তো? শুনেছ যখন!

বলেছ, নিকলকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।

নিকলের আবার কী অসুখ হল হঠাৎ? নিকলের নয়। অসুখ পিপির। পিপিটা কে? পিপি

হচ্ছে নিকলের বেড়াল।

পিপি পেচ্ছাপ করছে না। দানিয়েল বলে।

বেড়াল পেচ্ছাপ করছে না তো নিকলের হয়েছে কী?

তাই তো নিকলের মন খারাপ। ও মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যাবে।

নীলা চমকায়। বেড়াল খাচ্ছে না বলে কারও মনে অসুখ হয় আর সে অসুখ সারাতে ডাক্তারের কাছে যেতে হয়! নীলা জোরে হেসে উঠতে চায়, কলিকালে কত কী দেখব বাবা! বলে অনেকক্ষণ সে হাসির রেশ ধরে রাখতে চায়, কিন্তু দমন করে নিজের কুকুরে স্বভাব।

কুকুর বেড়ালের নাম শুনলে নীলার পা উসখুস করে লাথি লাগাতে। কুকুর বেড়ালকে সে লাথি লাগিয়ে আসছে হাঁটতে শেখার পর থেকে, বলা যায় লাথি লাগানো শেখার পর থেকে। পাঁচিল টপকে রাস্তার বেড়াল রান্নাঘরে ঢুকে পাতিলের ঢাকনা সরিয়ে রাঁধা মাছ মাংস খেয়ে যায়, এ ছিল নিত্যদিনের ঘটনা। তাই চোরা বেড়াল দেখলে একেবারে পেট বরাবর লাথি লাগানোই ছিল একরকম নিয়ম। রাস্তার নোংরা ঘাঅলা নেড়িকুত্তাগুলো বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকতে চাইলে লাথি মেরেই ওদের সরাতে হত। নীলা এই সভ্য সুন্দর কুকুরবিড়ালপ্রেমীর দেশে নিজের উসখুস করা পা দুটোকে ধমকে উদার করে।

এত কী দেখছ ওদিকে। নীলার চোখ যেদিকে, সেদিকে তাকিয়ে দানিয়েল দেখে এক ঝাঁকড়া চুলের যুবক দাঁড়ানো।

নীলার স্বীকারোক্তি, সুদর্শন থেকে চোখ ফেরাতে পারি না।

ছোঃ! একগাদা ঘেন্না ছুড়ে দেয় দানিয়েল। তুমি কি আবার আগের জীবনে ফিরতে চাও নীলা? দেখেছই তো পুরুষের সঙ্গে জীবনযাপন কী জঘন্য। তোমার শিক্ষা হয়নি?

সব ছেলেই তো কিষান নয়।

কিষান নয় তো সুশান্ত। ওই তো। সব পুরুষই এক। সব পুরুষই নারীকে অত্যাচার করে।

সবাই এক না দানিয়েল। কেউ কেউ ভালও তো বাসে।

ভালবাসা? এসপ্রেসোর কাপে চিনি নাড়তে নাড়তে দানিয়েল বলে, ও এক ধরনের জাল। পুরুষের ওই পাতা জালে আটকা পড়ে মেয়েরা। ভাবে, পুরুষ ছাড়া মেয়েদের চলে না। খুব চলে। এই দেখো আমাকে, আমার কি কোনও পুরুষের দরকার!

নীলার চা ঠাণ্ডা হতে থাকে, দানিয়েলের চোখে তাকিয়ে মুখের কথা শোনে।

দানিয়েলের পুরুষ ছাড়া চলছে, কিন্তু জগতের সবাই যদি দানিয়েলের মতো সমকামী হয়, জগৎ চলবে কী করে, নীলার প্রশ্ন। নীলা প্রাণী জগতের উদাহরণ দেয়, যে কোনও প্রাণীই স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি, মিলিত হয়, মিলিত হয় বলেই জন্মপ্রক্রিয়া চলছে, তা না হলে, সব মরে ভূত হয়ে যেত, জগৎটিও প্রাণীহীন হত, এমনকী উদ্ভিদহীন। ফিনিতো।

দানিয়েল বলে, এসব পুরুষের সৃষ্টি করা নিয়ম।

তুমি আমি কি কোনও বাচ্চা জন্ম দিতে পারব? পারব না। নীলা বলে।

কফিতে চুমুক দিতে গিয়েও না দিয়ে দানিয়েল বলে, আর কত বাচ্চার দরকার এ জগতে? যথেষ্ট আছে। আর পুরুষশাসিত বৈষম্যের জগতে আরও বাচ্চা এনে তাদের

বৈষম্যের মধ্যে ফেলার দরকার কী!

একসময় তো আর বৈষম্য থাকবে না। এক হবে সব। সুদূর স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে নীলা বলে।

দানিয়েল বলে, যখন হবে তখন হবে...আর যৌনতার জন্য, নারী যেদিন বলবে তার কোনও প্রয়োজন নেই পুরুষের, সেদিনই হবে পুরুষের পরাজয়। তার আগে নয়।

নীলা ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দেয়। এখানে ক্যাফেতে এক কাপ চা নিয়ে তিন চার ঘণ্টা পার করে লোকে। ক্যাফের বাইরে এদের দেখলে কী বিষম ব্যস্ত মনে হয়, যেন দৌড়োচ্ছে, ব্যস্ত ব্যস্ত বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলে এরা আর ক্যাফেতে এসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয় বসে, ব্যস্ততার নীলা দেখে না কিছু। তার অনেক সময় মনে হয়, এদের চেয়ে কলকাতার লোকেরা অনেক ব্যস্ত, সত্যিকার ব্যস্ত, কিন্তু ব্যস্ততার কথা ওরা অত বলে না। এরা সপ্তাহে দুদিন ছুটি পায়, এই দুদিন দিব্যি ঘুরে বেড়ায়, শুয়ে থাকে, দুঘণ্টা বসে থেকে কাগজ পড়ে বলে শক্ত পরিশ্রম করে এলাম। ছো! শক্ত পরিশ্রমের এরা কিছুই জানে না। দেখত কলকাতার মুটে মজুর, দেখত রিকশাঅলা। কলকাতায় চায়ের দোকানে কেবল চা খাওয়ার জন্য যায় লোকে, খামোকা বসে থাকার জন্য নয়। এখানে ক্যাফেতে বসে অলস সময় কাটানো, বা সস্তা আড্ডাকেও সম্ভবত ব্যস্ততা বলে ধরে এরা।

পরিশ্রমের সংজ্ঞাও আলাদা এখানে। ভোরবেলা থেকে রাত অব্দি মাথায় দুমণ করে একশোটি বালুর বস্তা নিয়ে দু মাইল দূরে যেখানে দালান তোলা হচ্ছে, হেঁটে পৌঁছে দিলে নীলা বলবে বেশ পরিশ্রম করে এসেছে লোকটি। নীলার কাছে পরিশ্রমের সংজ্ঞা হল এই।

দানিয়েল যেদিন প্রথম বলেছিল, আমি শক্ত পরিশ্রম করেছি গত দুসপ্তাহ।

কী পরিশ্রম? নীলা জানতে চেয়েছিল।

গোটা দুই বই পড়ে সারাংশটা লিখেছি।

শক্ত পরিশ্রম কী করলে সেটা বলো।

ওটাই তো শক্ত পরিশ্রম।

ওটা শক্ত পরিশ্রম? নীলা অবাক হয়েছে শুনে।

হ্যাঁ।

বই পড়ার মতো আরামের জিনিস আর আছে নাকি? কী বই?

গল্পের।

বাহ্। এ তো অবসরের মজা।

বলো কী? অবসরে আমি ঠিক ওই বইটিই হয়তো পড়তে চাই না।

হুম, ক পাতা লিখেছ?

দু পাতা।

এমন চাকরি যদি আমি পেতাম। নীলা মনে মনে বলেছে।

দানিয়েল তাকে আকর্ষণ করে আবার করেও না। দানিয়েলের কথায় যুক্তি আছে, আবার নেইও। নীলা দোলে। ভাল লাগায় না লাগায়। দানিয়েল যে যুক্তিই দিক, সুদর্শন পুরুষ থেকে নীলা চোখ ফেরাতে পারে না। তার ইচ্ছে করে পুরুষটি তাকে বলুক ভালবাসি। পুরুষটি তাকে চুমু খাক। তাকে নিয়ে শৃঙ্গারে মাতুক, পুরুষটি তার ভেতর ঘরে চলে যাক অপার

আনন্দে। কিন্তু নীলা চাইলেই ব্যাপারটি ঘটে না। সে লক্ষ করছে, কোনও সুদর্শন পুরুষ তার দিকে ফিরে তাকায় না। কলকাতার রাস্তায় বেরোলে লোকে ফিরে ফিরে দেখত তাকে। এখানে রাস্তার বখাটে ছেলেরাও সিটি বাজায় না নীলাকে দেখে, যেন সে কেউ নয়, যেন সে বিদঘুটে একটি মাংসপিণ্ড, তাকে এড়াতে পারলেই বাঁচে সব। রূপসি বলে তাকে সবাই বলত কলকাতায়, তার রূপের কোনও দাম নেই এদেশে। দানিয়েল দাম দিচ্ছে, দানিয়েলের শরীর রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের মতো সুডোল সুন্দর হোক না কেন, ওর মুখটি লাবণ্যহীন, কণ্ঠটি কর্কশ। নীলা শেষ অব্দি এক কুশ্রী মেয়ের সঙ্গে জীবন জড়াল কি! আসলে এ ঠিক জীবন জড়ানো নয়, দানিয়েলের প্রেমে সে পড়েনি, দানিয়েলকে নিয়ে কোনও স্বপ্ন সে দেখে না, ও কি জানে একথা? নীলার বিশ্বাস, জানে না।

এত গভীরভাবে ভাবছে কী নীলা, দানিয়েল কফি শেষ করে জানতে চায়। কী ভাবছে তা নীলা বলে না, কিন্তু জিজ্ঞেস করে দাানিয়েল তাকে কিছু ফ্রাঁ ধার দিতে পারবে কি না।

কত?

এই ধরো, পাঁচ হাজার।

পাগল হয়েছ। কী করবে ফ্রাঁ দিয়ে?

কলকাতা যাব।

কলকাতা কেন?

মার অসুখ।

ওই সুনীলের বাড়ি গেছিলে তো! ও তোমার মাথায় এসব দিয়েছে। যাও কলকাতা, দেখবে কীভাবে তোমাকে বন্দি করে ওখানে। দানিয়েল ভীষণ বিরক্ত হয়ে বলে।

আমার মার অসুখ, আমি দেখতে যাব। ব্যাস।

তুমি গিয়ে অসুখ সারাবে? এমনই দেশ তোমাদের, ডাক্তার নেই? হাসপাতাল নেই?

সব আছে, কিন্তু আমি দেখতে যাব।

এখন গিয়ে কোনও লাভ আছে? সৎকারের সময় না হয়ে যেয়ো।

সৎকারের প্রশ্ন আসছে না। সেবার প্রশ্ন।

ওখানে নার্স নেই সেবা করার? তুমি তো বলেছ কাজের লোক আছে অনেক।

সব আছে। কারও অভাব নেই। কিন্তু আমি যাব কলকাতা...

তা যাও। আমার কাছে এত টাকা নেই।

অন্য কারও কাছে ধার করে দিতে পারবে?

. কেউ এত টাকা দিতে পারবে না।

নীলা নিঃশব্দের কোলে মাথা রেখে বসে থাকে। চা তার অনেকক্ষণ শেষ হয়েছে।

এখন গিয়ে যদি চলে আসো, তারপর সৎকারের সময় কি আবার যাবে? দানিয়েল তার কর্কশ কণ্ঠ যথাসাধ্য মধুর করে বলে।

সৎকার সৎকার কোরো না দানিয়েল। আমার মার এমন অসুখ হয়নি যে তিনি মারা যাবেন। নীলা দাঁতে দাঁত পিষে বলে, চোয়ালের পেশি তার শক্ত হয়ে থাকে।

তাহলে আর যাওয়া কেন?

যাওয়া, কারণ আমার মা...

দানিয়েল নীলাকে কথা শেষ করতে দেয় না, ভেংচি কেটে বলে, আমার মা, আমার বাবা, আমার ভাই, আমার বোন, যত্তসব।

দানিয়েলের ভেংচিতে ভ্রূক্ষেপ না করে নীলা বলে, আমার মন বলছে মার কেবল সর্দিজ্বর হয়নি। অন্য কিছু।

দানিয়েল নিজের কফির দাম টেবিলে ছুড়ে দিয়ে শব্দ করে চেয়ার সরায়। বাঁ হাতের মধ্যমাটি তুলে ধরে নীলার সামনে। নিজের বাঁ বাহুতে ডান হাতে চাপড় লাগিয়ে, কনুই ভেঙে ঝাঁকুনি দেয়। দানিয়েলের সারা গা থেকে ছিটকে বেরোচ্ছে দগদগে রাগ, সেই রাগ সামান্য দমন না করে সে ক্যাফের দরজা ঠেলে বেরিয়ে যায়, চেঁচাতে চেঁচাতে, লা ফামেলিয়া। লা ফামেলিয়া।

আবিয়াঁ তো

কলকাতা যাবার আগে দুটো জায়গায় যাওয়া হয় নীলার। এক সানদানি, আর দুই ত্রকাদেরোয় মানসিক রোগের ডাক্তারের বাড়ি। সানদানিতে, কারণ রিতা সিকসুস তার তথ্যচিত্রের জন্য সাক্ষাৎকার নেবে। বাসিলিক দ্য সানদানির বাগানে বসে সাক্ষাৎকার নেওয়া হবে। বাগানের ভেতর সার্জ সান্তোসের বাড়ি। সার্জের সঙ্গে রিতার পরিচয়, তার বান্ধবী আন লরের কারণে, আন লরের মা ফ্রান্স বেনজাকিন জন্মেছে মিশরের এক ইহুদি পরিবারে, ফ্রান্সের যখন পাঁচ বছর বয়স, মিশর থেকে সব ইহুদিদের বের করে দেওয়া হয়েছিল, ফ্রান্সের পুরো পরিবার তখন চলে আসে ফ্রান্সে, রিতার প্রতিবেশী ছিল ফ্রান্স, এই সানদানিতেই, সানদানি তখন অনেকটা গ্রাম। সেই সানদানি এখন ঘিঞ্জি শহরতলি, চুরি ডাকাতি ছিনতাই হামেশা ঘটছে, সাদার বসতি খুব কম, বেশির ভাগই কালো আর বাদামি, বেশির ভাগই দরিদ্র, বেশির ভাগই লেখাপড়া না জানা, বেশির ভাগই বেকার।

নীলাকে যখন সানদানির ঝকঝকে বাড়িঘরের দিকে আঙুল তুলে বলা হয়, এসব দরিদ্র লোকের বাড়ি, নীলা ঠিক বোঝেনি দারিদ্র্য বলতে এরা কী বোঝে। বাড়িগুলোর সামনে দাঁড়ানো সার সার গাড়ি দেখে নীলা বলে, এই গাড়িগুলো তবে কাদের? ওদেরই, ওই দরিদ্রদের। নতুন মডেলের দামি গাড়ি নেই বলে ওরা দরিদ্র। নতুন মার্সেডিজ হলে, বি এম ডব্লু হলে, লিমোজিন হলে ওরা দরিদ্র নয়, খুব সহজ অঙ্ক। নীলার চোখ দেখেছে কলকাতার বস্তি, এ চোখে আর কোনও দারিদ্র্য দারিদ্র্য ঠেকে না। নীলার চোখ দেখেছে লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, পেটে খাবার নেই, পরনে কাপড় নেই, অসুখে ধুঁকছে, চিকিৎসা নেই, নীলাকে তোমরা দারিদ্র্য দেখিয়ো না, যে লোকটি রঙিন টেলিভিশনের সামনে বসে ভরপেট খেয়ে এই মাত্র বেরিয়ে এল, গায়ে ফ্যাশনের জামা জুতো, জোরে গান ছেড়ে, মাথা দুলোতে দুলোতে গানের তালে, গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে আর যাই বলো দরিদ্র বোলো না, অন্তত নীলার সামনে।

বোতাম টিপে বিশাল দরজা খুলে দিলে রিতার গাড়ি ঢুকে যায় সার্জের বাগানে। গির্জার ঠিক পেছনেই বাগান। বাগান বলতে ঘাসের মাঠ। মাঠে ছড়িয়ে আছে পুরনো পাথরের কফিন। কফিনের ওপর বসে কফি খাচ্ছে আন লর। মাঠে খেলছে রাফায়েল আর বেনজামিন। আন লরের দুই ছেলে।

রিতা পৌঁছতেই এক দফা চুমোচুমি হল।

দানিয়েল বাসিলিকের পাদদেশের বাড়িখানা দেখে অনেকক্ষণ উ লা লা উ লা লা করে। এত চমৎকার জায়গায় বাড়ি পাওয়া নাকি ভাগ্যের ব্যাপার। ভাগ্য কি আর সাধে, সার্জ এই বাসিলিকের পরিচালক বলেই না!

রিতার সঙ্গে নীলা আর দানিয়েল ছাড়াও আরও দুজন এসেছে, একজনের হাতে ক্যামেরা, আরেকজনের হাতে মাইক্রোফোন। নীলার বুক কাঁপে। ক্যামেরার সামনে সে কোনওদিন দাঁড়ায়নি আগে। রিতা তাকে কী প্রশ্ন করবে তার সে কিছুই জানে না। নীলার হাতের তালু ঘামতে থাকে, নাকে বিন্দু বিন্দু ঘাম।

রিতা বলে, তুমি নাকে একটু পাউডার লাগিয়ে আসবে?

নীলা হাতে নাক মুছে বলে, না, ঠিক আছে। আর আমি পাউডার আনিওনি সঙ্গে।

রিতার মুখ রক্তিম হয় শরমে।

দানিয়েল নীলার কানে কানে চাপা স্বরে বলে, নাকে পাউডার লাগানো মানে নাকে পাউডার লাগানো নয়। এর মানে তয়লেতে যাওয়া। পেচ্ছাপ পায়খানা করা।

তয়লেতে যাব কি না তা জিজ্ঞেস করলেই তো হয়?

না, এ শরমের কথা।

শরমের?

নীলা ঠিক বোঝে না, এ সমাজের শরম ঠিক কোথায় থাকে। এখনও গ্রীষ্মকাল আসেনি, এখনই মেয়েরা রাস্তায় আধন্যাংটো ঘুরে বেড়াতে শুরু করেছে। কাপড় চোপড় ব্যাপারটিই ঝামেলার। শরম ধুয়ে খেয়েছে বলেই না এদের দেখতে এত মৌলিক দেখায়।

ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর আগে ক্যামেরার লোকটি বলল, মুখে একটু পাউডার লাগালে ভাল হয়।

এই পাউডার সত্যিকার পাউডার। তয়লেত নয়। নীলার মুখে আন লর পাউডার মাখাতে নিয়ে যায়। আন লর-এর সাজানো ঘরদোর দেখে নীলা বলে, তোমাদের অনেকদিন বিয়ে হয়েছে?

না তো আমাদের তো বিয়ে হয়নি।

সার্জের কী হও তুমি তা হলে?

প্রেমিকা হই।

একসঙ্গে থাকো?

নিশ্চয়ই। আজ ছ বছর ধরে সংসার করছি।

আর বাচ্চারা?

আমাদের বাচ্চা। আমার আর সার্জের। আন লর মিষ্টি হেসে বলে।

নীলা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে পাউডার ঘসে। আজ রিতার অনুরোধে সে শাড়ি পরেছে। শাড়ি পরা, কপালে লাল টিপ পরা বাঙালি মেয়ে নীলা। মনে মনে কলকাতা ঘুরে আসে নীলা। মনের এই এক বড় গুণ, এটি খুব দ্রুত উড়তে পারে।

দুটো চেয়ার পেতে দেওয়া হয়েছে মাঠে। নীলার সামনে বসে রিতা দেখে নিল ক্যামেরায় ঠিক ঠিক আসছে কি না নীলার মুখ আর পেছনের বাসিলিক, বিখ্যাত গির্জা, ফ্রান্সের সব রাজারা শুয়ে আছেন যে গির্জায়। দেখে নিল নীলার মুখে রোদ পড়ছে কি না, কপালের টিপটিকে দেখাচ্ছে কি না রক্তের মতো লাল। পড়ছে, দেখাচ্ছে।

এবার মুখোমুখি বসে প্রথম প্রশ্ন, আচ্ছা নীলা, তুমি কপালে যেটি খোদাই করে লাগিয়েছ, সেটি তো তুমি যে বিবাহিত তার একটি প্রতীক, তাই না?

না।

রিতা থতমত খায়, কিন্তু একটি বেদনার্ত হাসি ঝুলিয়ে রাখে ঠোঁটে, অপেক্ষা করে নীলার ব্যাখ্যার, কেন না।

এটি বিয়ের কোনও চিহ্ন নয়, সব মেয়েরাই বিয়ের আগে টিপ পরে, দেখতে সুন্দর লাগে বলে পরে।

রিতার প্রশ্ন, এটি কি স্থায়ীভাবে লাগানো হয়নি তোমার কপালে?

নীলা হেসে ওঠে, হেসে সে কাগজের টিপটিকে আঙুলে তুলে নিয়ে দেখায়, দেখো, এটি অস্থায়ী একটি জিনিস। এই পরলাম, এই খুললাম।

কাট।

রিতার পছন্দ হয়নি টিপের ম্যাজিকটি। লাল একটি বিয়ের রং যদি নীলার কপালে খোদাই করা থাকত, সম্ভবত তার সুবিধে হত সাক্ষাৎকারে।

কোলের ওপর প্রশ্নের কাগজে চোখ বুলিয়ে রিতা পরের প্রশ্ন করে, তুমি তো ভারতের মেয়ে, অত দূর দেশ থেকে প্যারিসে এসেছ স্বামীর সঙ্গে সংসার করতে, তাই না?

হ্যাঁ তাই।

শুনেছি তুমি স্বামীর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছ। একটু বিস্তারিত বলবে, কেন?

কারণ স্বামীর সঙ্গে আমার মেলে না।

কেন মেলে না?

মেলে না কারণ দুজন আমরা ভিন্ন ধরনের মানুষ।

তোমার স্বামী তো ভারতীয়, তবে ভিন্ন কেন বলছ?

ভিন্ন কারণ আমাদের মানসিকতা ভিন্ন।

তোমার স্বামী শুনেছি অত্যাচার করত তোমার ওপর। খুলে বলো কী কী করত সে।

অত্যাচার বলতে আসলে যা বোঝায় তা সে কিছুই করেনি।

তোমার স্বামী তো তোমাকে মারত, কী করে মারত, কী ব্যবহার করত মারতে গিয়ে? চাবুক, নাকি লাঠি নাকি কোমরের বেল্ট। নাকি হাত...

আমার স্বামী আমার গায়ে কখনও হাত তোলেনি।

কাট।

রিতা হাত উঠিয়ে ক্যামেরা বন্ধ করতে বলে।

উঠে আসে নীলার সামনে, হাঁটু গেড়ে বসে বলে, তুমি বোধহয় আমার প্রশ্ন বুঝতে পারোনি নীলা।

নীলা নির্ঘাত বেকায়দায় পড়ে। তার অস্বস্তি দেখে, রিতা জল জল বলে চিৎকার করে। আন লর দৌড়ে এক গেলাস ঠাণ্ডা জল নিয়ে আসে। নীলার তেষ্টা পায়নি তবু পান করতে হয় জল, অর্ধেক জল হাতের কাছে রাখতে হয় যদি পান করার তাগাদা দেওয়া হয়।

ক্যামেরা তাক করা নীলার মুখে।

রিতা শুরু করে আবার, তোমাদের ভারতীয় মহলে আর যে মেয়েরা স্বামীর ঘর ছেড়েছে,

তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই তোমার কথা হয়েছে। ওদের অবস্থার কথা কিছু বলো, ওদের ওপর ওদের স্বামী কী কোরে অত্যাচার করে।

নাহ্। এরকম কারও সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। নীলার নিরীহ জবাব।

কাট।

এবার দানিয়েলের কাছে উঠে যায় রিতা। চেয়ার ফেলে কফিনের ওপর বসে দানিয়েলের সঙ্গে লঘুস্বরে কথা বলে। নীলা চেয়ারেই বসা, রোদের দিকে মুখ করা, পাউডার ঘসা মুখ।

ফিরে এসে মুখে হাসি টেনে রিতা বলে, শাড়িতে তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে নীলা। দেখেছি তুমি পশ্চিমি পোশাক পরো বেশি। শাড়িতেই কিন্তু তোমাকে মানায়।

এবার নতুন প্রশ্ন, তোমাদের সংস্কৃতিতে তো সতীদাহ বলে একটা ব্যাপার আছে, তোমার স্বামীর মৃত্যু হলে, তোমাকেও চিতায় উঠতে হবে।

সে পুরনো প্রথা। গত শতাব্দীতে এ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

মেয়েদের ভগাঙ্কুর ছেদ করা তো ভারতীয় সংস্কৃতির একটি অংশ, তা কত শতাংশ মেয়ের ভগাঙ্কুর ছেদ করা হয় ভারতে?

ভগাঙ্কুর ছেদ করা ভারতীয় সংস্কৃতি নয়।

আচ্ছা, তোমার সংসারজীবনের কিছু কথা বলো। তোমাকে তো সংসারের সব কাজ করতে হত, তাই না?

তা করতে হত।

কী কী করতে বলো তো?

রান্না করা, বাসন ধোয়া, ঘর পরিষ্কার করা, কাপড় ধোয়া এসব।

তোমার স্বামী কী কী কাজ করত ঘরের?

তেমন কিছু না।

তোমার স্বামী কখনও রান্না করেছে?

না।

ঘর পরিষ্কার করেছে?

না।

সে কাজ থেকে ঘরে ফিরে কী কী করত?

টেলিভিশন দেখত, মদ খেত...

রিতা মাথা নাড়ে, বলো বলো আর কী কী করত...

আর কী, খেত, ঘুমোত।

সংসারের খরচ দুজনে মেটাতে তাই না?

না, আমার চাকরি ছিল না, আমার স্বামীই সব খরচ দিত।

তুমি চাকরি করো, এ তোমার স্বামী চায়নি তো।

না চায়নি।

তোমার স্বামী তোমাকে ঘরে বন্দি করেছিল তো, তাই না?

ঘর থেকে বাইরে একা বেরোই সেটা চায়নি। তবে বন্দি বলতে যা বোঝায় তা ঠিক না। দরজার চাবি আমার কাছেও থাকত।

তোমার স্বামী তো তোমার যা কিছু সম্পদ, তোমার স্বর্ণালংকার সব রেখে দিয়েছে।

রাখেনি। ও আমি ভুলে ফেলে এসেছি।

তোমার স্বামী তোমাকে পর্দা করার জন্য চাপ দেয়নি, মানে মাথায় কাপড় চড়ানো?

না। ও রক্ষণশীল মুসলমান পরিবারে ঘটে, হিন্দু পরিবারে নয়।

তোমার স্বামী তো তোমাকে মাছ মাংস খেতে দেয়নি। কী খাবে না খাবে তাও তার আদেশে হত!

তা ঠিক, ও নিরামিষাশী। চাইত ঘরে নিরামিষ রান্না হোক।

আর তা না করলে কী করত? মারত?

না মারেনি কখনও।

গাল দিত?

তাও দেয়নি।

তা হলে কী করত?

মন খারাপ করত।

কাট।

সানদানি থেকে বেরিয়ে দানিয়েল বলে, কিষানের জন্য বেশ দরদ তো তোমার!

নীলা জিজ্ঞেস করে, কী বলা উচিত ছিল আমার? কী বললে বোঝা যেত যে আমার দরদ নেই?

বাদ দাও। দানিয়েল হাত ঝাঁকায়।

এই তথ্যচিত্রটা মূলত কীসের ওপর?

মেয়েদের ওপর, মেয়েদের কী করে অত্যাচার করা হচ্ছে, সেসবের ওপর।

নীলার মনে আরও প্রশ্ন, কোন মেয়ে? যে কোনও মেয়ে? ফরাসি মেয়েও?

এটা আগেই তো বলেছি, বিদেশি মেয়েদের নিয়ে।

বিদেশি মেয়ে? জার্মান মেয়ে? সুইস মেয়ে? বেলজ?

ওরা তো ফ্রান্সে থাকতে আসে না। যারা আসে তারা।

রুয়ান্ডার, সোমালিয়ার, মালির, ভারতের, পাকিস্তানের, ইরানের, আফগানিস্তানের মেয়েরা তাই না?

দানিয়েল অনেকক্ষণ উত্তর দেয় না। মেট্রোয় ভিড় উপচে পড়ছে। সেই ভিড়ে গা ধাক্কা খেতে খেতে বলে, তুমি মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে নেওয়ার ঘটনা জানো না? এই ফ্রান্সে কত মেয়েদের ভগাঙ্কুর কেটে নেওয়া হচ্ছে। সংস্কৃতির নামে এই নির্মমতা চলছে, এখানেও। তুমি যেন ব্যাপারটিকে সমর্থন করছ নীলা।

নীলা বলে, গলায় জোর তার, আমি সমর্থন করতে যাব কেন! যা সত্য তাই বলেছি, ভারতে এই সংস্কৃতি নেই।

এটা না থাক, অন্য কিছু আছে তো। সেসব বললে না কেন! এই তো বড় সুযোগ ছিল লোককে জানানো। যারা জানে না, তৃতীয় বিশ্বে মেয়েরা কী হারে বঞ্চিত হচ্ছে, লাঞ্ছিত হচ্ছে, তাদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা হয় না, পুরুষের দাসী হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য মনে

করা হয় যে মেয়েদের জন্ম, সব বললে না কেন? এমনিতে তো অনেক বৈষম্যের উদাহরণ দাও।

নীলা বলে, আমাকে যা জিজ্ঞেস করা হয়েছে, তার উত্তর দিয়েছি।

রিতা তোমার সাক্ষাৎকারে খুব একটা তুষ্ট নয়, সত্যি কথা বলতে গেলে।

নীলা পাঁচশো ফ্রাঁ কবে পাচ্ছে বা আদৌ পাচ্ছে কি না তা জিজ্ঞেস করতে গিয়েও করে না। মুখ বুজে থাকা, নীলা লক্ষ করেছে, অনেক সময় মঙ্গলজনক।

কী ব্যাপার কথা বলছ না যে! দানিয়েলের অতুষ্ট বাদামি চোখ নীলার চোখে।

কী বলব? কোনও প্রশ্ন করোনি তো!

তোমার সাক্ষাৎকারের পাট তো অনেকক্ষণ চুকেছে। এবার ধরায় ফেরো। স্বাভাবিক হও।

নীলা হেসে ওঠে। খামোখাই হাসে সে। দানিয়েল নীলার হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে নীলা ভেবে নেয়, বলবে যে খামোখাই হাসছে। খামোখা হাসে তো পাগল লোকেরা। নীলা বলবে যে সে পাগল।

বাসিলিক সানদানি থেকে কনকর্ড পৌঁছল দুজন। কনকর্ড থেকে এক নম্বর লাইনে এখন যেতে হবে শার্ল দ্য গোল এতোয়াল। কিন্তু এতোয়ালের দিকে মেট্রো চলবে না। এতোয়াল থেকে নেশনের পথে তিন ইস্টিশন গেলেই ত্রকাদেরো। কনকর্ড থেকে মেট্রো চলছে না, এতোয়াল থেকেও চলবে না। দানিয়েল উঠে আসে পাতাল থেকে মাটিতে। দানিয়েলের পেছন পেছন নীলা। বাস ধরা ছাড়া গতি নেই। কনকর্ডের বাসস্টপে দাঁড়ায় দুজন, বাস আসছে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু লোক তুলছে না, তিল ধারণের জায়গা নেই বাসের ভেতর। মেট্রো চলছে না তাই ভিড় বাসে, বাসস্টপের দু একজন বলে। ট্যাক্সি দেখলেই দানিয়েল হাত লম্বা করে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে, ট্যাক্সি যেমন যাচ্ছে, তেমন যেতে থাকে, কারও থামার লক্ষণ নেই। দেখে নীলা বলে, ভারতের মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে দেখছি। একরকম সে স্বস্তি বোধ করে দেখে যে কিছু অনিয়ম ঘটছে, এতদিন সে কোনও রেলগাড়ি বা বাসকে, সময়ের এতটুকু বাইরে যেতে দেখেনি। ঠিক পাঁচটা পঁয়ত্রিশে থামার কথা, পাঁচটা পঁয়ত্রিশে এসেই থামে, পাঁচটা চৌত্রিশেও নয়, পাঁচটা ছত্রিশেও নয়। ট্যাক্সি ডাকলেও তিন মিনিটে আসার কথা, তিন মিনিটেই আসে। হাত তুললে সে যে রাস্তায় হোক, যত রাত হোক, থামে। একটু অনিয়ম না হলে কেমন যেন দমবন্ধ লাগে, নীলা ভাবত। নীলা এই অনিয়ম দেখে মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নেয়।

মুহূর্তে কনকর্ড মেট্রো ইশটিশনটি পুলিশ এসে ঘেরাও করে ফেলে। পুলিশের একজনকে দানিয়েল জিজ্ঞেস করে, ঘটনা কী?

ঘটনা কিছু না। দুটো আত্মহত্যা ঘটেছে।

কী কারণ।

ওই যা ঘটে। কারণ হল বসন্ত।

কারণ হল বসন্ত, নীলা হাঁ হয়ে থাকে। দানিয়েল নীলার হাঁয়ের ভেতর একবোঝা তথ্য গুঁজে দেয়।

বসন্তকাল হল আত্মহত্যার ঋতু। দুটো যুবক চলন্ত গাড়ির তলায় ঝাঁপ দিয়েছে। মরতে চেয়েছে, মরেছে। এরকম প্রতি বসন্তকালেই লোকে রেলের তলে জীবন দেয়। এর কারণ, দানিয়েল আগেই জানিয়েছে যে বসন্তকাল।

বসন্তকালে মানুষের আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হবে কেন, এই কারণটি নীলা জানতে চায়।

বসন্ত এলে পশ্চিমিরা যত দূর জানে সে, আনন্দে মেতে ওঠে। তবে আত্মহত্যা কেন?

দানিয়েল বলে, যারা একা, সঙ্গীহীন, তারা আত্মহত্যা করে এ সময়টায়। বসন্তকালে একাকিত্বের জ্বালা খুব বেশিরকম হয় কিনা। বসন্তই তো জানিয়ে দেয় যে গ্রীষ্ম আসছে, সুখের সময় আসছে, প্রেমের সময় আসছে, মিলনের সময় আসছে। সারা গ্রীষ্মকাল প্রেমিক প্রেমিকা জোড়ায় জোড়ায় ঘুরে বেড়াবে, আনন্দ করবে, আর যারা একা, মাঠে ঘাটে লেকের ধারে, সমুদ্রতীরে এত জোড়া দেখে আরও বেশি একা বোধ করবে, এই ভয়ে এই কষ্টে বসন্তকালেই, গ্রীষ্ম আসার আগেই আত্মহত্যা করে।

নীলা বোঝে না।

বুঝলে না তো! বুঝবে কেন? অন্যের কষ্টের কথা তুমি বুঝবে কেন!

দানিয়েলের ব্যঙ্গোক্তি নীলাকে স্পর্শ করে না। ত্রকাদেরোর দিকে হাঁটতে হাঁটতে সে অন্যমন হয়। ভাবতে থাকে রেলের চাকায় পড়ে খুলি উড়ে যাওয়া, গায়ের মাংস হাড় থেঁতলে ছিটকে পড়া দুটো যুবকের কথা।

আত্মহত্যা করল কেবল সঙ্গী ছিল না বলে, সামনের দুটো মাসে তাদের আনন্দ করা হবে না বলে! নীলার যদি কোনও প্রেমিক না থাকত, নীলা কি আত্মহত্যা করতে পারত? পারত না। প্রেমই তো জীবনের একমাত্র সুখের ঘটনা নয়, আরও কত কী আছে, ঝরাপাতার মর্মর শব্দ শোনা আছে, মেঘের সঙ্গে এলোমেলো ভেসে বেড়ানোর খেলা আছে, দীর্ঘ বিকেল জুড়ে চমৎকার একটি কবিতার বই পড়ে ফেলা আছে, জীবন পূর্ণ করার সহস্র উপায় পড়ে আছে।

মানুষকে বুঝতে শেখো নীলা, মানুষের কষ্টগুলোকে জানতে শেখো।

নীলার জানা হয় না অনেক কিছু। ত্রকাদেরোর ডাক্তারখানায় রোগীর ভিড় দেখে নীলা ঘাবড়ে যায়। এত লোকের মনে কী অসুখ তার জানতে ইচ্ছে করে। নীলা দেখে, খুব মন দিয়ে কেউ পত্রিকা পড়ছে, কেউ পাশের জনের সঙ্গে গলা নামিয়ে কথা বলছে, কেউ ঝিমোচ্ছে। নিকল এসেছিল তার বেড়ালের পেচ্ছাপের অসুখ হয়েছিল বলে সে মনোকষ্টে ছিল, তা সারাতে। দানিয়েল এসেছে, নীলা কলকাতা যাচ্ছে বলে মনে সে আঘাত পেয়েছে সেটি দূর করতে। নীলা অনুমান করে ঝিমোচ্ছে লোকটির নিশ্চয় বউয়ের সঙ্গে দু রাত ঝগড়া হয়েছে বলে এসেছে, পত্রিকা পড়ছে ভদ্রলোকের নিশ্চয় কয়েক রাত ভাল ঘুম হয়নি বলে এসেছে, আর পাশের জনের সঙ্গে কথা বলছে যে সম্ভবত কথা যখন বলে জোরে বলে বলে এসেছে। আর যে ষোলো সতেরো বছর বয়সি মেয়েটি জানালায় তাকিয়ে আছে, মেয়েটি, নীলা অনুমান করে, প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না বলে এসেছে। প্রথম বিশ্বের লোকের মনের সামান্য এদিক ওদিক হলে চলে না। মন থাকা চাই একশো ভাগ সুস্থ। মনের ভেতর কোনও রোগ শোক, কোনও দুঃখ কষ্ট, কোনও জ্বালা যন্ত্রণার চিহ্ন যেন না থাকে। শরীরে বল না থাকতে পারে, মনে যেন বল থাকে। আবেগ পরিমাণ মতো, কম বা

বেশি হলে চলবে না। আর তৃতীয় বিশ্বে লোকের মনে পরিমাণ মতো কিছু নেই। এক কিলো শুয়োরে রসুনের কটি কোয়া চটকে দিলে স্বাদ হয় ভাল, তা নিয়ে প্রথম বিশ্বে গবেষণা চলে, তৃতীয় বিশ্বে চলে না, রসুনের পরিমাণ নিয়ে গবেষণা করার সময় নেই। পেটে ভাত নেই যাদের তাদের আবার রসুন, তাদের আবার মন। মন ধুয়ে জল খাওয়া গেলে, সে জলও খেত তৃতীয় বিশ্ব, খাবার জলের অভাব।

দানিয়েলের হয়ে আসতে ঘণ্টা দুই লাগে। ও ঠিক বেরিয়ে আসে গির্জার স্বীকারোক্তি ঘরের জানালা থেকে পাঁড় ক্যাথলিকের মতো। বেরিয়ে বিষণ্ণ মুখ, নীলার দিকে না এগিয়ে দরজার দিকে। নীলা ভিড় কেটে দানিয়েলকে ফেরায়।

নীলার দু বাহুর বেষ্টন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দানিয়েল বলে, আমাকে একা থাকতে দাও।

তাকে একা থাকতে দেয় না নীলা, কারও মন খারাপ হলে একা থাকতে দিতে সে শেখেনি। তার যদি মনে কষ্ট হত কোনও, মলিনা এসে পিঠে হাত বুলিয়ে দিতেন, চোখের জল মুছিয়ে দিতেন, আদর পেয়ে নীলার কষ্ট চলে যেত ত্রিসীমানার বাইরে। নীলার কখনও কোনও মনের ডাক্তার খুঁজতে হয়নি।

কেন তোমার ডাক্তারের কাছে যেতে হল। আমি যদি কারণ হই, আমার সঙ্গে কথা বলো। মনের যা কথা আছে খুলে বলো। আমাকে বলো, আমাকে তো তুমি ভালবাসো, ভালবাসো না? নীলা দানিয়েলের চিবুক ধরে নিজের দিকে মুখটি ফিরিয়ে বলে।

দানিয়েল চেঁচায়, বলেছি তো তোমাকে, আমাকে একা থাকতে দাও।

তোমার মন খারাপ, একা থাকলে মন আরও খারাপ হবে। ডাক্তারের ঘরে ঢোকার আগে মন তোমার এত খারাপ ছিল না। বলে নীলা দানিয়েলকে জড়িয়ে ধরে আবার দুহাতে। নীলার হাত ছুড়ে নিজেকে মুক্ত করে দানিয়েল ত্রকাদেরোর বেদিতে গিয়ে বসে। পাশে বসে নীলা বড় মমতায় একটি হাত রেখে দানিয়েলের কাঁধে, বলে, এত সুন্দর শহর, এত সাজানো, সবার পেটে খাবার আছে, সবার বাড়ি আছে, সবার পরনে কাপড় আছে, সবার জন্য নিরাপত্তা আছে, তার পরও কেন মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যেতে হয় এত লোকের।

দানিয়েলের চোখে জল উপচে পড়ছে। নীলা আঙুলে তা মুছতে গেলে সে ঝটিতে সরিয়ে নেয় মুখ, মাথা, চোখ, চোখের জল।

তুমি বুঝবে না নীলা, অন্ন বস্ত্র আশ্রয়ই সব নয় জীবনে, তুমি তৃতীয় বিশ্বের চোখ দিয়ে সবাইকে বিচার করতে চাও। মন বলে একটি জিনিস আছে, আর সে মন সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না।

নীলা বলে, মন তৃতীয় বিশ্বেও আছে দানিয়েল, সে মন পাথর দিয়ে গড়া নয়। আমি জানি তুমি কষ্ট পাচ্ছ। আমিও অনেক কষ্ট পাই, আমার তো কোনও ডাক্তারের কাছে যেতে হয় না। কষ্টকে এত ভয় পাওয়ার কী আছে। আমি কোনওদিনই শুনিনি, আমার দেশে লোকেরা মনের অসুখ সারাতে ডাক্তারের কাছে যায়।

অনেকক্ষণ নীলা আর কথা বলে না, দানিয়েল তার চোখের জল প্রাণপণ আড়াল করে।

চলো সাঁস এলিজেতে হাঁটি গিয়ে, তোমার মন ভাল হবে।

না। দানিয়েল কোথাও যাবে না। সে বাড়ি ফিরবে। সে একা থাকতে চায়।
মনখারাপের হাত ধরে টানে নীলা, চলো সিনেমায় যাই।
না।
চলো কোনও ক্যাফেতে বসি।
না।
সেইনের ধারে হাঁটি।
না।
থিয়েটার?
না।
রাতে তোমাকে খাওয়াব লা তুর দারজোঁয়, চলো।
না।
মরো গিয়ে। যত্তসব ঢং।

কলকাতা আছে কলকাতাতেই

প্রত্যেকের জন্য কলকাতার রাস্তা, ফুটপাত, এঁদো গলি নিজের ঘরের মতো, যেখানে সে বসতে পারে, ঘুমোতে পারে, এমনকী পচা আবর্জনার স্তূপ থেকে নিজের খাবার তুলে খেতে পারে।

ক্লদ লেভি স্ত্রস

কলকাতাকে যেমন রেখে গিয়েছিল নীলা, কলকাতা ঠিক তেমনি আছে। তবু তার মনে হয়, কলকাতা দেখতে মলিন হয়েছে আরও, ফুটপাতে নোংরা জমেছে আগের চেয়ে বেশি, ধুলো উড়ছে প্রচণ্ড, গাড়িঘোড়ার জটলা বেশি, আগেও ভেঁপু বাজত, এত তারস্বরে না, বাড়িঘরগুলো আগের চেয়ে রংওঠা, আস্তরখসা, দোকানপাটগুলো ছোট, ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেঁতে, রাস্তাগুলো হঠাৎ সরু হয়ে গেছে, মানুষগুলো আরও কালো, মাঠে ঘাস আগের চেয়ে কম। ঘাসের রং গাছের পাতার রং আগের চেয়ে কালচে। নীলা দমদম থেকে গাড়ি করে বালিগঞ্জে আসতে আসতে নিখিলকে থেকে থেকে বলে, খুব বদলে গেছে কলকাতা।

নিখিল কলকাতার বদলে যাওয়া খোঁজে এদিক ওদিক। আর চালক রামকিরণ ময়লা রুমালে ঘাড়ের ঘাম মুছে বলে, দিদি, আপনি বদলেছেন, কলকাতা যেমন ছিল, তেমনই আছে।

বালিগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে নীলার মনে হয়, বাড়িটিও অনেক ছোট হয়ে গেছে। নীলা বড় হয়ে তার ছোটবেলার বিশাল ইস্কুলবাড়িটি দেখতে গিয়েছিল একদিন, দেখে চিনতে পারেনি, ইস্কুলের যে বিশাল মাঠে নীলা দৌড়ে খেলত, সেই মাঠে দাঁড়িয়েই মাঠ খুঁজেছে, নদীর মতো বড় ইস্কুলের পুকুরটিকেও লেগেছিল ডোবা মতো।

মলিনার কী হয়েছে, কী অসুখ, নীলা কাউকে জিজ্ঞেস করেনি পথে, না নিখিলকে, না রামকিরণকে।

নীলাকে দেখে চিত্রা দৌড়ে খবর দিয়ে আসে মলিনাকে, দিদি এসেছে দিদি।

চিত্রার এমনই নিয়ম, নীলা দেরি করে বাড়ি ফিরলেই এমন খবর নিয়ে দৌড়োত। নীলার হঠাৎ মনে হয়, সে আজ দেরি করে বাড়ি ফিরেছে। পথে যানজট ছিল, তাই দেরি। নন্দনে অপর্ণার নতুন ছবি দেখতে গিয়েছিল, তাই দেরি।

নীলা যা করে ফিরে, মা মা বলে ডাকে।

মলিনাকে শোবার ঘরে না পেলে রান্নাঘরে ঢোকে, রান্নাঘরে না পেলে পুজোর ঘরে, পুজোর ঘরে না পেলে উঠোনের সবজিবাগানে, ওতেও না পেলে নীলা বেশ জানত, মলিনা এখন বাড়ির ছাদে, রোদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছেন।

নীলা মা মা ডেকে আজও শোবার ঘরে ঢোকে। শোবার ঘরে মলিনা। বোঁ বোঁ শব্দে পাখা চলছে, পাখার তলে মলিনা ঘামছেন। মলিনা ঘুমোচ্ছেন।

মা ঘুমোচ্ছ এই অসময়ে? ওঠো। আমি এসেছি।

নীলা এসেছে। মলিনা ওঠো। নীলাকে খেতে দাও। নীলাকে ঠাণ্ডা জল দাও। নীলাকে পাশে বসিয়ে গল্প শোনো, অনেক গল্প জমেছে ওর। গল্প বলতে বলতে ওর যদি গলা বুজে আসে, কোলে ওর মাথাটা নিয়ো, গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে ওকে বোলো, চোখের আড়ালে আর যাসনে মা। ঘুমপাড়ানি গান শোনাও নীলাকে, অনেকদিন পর তোমার পাশে তোমাকে জড়িয়ে ও ঘুমোবে, ওঠো।

নীলা শিয়রের কাছে বসে দেখছে মলিনার এক মাথা ঘন কালো চুল হাওয়ায় উড়ে গেছে, আর আস্ত একটি হাড়ের কঙ্কাল বোঁ বোঁ পাখার নীচে দুলছে। নীলা দোলে, নীলার ইফেল টাওয়ার দোলে।

চা দেব দিদি?

দিদি তার হ্যাঁ বলে না। না বলে না।

চিত্রা ডুকরে কেঁদে ওঠে। নীলা জানতে চায় না, চিত্রা কাঁদছে কেন।

উঠে যায়, উঠে দোতলায় নিজের ঘরে, নিজের বিছানায়।

চিত্রা পেছন পেছন যায়, আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে, দিদি শুচ্ছেন যে, চান টান করুন, কিছু মুখে দিন।

চিত্রা তুই যা তো, আমাকে একটু একা থাকতে দে।

চিত্রা দাঁড়িয়েই থাকে দরজা ধরে। বলতে থাকে, মাসিমার এ যে হঠাৎ কী হল দিদি! এই চলছেন ফিরছেন, হঠাৎ বিছানা নিলেন। এখন তো উঠে দাঁড়াতে পারেন না আর। ঘুমের ওষুধ খেয়ে পড়ে পড়ে ঘুমোন। ঘুমোচ্ছেন বলে রক্ষে, না হলে ব্যথায় সে যে কী চিৎকার করেন। দেখলে আপনার সইবে না দিদি।

এত কথা বলছিস কেন? তোকে তো এত কথা জিজ্ঞেস করিনি। নীলা ধমকে ওঠে।

চিত্রা পা পা করে নীলার আরও কাছে সরে এল।

মাসিমা কেবলই আপনার কথা বলছেন দিদি। এই তো বলে বলে ঘুমোলেন আজ আমার নীলা আসবে রে, কইমাছ ভাজ, সর্ষেইলিশ কর, রুইমাছের ঝোল কর, সন্দেশ নিয়ে আয়।

তুই এ ঘর থেকে যা না, খানিকক্ষণের জন্য যা। নীলা বালিশে মুখ গোঁজে। চিত্রা যেন শব্দ নয়, এক একটি আগুনের পিণ্ড নীলার দিকে ছুড়ছে।

কত লোক আসে মাসিমাকে দেখতে, কেউ তো ভাল করতে পারে না। কতরকম ডাক্তারবাবু আসেন। কতরকম ওষুধ দিয়ে যান। কোনও ওষুধে তো মাসিমা ভাল হচ্ছেন না। দিন দিন বিছানার সঙ্গে মিশে যাচ্ছেন। দুদিন আগেও নরম করে দিলে দুটো ভাত খেতে পারতেন, এখন তো কিছুই মুখে ওঠে না। চিত্রা আবার ফুঁপিয়ে ওঠে।

চিত্রা একাই নীলাকে যন্ত্রণা দিচ্ছিল, এরপর যন্ত্রণা দিতে আসেন মঞ্জুষা, এতদিন পর এলি রে নীলা বলে হু হু করে কেঁদে উঠলেন।

বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদলেন আর বললেন, কেন আগে এলি না রে। তুই বিদেশে এটা খেতে পারছিস না, ওটা খেতে পারছিস না, বাড়ি ফিরে এলে তোর জন্য নিজে হাতে কত কিছু রাঁধবেন, বলেছিলেন। তোকে মুখে তুঁলে খাওয়াবেন। মায়ের হাতের রান্না খাওয়ার ভাগ্য

তোর বুঝি আর হল না...

নীলা এবার বালিশে গোঁজা মুখ তুলে চেঁচায়, কী হয়েছে তোমাদের, ভেউ ভেউ করে সব এত কাঁদছ কেন। একটু দূরে সরো সবাই।

মঞ্জুষা বসেই থাকেন আর বলতে থাকেন, ডাক্তারবাবু আর ওষুধ দিচ্ছেন না, বলেছেন ওষুধ আর কাজ দেবে না। ব্যথার কটি ওষুধ কেবল চলছে। তাতে তো আজকাল ব্যথাও কমছে না। ক্যান্সার নাকি নাড়ি থেকে থেকে লিভারে গেছে, কাল বলে গেলেন হাড়ে ঢুকেছে, আবার বললেন মাথাতেও। কাল সারারাত দিদি কাতরালেন ব্যথায়, বসে বসে তাই দেখতে হল।

নীলা এবার উঠে যায় বিছানা থেকে, দৌড়ে যায় স্নানঘরে।

বাইরে থেকে মঞ্জুষা বলেন চানটা করে খেতে আয় নীলা।

নীলা নীরবতা চাইছে। নীরবতা সম্ভবত বড় দুর্লভ জিনিস এ মুহূর্তে। সে চাইছে না কেউ কোনও নিখুঁত বর্ণনা দিক মলিনার শরীরের বা ইচ্ছের। মলিনার ইচ্ছের কথা নীলা সেই ছোটবেলা থেকেই জানে, মলিনার কোনও ইচ্ছে কখনও পূরণ হয়নি, তিনি চেয়েছিলেন অনির্বাণের সামান্য ভালবাসা পেতে, পাননি। অনির্বাণ মণ্ডল যে ভালবাসেন না কাউকে তা নয়, বাসেন, তবে মলিনাকে নয়, স্বাতী সেনকে। মলিনা একবার কাঞ্জিপুরম শাড়ি দেখে এসে বলেছিলেন, কী সুন্দর শাড়ি গো। একটা পরতে পারলে বেশ হত।

অনির্বাণ কাঞ্জিপুরম শাড়ি কিনে মলিনাকে দেননি, দিয়েছেন স্বাতীকে, স্বাতীকে সেই শাড়ি পরিয়ে সিমলায় নিয়ে গেছেন বেড়াতে। মলিনার সাধ ছিল কোনও একদিন দার্জিলিং যাবেন, অনির্বাণের কোনও দিনই সময় হয়নি মলিনাকে দার্জিলিং নেবার। স্বাতী দেখতে মলিনার চেয়ে ফর্সা ছিল, স্বাতীর ওই একটি গুণের কারণে অনির্বাণ স্বাতীর পিছু ছাড়েননি। বুদ্ধি হবার পর থেকে নীলা কখনও দেখেনি অনির্বাণ আর মলিনা এক ঘরে এক বিছানায় শুয়েছেন। মলিনা যত্ন করে স্বামীর বিছানা গুছিয়ে দিতেন, অনির্বাণ স্বাতীর সঙ্গে রাতের আমোদ আহ্লাদ সেরে বাড়ি ফিরে খেতে বসে কোন নিরামিষে নুন হয়নি, কোন মাংসে তেল বেশি পড়েছে, কোন ভাজা পুড়ে গেছে এসব নিয়ে চেঁচিয়ে গোছানো বিছানায় ঘুমোতেন নাক ডেকে। মলিনার জীবন ওরকমই ছিল। ইচ্ছের গায়ে শেকল পরিয়ে তিনি তাঁর জীবন কাটিয়েছেন এ সংসারে।

বিকেলে বাড়ি ভরে গেল মলিনাকে দেখতে আত্মীয়স্বজনে। বাড়ির মাঠ ভরে গেল ঝকঝকে গাড়িতে। মলিনার দিদি জামাইবাবু, তাদের ছেলে, ছেলের বউ, ছেলের বউয়ের দু বাচ্চা, মলিনার কাকিমা, দুই কাকাতো বোন, কাকাতো বোনের ছেলে পল্টু, অনির্বাণের দাদা, দিদি, পিসতুতো দাদা, তার মেয়ে মিঠু, আর দুজন প্রতিবেশী গৃহবধূ। চৌকাঠের জুতোর ঢিবিতে জুতো রেখে সব ঢুকে যাচ্ছে মলিনার ঘরে, হাতে কারও আপেল আঙুর কমলালেবু, কারও হাতে বেদানা, ডালিম, কেউ নিয়ে এসেছে হরলিকস, কেউ আবার বাটি ভরে শিংমাছের ঝোল এনেছে, কেউ এনেছে ঘরেপাতা খাঁটি দই, কারও হাতে ফুল।

মলিনাকে দেখিয়ে দেখিয়ে জিনিসগুলো সামনে রাখছেন মঞ্জুষা। মঞ্জুষা জানেন যে ফুলের ঘ্রাণ মলিনার নাকে গন্ধিপোকার গন্ধ হয়ে ঢোকে, বেদানা বা কমলার রস মুখে ঢোকালে বমি হয়ে বেরিয়ে যায়। মলিনা শুকনো চোখে আত্মীয়দের খানিকক্ষণ দেখে আবার চোখ বোজেন। যেন সারাজীবন নিরন্তর পরিশ্রম করার পর এখন এত ক্লান্ত যে চোখ মেলার শক্তিও নেই। মলিনাকে দেখে কেউ আহা বলে, কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কেউ আঁচলে চোখ মোছে, হাতপাখায় কেউ বাতাস করে গায়ে, কেউ হাত বুলোতে থাকে মলিনার হাড়সার হাতে।

আর ভিড় থেকে ভেসে আসতে থাকে

এই কদিন আগেও তো হেঁটেছেন! কথা বলেছেন।

আহা শরীরের কী হাল হয়েছে?

পেটটা আজ বেশি ফোলা লাগছে।

চোখের হলুদটা আরও বেড়েছে।

নীলা ভিড় কেটে বেরিয়ে আসে ঘর থেকে। নীলার পেছন পেছন ভিড়ের মানুষগুলোও এক এক করে। মঞ্জুষা নীলাকে তাড়া দেন, শাঁখা সিঁদুর পরে আয় তো। এত লোক এসেছে, কী বলবে বল।

লোকেরা কি আমার শাঁখা সিঁদুর দেখতে এসেছে?

তা দেখতে আসেনি, কিন্তু চোখ তো বাড়িতে রেখে আসেনি কেউ। এ নিয়ে দেখিস, কথা হবে।

হোক।

নীলা শাঁখা সিঁদুর পরা অনেক আগেই ছেড়েছে, ও পরার কোনও ইচ্ছে তার নেই। জানালায় গিয়ে সে দাঁড়ায়, সেই জানালা, তাকালে প্রতিবেশীর বাড়ির পিঠ দেখা যায়, আর পিঠের তলে এক বোঝা আবর্জনা, আবর্জনা খুঁটে খাচ্ছে রাস্তার দুটো নেড়ি কুকুর। নীলার মগ্নতা ভাঙে মলিনার দাদার কণ্ঠস্বরে, হোয়াই ডিডন্ট হি কাম, নীলা?

কে?

কিষানলাল। আমি ভেবেছিলাম, হি হ্যাজ অলরেডি এরাইভড ইন ক্যালকাটা, আড্ডা ফাড্ডা দেব, হি ইজ রিয়েলি এ জেন্টেলম্যান!

তা বটে। কিন্তু সে আসেনি। নীলা একা এসেছে!

আমি প্যারিসে কখনও যাইনি। বাট আমি জানি, প্যারিস ইজ এ ওয়ান্ডারফুল সিটি, আই উড লাভ টু গো দেয়ার। কিষানলালের বাড়িতে থাকা যাবে তো! আই এম সিওর হি হ্যাজ এ বিউটিফুল বিগ হাউজ।

নীলা বলে, কথা বলতে গিয়ে এত ইংরেজি ব্যবহার করছেন কেন? বাঙালি মানুষ, বাংলায় কথা বলুন।

বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে কথা বলা তাঁর চিরকালের স্বভাব। নীলা কখনও আপত্তি করেনি আগে, নিজেও সে মলিনার দাদার সঙ্গে বাংলা ইংরেজি মিলিয়েই কথা বলত।

হো হো শব্দে হেসে ওঠেন মলিনার দাদা, আত্মসম্মানে তাঁর আঘাত লাগেনি, বরং তাঁর সম্মান, নীলা অনুমান করে, তিনি ভাবছেন, যে বেড়েছে। তাঁর জিভে বাংলা শব্দ সহসা আসে না, এ নিয়ে কোনও লজ্জার বদলে গর্ব হচ্ছে তাঁর।

অনির্বাণের দিদি নীলাকে টেনে জানালা থেকে সরান। কী, এত চুপচাপ কেন নীলা! কথা বলো। কথা না বললে কষ্ট হয়ে বেশি। কী করবে বলো, আমাদের কারও কি হাত আছে মলিনাকে সারানোর... সব ভগবানের ইচ্ছে... মলিনার জামাইবাবু একটি সিগারেট ধরিয়ে সোফায় গা এলিয়ে বলেন, তা প্যারিসে জীবনযাপন কেমন চলছে! স্বামী ভাল কামায় তো? আই হার্ড দ্যাট হি আর্নস গুড মানি।

মলিনার কাকাতো বোন নীলার হাত দুটো তুলে ধরে, দেখো দিকিনি, কেমন খালি হাত, গয়নাগাটি খুলে রেখেছ কেন! শাঁখা সিঁদুরও পরোনি। কেমন বিধবার মতো দেখাচ্ছে।

আরেক কাকাতো বোন বলে, বাচ্চা কাচ্চা কবে হবে! যা নেবে, তাড়াতাড়ি নিয়ে নাও।

এবার মলিনার দিদির মেয়ে বলে, কোলের বাচ্চার মুখে দুধের বোতল ঢুকিয়ে দিয়ে দোলাতে দোলাতে, তোমার বাচ্চা তো জন্মেই ফরাসি নাগরিক হবে, তাই না!

মলিনার কাকিমা পল্টুকে ডেকে নীলার সামনে দাঁড় করায়। কী তোর দিদিকে নাকি প্যারিসের কথা জিজ্ঞেস করবি! করেছিস। পনেরো বছর বয়স পল্টুর, দিদিকে আর জিজ্ঞেস করা হয় না কিছু, দিদিমার পেছনে মুখ লুকোয় সে। এই পল্টুটাকে বিদেশে নেওয়া যায় কি না দেখো তো। ছেলেটা মোটে লেখাপড়া করতে চাইছে না দেশে।

অনির্বাণের পিসতুতো দাদা সাধন দাস নীলাকে আড়ালে ডেকে বড় শ্বাস ফেলে বলেন, মিঠুর জন্য কিছু কি করতে পারবে নীলা? একটা বিয়ে টিয়ের বন্দোবস্ত যদি করতে পারো...

নীলা অনুমান করে, আত্মীয়দের বিশ্বাস তার হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা এখন। কেউ জানে না যে সে নিজে সুনীলের কাছ থেকে বিমানভাড়ার টাকা ধার করে কলকাতা এসেছে। কেউ জানে না কারও কোনও সমস্যার সমাধান করা নীলার দ্বারা সম্ভব নয়। কেউ জানে না কার বিয়ে হচ্ছে না, কার লেখাপড়া হচ্ছে না এ দেশে, সে এসব জানতে চায় না। নীলা চায় বাড়ি থেকে অতিথিরা সব বিদেয় হোক, মলিনার পাশে বসার অবসর জুটুক তার, মলিনার বোজা চোখের দিকে তাকিয়ে থাকার যতক্ষণ না তিনি চোখ খোলেন, খুললে নীলা দেখাবে মার জন্য একজোড়া জুতো এনেছে সে প্যারিস থেকে, একটি ঘড়ি এনেছে হাতে পরার, আর একটি ক্রিম মুখে মাখার, বয়সের রেখা মুছে দেওয়ার ক্রিম।

চিত্রা আর মঞ্জুষা ব্যস্ত অতিথি আপ্যায়নে। চা বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে ঘরে ঘরে।

নীলা দুর্লভ নীরবতা খোঁজে।

মিঠু একটি সাদা সুতি শাড়ি গায়ে, ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়েছিল, পায়ে পায়ে এগিয়ে আসে নীলার দিকে, ইতিউতি তাকিয়ে গলা চেপে বলে, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলব।

বলো।

এখানে না। চলো না তোমার ঘরে যাই।

নীলা দোতলায় নিজের ঘরে মিঠুকে নিয়ে ঢুকল। মিঠু ঘরের দরজা ভেজিয়ে বিছানায় বসল। বসে নীলার দুহাত চেপে ধরে বলল, আমার জন্য কিছু করো নীলা।

কী করব।

একটা ছেলে, যে কোনও একটা ছেলে খুঁজে দাও। তোমার চেয়ে চার বছরের বড় আমি জানো তো। বাবা কেরানি ছিলেন, সে ভাল চাকরিটা গেছে। এখন সে আপিসেই

দারোয়ানের কাজ করেন। দাদা বেকার বসে আছে। বিয়ের জন্য যেই আসে, আমার রং তাদের পছন্দ হয় না। আমি কালো বলে, কেউ বিয়ে করতে চায় না আমাকে। বাবার এমন পয়সাও নেই যে ছেলে কিনতে পারে। বিয়ে না হওয়া এ সমাজে কী ভয়ংকর অপরাধ নীলা, তোমার বিয়ে হয়েছে, তুমি বুঝবে না। সেই কবে বি এ পাশ করে বসে আছি। বাপমায়ের সংসারে আমি একটা বোঝা ছাড়া কিছু নই। আমি অকল্যাণ। আমার ছায়া দেখাও পাপ। বিদেশের কোনও ছেলে, আমি ধর্ম টর্ম দেখব না, যে ধর্মেরই হোক, কানা হোক, খোঁড়া হোক, যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়...। এ দেশে তো আমাকে বিয়ে করার কেউ নেই, পণ দেবার ক্ষমতা আমার বাবার নেই। কী করে হবে বিয়ে, বলো!

মিঠুর ডাগর চোখে জল। মিঠুর দীঘল ঘন চুল পিঠে ছড়িয়ে আছে। মিঠুর পানপাতার মতো মুখে নীল আতঙ্ক। মিঠুর মেদহীন দীর্ঘ কালো শরীরের লাবণ্য নীলা দুচোখ ভরে দেখে।

দাদাকে বলি দাদা তুমি বিয়ে করছ না কেন? দাদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, তোর বিয়ে না দিয়ে কী করে করি। দাদারও তো বয়স কম হল না। আমার বিয়ে হচ্ছে না বলে নিজে বিয়ে করতে পারছে না। আমার ভয় হয় নীলা। বিয়ে হয় না বলে সমাজে মুখ দেখানো যাচ্ছে না আর।

মিঠুর হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে নীলা বলে, বি এ পাশ করেছ। কোথাও চাকরি বাকরি করো। বিয়ে না হলে কী হয়? মানুষ মরে যায়?

বিয়ে কি আমি আমার জন্য চাইছি নীলা! বাবা মার মুখের দিকে তাকাতে পারি না। অন্ধকার। আমার গায়ের রং দেখি সবার মুখে। এ যে কত বড় অপরাধ আমার, আমি কালো। দূর দূর করে আমাকে তাড়ায় সবাই। নীলা, যদি কেউ বিয়ে কোরে আমাকে দাসীবাঁদির মতো রাখে রাখুক, তবু বিয়েটা করুক। যদি পাও, বুড়ো হোক, পাগল হোক...

নীলা কোনও আশাও দেয় না মিঠুকে। মিঠু তার মুখের নীল আতঙ্ক মুখে নিয়ে ফিরে যায়।

অনির্বাণ সন্ধের পর বাড়ি ফিরে নীলাকে ডাকেন। যেমন ছিলেন তিনি, তেমনই আছেন। ঘরে ফিরে আগের মতো তিনি জামা জুতো খুলে, হাত মুখ ধুয়ে, পাজামা ফতুয়া পরে বসেন সোফায়। দিনের পত্রিকায় চোখ বুলোন। নীলা যখন সামনে মুখোমুখি বসল, অনির্বাণের চোখ দিনের পত্রিকায়।

কিষানের সঙ্গে হয়েছেটা কী তোর?

কিছু হয়নি তো।

অনির্বাণ চশমা খুলে ফতুয়ার কোনায় চশমার কাচ মুছে আবার পরে নিয়ে বলেন, জীবন যে খুব অল্পদিনের, দেখছ না? তোমার মার অবস্থা তো দেখছ! জীবনের মূল্য যদি না বোঝো, যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াও, ভবিষ্যতের বারোটা বাজিয়ে যদি বসে থাকো, হঠাৎ একদিন দেখবে জীবন ফুরিয়ে গেছে। কিছুর আর সময় নেই। পালটাবার বা নতুন করে গড়ার।

মানুষটি সারা জীবন ভবিষ্যতের কথাই বলেছেন নীলা আর নিখিলকে, ঠিক এভাবে।

নীলা মনে করতে চেষ্টা করে, অনির্বাণকে কখনও সে কাঁদতে দেখেছে কি না।

অনির্বাণ মন্দ্রগম্ভীর স্বরে বলেন, কিষানের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে সেদিন। ও বলল, তুমি যদি ভদ্র হয়ে থাকো, আর দশটা মেয়ের মতো স্বামীর ঘর করতে চাও, স্বামীর কথা মতো চলতে চাও, তবে সে তোমাকে ক্ষমা করবে, ঘরে নেবে। না হলে কাগজে কলমে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে তার কোনও আপত্তি নেই। এই সোজাসাপটা ভালমানুষটাকে খেপিয়ে দিয়েছ নীলা। দুশ্চিন্তায় আমি ঘুমোতে পারি না।

নীলা অনির্বাণের ঠোঁটের দিকে উদাস তাকিয়ে ঠোঁটের নড়াচড়া দেখতে দেখতে বলে, বাবা, তুমি কখনও কেঁদেছ?

হঠাৎ কাঁদার কথা উঠছে কেন?

উঠছে কারণ আমি ওঠাচ্ছি। আমার খুব জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কখনও, তোমার জীবনে, তুমি কেঁদেছ কি না। মনে করে দেখো তো, কারও জন্য কেঁদেছ কি? কারও জন্য না হলেও নিজের জন্য কেঁদেছ কি না। চোখে কখনও হঠাৎ অনুভব করেছ যে জল? ওই চোখদুটো, চশমার আড়ালে, চশমা, মাত্র যার কাচ মুছে নিয়ে পরলে, সেই চশমার আড়ালে যে চোখ, সে চোখের কথা বলছি। ওই চোখদুটো থেকে এক ফোঁটা জল কখনও ঝরেছে? বুকের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে কোনও, দেখলে তোমার গাল ভিজে গেছে কীসে যেন, চোখে হাত দিলে, দেখলে হাত ভিজে গেল, চোখ থেকে জল গড়ালে তো এমনই হয় তাই না? হাত ভিজে যায় মুছতে গেলে। এমন হয়েছে তোমার কখনও? অথবা বালিশ, শুয়ে কাঁদলে বালিশ ভিজে যায়। এরকম হয়েছে কখনও?

পাগল হয়ে গেছিস নাকি? অনির্বাণ ধমক লাগান।

নীলার অদ্ভুত শান্ত কণ্ঠ, হ্যাঁ হয়েছি।

অনির্বাণ আবার চশমা খুলে হাতে নেন। এবার আর চশমার কাচ মোছার জন্য নয়। নীলার দিকে তীক্ষ্ণতা ছুড়ে দিতে।

অনির্বাণের দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা পরোয়া না করে নীলা বলে অনুতাপ বলে একটি শব্দ আছে কখনও শুনেছ? কখনও অনুতাপ করেছ? কখনও করোনি। করার দরকার হয়নি। মাকে বিয়ে করেছিলে, তোমার টাকার দরকার ছিল বলে। মিটেছে। পণের টাকা নিয়ে নিজে ডাক্তারি পড়েছ, ডাক্তার হয়েছ, মিটেছে। মা এ সংসারে দাসীর মতো ছিল, ছিল না কি? ছিল। তাতে লোকে কেউ কিছু বলেনি, কারণ মেয়েরা স্বামীর সংসারে দাসীর মতোই থাকে। প্রভু হবার আনন্দও ভোগ করেছ। ওদিকে আবার স্বাতী সেনকে রেখেছ তোমাকে অন্য রকম আনন্দ দিতে। লোকে এতেও মন্দ কিছু বলেনি, কারণ পুরুষদের ওরকম দু একজন কিছু মেয়েমানুষ বাইরে থাকেই, থাকাটা তেমন খারাপ কিছু নয়। লোকে তোমাকে মন্দ বলেনি, বরং দেবতা ঠাউরেছে, কালো পেঁচি বউকে কখনও তাড়িয়ে দাওনি বলে। এদিকে নিষ্ফলা নপুংসক যে নও, তারও প্রমাণ রেখেছ, দুটো ছেলেমেয়ে হইয়ে। দুটো ছেলেমেয়ে লেখাপড়া করে বড় ডিগ্রি নিয়েছে, এও সাতজনকে শোনানোর বিষয়, এতেও জিতেছ। এক কানাকড়ি মেয়ের বিয়েতে পণ লাগেনি, বেঁচেছ। লোকের কাছে আরও বলার সুযোগ হয়েছে মেয়ে তোমার বিদেশে থাকে। বিদেশে কেমন আছে কেমন থাকে তা তো আর লোকে জানতে চায় না, বিদেশে থাকা মানেই ভাল থাকা। মায়ের মতো মেয়েও যেন স্বামীর দাসী

হয়ে জীবন পার করে, তা হলেই ষোলো কলা পূর্ণ হয়। তা না হলে মেয়ে আবার ডিভোর্সি হয়ে বাপের বাড়ি উঠলে তো ঝামেলার শেষ নেই। ছেলে এখন বড় চাকরি করে, রাজনীতিও করে, একদিন, কে জানে হয়তো মন্ত্রী ফন্ত্রীও হয়ে বসবে। বাহ! কানায় কানায় পূর্ণ জীবন, সার্থক জীবন। অনুতাপ আর যাকে করা মানায়, তোমাকে না। তাই না বাবা?

অনির্বাণকে আর কোনও কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নীলা চলে যায় অন্য ঘরে, মলিনার ঘরে। মলিনা চোখ বুজে আছেন, নীলা কাছে বসে মলিনার হাতটিতে আঙুল বুলোতে নিয়েছে যেই, সূর্যমুখীর কুঁড়ির ফুল হয়ে ফোটার মতো মলিনার বোজা চোখ খোলে।

মা কিছু বলবে?

তোমার বাবাকে কিছু বোলো না। বিপদে আপদে তোমার বাবাই তো ভরসা। মলিনার ক্লান্ত ভাঙা স্বর।

মা, তোমাকে আমি প্যাবিস নিয়ে যাব। চিকিৎসা করাব। তুমি ভাল হয়ে উঠবে। তোমাকে বলেছি না প্যারিসে কত কী আছে দেখার। সব তোমাকে দেখাব, সব।

মলিনার চোখদুটো হঠাৎ উজ্জ্বল হয়, আমি ভাল হয়ে যাব?

নিশ্চয়ই তুমি ভাল হয়ে যাবে। ওখানে কত ভাল ভাল ডাক্তার। তারপর সমুদ্রের ধারে একটা চমৎকার বাড়ি বানাব। পাহাড়ও থাকবে পেছনে। তুমি তো সমুদ্র খুব ভালবাসো, তাই না?

মলিনা শিশুর মতো মাথা নাড়েন।

এ দেশেও কত কিছু দেখার আছে। আমি তোমাকে দার্জিলিং নিয়ে যাব, সিমলা নিয়ে যাব, কাশ্মীর নেব।

মলিনা বলেন, সেই ক্লান্ত অস্ফুট স্বর, না কাশ্মীর না।

ঠিক আছে কাশ্মীর না, কাশ্মীরে গণ্ডগোল। জয়পুর যাবে না মা? গোয়াতেও তো যাবে। গোয়ার সমুদ্রে সাঁতার কাটব আমরা...

মলিনার ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে যায়। চোখদুটো বোজেন, ধীরে, তারপর জোরে। এত জোরে যে নাক চোখ মুখ সব কুঁচকে দলামোচা করা কাগজের মতো দেখতে লাগে।

নীলা মলিনাকে জড়িয়ে রাখে।

হঠাৎ মঞ্জুষা বলে চিৎকার করেন মলিনা।

মঞ্জুষামাসি নেই মা। চলে গেছেন। বলো কী লাগবে।

চিত্রা দৌড়ে আসে চিৎকার শুনে।

দিদি, মাসিমাকে ওই লাল ওষুধটা খাইয়ে দিন। চিত্রা বলে।

ব্যথার ওষুধ। দুটোর জায়গায় তিনটে বড়ি জলে গুলে খাইয়ে দেয় নীলা।

ব্যথা কমার নাম গন্ধ নেই।

নীলা নিখিলকে ডেকে তোলে, দাদা বেশ তো ঘুমোচ্ছ! মা যে ব্যথায় চিৎকার করছেন। উঠে এসো। কোন ডাক্তার দেখছে মাকে, তাকে শিগরি ডাকো!

অনির্বাণ নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিলেন, ডেকে তোলে তাঁকেও নীলা, ডাক্তার ডাকতে বলে। অনির্বাণ ধমকে ওঠেন, এত রাতে আবার কীসের ডাক্তার!

ঘুমন্ত বাড়ির ভেতর গোঙানোর শব্দ কেবল। মলিনা সারারাত গোঙান, চিৎকারের শক্তি চলে গেছে। নীলা অসহায় বসে থাকে পাশে। মনের সমস্ত শক্তি দিয়ে সে মলিনার কষ্টগুলো নিজের শরীরে নিতে চায়, চায় মলিনার সব দুঃখগুলো আলতো করে তুলে নিয়ে নিজের হৃদয়ে ধারণ করতে।

হা ফামেলিয়া

সকালে বেরোবার আগে অনির্বাণ একবার উঁকি দেন মলিনার ঘরে। নিখিলও। প্রাতরাশ সেরে, উঁকিপর্ব সেরে ঝাড়া হাত পা, সারাদিনের জন্য হাওয়া হয়ে যেতে কারও কোনও অনুশোচনা হয় না।

নীলা পথ আগলে বলে, মার এমন অসুখ রেখে সকাল হতেই গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছ যে সব।

চাকরি আছে না!

চাকরি? সারাজীবন তো চাকরিই করবে। মোটা বেতনের চাকরি। ছুটি নাও।

কী করব ছুটি নিয়ে। মাকে কি সারাতে পারব?

সারাতে না পারলে। পাশে থাকো। তোমাকে দেখবেন মা।

দেখবেন কী, ঘুমিয়েই তো কাটাচ্ছেন।

সময় নষ্ট কোরো না। তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে। অনির্বাণ নিখিলকে তাড়া দেন।

এই বাস্তবজ্ঞানবিবর্জিত মেয়ের কথায় কান দিয়ো না নিখিল, বেরোও। একজনের জীবন থেমে আছে বলে সংসারের বাকি মানুষদের জীবন থেমে থাকবে নাকি! ভারী গলায় বলেন অনির্বাণ।

যাও। যত পারো টাকা কামাই করো গিয়ে। তোমাদের সম্ভবত থাকারও দরকার নেই। কেবল ডাক্তার পাঠিয়ে দিয়ো। না পারো, ডাক্তারের নাম ঠিকানা দিয়ে যাও। আমিই আনার ব্যবস্থা করব। নীলা বলে, ক্লান্ত কণ্ঠ।

সকালে সূর্যমুখী ফোটে।

আজ বিকেলে গঙ্গার ধারে যাবে বেড়াতে?

মলিনার মুখে শিশুর হাসি। তিনি যাবেন। বহুকাল তাঁর বাড়ির বাইরে বেরোনো হয়নি। বাড়ির বাইরে কোথাও যে একটি জগৎ আছে, বহুকাল দেখা হয়নি তাঁর।

পই পই করে নীলা কী খাচ্ছে না খাচ্ছে সে খোঁজ নেন মলিনা। স্বর ফুটতে চায় না, তবু ফোটান, চোখ বুজে আসতে চায়, তবু তিনি খুলে রাখেন। মনের জোরে রাখেন। নীলা বলে সে খুব ভাল খাচ্ছে, চিত্রা রাঁধছে খুব ভাল, কইমাছ ভাজা, পুঁইশাক, চিতলমাছের ঝোল...

ঝোলে ধনেপাতা দিয়েছে তো।

দিয়েছে মা।

নিজে তিনি কিছুই খেতে পারেন না, সারাদিনে এক কাপ দুধ যদিও মুখে নেন, তাও বমি হয়ে যায়। নীলা মলিনাকে দেখে আর ভাবে, স্বামী সন্তানদের খাইয়ে নিজে এঁটোকাঁটা খেতেন, বাসি খাবার খেতেন। সংসারে মায়েরা যা করে, মলিনা তাই করেছেন। ওই করে অসুখ বেঁধেছে। নিজের দিকে কখনও তাকাননি, নিজের সামান্য সুস্থতার দিকে, সুখের

দিকে। নীলাও কোনওদিন ফিরে দেখেনি মলিনা কী খাচ্ছেন না খাচ্ছেন, মলিনার অসুখ করছে কি না। বাড়ির আর সবাই যেমন দেখেনি। এখন নীলার চেতন ফিরেছে, এখন সে মরিয়া হয়ে মলিনাকে ভাল খাওয়াতে চাচ্ছে, নিজের হাতে মুখে তুলে। মলিনাকে সে সুস্থ করে তুলতে চাইছে। কিন্তু মলিনার পক্ষে কারও কোনও স্নেহ মমতা, কারও শ্রদ্ধা সেবা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বড় দেরি হয়ে গেছে নীলার। নীলা প্রাণপণ চায় সময়কে পিছিয়ে দিতে, পারে না। প্রাণপণ চায় নিজের ভুলগুলি শুধরে নিতে, পারে না। সময়ের সময় নেই দাঁড়াবার, এ যখন যায়, যায়। মানুষের ভুলগুলি, অন্যায়গুলি সঙ্গে নিয়েই যায়।

ডাক্তার প্রশান্ত এলেন দুপুরের পর। অনেকদিনের চর্চায় হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দন করতে, ডাক্তারের অপ্রস্তুত মুখ দেখে হাতের আঙুল গুটিয়ে নিয়ে, যেন হাতটি আসলে করমর্দনের জন্য সে বাড়ায়নি, কোন ঘরে যেতে হবে ডাক্তারকে তা দেখাতেই কেবল হাতটি প্রসারিত করা, এর বেশি কিছু নয়, নীলা হাঁপ ছাড়ে, ভাগ্য ভাল যে ডাক্তারের গালে চুমু খাবার জন্য সে ঠোঁট বাড়িয়ে দেয়নি। তাহলে শহরে নীলার নাম ছড়িয়ে যেতে মোটে দেরি হত না যে নীলা কেবল নষ্ট হয়ে যায়নি, তার মাথায় কোনও গোলমালও দেখা দিয়েছে।

ডাক্তার মলিনার রক্তচাপ মাপলেন, নাড়ি দেখলেন, বললেন যে ওষুধ তিনি লিখে দিয়েছেন, তাতেই চলবে।

তাই চলছে না ডাক্তারবাবু। কড়া ওষুধ দিন ব্যথার। মরফিন ইঞ্জেকশন দিন।

পাকাচুলো ডাক্তার, নাকের ওপর ঘোলা চশমাটি বছর তিরিশের পুরনো বলে নীলার মনে হয়, দুপাশে মাথা নেড়ে বলেন, মরফিন এখনই না। আরও পরে।

কত পরে?

কত পরে, তা ডাক্তার বলেন না। কেবল বলেন, পরে।

মরফিন পরে দেবার কারণটি শেষ অব্দি ডাক্তার ব্যাখ্যা করেন। তাঁর ধারণা, মরফিন জিনিসটি সুবিধের নয়, এটি নিলে নেশা হয়।

নীলার বিস্ময় চোখে ধরে না। গায়ে পায়ে নামে। লোমকূপে। সারা গা তার কাঁপে ক্রোধে। যে মানুষটি যে কোনও মুহূর্তে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবেন, তাঁর জন্য করা হচ্ছে মরফিনের নেশা হওয়ার আশঙ্কা!

নীলা বলে, হোক, মরফিনের নেশা হোক আমার মার। মার কখনও কোনও নেশা ছিল না। বাড়ির আর সবার নানা রকম নেশা আছে। আমি খুব করে চাইছি আমার মা যেন মরফিনের নেশা করেন। লিখে দিন মরফিন।

ডাক্তারিতে নীতি বলে আমাদের একটা ব্যাপার আছে তো! আমরা এর বাইরে যেতে পারি না। ডাক্তার তাঁর ঘোলা চশমাটি নাক থেকে চোখের দিকে ঠেলে বললেন।

রাখুন আপনার নীতি। মরফিন লিখে দিয়ে যান। আমি মাকে ইনজেকশন দেব। নীলা তার ত্রিগুণ বয়সী ডাক্তারকে ধমক দিয়েই বলে।

এরকম নিয়ম নয় নীলা জানে। গুরুজনদের সম্মান করার শিক্ষা জন্মের পর পরই সবাই পায় এ দেশে। নীলাও পেয়েছে, গুরুজন যাহা আদেশ করিবে, তাহাই পালন করিবে।

গুরুজনের চোখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিবে না। তাহাদের সঙ্গে নিচু কণ্ঠে কথা বলিবে, উচ্চকণ্ঠে না। গুরুজন মিথ্যা বলিলেও সে মিথ্যা মানিয়া লইবে। গুরুজন মন্দ কাজ করিলেও বলিবে, ইহা মন্দ নয়, ইহা ভাল। গুরুজন ভুল করিলে কখনও তাহা শুধরাইতে যাইও না, ভুলকেই ঠিক বলিয়া মানিয়ো। গুরু যদি গোরুর মতো ব্যবহার করে, তবে চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিয়ো। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নীতির জলে ডুবে ডাক্তার খাবি খাচ্ছেন। মরফিনের পরামর্শ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

পশ্চিমে যে ব্যাপারটি চলছে ইদানীং, ইউদেনেশিয়া, নীলার হঠাৎ মনে হয়, মন্দ নয়। আগে সে ইউদেনেশিয়াকে চরমতম নিষ্ঠুরতাই মনে করত। আজ, তার মনে হতে থাকে, বেঁচে থাকার অধিকার যেমন মানুষের আছে, মরে যাবার অধিকারও তার থাকা উচিত। এটিও মানবাধিকার। কী লাভ বেঁচে থেকে যখন যন্ত্রণা পোহানো ছাড়া সামনে আর কিছুই থাকে না!

যাবার সময় ডাক্তার বলে যান, এত উত্তেজিত হওয়ার কী আছে! অসুখ তো হঠাৎ করে হয়নি। দীর্ঘদিনের পোষা অসুখ। একটা ফুসকুড়ি মতো ছিল অন্ত্রে, ও থেকে রক্ত যাচ্ছিল, ওটি কেটে ফেলে দিলেই হত। না ফেলার কারণেই তো ক্যান্সারে দাঁড়িয়েছে। রোগীর পরিবার নিয়ে এই এক ঝামেলা পোহাতে হয় আমাদের। সময়মতো চিকিৎসা করাবে না, সময় চলে গেলে, মাথা গরম করবে।

বিকেলে নিখিল বাড়ি ফিরে গাড়ি পাঠিয়ে দেয় অনির্বাণকে হাসপাতাল থেকে তুলে আনতে। অনির্বাণ ফিরলে নীলা বলে, রামকিরণকে অপেক্ষা করতে বলো, আমি বেরোব।

কোথায় বেরোবে?

নীলা উত্তর দেয় না। নিখিলকে বলে মলিনাকে পাঁজাকোলা করে নিয়ে গাড়িতে তুলতে।

নিখিলকে ধমকে থামায় অনির্বাণ। ওঁরও মতো পাগল হয়েছিস তুই!

নিখিলও মত দেয়, এ পাগলের মতো কথাই বটে। যে মানুষ হাঁটতে পারে না, দাঁড়াতে পারে না, উঠে বসার শক্তি নেই যার, হাত পা প্রায় অবশ, সেই মানুষকে নিয়ে গঙ্গার ধারে যাওয়া!

মরার আগেই মেরে ফেলার ফন্দি এঁটেছে নাকি!

হতবাক দাঁড়িয়ে থাকা নীলাকে টেনে বারান্দায় নেয় নিখিল, বলে, তোর হয়েছে কী বল তো! এমন পাগলামো করছিস কেন! মার শরীর তো দেখছিস! এ সময় টানাটানির কোনও মানে হয় না!

নীলা নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে।

কী যে হল মার হঠাৎ! নিখিল দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

দীর্ঘশ্বাসটি, নীলার বিশ্বাস, কৃত্রিম।

মলিনা ব্যথায় চিৎকার করছেন। বারান্দা থেকে সেই কাতর চিৎকারধ্বনি শুনছে সে। তার ইচ্ছে করে না সেই ভয়ংকর কষ্টের সামনে যেতে, দেখতে দুঃসহ যন্ত্রণায় কোঁকড়ানো

মুখ। বারান্দার গ্রিল শক্ত মুঠোয় ধরে রাখে সে, কোথাও সে যাবে না, এখানে দাঁড়িয়েই সে জীবনের যত দুর্ভোগ দুর্যোগ দেখা থেকে নিজেকে রক্ষা করবে। কিন্তু যায়, পেছন ফিরে যখন দেখে টেলিভিশনে ধুন্দুমার নাচ হচ্ছে, আর সোফায় পাজামা আর ফতুয়া পরে অনির্বাণ বসে আছেন, হাতে দিনের পত্রিকা, চোখ বুক কাঁপানো কোমর দুলোনো তরুণীদের নাচে, সেদিকে।

টেলিভিশনটি বন্ধ করে, অনির্বাণের নাক বরাবর বসে বলে, কাল যে বলেছিলাম, অনুতাপের কথা। অনুতাপ হয় তোমার কোনও কারণে?

কী কারণে হবে? অনির্বাণ চশমা খোলেন। আবার সেই তীক্ষ্ণ চোখ।

হবে এই কারণে যে তুমি মার চিকিৎসা করোনি। দশ বছর ধরে মার রক্ত যাচ্ছিল, অর্শরোগের কারণে রক্ত যাচ্ছে বলেছ। বলোনি? এখন তো জানো, ওই রক্ত যাওয়া কোনও অর্শরোগের কারণে ছিল না। মার যে পেটে ব্যথা হত, বলোনি, ও কিছু না! মা খামোকা আহ্লাদ করছেন! ব্যথার কথা বলে মা নাকি আসলে শুয়ে আরাম করতে চান। বলোনি? বলেছ। মা তোমার মনোযোগ পেতে মিথ্যে বলছেন, বলোনি? বলেছ। এখন তো সব বুঝেছ। অনুতাপ হয় না? একবারও অনুতাপ করো না, যখন একা বসে থাকো, একবারও মনে হয় না যে এ রোগ হত না যদি তুমি মার চিকিৎসা করতে আগে থেকে। আগে যদি অবহেলা না করতে। তুমি তো গ্যাস্ট্রোএনটারোলজির প্রফেসর ছিলে, ছিলে কী এখনও আছো, অনুতাপ হয় না? অনুতাপ হয় না একবারও যে তুমি ডাক্তার বলে মা তোমার ওপর ভরসা করে ছিলেন, আর তুমি ফিরেও তাকাওনি, বিনা চিকিৎসায় মাকে মরতে হচ্ছে। হয় তো অনুতাপ, হয় না?

চিকিৎসা তো চলেছেই, এখনও চলছে। কেমোথেরাপি কি কম দেওয়া হল! অনির্বাণ গলা চড়ান।

বাজে কথা বোলো না। কেমোথেরাপি কোনও চিকিৎসা নয়। ক্যান্সার ঘটিয়েছ, আর এখন কেমোথেরাপি দিয়ে লোক ভোলাচ্ছ যে চিকিৎসা করছ! চিকিৎসা যখন করার দরকার ছিল, তখন করোনি। এ তো তুমি ভাল জানো, জানো না? অনুতাপ হয় না? নীলার কণ্ঠে ক্রোধ, চোখে ঘৃণা।

আজও আমি অনকোলজিস্ট পাঠিয়েছি।

সে তো লোক দেখানো। লোককে দেখাচ্ছ যে বড় ডাক্তার এনেছ।

অনির্বাণ নিখিলের দিকে চেয়ে সমর্থন খোঁজেন, কী বলছে এই মেয়ে, শহরের সবচেয়ে নামকরা অনকোলজিস্ট...

ফাক ইয়োর অনকোলজিস্ট।

হোয়াট?

ফাক ইয়োরসেল্ফ।

এটুকুর পর নীলা কাঁদে। বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁদে।

কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়ে নীলা, সোফায়। ঘুম ভাঙে মলিনার চিৎকারে আর অনির্বাণের নাক ডাকায়। বাড়ির একটি ঘরে অসহনীয় যন্ত্রণায় কাঁদছেন একজন, আর অন্য ঘরে

সুখনিদ্রা যাচ্ছেন আরেকজন। দীর্ঘ চল্লিশ বছর তাঁরা এক ছাদের তলে বাস করেছেন। গুমোট, এত স্তব্ধতা চারদিকে। মলিনা যেমন শরীরের যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন, নীলা ওই স্তব্ধতার মধ্যে একা দাঁড়িয়ে থেকে মনের যন্ত্রণায় কাতরায়। নীলার ভয় হয়। মলিনাকে স্পর্শ করতে তার ভয় হয়। বোঁ বোঁ পাখার তলে মলিনার পা বরফঠাণ্ডা হচ্ছে আর মাথায় গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন। আহা মলিনার কেন বিদেশি কুকুর হয়ে জন্ম নেওয়া হল না।

সকালে সূর্যমুখী চোখ ফোটে।

চিত্রা নীলাকে চা করে দে রে!

চিত্রা শুয়ে ছিল ঘরের মেঝেয় কাঁথা বিছিয়ে। কাঁথা গুটিয়ে উঠে যায় চা করতে।

দরজাটা বন্ধ করে এসো তো আমার কাছে। মলিনা বলেন।

নীলা দরজা বন্ধ করে।

বালিশের তল থেকে চাবি নিয়ে আমার আলমারিটা খোলো।

মলিনার কণ্ঠ মনে হয় চাঁদের দেশ থেকে আসছে। এমন ক্ষীণ।

নীলা আলমারি খোলে।

ডান দিকের ড্রয়ারে দেখো কিছু কাগজ আছে।

নীলা কাগজ নিয়ে এল।

মলিনা বললেন এটা তোমার কাছে রাখো। এটা তোমার।

নীলা কাগজ খুলে দেখে তার নামে ভেতরে কুড়ি লক্ষ টাকার চেক।

সে চমকে ওঠে, এত টাকার চেক দেখে। এত টাকা তুমি আমাকে দিচ্ছ কেন মা? নীলা দেখে মলিনার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছে বালিশে। জল মুছে দিয়ে ধরা গলায় বলে, এ টাকা দিয়ে তোমার চিকিৎসা করাব মা। তুমি ভাল হবে। আবার আগের মতো হাঁটবে, গান গাইবে। মনে আছে তুমি যে গাইতে আমি অকৃতি অধম বলেও তো কিছু কম করে মোরে দাওনি, যা দিয়েছ তারি অযোগ্য ভাবিয়া কেড়েও তো কিছু নাওনি...

বালিশে জল গড়াতে থাকে মলিনার।

দেখো মা আমি গাইছি গানটি...

নীলা গাইতে থাকে মেঝেয় বসে মলিনার মাথার পাশে মাথা রেখে, ভেজা বালিশে। বালিশ ভিজতে থাকে আরও, নীলার চোখের জলে মলিনার সিঁথিতে ঝাপসা হয়ে আসা সিঁদুরও মুছতে থাকে।

নীলার গলা বুজে আসে, গান শেষ হয় না।

চাঁদের দেশ থেকে আসা স্বর আবার, দেশে থেকো, বিদেশ যেয়ো না।

বাড়িতে হুলস্থুল শুরু হয়। নিখিল জানাল, দানিয়েল নামে একটি মেয়ে ফোন করেছিল প্যারিস থেকে। সে আজ রাতে এসে পৌঁছোচ্ছে কলকাতায়। অনির্বাণ বাজার করতে গেছেন, বিদেশি অতিথির জন্য ভাল মাছ মাংস কিনতে। তাছাড়া অনির্বাণের দুজন বন্ধুও দুপুরে খাবে। রাতে খাবে কিছু আত্মীয়। এক চিত্রার ওপর চাপ বেশি পড়ে যায়। খবর পাঠিয়ে চিত্রার মা মাসিকে আনা হল। নীলা দূর থেকে বাড়ির ভোজউৎসব দেখে। নিখিলের ব্যস্ততা দেখে।

আচ্ছা তোর বিদেশি অতিথি কী পান করবে? ফরাসি ওয়াইন না হলে কি চলবে? ভারতীয় ওয়াইনের ব্যবস্থা করলে হবে তো!

নীলা কাঁপা কণ্ঠে বলে, দাদা, মার পাশে একটু বসো। একটু কথা বলো মার সঙ্গে। গায়ে একটু হাত বুলিয়ে দাও।

ডাক্তার বলেছে আরও দুমাস বাঁচবে মা। নিখিল বলে।

আমার ভয় লাগছে দাদা।

নিখিল বিমানবন্দর থেকে দানিয়েলকে নিয়ে বাড়ি এল সন্ধেবেলা। বাড়িতে আত্মীয়দের ভিড়ও বেড়েছে। সবাই দেখতে এসেছে মলিনাকে। রাতের ভোজ শেষ হলে অনির্বাণ মলিনার নাড়ি টিপে এসে মলিনার দাদা আর জামাইবাবুর সঙ্গে ফিসফিস করে শ্মশানঘাট, খাটিয়া, টাকা ইত্যাদি কথা বলেন।

নীলার কানে আগুনের শলার মতো ঢোকে প্রতিটি শব্দ। একা সে পুড়তে থাকে।

নীলার পোড়া কাঁধে হাত রেখে, দানিয়েল ফিসফিস করে বলে, এত দূর থেকে তোমার কাছে এলাম, দেখে একটু খুশি হলে না মনে হচ্ছে।

ফিসফিসের কোনও উত্তর দেয় না সে।

নীলার বিছানাতেই দানিয়েলের ঘুমোনোর ব্যবস্থা হয়। নীলার বান্ধবী নীলার বিছানায় ঘুমোবে, এ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিক, পশ্চিমে সূর্য ডোবার মতো, মলিনার কষ্ট পাওয়ার মতো। দুটো বেশি বালিশ পেতে বিছানা গুছিয়ে দিয়ে আসে চিত্রা। ঘুমোতে যাবার আগে অনেক রাত অব্দি বসার ঘরে বসে দানিয়েলের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লব, ফরাসি সুগন্ধী নিয়ে কথা বলে নিখিল আর অনির্বাণ।

নীলা একা বসে ছিল মলিনার বিছানার পাশে, দেয়ালে হেলান দিয়ে। মধ্যরাত পার হলে দানিয়েল মলিনার ঘরে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে ঢুকে, বলে, চলো ঘুমোতে যাবে।

তুমি ঘুমোও, আমি মার কাছে বসব।

তুমি খুব ক্লান্ত নীলা, তোমার ঘুম দরকার। এভাবে না ঘুমিয়ে শরীর খারাপ করলে তোমার মার কাছেই তোমার থাকা হবে না। তোমাকে নিয়েই বাড়ির লোকেরা ব্যস্ত হবে। তার চেয়ে রাতটা ঘুমিয়ে, সকালে এসে বোসো এখানে। দানিয়েল ফিসফিস করে বলে।

বাড়িটি, নীলা দেখে, ফিসফিসে ফিসফিসে ভরে উঠছে।

দানিয়েল নীলার ক্লান্ত শরীরকে টেনে নিয়ে যায় দোতলায়।

সারারাত নীলার নিস্তরঙ্গ শরীরে দানিয়েলের তৃষ্ণার্ত জিভ খেলা করে। নীলার মরাকাঠ শরীর হঠাৎ বানের জলে ভেসে যায়। দানিয়েল নিখুঁত শিল্পীর মতো নীলার শরীরে আঁকতে থাকে ওর স্বপ্নের ছবি।

নীলা শীৎকারে, শীর্ষসুখে যখন আকণ্ঠ ডুবে আছে, ভোরের আলো এসে চুমু খাচ্ছে তার এলো চুলে, তখনই চিত্রার চিৎকার তাকে পাথর করে দেয়।

দানিয়েল বেরিয়ে যায়, হিন্দুর সৎকারউৎসব ও দেখেনি কোনওদিন। দেখবে, এ এক নতুন অভিজ্ঞতা ওর জন্য।

নীলা বিছানা থেকে ওঠে না। নিখিল এসে ডেকে যায়। চিত্রা ডাকতে এসে বলে যায়,

দিদি, মাসিমা অস্থির অস্থির করছিলেন, আর নীলা নীলা বলে ডাকছিলেন। ওই ডাকেই তো আমার ঘুম ভাঙে। তারপর মাসিমাকে কত ডাকি, মাসিমা আর কথা বলেন না। চোখ খোলেন না।

চিত্রা সরে গেলে নীলা উলঙ্গ শরীরে নেমে আসে বিছানা থেকে, ঘরের দরজায় খিল এঁটে দেয়। সারাদিন দরজায় শব্দ হয়, কেউ টোকা দেয়, কেউ ধাক্কা, কেউ ওপাশ থেকে শেষবার মায়ের মুখ দেখার অনুরোধ করে, কেউ আদেশ করে, মঞ্জুষা ভাঙা গলায় করেন, মলিনার দিদি দাদা ভারী গলায় করেন, অনির্বাণও কী কারণে নীলা জানে না, ডাকতে আসেন। কারও জন্য দরজা খোলে না সে।

সারাদিন জানালার হলুদ রোদ্দুরের দিকে তাকিয়ে থাকে নীলা, রাস্তার ফেরিঅলার ডাক, বাস ট্রাকের চিৎকার, সৎকারউৎসবের কোলাহল কিছুই তাকে স্পর্শ করে না।

রাতে অতল নিস্তব্ধতার বুক চিরে চিত্রার মিহি কান্নার শব্দ বাড়ির গুমোট বাতাসে ভাসতে থাকে।

নীলার বুক চিরে কোনও দীর্ঘশ্বাস বেরোয় না, চোখ জ্বালা করে এক ফোঁটা জল বেরোয় না।

মলিনার দুঃখগুলোর ওপর গোলাপজল ছিটিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল নীলার। যেন দুঃখগুলো সুগন্ধ পেতে পেতে ঘুমিয়ে পড়ে কোথাও, ময়দানের ঘাসে, বিড়লামন্দিরের সিঁড়িতে। সন্ধেবেলা আলতো করে তুলে বাড়ির ছাদে রেখে এলে দুঃখগুলো দুঃখ ভুলে চাঁদের সঙ্গে খেলত হয়তো বুড়িছোঁয়া খেলা। দুঃখরা মলিনাকে ছেড়ে কলতলা অব্দি যায়নি কোনওদিন। যেন এরা পরম আত্মীয়, খানিকটা আড়াল হলে বিষম একা পড়ে যাবেন মলিনা, কাদায় পিছলে পড়বেন, বাঘে ভালুকে খাবে।

মলিনাকে দুঃখের হাতে সঁপে বাড়ির মানুষগুলো অসম্ভব স্বস্তি পেত। দুঃখগুলোকে পিঁড়ি দিত বসতে, চা বিস্কুট দিত। নীলার ইচ্ছে ছিল বেড়াতে নিয়ে গিয়ে মলিনার দুঃখগুলো গঙ্গার জলে, কেউ জানবে না, ভাসিয়ে দেবে একদিন। কচুরিপানার মতো, খড়কুটোর মতো, মরা সাপের মতো ভাসতে ভাসতে দুঃখরা চলে যাবে দূরে... অনেক দূরে। নীলার কোনও ইচ্ছে পূরণ হয়নি, মলিনার দুঃখগুলো মলিনার সঙ্গে শ্মশান অব্দি গেছে।

আমরা এমনি ভেসে যাই

পুরো সপ্তাহ কলকাতার রাস্তায় ঘুরে ভিড়ভাট্টা ধুলোবালি যানজট ভেঁপুতে কাতর হয়ে, ফুটপাতের আলুকাবলি খেয়ে পেটের অসুখ বাঁধিয়ে, মনিক ক্লদ ম্যাথুর পার্ক স্ট্রিটের বাড়িতে দুদিন আড্ডা দিয়ে, চোখ বিস্ফারিত করে নিখিলের মাতৃদায় দেখে দানিয়েল প্যারিস ফিরে গেল। যাবার আগে নীলাকে সেধেছিল যেতে। নীলা যায়নি।

অনুতাপ? তুমি তো প্যারিস থেকে নাও আসতে পারতে। তোমাকে না দেখেই সম্ভবত মলিনার যেতে হত। নিজেকে দোষী ভাবছ তো! কক্ষনও নিজেকে কোনও কিছুর জন্য দোষী ভাবতে নেই নীলা, দোষী ভাবলে জীবন আর এগোয় না। স্থবির জলাশয় হতে চাও? তা হলে ভাবো।

এসব বলে পাথরে টোকা যতই দিতে চেয়েছে দানিয়েল, পাথরে শব্দ হয়নি। ঠেলেছে, পাথর নড়েনি।

দানিয়েলের শব্দবাক্য বাড়ির পেছনের আবর্জনায় ছুড়ে দিয়ে নীলা বলেছে, যথেষ্ট বিরক্ত করেছ আমাকে, আর কোরো না।

নীলার এ বাক্যই দানিয়েলের জন্য যথেষ্ট ছিল পেছনে আর ফিরে না তাকাবার। কিন্তু ও দরজার কাছ থেকে ফিরে মনিক ম্যাথুর ঠিকানা লেখা কাগজটি রেখে বলে যায়, নিকলের বন্ধু মনিক। চমৎকার মহিলা। যদি প্রয়োজন মনে করো কখনও, যেয়ো।

রাতগুলো আগের চেয়েও আরও বেশি স্তব্ধতার জলে ডুবে থাকে। কেউ আর এ বাড়িতে কাতরায় না। চিত্রাও আর কাঁদে না। মলিনার ঘর থেকে মলিনার বিছানা বালিশ সব ফেলে ঘর খালি করে ধুয়ে মুছে দিয়েছে চিত্রা। অনির্বাণ সে ঘরে টেবিল পাতবেন, রোগীর শোয়ার টেবিলও, চেয়ার পাতবেন চারটে কি পাঁচটা, হাসপাতাল থেকে ফিরে রাতে রোগী দেখবেন সে ঘরে। হলুদ রোদ্দুর চলে গিয়ে অন্ধকার এসে বসে জানালায়, নীলা সেই অন্ধকারের দিকেই তাকিয়ে থাকে। ঘোর অমাবস্যার দিকে নীলার চোখ স্থির হয়ে থাকে।

অমনই এক রাতে, নিখিল এসে নীলার শিয়রের কাছে বসে, পিঠে হাত রেখে নীলার, বলে, কষ্ট তো তোর একার হচ্ছে না, কষ্ট আমাদের সবারই হচ্ছে। কিন্তু কী করা যাবে, মাকে কি ফিরিয়ে আনতে পারব! পারব না। জীবন তো আমাদের যাপন করতেই হবে। এটাই তো নিয়ম, বাস্তব খুব নির্মম হয়, কিন্তু মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকে না।

অমাবস্যার ঘোরে নাকি জ্বরের, নীলা বলতে থাকে, আমাদের একটি মা ছিল, মা আমাদের খাওয়াত, শোয়াত, ঘুম পাড়াত। গায়ে কোনও ধুলো লাগতে দিত না, পিঁপড়ে উঠতে না, মনে কোনও আঁচড় পড়তে দিত না, মাথায় কোনও চোট পেতে না। মাকে লোকেরা কালো পেঁচি বলত, আমরাও। বোকা বুদ্ধু বলে গাল দিতাম মাকে। মা কষ্ট পেত,

মা কষ্ট পেলে আমাদের কিছু যায় আসত না। আমাদের কিছুতে কিছু যায় আসত না, মা জ্বরে ভুগলেও না, মা জলে পড়লেও না। মাকে মা বলে মনে হত, মানুষ বলে না। মা মানে সংসারের ঘানি টানে যে, মা মানে সবচেয়ে ভাল রাঁধে যে, বাড়ে যে, কাপড় চোপড় ধুয়ে রাখে, গুছিয়ে রাখে যে, মা মানে হাড়মাংস কালি করে সকাল সন্ধে খাটে যে, যার খেতে নেই, শুতে নেই, ঘুমোতে নেই। যার হাসতে নেই, যাকে কেবল কাঁদলে মানায়, শোকের নদীতে যার নাক অব্দি ডুবে থাকা মানায়। মা মানে যার নিজের কোনও জীবন থাকে না। মাদের নিজের কোনও জীবন থাকতে নেই। মা ব্যথায় চেঁচাতে থাকলে বলি, ও কিছু না খামোকা আহ্লাদ। মরে গেলে মাকে দিব্যি পুড়িয়ে ফেলি। ভাবি যে বিষম এক কর্তব্য পালন হল। মা নেই, এতেও আমাদের কিছু যায় আসে না।

বাজে বকিস না তো, খাবি আয়। নিখিল নীলাকে টেনে, প্রায় কোলে তুলে নিয়ে গেল খাবার টেবিলে।

অনির্বাণ আর নিখিল দুজনই তিনদিনের ছুটি নিয়েছে। তিনদিন বাড়িতে কেবল ভাত আর নিরামিষ সেদ্ধ হবে। তিনদিন পর পুরুত ডেকে মায়ের শ্রাদ্ধ দিতে হবে নীলাকে। নিখিলের মাতৃদায় চলবে পুরো এক মাস। নিখিল সেলাই ছাড়া সাদা কাপড় এক টুকরো কোমরে পেঁচিয়েছে, আরেক টুকরো গলায়, হাতে কুশাসন। যেখানেই বসবে, কুশাসন পেতে। খাবার মধ্যে দুবেলা সেদ্ধ শাকান্ন আর চিড়া মুড়ি দই। এক মাস এই শোক চলবে নিখিলের। নীলার জন্য এক মাসের নয়, শোক তিনদিনের, বিয়ে হয়েছে তার, এক বংশ থেকে আরেক বংশে গেছে, সে এখন পর, মাতৃদায় তেমন নেই। অনির্বাণও আচার অনুষ্ঠান পালন করছেন যথারীতি। মাস গেলে মলিনার শ্রাদ্ধে কত লোক নেমন্তন্ন করবেন, তারই এখন থেকে হিসেব চলছে। শ্রাদ্ধ শেষ হলে অনির্বাণ আর নিখিল দুজনেরই ব্যস্ততা বাড়বে। মৃত্যুর স্মৃতিকে পেছনে ফেলে সামনে এগোবে। পেছনের কিছুর জন্য হাহাকার করে সময় নষ্ট করার যুক্তি না দেখেন অনির্বাণ, না দেখে নিখিল। একা নীলাই কেবল জীবন আর মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করতে শুরু করেছে, কী অর্থ এই জীবনের।

মলিনার ঘরে হঠাৎ ঢুকে নীলা মা মা বলে ডাকে। ডেকে সে চমকে ওঠে, খালি ঘর, একটি টিমটিমে প্রদীপ জ্বলছে ঘরের মাঝখানে। মলিনার বুকে মাথা রেখে তার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছিল, সুশান্ত চলে যাবার পর যেমন শুয়েছিল। টেলিভিশনের বিকট শব্দ আর নিখিলের হা হা হাসির যন্ত্রণায় নীলা কুঁকড়ে যেতে থাকে, চিত্রা এসে নীলাকে প্রদীপের সামনে থেকে তোলে।

চিত্রা, মা কী বলতে চেয়েছিলেন?

তা আমি কী করে বলব দিদি।

মুখে একটু জল চাইছিলেন? ওষুধ চাইছিলেন ব্যথা কমার?

তা কী করে বলব দিদি?

মা কি আমাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছিলেন? ভয় পাচ্ছিলেন?

মৃত্যুর সময় কেমন লাগে, কী বলতে ইচ্ছে হয়, কী করতে, তা তো আমি জানি না দিদি! যাঁরা মরেছেন তাঁরা জানেন।

মলিনা নেই বলে কটি বিষাক্ত সাপ উঠে এসেছে উঠোনে, ফিরে যাচ্ছে না জলায় বা জংলায়। কাপড়ের ভাঁজে, টাকা পয়সার ড্রয়ারে, বালিশের নীচে, গেলাসে বাটিতে, ফুলদানিতে, চৌবাচ্চায়, জলকলের মুখে ইঁদুর আর তেলাপোকার বিশাল সংসার। মলিনা নেই বলে মাধবীলতাও আর ফুটছে না। দেয়াল ঘেঁষে যে রজনীগন্ধার গাছ ছিল, কামিনীর, মরে গেছে। গোলাপবাগানে গোলাপের বদলে শুধু কাঁটা আর পোকা খাওয়া পাতা। বুড়ো জাম গাছে বিচ্ছুদের বাসা, পেয়ারা গাছটি ঝড় নেই বাতাস নেই গুঁড়িসুদ্ধ উপড়ে পড়েছে। মিষ্টি আমের গাছে একটি আমও আর ধরে না, নারকেল গাছে না একখানা নারকেল। সুপুরি গাছেদের নাচের ইস্কুল এখন বন্ধ। মলিনা নেই বলে সবজির বাগান পঙ্গপাল এসে খেয়ে গেছে, সবুজ মাঠটি ভরে গেছে খড়ে, আগাছায়।

মলিনা নেই, মলিনার না থাকা জুড়ে দাপট এখন অদ্ভুত অসুস্থতার, নীলার শ্বাসরোধ করে আনে দূষিত বাতাস, মলিনার না থাকার দৈত্য ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঘাড়ে, মলিনার না থাকার শকুন ছিঁড়ে খাচ্ছে নীলার সর্বাঙ্গ, মলিনার না থাকার উন্মত্ত আগুন পুড়িয়ে ছাই করছে, মলিনার না থাকার সর্বগ্রাসী জল নীলাকে ডুবিয়ে নিচ্ছে। নীলাও মলিনার মতো নেই হতে চায়।

নেই হওয়ার নানা পথ আছে, মনিক ম্যাথুর বাড়ি যাওয়া নয়। কিন্তু নীলা মনিকের বাড়ি যায়।

মনিক মলিনার বয়সি। অথচ কী দিব্যি বেঁচে আছেন। হাত পায়ের প্রতিটি নখ নিখুঁত করে রাঙানো, চোখের পাতায় গাঢ় নীল রং, পাপড়িগুলোয় রঙের প্রলেপে উজ্জ্বল, গালে রং, ঠোঁটে রং, বাদামি চুলকে রাঙিয়ে সোনালি করেছেন, স্তন ফুটে বেরোচ্ছে এমন পাতলা জামা পরেছেন। নীলা কোনওদিনই মলিনাকে মুখে কোনও রং লাগাতে দেখেনি। ভয় ছিল, কালোর ওপর রং পড়লে কী জানি আরও বিদঘুটে না দেখায়। মনিক ঝটপট চা বানিয়ে আনলেন, চা খেতে খেতে বললেন, জীবনের অর্থ কী জানো? ডগলাস আদামস বলেছিলেন জীবনের অর্থ বিয়াল্লিশ, আমার মনে হয় ভুল বলেছিলেন, জীবনের অর্থ আসলে সাতচল্লিশ।

মনিক স্তন দুলিয়ে হাসেন। নীলার হাসি পায় না।

মনিক উচ্ছল উজ্জ্বল প্রাণবান মানুষ। বয়সে ছোট এক বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করেছিলেন, সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে দিল্লি চলে যাচ্ছেন এখন। আলিয়ঁজ ফ্রসেজে ফরাসি ভাষা শেখাতেন, ভাষা শেখানো ছেড়ে ফরাসি দূতাবাসে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন, তাই কলকাতার পাট চুকোতে হবে তাঁর। কিন্তু কলকাতার এই বাড়িটি বিক্রি করবেন করবেন করেও মন তাঁর সায় দিচ্ছে না।

কলকাতার মতো, বুঝলে নীলা, শহর হয় না! যদি বাস করার জন্য কোনও শহর চাও, তো কলকাতা।

নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তা তুমি কি ফিরে যাচ্ছ প্যারিসে? মনিক জিজ্ঞেস করেন।

নাহ।

দুটো জার্মান শেফার্ড ঘরে দাপট দেখিয়ে হাঁটে। লুলু আর ভুলু। বিদেশি কুকুরের বাংলা নাম!

মনিকের ওই প্রেমিক ছোকরাটি নাম রেখেছে। লুলুর গলায় ভুলুর পিঠে হাত বুলিয়ে মনিক ওদের খেলতে পাঠান বাগানে।

লুলু ভুলুকে নিয়েই আমার সংসার। অনেক পুরুষের সঙ্গে সংসার করে দেখেছি, কুকুরের সঙ্গে সংসার করায় আনন্দ বেশি। কারণ বিশ্বাস হল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। মানুষ বিশ্বাস ভাঙে, কুকুর ভাঙে না। তুমি কুকুর পোষো?

নাহ।

নীলা তার মলিন মুখ আর উদাস দুচোখ নিয়ে বসে থাকে। সুতি একটি সাদা শাড়ি গায়ে, শাড়ির আঁচল গড়াচ্ছে মেঝেয়, উড়ো খুড়ো চুল, গালের ত্বক ফেটে চৌচির, নখে পুরনো রং আধখেচড়া হয়ে আছে।

মনিক অনেকক্ষণ তাকিয়ে নীলার দিকে, বলেন, তোমাকে দেখে একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তুমি অমর! কখনও মরবে না।

নীলা আগ্রহ দেখায় না মনিকের এই মন্তব্যের ব্যাখ্যা শুনতে, কিন্তু মনিক বলে যান, চোখের সামনে কেউ মরলে তুমি এত কষ্টে কাতর হও যে মনে করতে ভুলে যাও, মানুষ লক্ষ লক্ষ প্রজাতির ভিড়ে একটি প্রজাতি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহস্র কোটি গ্যালাক্সির ভেতর ছোট্ট একটি গ্যালাক্সিতে সহস্র কোটি সৌরজগতের ছোট্ট একটি সৌরজগতে ছোট্ট এক গ্রহে মানুষ নামক প্রাণী বাস করছি। তুমি একটি বিন্দুর মতো, আসলে একটি বিন্দুর মতোও না, তারও চেয়ে ক্ষুদ্র, ক ফুট লম্বা তুমি, আমার চেয়ে দু ইঞ্চি বেশি যদি হও, পাঁচ ফুট ছয়। আমার চেয়ে পাঁচ কিলো যদি কম হও, ষাট কিলো, এই বিশাল মহাজগতে কোথাও দেখতে পাও তোমার অস্তিত্ব? তোমার মায়ের? মানুষের চেয়ে ওই কাদাঘাঁটা কচ্ছপ বেশিদিন বাঁচে। প্রকৃতি এমনই। প্রকৃতিকে জয় করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা আসি, যাই। আমরা এমনি এসে ভেসে যাই। এক পলকে মানুষের আয়ু ফুরোয়। হিসেব করতে পারো বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে পৃথিবীর এই মাটিতে কত কিছুর জন্ম হচ্ছে, কত কিছু বিলীন হচ্ছে। ডায়নোসর এককালে দাপটের সঙ্গে বেঁচে ছিল, কোথায় এখন তারা, নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। মানুষের অস্তিত্বও একসময় আর থাকবে না, মানুষের ইতিহাসই অতীতের গর্ভে গর্তে তলিয়ে যাবে। এই মহাজগতে আমরা কেউ না, কিচ্ছু না...

মনিকের সবুজ চোখদুটো উদাস।

উদাস চোখ নিমেষে চঞ্চল হয়। আচ্ছা তুমি কি পরজন্মে বিশ্বাস করো?

নীলা মাথা নাড়ে, সে বিশ্বাস করে না।

পরজন্মে বিশ্বাসীদের একটা সান্ত্বনা থাকে, এ জীবনে তো এ কাজটা করা হল না, পরের জন্মে না হয় করব। কিন্তু যদি বিশ্বাস করো জীবন একটিই, তবে অপেক্ষা কোরো না। যার যার জীবন তার তার। সময় খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায়, যা পাবে, সব গ্রহণ করবে। স্বার্থপর হবে

নীলা, এ ছাড়া গতি নেই। লুফে নাও, গোগ্রাসে নাও।

মনিকের মুখ তিজেভির মতো চলে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে মখমলের সোফায় পা তুলে বসে বাগানের মিঠে রোদ্দুরে বিশ্বাসী কুকুরের খেলা দেখতে দেখতে, নীলা জানে, চমৎকার চমৎকার সব কথা বলা যায়।

হঠাৎই প্রসঙ্গ ছাড়া প্রশ্ন করে বসে নীলা, তোমার মা আছেন মনিক?

আছেন। তুলুজের এক গ্রামে থাকেন। একানব্বই বছর বয়স।

বাড়িতে আর কে কে আছে?

মা একাই থাকেন।

একা?

হ্যাঁ একা।

তুমি গিয়ে থাকো না তোমার মার সঙ্গে?

আমার সময় কোথায়? আর মাও চান না ছেলেমেয়ে গিয়ে তাঁকে বিরক্ত করুক। যার জীবন তার নীলা।

স্বনির্ভরতার অহঙ্কার কে ছাড়তে চায়? বছরে একবার ক্রিসমাসের সময় মাকে দেখতে যাওয়া হয়। তাও সব বছর হয়ে ওঠে না।

তোমার মা একা পারেন রান্নাবান্না করতে? ঘর গোছাতে?

এখনও পারছেন। না পারলে বুড়োবুড়িদের সরকারি বাড়িতে চলে যাবেন, ওখানে দেখাশোনার লোক থাকবে।

অর্ধেক বেলা মনিকের বাড়িতে কাটিয়ে নীলা যখন বাড়ি এল, নিখিল জানাল, গলায় শাড়ি পেঁচিয়ে কড়িকাঠে ঝুলে গত রাতে আত্মহত্যা করেছে মিঠু।

অ রভোয়া

মিঠুকে শুইয়ে রাখা হয়েছে মেঝেয়। লাল একটি শাড়ি পরানো হয়েছে। গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দন। পায়ে আলতা। মিঠু বেঁচে থাকতে নিশ্চয়ই এত সাজেনি। মিঠুর জন্য সাজ সাজ রব পড়ে গেল। মিঠুকে সাজাও, খাটিয়া সাজাও।

লোক দেখতে এসে বলে যাচ্ছে, আহা কী নিখুঁত মুখ মেয়েটির। কী টিকোলো নাক! কী দীঘল কালো চুল। আহা চিবুকের তিলটি মেয়েকে আরও মায়াবী করেছিল। মেয়েটার স্বভাব চরিত্র, কী বলব, ফুলের মতো পবিত্র ছিল। মাটির দিকে তাকিয়ে হাঁটত, গুরুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে কোনওদিন কথা বলেনি, বেয়াদবি করেনি। লেখাপড়া জানা মেয়েরা আজকাল কি আর আদব কায়দা মানে! কিন্তু মিঠু মানত। মিঠু একা হাতে সংসারের সব কাজ করত, এত লক্ষ্মী ছিল!

নীলা দেখে মিঠুর মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন, কাঁদছেন কিন্তু সে কাঁদায় এক ধরনের তৃপ্তি আছে।

সাধনবাবু, মিঠুর বাবাও পাঞ্জাবির খুঁটে চোখের জল মোছেন, তাঁর কপালের দুশ্চিন্তার ভাঁজগুলো আগের মতো নেই। মিঠুকে নিয়ে এখন কারও আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। এখন কেবল কেওড়াতলা, নিমতলা, এখন মুখাগ্নি, এখন ছাই। মিঠু এ জগৎ থেকে জন্মের মতো নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আগুনে পোড়া তার কালো শরীরের কালো ছাই নিয়ে সংসারে কেউ দুর্ভাবনার মধ্যে পড়বে না। মিঠু আত্মহত্যা করে কালো হওয়ার অপমান থেকে যত না বাঁচল, ওর বাপ মাকে বাঁচাল আরও, ওর দাদাকেও বাঁচাল, ওর দাদা এখন দেখে শুনে ভাল পণ নিয়ে একটি মেয়ে বিয়ে করতে পারে।

মিঠুর এই মৃত্যু নীলাকে বাকরুদ্ধ করে আবার।

নীলাকে ঠেলে সজাগ করে অনির্বাণ জানতে চান কবে সে প্যারিস ফিরছে।

প্যারিস আর যাচ্ছি না। আমি এখানেই থাকব।

এখানে কোথায়?

এখানে এই কলকাতায়।

কলকাতায় কোথায়?

এই বাড়িতে।

বিয়ের পর স্বামীর বাড়িই তোর বাড়ি। স্বামীর বাড়িতেই তোর সব অধিকার। বাপের বাড়িতে মেয়েরা বেড়াতে আসে, থাকতে না। অনির্বাণ ভারী গলায় ভারী কানুন টানেন।

নীলা তার ঘরটিতে চোখ বুলোয়। তার বিছানা বালিশ, তার বইপত্র, শাড়ি কাপড়, পুরনো

চিঠি, তার শখের তানপুরা, হারমোনিয়ম সব এ ঘরেই। প্যারিসের সুটকেসের জীবনের মতো জীবন নয়, অনেক প্রসারিত।

কী কারণে নীলাকে প্যারিস যেতে হবে? কারণ হল আত্মীয়রা এমনকী পড়শিরাও কানাঘুষা করছেন, নীলা বুঝি স্বামী ছেড়ে দিয়ে এসেছে।

হ্যাঁ এসেছি। তো ওদের হয়েছে কী?

অনির্বাণ গলা ফাটিয়ে বলেন, ওদের কিছু হয়নি। হয়েছে আমার। আমার আর এ সমাজে মুখ দেখানো যাবে না। বংশের মুখে চুনকালি দিতে চাস?

স্বামীর সঙ্গে যদি আমার না মেলে, তবে এ কি চুনকালি দেওয়া হল?

হল। অনির্বাণ জোর দেন এই হল-য়।

এই সমাজে থাকতে হলে, সমাজের আর দশটা লোক যেন ভাল বলে সেভাবে থাকতে হবে। প্যারিসে স্বামীর বাড়ি ফিরে যা, নয়তো মিঠুর মতো আত্মহত্যা করে আমাদের মুক্তি দে। এই আমার শেষ কথা।

অনির্বাণ তাঁর শেষ কথা বলে চলে যাওয়ার পর নীলা বাথটাবের ঠাণ্ডা জলে শুয়ে থাকে অনেকক্ষণ। না, চোখে এক ফোঁটা জল নেই নীলার।

গভীর রাতে বাড়ির সবাই ঘুমিয়ে গেলে, মলিনার খালি ঘরের খালি মেঝেয় শুয়ে একটি বাহু ছড়িয়ে দিয়ে সামনে, যেমন করে প্রায় রাতে এসে মলিনার গায়ের ওপর বাহু ছড়িয়ে, নীলা ঘুমোত, ফিসফিস করে বলে, মা তুমি নেই কেন? প্রদীপের আলোয় পিঠ করে শোয়া নীলার ছায়া বিশাল দৈত্য হয়ে তাকেই ছিঁড়ে খেতে আসে। নীলা সিদ্ধান্ত নেয় সে কলকাতা ছেড়ে যাবে।

মায়ের শ্রাদ্ধটা শেষ করেই যা। অনির্বাণ থেকে শুরু করে মলিনার কাছের দূরের সব আত্মীয় বলেন।

মলিনার শ্রাদ্ধে নীলার এতটুকু আগ্রহ নেই। লোক খাওয়ানো, পুরুত খাওয়ানো, এসবে সে কোনও যুক্তি দেখে না।

তোর মার আত্মা কষ্ট পাবে, এমন করিস নে।

নীলা হেসে বলে, মার কষ্ট সয়ে অভ্যেস ছিল, মার আত্মাও কষ্ট সইতে পারবে, এ কোনও ব্যাপারই না।

যাব বলে সুটকেস গোছানো হতে পারে, কিন্তু যাওয়া অত শিগরি হয় না। টিকিটের তারিখ ঠিক করো, ব্যাঙ্কের চেক ভাঙাও, টাকা তোলো, টাকা পাঠাও, নানান ঝামেলা।

পুরনো টিকিটে প্যারিস ফেরার যাত্রা বাতিল হয়ে গেছে, সুতরাং নতুন টিকিট করা চাই। শ্রাদ্ধ অব্দি যখন থাকতে চাইছে না, ঠিক আছে, অনির্বাণ নিখিলের হাতে টাকা দেন, সস্তায় কলকাতা প্যারিস টিকিট কিনতে।

নীলা পথ আটকায় নিখিলের। ও টাকা দিয়ে দাও, আমি কিনব টিকিট।

টিকিট কিনবে টাকা কোথায় পাবে?

এ কথা গোপন থাকে না, মলিনা তাঁর বাবার সম্পত্তি যা পেয়েছিলেন, বিক্রি করে ব্যাঙ্কে রেখেছিলেন, ব্যাঙ্কের সেই কাগজপত্র মলিনার ড্রয়ারে নেই, নীলার হাতে।

কত টাকা?

কুড়ি লক্ষ।

অনির্বাণ ধপাস করে বসে পড়েন। মাথায় হাত।

এত টাকা কী করবি তুই? যা দরকার কিষানলাল দেবে। এ টাকা রেখে যা, সংসারের অনেক খরচা আছে। পুরনো বাড়ি, ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে।

এ বাড়ি তো আমার নয়, আমি এ বাড়ির কেউ নই। এ তোমাদের বাড়ি, তোমরা করো যা করার। আমার টাকায় লোভ কোরো না।

তুই কি জানিস যে আইনত এই টাকা তিন ভাগে ভাগ হবে। এক ভাগ কেবল পাবি তুই। আর কোথায় কোনও মেয়েকে শুনেছিস টাকা নিতে? সব মেয়েরাই তো ভাইকে দিয়ে দেয় নিজের ভাগ।

ভাগাভাগি করতে চাইলে মা আমার নামে লিখে দিতেন না।

লিখে দিলেই হবে! উত্তরাধিকার বলে একটা ব্যাপার আছে না?

উত্তরাধিকার বলে যে একটি ব্যাপার আছে তা অনির্বাণ মলিনার আত্মীয়দের বাড়িতে ডেকে নীলাকে বোঝাতে অনুরোধ করেন। মলিনার দিদি, জামাইবাবু, দাদা, বউদি এমনকী মঞ্জুষাও এসে মাথা নেড়ে সায় দেন, যে উত্তরাধিকার বলে একটি ব্যাপার আছে। স্বামীর ঘরে যদিও জীবন পার করে, মেয়েরা কি বাপ ভাইকে ভুলে থাকে? থাকে না। পারলে জীবন দেয়। বাপ মায়ের সম্পত্তির কিছুর ওপর কোনও মেয়েরা লোভ করে না। লোভ করলে লোকে ভাল বলে না, মেয়েদের আর কিছু থাক, লোভ থাকা মানায় না। মেয়েরা হবে নির্লোভ, নিঃস্বার্থ নির্দোষ, নিষ্পাপ, নির্বিরোধ, নিবেদিত, নিখাদ, নিভৃত, নির্মল, নিরহঙ্কার, নির্ঝঞ্ঝাট...

মলিনারও কাণ্ড, মাথার ঠিক ছিল না, কী করতে কী করেছেন, এসব কি ধরতে আছে! না কি এ সই মলিনার নয়, হবে হয়তো, মলিনাকে ফুসলিয়ে বা নিজেই নকল সই দিয়ে কাজগুলো নীলা তলে তলে করেছে। আর যদি সই সত্যিকার সই-ই হয়, এত টাকা প্যারিস নিয়ে নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। কিষানলাল তো আর এমন নয়, যে টাকা কম কামায়, দুটো রেস্তোরাঁর ব্যবসা, বহাল তবিয়তে আছে। আর যদি গোঁই ধরে, ঠিক আছে, টাকা কলকাতার ব্যাঙ্কে রেখে দিক, বিপদ আপদের কথা তো বলা যায় না, নয়তো এখানে একটা বাড়ি কিনে রাখুক, ভাড়ার টাকা নীলার ব্যাঙ্কে জমা থাকবে। লোকে বিদেশ গিয়ে টাকা রোজগার করে দেশে টাকা পাঠায়। কেউ দেশের টাকা বিদেশে খরচার জন্য নেয় না।

নীলা কি পাগল?

নীলা বলে, হ্যাঁ সে পাগল।

পাগলকে কে সামাল দেবে!

নীলার ধারণা, দেখতে খারাপ দেখায় বলে, অনির্বাণ নিখিলকে পরামর্শ দেননি নীলার বিরুদ্ধে মামলা করতে। মাঝে মাঝে সমাজের চোখের কারণে অনেক অন্যায়কেই থাবা গুটোতে হয়। এতে কপাল ভাল থাকলে বেঁচে যাওয়া যায়, নীলা যেমন বাঁচে। তবে ব্যাঙ্কগুলো নীলার জুতোর সুকতলি খসিয়ে ছাড়ে, মাড়োয়ারি ব্যাঙ্কারের মুখে প্রতিদিন খই ফোটে, এত টাকা দেশ থেকে চলে যাবে, এ কি মুখের কথা, কেন যাবে, কোথায় যাবে, কী

কারণ, এত টাকা কোত্থেকে এল, করের কাগজ কোথায়, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমতি নিয়ে এসো, দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করে দেশের অর্থনীতির বারোটা বাজানো হচ্ছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

জুতোর সুকতলি খসিয়ে অন্তত একটি ব্যাপার নীলা সম্ভব করতে পারে, হাজার পঞ্চাশেক টাকা সে তুলতে পারে, বাকিটা তার প্যারিসের ব্যাঙ্কে পাঠাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রও ঠিকঠিক জমা দিতে পারে, যদিও কবে টাকাটা প্যারিস পৌঁছবে, সে সম্পর্কে মাড়োয়ারি সঠিক কিছু বলতে পারেনি। অনিশ্চয়তার হাতে ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়ে নীলা টিকিট কেনে।

প্রতিদিন বিমান যায় না কলকাতা থেকে প্যারিস, গেলে নীলা সেদিনই কে এল এম-এ চড়ে বসত। দিল্লি বোম্বেতে যে সুবিধে তা কলকাতায় নেই। দিন দিন পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে পড়ছে ভারতের আর সব রাজ্য থেকে। এখানকার বাঙালি বাবুরা বাণিজ্যে মন না দিয়ে লেখাপড়ায় মন দেন বেশি, রাজনীতিও ভিন্ন, সমাজতন্ত্রের জয়জয়কার, যে দলই কেন্দ্রে যায়, চুলের মুঠি ধরে সমাজতন্ত্রকে নামাতে চায় পশ্চিমবঙ্গের মঞ্চ থেকে, আর নামাতে গেলে রাস্তাঘাট থাকা চাই ভাঙা, কলকারখানা থাকা চাই অচল, বিমানবন্দরে চাই যত কম বিমান, অর্থনীতি ধসিয়ে সমাজতন্ত্র ভাঙার ঝনঝন শব্দ শুনতে কান পেতে আছে কেন্দ্রের বাবাবা।

•

দু সপ্তাহ অপেক্ষা করা ছাড়া নীলার গতি নেই। দু সপ্তাহ নীলার কাছে দু বছর মতো সময় মনে হয়। নীলা পালাতে চায় এই নোংরা সমাজ থেকে। কলকাতাকে তার আর আপন মনে হয় না, এ শহরে তার জন্ম, এ শহরে কেটেছে তার শৈশব কৈশোর, অথচ এ শহরকেই তার মনে হতে থাকে সবচেয়ে অচেনা, যেন এ শহরের সঙ্গে কোনওদিন তার কোনও ভাব ছিল না, এ শহরের ধুলোয় শরীর মেখে সে খেলেনি কোনওদিন, গঙ্গার হাওয়ার সঙ্গে মনে মনে তার কোনওদিন কোনও কথা হয়নি। কলকাতা এখন নীলার কাছে আস্ত একটি শ্মশান, যে শ্মশানে দাঁড়িয়ে প্রতিরাতে একটি কুকুর কাঁদে, আর কোণে নেশাগ্রস্ত পড়ে থাকে চিতা জ্বালানোর কজন লোক। কলকাতা ছিল মলিনার ধনেখালি শাড়ির আঁচল, যে আঁচলে ঘাম মুছে, চোখের জল মুছে দাঁড়িয়ে থাকতেন মলিনা, দরজায়। কলকাতা ছিল মলিনার গভীর কালো চোখ, যে চোখ ডানা মেলে উড়ে যেত, রোদ্দুরে, রাত্তিরে, যেখানেই নীলা ভাসে, ডোবে, পাড় পায়, খুঁজত নীলাকে। কলকাতা ছিল মলিনার এলো চুলের হাতখোঁপা, ভেঙে পড়ত, হেলে পড়ত, রাজ্যির শরম ঢাকত নীলার। কলকাতা ছিল মলিনার হাতে সর্ষের তেলে মাখা মুড়ি, মেঘলা দিনে ভাজা ইলিশ, ভুনি খিচুড়ি। কলকাতা ছিল মলিনার হাতের ছ জোড়া রঙিন চুড়ি। কলকাতা ছিল বাড়ির আঙিনায় মা মা বলে ডাকার আনন্দ। কনকনে শীতে মলিনার কাঁথার তলে গুটিসুটি শুয়ে পড়া, ভোরবেলা শিউলি ছাওয়া মাঠে বসে ঝাল পিঠে খাওয়া, অন্ধকারে মুড়ে, দূরে, নৈঃশব্দ্যের তলে মাটি খুঁড়ে কলকাতাকে পুরে, পালিয়েছে কারা যেন, কলকাতা বলে কেউ নেই এখন, কিছু নেই নীলার। খাঁ খাঁ একটি শ্মশান সামনে, একটি কুকুর, আর কজন নেশাগ্রস্ত লোক।

ফোসকা পড়া গরমে ঘেমে নেয়ে মনিকের ছায়ায় মায়ায় আশ্রয় নেয় নীলা।

কলকাতার নয়, ফরাসি দেশের গল্প বলো মনিক।

মনিক লাল অমৃতে ডুবে ফরাসি দেশের গল্প বলেন। অলস দুপুর জুড়ে লুলু ভুলু বারান্দায়, মনিকের গাড়ির চালক সুরঞ্জিত আগুনের হলকা থেকে গা বাঁচাতে গাছের ছায়ায়, রাঁধুনি বিন্দিয়া গুনগুনাচ্ছে, বিনুনি বাঁধছে, মালি হরিদাস লুলু ভুলুর পাশে গল্প বলা দাদার মতো শুয়ে আছে। আর ঠাণ্ডা ঘরে বসে মনিকের সবুজ চোখ ঝলমলিয়ে ওঠে গল্প বলতে বলতে। দক্ষিণ ফ্রান্সের শাতো মনতান-এ তার পূর্বপুরুষের বাস ছিল, এখনও সেই শাতোয় গিয়ে সেই হরিণ মাথার দিকে, সেই নিখুঁত তাপেসিরি পলকহীন চোখে দেখে। মনিকের প্রতি লোমকূপ থেকে ছিটকে বেরোতে থাকে আভিজাত্যের অহংকার। পরক্ষণেই, শাতো মনতান ভেঙে পড়ার নির্মম দৃশ্য কল্পনা করে তাঁর লোমকূপ বুজে যেতে থাকে, বাস্তিল ভাঙার দৃশ্য যেন তিনি নিজের চোখে দেখছেন, বিপ্লবের বিকট চিৎকার যেন নিজের কানে শুনছেন, কেঁপে ওঠে মনিকের স্তনজোড়া, ভয়ে।

তারপর তো ওই, ইগালিতে। ইগালিতে শব্দটি দুবার উচ্চারণ করেন তিনি।

আমি কাল দিল্লি যাচ্ছি তিনদিনের জন্য, কিন্তু বিষম দুশ্চিন্তায় পড়েছি। এই তিনদিন লুলু ভুলুকে খাওয়ানোর লোক পাচ্ছি না। মনিকের চোখে শ্যাওলা রঙের দুশ্চিন্তা।

তুমি এ কাজটা করবে নীলা? তোমাকে আমি চাবি দিয়ে যাচ্ছি। দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় খাবারগুলো রাখা, রেফ্রিজারেটরে কিছু, বাইরে কিছু, দু বোতল বিশুদ্ধ জল। তিনবার জল বদলাবে, আর খাবার দেবে দু বেলা।

নিশ্চয়ই করব। এ কোনও ব্যাপার হল! কিন্তু...

কিন্তু কী?

বিন্দিয়া, হরিদাস, আর ওই সুরঞ্জিত, ওরা থাকছে না?

তা থাকছে।

মনিক সিগারেট ধরান। ধোঁয়া ছুড়ে দিয়ে দেয়ালে টাঙানো সুনীল দাসের ঘোড়ায়, বলেন, থাকছে কিন্তু...

কিন্তু কী?

কিন্তু আমার লুলু ভুলু তো এখানকার কুকুরদের মতো আবর্জনা খায় না, ফেলে দেওয়া হাড় হাড্ডিও খায় না। ওদের জন্য প্যারিস থেকে প্যাকেটের খাবার আসে।

তো?

আমার সন্দেহ হয়, ওরা লুলু ভুলুকে খাওয়াবে না। মনিক গলা নিচু করে বলেন।

নীলা উৎসুক জানতে, খাওয়াবে না কেন?

কারণ ওরা নিজেরা ও খাবার খেয়ে ফেলবে।

নিজেরাই খেয়ে নেবে? বলো কী! কখনও খেয়েছে আগে?

খায়নি।

তবে?

খেতে পারে।

বিশ্বাস কী! খেতে পারে।

নীলা বিষম এক বিবমিষা নিয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

বাড়ির উঠোনে সেদ্ধ ভাত ছড়িয়ে নিখিল আকাশে তাকিয়ে কা কা কা কা করছে।

কা কা শব্দ শুনে কাক এসে ছড়ানো ভাত খাবে, তারপর নিখিল খাবে। মাতৃদায় সহজ জিনিস নয়, কাককে খাইয়ে তবে নিজে খেতে হয়।

নিখিলের পেছনে দাঁড়িয়ে নীলা বলে, আচ্ছা তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস করো যে মা কাক হয়ে গেছেন?

পাগল নাকি তুই? নিয়ম, তাই করতে হয়। নিখিল আকাশ থেকে মুখ না ফিরিয়ে বলে।

নিজেকে কমুনিস্ট বলো, আবার তারাপীঠের মন্দিরে গিয়ে ফুল দাও, খাবার আগে কাক খাওয়াও! মেলে না কিছু। নীলা মরা সবজি বাগানে একটি পচা টমাটো পায়ে চটকে বলে।

শুনে নিখিল শুকনো ঠোঁটে হাসে। নীলা টেনে নিয়ে যায় নিখিলকে ঘরের ভেতর। গলার ধড়া খুলে নেয় এক টানে, ইস কী অবস্থা, এই পরেই স্নান করছ, গায়েই এই কাপড় শুকোচ্ছ! জামা পরো তো, খোলো এসব। এভাবে মায়ের ঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। যত্তসব অদ্ভুত রীতি। যাও স্নান করে এসো, জামা জুতো পরে এসো, চলো কোনও ভাল রেস্তোরাঁয় গিয়ে খেয়ে আসি।

বাদ দে। আর কটা দিন মাত্র আছে। নিখিল ক্লান্ত গলায় বলে। সে যাবে না কোথাও, সেদ্ধ শাকান্নই খাবে।

তবে কাকের আগে নিজে খাও। নীলা নিখিলের মুখের ভেতর খাবার ঠেলে দেয়।

খেয়ে, ঘরের গুমোট গরম থেকে বেরিয়ে মাঠে ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে নিখিল। চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে।

নীলাও পাশে এসে বসে।

দাদা সত্যি করে বলো তো, তুমি কি এই ধর্ম কর্ম হিন্দু আচার এসব আসলেই বিশ্বাস করো?

এসব কি বিশ্বাসের জিনিস?

তা হলে করো কেন?

এক ধরনের মজা আছে এসবে।

মজা? আমি তো কোনও মজা দেখি না। যুক্তিহীন জিনিস সব। ফালতু আবেগ।

ধর, আজ যদি পুজো উঠে যায়, তোর কি ভাল লাগবে? খালি খালি লাগবে না? উৎসবের আনন্দ আর কোথায় পাবি!

তোমার মনে আছে দাদা, এই মাঠে আমরা যখন লুকোচুরি খেলতাম, তুমি ওই বেদিটার পেছনে বেশির ভাগ সময় লুকোতে! আর তোমাকে সবার আগে খুঁজে পেতাম আমি।

তোর লুকোনো ছিল অন্যরকম। আমগাছের মগডালে।

মনে আছে সেই প্রফুল্লদের বাড়ির পেয়ারাগাছের কথা? তুমি গিয়ে সব পাকা পেয়ারাগুলো চুরি করে আনলে...আর প্রফুল্ল বাবার কাছে বিচার নিয়ে এল!

নিখিল হা হা হাসে।

কেমন লেগেছিল বাবার পিটুনিগুলো? উফ।

আর রাতে, পূর্ণিমা রাতে, এত বাড়িঘর ওঠেনি তখন আশপাশে, মা মাঠে বসে রজনীকান্তের গান গাইতেন, সে কী চমৎকার গানের গলা ছিল মার...

অনেকক্ষণ দুজনের কেউ কোনও কথা বলে না।

সূর্যাস্তের আকাশের লালচে রঙের দিকে উদাস তাকিয়ে নীলা নীরবতা ভাঙে, জানো দাদা, মা একদিন ফিরে আসবেন। ফিরে কলতলায় পায়ের কাদা ধুতে ধুতে বলবেন, হঠাৎ দার্জিলিং গিয়েছিলাম, তোরা সব ভাল ছিলি তো! দার্জিলিঙের গল্প শোনাতে শোনাতে মা আমাদের খাওয়াবেন রাতে, নেপথলিনের গন্ধঅলা লাল পাড় শাড়ি পরে এই মাঠে বসে মা আমাদের আগের মতো গান শোনাবেন...

নীলা চকিতে উঠে দাঁড়ায়, বলে, আজ রাস্তায় দেখলাম, পঁচাশি বছরের এক বুড়ো হেঁটে যাচ্ছে। ওর কী দরকার ছিল বেঁচে থাকার। কাউকে বাঁচতে দেখলে অসম্ভব রাগ হয় আমার। পৃথিবীর সব গাছ যদি মরে কাঠ হয়ে যেত, পাহাড়গুলো ধসে যেত বাড়িঘরের ওপর, নদী সমুদ্র শুকিয়ে চর হয়ে যেত, সেই চরে পশুপাখি মানুষ এক বিষম অসুখে কাতারে কাতারে মরে যেত! আর এই কুৎসিত পৃথিবীটা যদি মহাকাশে ছিঁড়ে পড়ত হঠাৎ, সূর্যের দু হাত কাছে গিয়ে ঝলসে যেত, ছাই হয়ে যেত।

নীলা খেয়াল করে তার গা কাঁপছে। শিথিল হয়ে যাচ্ছে সমস্ত শরীর। নিখিলের পাশে ঘাসের ওপর শুয়ে পড়ে সে, ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, জানো দাদা, আমার খুব একা লাগে। ভীষণ একা লাগে।

তুই কি সত্যি প্যারিস চলে যাচ্ছিস?

আমার কি না যেয়ে উপায় আছে, দাদা?

কবে ফিরবি?

কোথায়?

কোথায় আবার? কলকাতায়।

নীলা উত্তর দেয় না।

বাবার কথায় রাগ করেছিস তো! তুই চলে গেলে আবার ঠিক ঠিকই ভেবে মরবেন, কেমন আছিস ওখানে, সুখে আছিস তো!

সুখ! দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসে সুখ শব্দটি।

বাবা জানেন না কিষানলাল যে বিয়ে করেছিল আগে। আমি সেদিন মাত্র জানলাম, সুনীল বলল। কাউকে বলিনি।

বোলো না। কী দরকার। বাবা আবার চুনকালির ভয়ে অতিষ্ঠ হবেন।

তুই সে কারণেই কিষানকে ছেড়ে গিয়েছিলি, তাই বলল সুনীল। ও বিয়ে নাকি অনেকটা পাতানো বিয়ে ছিল, নাগরিকত্ব পাবার জন্য। ওটাকে ধরিস না।

ধরছি না।

এবার গিয়ে ভাল একটা শ্যানেল পাঠাস তো, আগে যেটা পাঠিয়েছিলি, নকল ছিল।

নকল কী করে বুঝলে?

মোটে গন্ধ নেই। কলকাতা থেকে যে শ্যানেল কিনি, ওতে কড়া গন্ধ থাকে।

আমি যেটা পাঠিয়েছিলাম, সেটাই আসল শ্যানেল।

ওটা কবেই ফেলে দিয়েছি।

আসল ফেলে নকলটা ব্যবহার করছ তো! আমার অতগুলো টাকা জলে ফেললে।

নীলার ভাল লাগছিল ওভাবে ঘাসে শুয়ে থাকতে। ফুরফুরে হাওয়ায় নীলার চুল উড়ছিল। পাখিরা ঝাঁক বেঁধে ঘরে ফিরছে। পাঁচিলের ওপর প্রতিবেশীর দুটো বেড়াল বসে ছিল, ওরাও লেজ গুটিয়ে ফিরে যাচ্ছে।

নিখিলও একসময় বলে, যাই ইন্টারনেটে চ্যাট করি গিয়ে।

নীলা শুয়ে থাকে ঘাসে। আকাশে একটি একটি তারা ফুটতে থাকে, আর নীলা একটি উজ্জ্বল তারা খোঁজে। নীলা যখন ছোট, মলিনা একবার বলেছিলেন, মানুষ মরে গেলে আকাশে তারা হয়ে ফুটে থাকে।

নীলার যাবার দিন, মঞ্জুষা এসে নীলার সুটকেস গুছিয়ে দিতে দিতে বারবারই বলেন, মানিয়ে থাকিস কিষানলালের সঙ্গে। বিয়ে তো তোকে জোর করে কেউ দেয়নি, তোর নিজের ইচ্ছেতেই হয়েছে।

অনির্বাণ প্যারিসে ফোন করে কিষানলালকে জানিয়ে দেন নীলা কখন কটায় গিয়ে পৌঁছবে। পিতার কর্তব্য করেন তিনি।

বিমানবন্দরের ভেতরে ঢোকার আগে, নিখিল পকেট থেকে একটি কৌটো বের করে নীলার হাতে দেয়, এটা রাখ।

কী এটা?

মার ছাই।

মা আমার কাছে মা, ছাই নয়। নীলা ফিরিয়ে দেয় কৌটো।

বিমানে ঢুকে চেয়ারে হেলান দিয়ে কলকাতাকে অ রভোয়া বলে নীলা।

তারপর জিজ্ঞেস করে নিজেকে, নীলা তুমি জানো তুমি কোথায় যাচ্ছ? কার কাছে যাচ্ছ?

নিজেকেই উত্তর দেয় সে, না।

তুমি কি জানো তোমার এই জীবন নিয়ে কী করবে তুমি?

না।

বেনোয়া দুপঁ

দমদম থেকে শার্ল দ্য গোল।

মাঝখানে বেনোয়া দুপঁ ঘটে যায়।

নীলা বসেছিল জানালার ধারে, পাশের আসনে বেনোয়া। সোনালি চুলের বেনোয়া। নীল চোখের বেনোয়া। গোলাপি ঠোঁটের বেনোয়া। ফরাসি যুবক বেনোয়া। ছ ফুট তিন ইঞ্চি বেনোয়া। নীল জিনস বেনোয়া। সাদা টিশার্ট বেনোয়া। কালো বুটজুতো বেনোয়া। ম্যাক ল্যাপটপ বেনোয়া।

চোখে চঞ্চলতা বেনোয়ার, বারবার নীলায়, নীলার উদাস চোখে, এলো চুলে, গালের কালো তিলে, কপালের ছোট্ট কাটা দাগে। মাথার ওপরের ছোট আলো ল্যাপটপে আর বেনোয়ার চোখের আলো নীলায়, জানালায় মাথা রেখে বাইরের অদ্ভুত অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা নীলায়। অন্ধকার সরিয়ে উজ্জ্বল একটি তারা খোঁজা নীলায়।

সাদা মেঘবালিকারা পাখির মতো উড়ে উড়ে যাচ্ছে কোথাও, বাড়ি ফিরছে! সবাই বাড়ি ফেরে, মেঘেরাও, কেবল নীলাই ফেরে না।

রাতের খাবার নিয়ে এলে, নীলা বলে দেয় সে খাবে না।

বেনোয়া শুরু করে এভাবে, অন্ধকারে কী দেখছেন এত?

আমাকে বলছেন?

হ্যাঁ আপনাকেই।

ম্লান হেসে বলে নীলা, অন্ধকারে অন্ধকার দেখছি।

অন্ধকারে কিছু কি দেখা যায়?

যায়, অন্ধকার দেখা যায়।

অদ্ভুত।

অন্ধকারেরও রূপ আছে। অন্যরকম।

বেনোয়া শ্যাম্পেন পান করে ধীরে। বলে, আমার দেখা হয়নি কোনওদিন।

শ্যাম্পেন শেষ করে খাবার খেতে খেতে বেনোয়া আবার বলে, এই বিমানে সম্ভবত আর কেউ নেই যে কিছু খাচ্ছে না, পান করছে না। কেবল অন্ধকার দেখছে।

নীলা ফেরে না।

প্যারিস যাচ্ছেন বেড়াতে?

নীলা ফেরে না।

দুঃখিত, আমি বোধহয় আপনাকে বিরক্ত করছি।

নীলা ফেরে, কিছু বলছেন আমাকে?

প্যারিস যাচ্ছেন বেড়াতে?

নাহ!

তবে?

থাকতে!

প্যারিসে কী করছেন, লেখাপড়া?

না।

চাকরি?

না।

বেনোয়ার চোখে নীল কৌতূহল, তার চোখের নীল মণির সঙ্গে গাঢ় নীল হয়ে সেঁটে থাকে।

ওখানে কি একা থাকেন? না কি সংসার আছে?

নীলা উত্তর দেয় না।

ওখানে আত্মীয় আছে?

নীলা মাথা নাড়ে। নেই।

তবে কে আছে?

কেউ নেই।

তাহলে বলুন একা থাকেন ওখানে।

খাওয়া শেষ হওয়ার পরও বেনোয়া লাল ওয়াইনের নতুন বোতল নেয়।

আমি বেনোয়া দুপঁ।

নীলা মাথা নাড়ে, শুনেছে সে যে সে বেনোয়া দুপঁ।

আপনি? আপনার নাম?

নীলা।

নীলা, দ্যা ভারতীয় সুন্দরী।

নীলা স্পষ্ট বুঝতে পারে, বেনোয়া দুপঁ তার সঙ্গে কথা বলতে চায় আরও। এরকম হয়, দীর্ঘ বিমানযাত্রায় একঠায় বসে থাকা ক্লান্তিকর বলে পাশের যাত্রীকে কোথায় যাওয়া হচ্ছে, কেন যাওয়া হচ্ছে, কী করা হয়, কোথায় থাকা হয়, বিয়ে হয়েছে কি না, বিয়ে হলে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে কি না, বাচ্চা কাচ্চা হলে বয়স কার কত, কী খেতে পছন্দ, কী গান পছন্দ, কোনও বিশেষ শখ আছে কি না, থাকলে কী, যদি কোনও বইয়ে চোখ বুলোতে থাকে পাশের জন, কী বই এটা, কার লেখা, এই লেখক আর কী বই লিখেছে, কোনটা তার পড়া হয়েছে, কোনটি হয়নি জিজ্ঞেস করে বারো ঘণ্টার যাত্রাকে কমিয়ে অন্তত ছ ঘণ্টায় আনা যায়। বেনোয়া দুপঁ এই একঘেয়ে বসে থাকার চেয়ে পাশের রহস্যময়ীর রহস্য উদ্ধারে ব্যস্ত হতে চাইছে। গতবার প্যারিস যাওয়ার সময়, নীলার পাশের আসনে বসে থাকা ওলন্দাজ মেয়েকে নীলা এরকমই প্রশ্ন করেছিল, যত না একঘেয়েমি কাটাতে তার চেয়ে বেশি সাদা রঙের আকর্ষণে, সাদা রং কী করে, কী খায়। বয়স তেতাল্লিশ গাব্রিয়েলার, পাঁচ বছর ধরে

ভারত থেকে কাপড় কিনে নিয়ে যায় নিজের দেশে বিক্রি করতে, কেবল কাপড় নয়, পাথরের মালা, দুল, আগরবাতি, শিবমূর্তি। কত টাকায় কেনে, কত লাভ হয়, কত টাকা বাড়িভাড়া দিতে হয় তার, কত টাকা খাওয়ার খরচা, কত যায় ভ্রমণে এসবের হিসেবও দিয়েছিল, আরও ব্যক্তিগততে গিয়ে বলেছিল, বিয়ে থা করেনি সে, একা থাকে, তবে একেবারে একাও নয়, মাঝে মাঝে প্রেম হয়, প্রেমিকের সঙ্গে দুবছর একবছর কাটানোও হয়, গাব্রিয়েলার শেষ প্রেমিক ছিল আবু নাসের, মিশরের ছেলে, মাস দুই পর নাসেরকে সে বলেছে ব্যস, যথেষ্ট হয়েছে, এবার বিদেয় হও, নাসের বিদেয় হওয়ার লোক ছিল না, শেষে পুলিশ ডেকে বিদেয় করতে হয়েছে। তারপর গভীর ব্যক্তিগততে গিয়ে বলেছিল, নাসের দুমিনিটে কাত। হা হা। কখনও গেছ আমস্টারডামে? না। কী আছে দেখার? পতিতা। পতিতা দেখার জিনিস? নিশ্চয়ই। রাস্তার কিনারে সারি সারি কাচের ঘরে পতিতারা উলঙ্গ দাঁড়িয়ে থাকে, তাই দেখতে লক্ষ লোকের ভিড় হয় ও শহরে। নীলা ওয়াক করে। আর কী আছে দেখার? আর দেখার আছে স্বাধীনতা। কী রকম? উড়ে বেড়াবার। মারিহুয়ানার ধোঁয়া পিঠে দুটো পাখা বসিয়ে দেয়, তারপর শহর জুড়ে উড়ে বেড়াও, নেচে বেড়াও হা হা। বিমান থামলে সেই গাব্রিয়েলা বাই বলে নেমে গেল, পেছন ফেরেনি, নীলার ঠিকানাও নেয়নি, নিজেরটিও দেয়নি। প্যারিস থেকে কলকাতা যাবার পথেও প্রায় ওরকম হয়েছিল। নীলার পাশে এক শিখ যুবক তার জীবনের শুরু থেকে শেষ অব্দি নিজের জীবনের সব গল্প বলে নীলার গল্প শুনে গুরুনানকের জীবনের নানা দর্শন বর্ণনা করে কলকাতায় নেমে গেল। নীলা জানে ওই শিখের সঙ্গে নীলার আর কখনও দেখা হবে না, শিখের নামটিও নীলার জানা হয়নি। সে জানে নাগাড়ে বারো ঘণ্টা বসে থাকাকে কেবল বসে থাকা যেন না মনে হয় সে কারণে গল্প বলা এবং শোনা।

জানে বলে এ যাত্রায় নীলা কোনও আগ্রহ দেখায় না বেনোয়ার লাগামছাড়া উৎসাহের।

বেনোয়া এই প্রথম ভারতে এল, ভারতের দিল্লিতে নেমেছিল, আগ্রা ঘুরে চন্দননগর গেছে, চন্দননগর থেকে কলকাতা, ওখানে দুদিন কাটিয়ে ফিরে যাচ্ছে প্যারিসে। ভালয় ভালয় ফিরছে, অসুখ বিসুখ কিছু করেনি। অবশ্য প্যারিসের ডাক্তার তাকে ভারতে যাবার আগেই ম্যালেরিয়া থেকে শুরু করে যত রোগ শোক আছে পৃথিবীতে সব কিছুর প্রতিরোধক দিয়েছিল। আফ্রিকা যাবার বেলাতেও তাই হয়েছিল বেনোয়ার।

আমার তো কোথাও গেলে ওষুধ লাগে না। আপনার লাগে কেন?

আমাদের লাগে।

আপনাদের মানে?

ইয়োরোপিয়ানদের। সাদাদের।

ও।

আচ্ছা, ভারতীয় মেয়েরা এত সুন্দরী হয় কেন?

নীলা চমকায় প্রশ্ন শুনে। কিন্তু এটিই প্রশ্ন বেনোয়ার, ভারতীয় মেয়েরা কেন এত সুন্দরী!

কই আমি তো সুন্দরী নই!

বেনোয়া হাসে।

ভারতীয় মেয়েদের যে এত মিথ্যে বলার অভ্যেস আছে, তা অবশ্য আমার জানা ছিল না।

বেনোয়া তার ভারত সফরে কোথায় কত মেয়ে দেখেছে, এবং কোথায় কোন মেয়েকে দেখে মনে হয়েছে, ভগবান নিজের হাতে তৈরি করেছেন, এবং রাস্তায় ভিখিরি মেয়েদের থেকেও সে চোখ ফেরাতে পারেনি, এসব বলে বলে নীলাকে বাইরের অন্ধকার থেকে ফেরায় এবং শেষে একটি কথাই জোর দিয়ে বলে যে এ তার অনেক বড় সৌভাগ্য যে সে একজন ভারতীয় মেয়ের পাশে বসে আছে এবং কথা বলছে। কিন্তু সে একাই বকবক করছে, নীলা যদি কেবল হ্যাঁ না বা আচ্ছা ছাড়া আরও কিছু বলে, কিছু পূর্ণ বাক্য টাক্য, বেনোয়া দুপঁর জীবন সার্থক হবে।

আমি সুন্দরী হব কেন? আমি তো সাদা নই।

সাদা মেয়েরা বুঝি সুন্দরী? সাদা মেয়েরা ফ্যাকাশে। দেখেছেন কেমন কুৎসিত ভঙ্গিতে হাঁটে, ফ্যাসফ্যাস করে কথা বলে। বুক চিতিয়ে, ঘাড় উঁচিয়ে, দেখতে কেমন উটের মতো লাগে। এদের সঙ্গে ঘুমোনো যায়, কিন্তু প্রেম করা যায় না। বেনোয়া ঝুঁকে বলে, নীলার দিকে।

তাহলে এ অব্দি কোনও সাদা মেয়ের প্রেমে পড়েননি?

প্রেমে পড়েছিলাম এক ইথিওপিয়ার মেয়ের। আগুনের মতো সুন্দরী। কিন্তু সে মেয়ে,... গন উইদ দ্য উইন্ড।

প্রেম করলে ভারতীয় মেয়ের সঙ্গে করব। এ আমার সিদ্ধান্ত। বেনোয়া চোখ টেপে।

ভারতীয় মেয়ে পাবেন কোথায়? ভারতে তো থাকেন না।

না থাকি। প্যারিসে কি ভারতীয় মেয়ের অভাব আছে?

যারা আছে সবাই বিবাহিত।

আপনিও কি বিবাহিত?

আমিও।

বেনোয়ার কপাল ভাঁজ পড়ে সাতটা।

তবে যে বললেন কেউ নেই আপনার?

আমি স্বামীর সঙ্গে থাকি না। তাকে আমার কেউ বলে মনে হয় না।

বেশ জটিল ব্যাপার।

বেনোয়া এরপর নিজের বিয়ের কথা বলে, নিজে সে বিয়ে করেছে এক সাদাকে। একটি মেয়ে আছে, জ্যাকলিন, তরতর করে বড় হয়ে যাচ্ছে।

আপনার বয়স কত নীলা? কুড়ি পার হয়নি নিশ্চয়ই।

সাতাশ।

সাতাশ? দেখে, উনিশ মতো লাগে।

আপনার কত?

পঁচিশ।

পঁচিশ? নীলা অবাক হয়।

কেন দেখে কি বেশি বয়স লাগে? কত ভেবেছিলেন?

নীলা ভেবেছিল বিয়াল্লিশের নীচে নয়। কিন্তু কমিয়ে বলে তিরিশ কি বত্রিশ।

শুনে হা হা হাসে বেনোয়া, রীতিমতো বুড়ো বানিয়ে ফেলেছিলেন।

কপালে সাতটা, চোখের কোণে চার দ্বিগুণে আট মোট পনেরোটা ভাঁজ, কী করে সে ভাববে বিয়াল্লিশ নয়।

বিমানের ভেতর আলো নিবে যায়, ব্যাস চেয়ার পেছনে হেলিয়ে ঘুমিয়ে যাও সব। ঘুম না এলে টেলিভিশনে বোবা ছবি দেখো, শব্দ শুনতে চাইলে চেয়ারের হাতলে লাগানো শব্দ যন্ত্র কানে লাগিয়ে শব্দ শোনো।

টেলিভিশনের শব্দ শুনতে না চাও, গান শোনো। বেনোয়া ছবিও দেখবে না, শব্দ যন্ত্রও কানে লাগাবে না, গান শুনবে না, ঘুমোবেও না। একটির পর একটি লাল ওয়াইনের বোতল শেষ করছে আর বলছে, পাসকালের সঙ্গে তার চার বছর আগে বিয়ে হয়েছে, প্রথম প্রথম বেশ উত্তেজনা ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে কেমন যেন একঘেয়ে লাগছে, ঠিক এরকম ধরাবাঁধা জীবন সে চায়নি, অন্য কিছু চেয়েছিল, অন্যরকম কিছু।

কী রকম?

ঠিক জানি না কী রকম। তবে অন্যরকম।

বিমানের কেউ কেউ হাতের কাছের আলো বইয়ে ফেলে পড়ছে, কেউ হাঁ হয়ে আছে টেলিভিশনের দিকে। কেউ চেয়ারে ঘুমোচ্ছে, কেউ আবার তিনটে চেয়ার দখল করে লম্বা হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বেনোয়া ফিসফিস করে, কারও যেন ঘুম না ভাঙে, আর ফিসফিসের কারণে তার নীলার দিকে সরে আসতে হয় অনেকটা। নীলারও সরতে হয় বেনোয়ার দিকে অনেকটা।

প্যারিসে কোথায় থাকেন?

ছিলাম গার দ্য নর্দের কাছে, এরপর পাঁচ এরনদিসময়, গার দ্য অস্তারলিজের কাছে, এক বান্ধবীর বাড়িতে।

এখন কি বান্ধবীর বাড়িতেই উঠবেন।

ঠিক জানি না।

আপনি কি সমকামী?

নীলা জানালায় তাকায়, অল্প অল্প আলো ফুটছে।

না কি উভকামী?

নীলা উন্মূল উদ্বাস্তুর মতো, বেনোয়াও তা টের পায়। নীলার কণ্ঠেও তা, অনিশ্চয়তা।

প্যারিসে কারও সঙ্গে প্রেম করেননি?

নীলা মাথা নাড়ে।

কোনও ফরাসি প্রেমিক?

না।

আপনি কি সবসময়ই কথা এত কম বলেন।

কম বলছি কোথায়!

আমি একটু বাচাল তা জানি। কিন্তু ভারতীয়রাও বাচাল শুনেছি। আপনাকে আমার ভারতীয়র চেয়ে ইয়োরোপিয়ান মনে হচ্ছে বেশি।

ইয়োরোপিয়ানরা কি কম কথা বলে?

মেপে কথা বলে। যার তার সঙ্গে বলে না। খামোখা বলে না।

আপনিও না?

মেপে হয়তো বলছি না, কিন্তু খামোখা বলছি না।

কী উদ্দেশ্য শুনি?

আপনি আমার কাছে এখনও রহস্য। উদ্দেশ্য রহস্যের গভীরে যাওয়া।

নীলা তাকায় বেনোয়ার নীল চোখে। স্বপ্নে যে সব সুদর্শনকে প্রেমিক হিসেবে ভেবেছে এতকাল, বেনোয়ার সঙ্গে তাদের কারও তুলনা হয় না। বেনোয়া নীলার যে কোনও স্বপ্নপুরুষের চেয়ে বেশি সুদর্শন। সোনালি কটা চুল বেনোয়ার কপালে পড়েছে এসে, ইচ্ছে করে চুলগুলো সরিয়ে দেয় সে। ইচ্ছে করে চুল সরিয়ে দিতে গিয়ে স্পর্শ করতে বেনোয়ার উজ্জ্বল ত্বক।

ইচ্ছেকে প্রশ্রয় না দিতে নীলা জানালায় ফেরায় চোখ। আকাশে অদ্ভুত এক আলো। এরকম আলো নীলা কখনও দেখেনি।

কী অপূর্ব! নীলা গলা চেপে চিৎকার করে ওঠে। এত সুন্দর কী করে হয় রং?

ইচ্ছে করে দিগন্তের ওই রংগুলোকে স্পর্শ করতে, মুঠো মুঠো তুলে আনতে ওই রং, গায়ে মাখতে।

বেনোয়াও ঝুঁকে থাকে, জানালায়, নীলায়।

নীলা টের পায় না বেনোয়া তার হাতটি নিয়েছে হাতে, সে হাতে আঙুল বুলোচ্ছে।

নীলার চোখের মুগ্ধতার দিকে অপলক তাকিয়ে বেনোয়া বলে অপূর্ব!

তাই না?

তাই।

এত চমৎকার আলো আমি আর আগে দেখিনি।

আমিও না। এত আলো কোথায় পেলেন আপনি, নীলা?

নীলা চমকে তাকায়। দেখে বেনোয়ার চোখ আকাশে নয়, তার চোখে।

আপনি আকাশের আলো দেখেননি?

দেখেছি, আমি আপনার চোখের আলো দেখেছি।

নীলা জানে, বেনোয়ার এই আবেগ আর কিছুক্ষণ পর নিবে যাবে। প্যারিস পৌঁছে বেনোয়া বাই বলে নেমে যাবে। স্বপ্নালু চোখদুটো নেমে যাবে। হাজার অচেনা মানুষের স্রোতে ভেসে যাবে। আর নীলা দাঁড়িয়ে থাকবে, না কূলে, না জলে।

কিন্তু নীলাকে অবাক করে প্যারিস পৌঁছে বেনোয়া বলে, খুব তাড়া নেই নিশ্চয়ই আপনার। গার দ্য অস্তারলিজের উলটোদিকে যাবেন তো। আমার বাড়িতে এক কাপ কফি খেয়ে গেলে নিশ্চয়ই আপনার বান্ধবী রাগ করবে না খুব!

ও জানেই না আমি এসেছি। নীলা হেসে বলে।

তা হলে আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করছে না প্যারিসে? আমার সৌভাগ্য, চলুন চলুন।

বেনোয়া গাড়ি রেখে গিয়েছিল বিমানবন্দরের গাড়ি পার্কিংয়ে। লাল পুযো।

নীলাকে তুলে নিয়ে সোজা রু দ্য রেনের দিকে যায় সে। প্যারিসের স্নিগ্ধ সুন্দর সকাল দেখতে দেখতে যায় নীলা, ফুসফুস ভরে হাওয়া নেয়। বসন্ত নাকি গ্রীষ্ম এখন, নীলা হিসেব করে না, সে হাওয়ায় বসন্তের ঘ্রাণ পাচ্ছে। কলাপাতা রঙের সবুজে ছেয়ে আছে ঘাস, সবুজ পাতার পোশাকে সেজে আছে প্যারিস। গাছে ফুল, ঘাসে ফুল, বাড়ির জানালায় ফুল, ফুলেশ্বরী প্যারিসকে নতুন চোখে দেখে নীলা।

বেনোয়া বাড়ির সামনে গাড়ি রেখে নিজের সুটকেস নামিয়ে নেয়, নীলার দুটো থেকে যায় পুযোর পেটে।

সুন্দর সাজানো গোছানো বাড়ি বেনোয়ার।

নীলা জিজ্ঞেস করে, আপনার বউ বাড়ি নেই?

বউ থাকে স্টারসবুর্গে। ওখানে মেয়রের অফিসে চাকরি করে, ছুটিছাটায় প্যারিসে আসে।

বেনোয়া নিস্পৃহ কণ্ঠে বউয়ের স্টারসবুর্গ থাকার খবরটি দেয়। নীলা সোফায় বসে ঘরটি দেখে, আবছা আলো ঘরটিতে, জানালার ভারী পর্দা ফুঁড়ে আসছে সকালের রোদ। সোফার পাশে একটি বিছানা, তার পাশে গানের যন্ত্র, গানের যন্ত্রের পাশে একটি তাকে কিছু বই, কিছু সিডি, কিছু ভিডিও। ঘরটির সামনে খোলা রান্নাঘর, কফি বানানোর মেশিনে জল ঢালতে ঢালতে বেনোয়া জিজ্ঞেস করে, কফিতে চিনি?

আমি কফি খাই না।

তবে কী খান?

চা।

চা তো নেই।!

তবে যাই বলে নীলা উঠে দাঁড়াল। কফি খেতে ডেকেছে বেনোয়া তাকে, কফি যে সে খায় না, তা আগে সম্ভবত জানানো উচিত ছিল তার, যেহেতু সে জানায়নি, চায়ের সরঞ্জামাদি জোগাড় করা এখন সম্ভব নয়, যেহেতু সম্ভব নয়, এবং তার পক্ষে কফি পান করাও সম্ভব নয়, তবে, নীলা অনুমান করে, তার বিদায় নেওয়াই ভদ্র আচরণ। নীলার যাই শুনে বেনোয়া কফি রেখে সামনে এসে দাঁড়ায় নীলার। চোখে চেয়ে থাকে। নীলা চোখ নামিয়ে নেয়।

পান করার কিছু নেই বলে চলে যেতে হবে? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

নীলা উত্তর দেয় না, নখের তলের ময়লা খোঁটে।

নীলার হাতদুটো ধরে বেনোয়া নীলার কাছে সরতে থাকে, সরতে সরতে ধুকপুক করা বুকের কাছে। নীলা ছিটকে সরে যায়, আর ছিটকে সরে যাওয়া দ্য ভারতীয় সুন্দরীকে টেনে এনে বুকে জড়িয়ে গভীর চুমু খায় বেনোয়া।

কী হচ্ছে কী! নীলা নিজেকে ছাড়িয়ে বলে।

আমাকে পান করো নীলা, আমাকে পান করো। বেনোয়া নিবিড় কণ্ঠে বলে।

নীলার মনে হয় না এ বাস্তবে ঘটছে। মনে হয় এখনও সে বিমানের ভেতর বসা, আর আকাশের অদ্ভুত আলোর দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছে।

এমন চুমু নীলাকে কেউ খায়নি কোনওদিন। নীলা জানে না চুমু এরকম গভীর হতে পারে। তার সমস্ত শরীর অবশ মতো হয়ে আসে, আর অবশ মতো শরীরটিকে তুলে তুলো-মেঘের

মতো নরম বিছানায় শুইয়ে দিয়ে একটি একটি করে জামা খুলে ফেলে। কী সুন্দর তুমি, নীলা ও নীলা, ভগবান তোমাকে নিজের হাতে গড়েছেন বলে বলে নীলার সারা শরীরে চুমু খায় বেনোয়া। চুলে কপালে কানে চোখে নাকে ঠোঁটে জিভে গালে চিবুকে গলায় ঘাড়ে পিঠে বুকে বাহুতে হাতে আঙুলে স্তনে পেটে তলপেটে নিতম্বে উরুতে উরুসন্ধিতে হাঁটুতে পায়ে নখে পায়ের পাতায়।

নীলার সারা শরীর ভিজে ওঠে চুমুতে। চোখ বুজে থাকে সে।

এত সুখ সে তার সাতাশ বছরের জীবনে কখনও পায়নি।

এত আনন্দ তার জীবনে কখনও আসবে সে ভাবেনি। এই নির্মম নিষ্ঠুর কুৎসিত পৃথিবীতে ভালবাসা যে এত গভীর হতে পারে, সঙ্গম যে এত অসম্ভব সুন্দর হতে পারে, আগে সে কখনও অনুমানও করেনি।

নীলার জীবনে, নীলার অলক্ষেই ঘটে যায় বেনোয়া দুপঁ।

বেনোয়ার বেনো জল

সারাদিন ঘোরে কাটে নীলার। সন্ধেয় দানিয়েলের বাড়িতে নীলাকে পৌঁছে দিয়ে বেনোয়া বলে যায়, কাল সন্ধে সাতটা। মোপারনাস, ক্লসারি দ্য লিলা। ঠিক তো?

ঠিক।

দানিয়েল ঘরেই ছিল, দরজা খুলে নীলাকে দেখে অবাক, তুমি প্যারিসে? কবে এলে?

আজ।

নীলা ঘরে ঢুকে দেখে ঘর সেই আগের মতোই, তবে ঘরে অন্য এক মেয়ে।

ও নাতালি, আমার প্রেমিকা।

নাতালি পাতলা জামা গায়ে বিছানায় শুয়েছিল। উঠে বসল। প্রথম পরিচয়ের বেলায় যা করে, হাতে হাত ধরে ঝাঁকানো, তা চলে নীলা আর নাতালিতে, আর দানিয়েলের সঙ্গে নীলার গালে গাল লাগিয়ে চুমু।

নাতালি প্রভান্সের মেয়ে, প্যারিসে নতুন এসেছে, এখন, হ্যাঁ এখানেই থাকবে। নাতালি মিষ্টি হাসে। ছোট করে কাটা বাদামি চুল মাথায়, বাদামি চোখ। বাদামি চোখদুটোও হাসে। নীলা কে, তার পরিচয় দিতে হয় না নাতালিকে, সে জানে, দানিয়েলই নীলার গল্প করেছে ওর কাছে।

আমি তো জানি তুমি আর ফিরবে না, প্যারিসে। দানিয়েল বলে।

নীলা চেয়ার টেনে বসে, ভেবেছিলাম ফিরব না, কিন্তু ফিরতে হল।

কোথায় উঠেছ?

নীলা এর উত্তর তক্ষুনি দিতে পারে না। দানিয়েলের বাড়িতে উঠেছে বলেই সে জানে। কিন্তু প্রশ্ন তার জিভকে ভারী করে রাখে।

দানিয়েল সিগারেটে লম্বা একটি টান দিয়ে বলে, প্রথমেই বলে নিই, এ ঘরে কিন্তু এখন নাতালি আর আমি থাকছি, তোমাকে অন্য কোথাও থাকতে হবে।

সিগারেটটি দানিয়েল নাতালিকে দেয় ফুঁকতে।

তা যাবে কোথায় জানো?

নীলা জানে না, দানিয়েলের এখানে আশ্রয় না মিললে সে যাবে কোথায়।

পকেটে রাখা বেনোয়ার ঠিকানা ফোন নম্বর লেখা কাগজটি সে স্পর্শ করে, যেন সে বেনোয়ার শরীর স্পর্শ করছে। শরীরে তার অদ্ভুত এক শিহরন জাগে। বেনোয়ার তীব্র শীৎকার এখনও তার কানে লেগে আছে, এখনও শরীর ভিজে আছে বেনোয়ার বেনো জলে। এখনও নীলা ঘোরে।

নাতালি সিগারেটটি আবার দানিয়েলকে দেয় ফুঁকতে।

টানবে মারিহুয়ানা?

নীলা কোনওদিন মারিহুয়ানার স্বাদ নেয়নি। স্বাদ নিতে গিয়ে, এক টানেই মাথা ঝিমঝিম করে নীলার।

ঘরে ছড়িয়ে আছে নাতালির জুতো জামা। বেড়েছে বই। টেবিলে একটির জায়গায় দুটো কম্পিউটার।

আমার ছবিগুলো? ইজেল? নীলা জিজ্ঞেস করে।

দানিয়েল মারিহুয়ানায় টান দিয়ে হাসে। হাসতে হাসতে বলে, ঘরে জায়গা নেই। ফেলে দিতে হয়েছে।

দানিয়েল মজা করছে, নীলা ভাবে।

সত্যি করে বলো, কোথায় রেখেছ ইজেল, আমি ছবি আঁকা শুরু করব আবার। নীলার দিকে একটি স্বপ্নশিশু হামাগুড়ি দিতে দিতে এগোয়।

দানিয়েল আবারও বলে, ফেলে দিয়েছি।

নীলার সংকোচ হয় ইজেল আর ছবি বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন করতে। দানিয়েল ওগুলো ফেলে দিয়েছে, এর অর্থ ওগুলো বিরক্তিকর ঠেকেছে তার কাছে, তাই যদি হয়, ওগুলোর প্রসঙ্গও বিরক্তিকর নিশ্চয়ই।

বদল করে সে প্রসঙ্গ, তোমার ওই মনিকের সঙ্গে কলকাতায় দেখা করেছিলাম।

তাই নাকি? মনিক চমৎকার মানুষ, তাই না? দানিয়েলের উচ্ছ্বাস উপচে পড়ে।

মনিক কলকাতা অন্ত প্রাণ। কলকাতা সম্পর্কে এত বিস্তর জ্ঞান তাঁর, এমন জ্ঞান কোনও কলকাতা বিশেষজ্ঞরও নেই। জঁ রাসিন কলকাতা বিষয়ে কী জানে, তার চেয়ে অনেক বেশি জানেন মনিক। এত ধুলো, এত ভিড়, এত নোংরা কলকাতা, তারপরও ওই কলকাতাকে ভালবেসে তিনি থেকে গেছেন ওখানে। গরিবদের দুহাতে সাহায্য করেন। এমন বড় হৃদয়ের মানুষ, সহসা দেখা যায় না। বাঙালি জাতিকে এত ভাল আর কেউ বাসেনি।

নীলা দানিয়েলকে থামিয়ে বলে, আমার মনে হয় না।

কী মনে হয় না?

মনে হয় না মনিক খুব বড় হৃদয়ের মানুষ। মনে হয় না তিনি কলকাতার মানুষদের সত্যিকার শ্রদ্ধা করেন। নীলা তার মনে না হওয়ার কথাকটি বলে শুধু, কেন তার মনে হয় না, তা বলতে যাবার আগেই দানিয়েল বারুদের মতো জ্বলে ওঠে, চেঁচিয়ে চিলেকোঠা চৌচির করে,

তুমি এক আশ্চর্য চরিত্র নীলা। মোটেও তুমি লোককে বাহবা দিতে চাও না। মনিকের মতো মেয়ের প্রশংসা তুমি করতে চাও না। আমি তোমার জন্য কম করেছি? তোমার জন্য আমি কলকাতা পর্যন্ত গেছি, গেছি তোমার পাশে থাকার জন্য, তোমাকে সাহস আর শক্তি জোগাতে। তোমার জন্য ভেবেছি, তোমার জন্য করেছি, আর বিনিময়ে তুমি কী করেছ? জঘন্য ব্যবহার করেছ, যাচ্ছেতাই রকম অবহেলা করেছ, অপমান করেছ। এই প্যারিসে তোমার কোথাও যাওয়ার জায়গা ছিল না, আমি তোমাকে আশ্রয় দিয়েছিলাম, আমি দিয়েছিলাম আমি। অথচ প্রথম দিনই তুমি আমার সঙ্গে মিথ্যে কথা বলেছ। বলেছ, নাচতে জানো না, অথচ তুমি নাচতে জানো। নিকলের বাড়িতে তোমাকে নেমন্তন্ন খেতে নিয়েছি, তুমি ইচ্ছে করেই ভাল কোনও ড্রেস পরোনি, পরে গেছ জিনস। এত তোমাকে খাতির করল

নিকল, ওকে তুমি যাওয়ার আগে একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত বলোনি। ক্যাথারিনের বাড়িতে হঠাৎ গিয়ে হাজির হয়েছিলে, এমন অদ্ভুত আচরণ এ দেশে কেউ করে না, ক্যাথারিন না হয়ে অন্য কেউ হলে পুলিশ ডাকত, ও তোমাকে সাহায্য কম করেছে? তুমি জানতেই না কারখানার কাছে কোথায় রেস্তোরাঁ, ও তোমাকে চিনিয়েছে, পোস্টাপিস কোথায় তাও তো তুমি জানতে না, ও দেখিয়ে দিয়েছে। অথচ ওর সঙ্গে তুমি অনেকদিন হেসে কথা বলোনি। তুমি ভাবো, অন্যরা তোমার জন্য করবে, করাটা অন্যের দায়িত্ব আর তুমি রানির মতো বসে সব উপভোগ করবে আর যারা করবে তাদের দিকে তুমি অবজ্ঞা ছুড়বে, এভাবেই জীবন চলবে তোমার, ভেবেছ? দেখলাম তো কী বুর্জোয়া পরিবারের মেয়ে তুমি। খামোখা তো স্বভাব নষ্ট হয়নি। যা চাও, পেয়ে যাও হাতের কাছে, কোনও কিছু পেতে তোমার পরিশ্রম করতে হয় না। তোমার এই স্বভাব বদলাও নীলা, নাহলে ভুগে মরবে। কেউ তোমার দাস বা দাসী হবার জন্য বসে নেই। ইয়োরোপের ধনীরাও এত প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে না, ভারতের মতো গরিব দেশে যেমন তুমি ছিলে। আর এখন এখানে এসেছ শ্রমিকের জীবন যাপন করতে? দারিদ্র্য পোহাতে? ধনীর আবার শখের শেষ নেই। তুমি ওই ইজেল চাইছ আর ছবি, ফেলে দিয়েছি। তুমি ছবি না, ছাই আঁকতে জানো! কিচ্ছু হয় না ওসব। ওগুলো ফেলে দেওয়ার মতো জিনিস, তাই দিয়েছি। আর বেশি কথা না। আমাদের নেমন্তন্ন আছে। বেরোতে হবে। তোমাকে আর সময় দিতে পারছি না নীলা। যথেষ্ট বিরক্ত করেছ আমাকে, আর নয়।

নীলা দ্রুত বেরিয়ে যায় ভারী সুটকেসদুটো নিয়ে। একটি একটি করে সুটকেস ওপর থেকে নীচে নামায়, এখানে রামকিরণ নেই যে সুটকেস নামাবে, এখানে সিঁড়ির কাছে গাড়ি অপেক্ষা করছে না যে সে উঠে বসবে, চালককে গন্তব্য বলে দেবে। এখানে তার কোনও গাড়ি নেই, চালক নেই, এবং সবচেয়ে বড় যেটি নেই তার, সে হল গন্তব্য। নীচে নেমে, রাস্তায়, নীলার ইচ্ছে করে কাছের ফোন বুথ থেকে ফোন করে বেনোয়াকে।

কী বলবে! আমাকে তোমার বাড়িতে আশ্রয় দাও! লজ্জার কী আছে আর তার! সব লজ্জা কি আজ সারাদিন বেনোয়ার বেনোজলে ভেসে যায়নি!

নীলা প্রথম কিছুক্ষণ ইতস্তত করেও ফোন করে বেনোয়ার নম্বরে, বেনোয়া ফোন ধরেও।

কী করছ?

তোমাকে ভাবছি। হা হা।

সত্যি?

সত্যি সত্যি সত্যি।

আমিও ভাবছি তোমাকে।

বান্ধবী নিশ্চয় তোমাকে পেয়ে খুব খুশি?

নীলা থামে এখানে। বান্ধবী যে তাকে পেয়ে খুব খুশি হয়নি, এ কথা নীলার জিভে গড়াগড়ি খায়। জিভ থেকে খসে পড়লেই নীলা বেনোয়ার কাছে প্রমাণ করবে সে এ শহরে অবাঞ্ছিত এক মানুষ। নীলার ভয় হয়, আবার না বেনোয়ার কাছেও সে অবাঞ্ছিত হয়। যে কুকুরটিকে একজন লাথি দেয়, নীলা দেখেছে তাকে সবাই লাথি দেয়, তার ভয় হয়। জিভের গড়াগড়ি খাওয়া কথাগুলো ভেতরে ফিরিয়ে নিয়ে বলে সে, হ্যাঁ খুশি।

আমার কথা বলেছ ওকে?

বলেছি।

কী বলল?

বলল, তা ওর বাড়িতে গিয়ে থাকো না কেন? বলে নীলা অপেক্ষা করে, অপেক্ষা করে বেনোয়া বলবে, তা চলে আসছ না কেন আমার কাছে। আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধু হে, ফিরে এসো, আমার করুণ কোমল, এসো, ওগো, সজলজলদস্নিগ্ধকান্ত সুন্দর, ফিরে এসো, আমার নিতিসুখ, ফিরে এসো, আমার চিরবাঞ্ছিত, এসো! আমার চিতসঞ্চিত, এসো! ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এসো! আমার বক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার চক্ষে ফিরিয়া এসো, আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এসো!

বেনোয়া হাসে, হেসে বলে, কাল কিন্তু ক্লজারি দ্য লিলা, একশো একাত্তর বুলেভার্ড মোপারনাস, মনে আছে তো?

নীলার নিশ্চয়ই মনে আছে। তার স্মরণশক্তি এখনও ধসে পড়েনি, তবে রেস্তোরাঁর খাবারের চেয়ে এই মুহূর্তে নীলার কাছে একটি চার দেয়ালের ঘর আর মাথার ওপর ছাদ সবচেয়ে বেশি প্রার্থনীয়।

জিজ্ঞেস করে সে, ওখানে যাব, খাব। তারপর?

তারপর আমার বাড়িতে কফি খেতে আসবে।

তারপর?

অনুমান করো।

অনুমান করতে পারছি না। আর জানো তো কফি খাই না আমি।

তাহলে আমাকে খাবে।

আমার এত খিদে নেই।

আছে।

কী করে জানো?

আমি জানি।

খুব অভিজ্ঞ বুঝি তুমি?

খুব না হলেও কিছুটা তো। বোঝোনি?

বেনোয়া হাসে একা একাই। নীলা চুপ হয়ে শোনে। শোনে, তোমার বান্ধবীকে বলে রেখো, কাল তোমার ফিরতে রাত হবে। ভেবো না, আমি পৌঁছে দিয়ে আসব।

হাতে অনেক টাকা থাকলে সে কোনও হোটেলে উঠত। কারও বাড়িতে ধরনা দেওয়ার, কাউকে বিরক্ত করার লজ্জা থেকে নিজে সে মুক্ত হত। কিন্তু এই মুহূর্তে সহায় হতে পারে এক কিষান আর সুনীল। অনির্বাণের সঙ্গে কিষানের যে কথা হয়েছে, তাতে সে জানায়নি যে নীলার পাট সে চুকিয়েছে। একটি ট্যাক্সি ডেকে প্রথম রু দ্য ফুবোই বলে নীলা, পরে মাঝপথে মত পালটে বলে, রু দ্য রিভলি।

চৈতালি ছিল বাড়িতে। নীলাকে দেখে চমকে ওঠে, তুমি কোত্থেকে?

নীলা টের পায়, কোথাও তাকে কেউ আশা করছে না। দানিয়েলও ঠিক এই সুরে এ কথা জিজ্ঞেস করেছে। কলকাতার মেয়ে কলকাতায় থাকবে এই ভেবে নিয়েছিল সবাই। প্যারিস

নীলার জন্য নয়, অথবা নীলা প্যারিসের জন্য নয়, এরকম একটি সরল অঙ্ক কষা হয়ে গেছে চৈতালিরও। অনাহুত অবাঞ্ছিত চৈতালিকে পাশ কেটে সে ভেতরে ঢোকে।

কী ঘটনা, বলো। চৈতালি তার চমকানো চোখ নিয়ে জানতে চায়।

কিছু ঘটনা নয়। কলকাতা থেকে এলাম। থাকার জায়গা খুঁজে বেড়াচ্ছি। শেষ অব্দি এখানে...

এই তো একটু আগে কিষান ফোন করল। বলল ও সকালে বিমানবন্দরে গিয়েছিল, কথা তো ছিলই এমন!

নীলা বলে, আমার সঙ্গে কথা হয়নি।

বলল, তুমি নাকি এক ফরাসি ছেলের হাত ধরে চলে গেলে, ওর দিকে ফিরেও তাকাওনি!

নীলার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে। জল চেয়ে খায়।

কী হয়েছে কী তোমার?

কিছু হয়নি তো!

নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

সোফায় গা ছেড়ে দেয় নীলা। সুটকেস পড়ে থাকে দরজার কাছে। চৈতালি বলে না সুটকেস ভেতরের ঘরে নিয়ে যেতে, বড় ধকলের কথাও বলে না, স্নান সেরে আসার কথাও না, কিছু খাবার কথাও না। অথচ এই চৈতালিই গতবার নীলা প্যারিস এলে আপন দিদির মতো স্নেহ ঢেলেছিল, গায়ের কোট খুলে ঢেকে দিয়েছিল নীলার গা, স্নান করতে পাঠিয়েছিল, খেতে দিয়েছিল। মানুষ কত তাড়াতাড়ি বদলে যায়! নীলা ভাবে।

মুখ চুন করে কিছুক্ষণ বসে থেকে চৈতালি সুনীলকে ফোন করে। কথা বলা শেষ করে নীলার সামনে আবারও মুখ চুন করে বসে।

কী বলল সুনীলদা?

শোনো নীলা! সুনীলের সঙ্গে কিষানের সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে গেছে তোমার কারণে। এখন কিষান যদি জানে যে তুমি আমাদের বাড়িতে উঠেছ, সুনীলের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগবে। ব্যাপারটা ভাল দেখায় না। স্বামীর কল্যাণকামনায় যে স্ত্রী সকাল সন্ধ্যা ঠাকুরকে ডাকে, সে স্ত্রীর জন্য এ অস্বাভাবিক নয় যে স্বামীর অমঙ্গল আশঙ্কায় সে বিষাদকাতর হবে, আর তার কাতরতা যতদূর ছড়ানো যায়, ছড়াবে।

নীলা বলে, আমি কলকাতা থেকে কিষানের বাড়ি যাবার জন্য আসিনি।

তবে কী?

না, এখানে থাকার জন্যও আসিনি। আমি একটি বাড়ি ভাড়া নেব শিগরি। কলকাতা থেকে আমার টাকা এসে না পৌঁছোনো পর্যন্ত এখানে থাকব। আমাকে অন্য কোথাও যেতে বোলো না।

চৈতালি আবার ফোন করতে ওঠে সুনীলকে। চৈতালির বিষাদ নীলাকেও কুরে খাচ্ছে, সে দ্রুত সুটকেসদুটো তুলে নিয়ে বেরিয়ে যায়। ফিরে যাওয়ার জন্য পেছনে চৈতালির কোনও ডাক সে শোনে না। রাস্তায় নামলে একেবারে গা ঘেঁষে গাড়ি থামাল সুনীল।

কোথায় যাচ্ছে নীলা? সে জানে না সে কোথায় যাচ্ছে। কিষানের বাড়ি যেতে চাইলে, সুনীল প্রস্তাব দেয়, সে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারে। কিষানের বাড়িতে নীলা যাচ্ছে না। তবে কি সেই বান্ধবীর বাড়িতে যাচ্ছে? যেতে চাইলে সুনীল ওখানেও পৌঁছে দেবে। না, সে বাড়িতেও নীলা যাচ্ছে না। তবে সে যাচ্ছেটা কোথায়? সে কোথাও কারও বাড়িতে যাচ্ছে না, যে কোনও রাস্তাই তার ঠিকানা, এর চেয়ে নিরাপদ আপাতত তার সামনে কিছু নেই, রাস্তা থেকে তাকে অন্তত কেউ তাড়িয়ে দেবে না। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা নীলাকে সুনীল টেনে ওপরে তোলে। তারপর ধীরে সুস্থে, মাথা ঠাণ্ডা করে যে প্রশ্নের উত্তর সুনীল নীলাকে দিতে বলে, তা হল কিষানের বাড়িতে সে কেন যেতে চাইছে না।

কিষানের বাড়িতে তার যেতে ইচ্ছে করছে না। ঠাণ্ডা মাথা উত্তর।

ইচ্ছের বাইরে মেয়েদের অনেক কিছু করতে হয় নীলা! চৈতালি কঠিন স্বরে বলে।

চৈতালির মতে ইচ্ছের বাইরে নীলাকে কিষানের বাড়ি গিয়ে নিজের সংসার গুছিয়ে নেওয়া উচিত। সুনীলের মতে নীলার উচিত কলকাতা ফিরে যাওয়া।

কিন্তু নীলা কিষানের সঙ্গে সংসার করবে না, কলকাতায়ও ফিরবে না। ওই নোংরা সমাজে সে আর ফিরতে চায় না। বালিগঞ্জের বাড়িতে ফিরে গেলে অনির্বাণের মুখে চুনকালি পড়বে, ও বাড়ি থেকে বেরিয়ে যদি সে শহরে কোথাও একা থাকতে চায়, লোকে ছি ছি করবে। চাকরি বাকরি করে সে একা থাকার ব্যবস্থা নিশ্চয় করতে পারে, কিন্তু সে জীবন এক দুর্বিসহ জীবন, এ সে জানে। স্বামী ছেড়ে এসেছে যে মেয়ে, সে মেয়ে নষ্ট, সে মেয়ে পচা, সে মেয়ে পতিতা, তার ওপর বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়বে যত কামুক পুরুষ।

আবার বিয়ে করার প্রসঙ্গ ওঠে।

একবার বিয়ে হওয়া মেয়েকে বিয়ে করতে কে আসবে? কেউ না। যদি কেউ আসে, সে হবে সত্তর বছরের বুড়ো, নয়তো চরিত্রহীন, নয়তো পাগল, নয়তো...

চৈতালি মাঝখানে আসল প্রশ্নটি করে, বিমানবন্দরে কার হাত ধরে যাচ্ছিলে, কে সে?

নীলার গলা শুকিয়ে আসে। জল চেয়ে নয়, এবার নিয়ে খায়। ঢোক গিলে বলে, এক বন্ধু।

ফরাসি বন্ধু তোমার সঙ্গে কলকাতা থেকে ফিরেছে? নাকি তোমাকে তুলে আনতে গিয়েছিল?

ওই বিমানে পরিচয়।

বিমানে পরিচয় ছেলে তোমার বন্ধু হয়ে গেল? এত শিগরি?

সুনীল হেসে ওঠে, এ হাসিতে সুখের ছিটেফোঁটা নেই। চৈতালি এবং সুনীল দুজনেরই ধারণা নীলার বোধবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে।

বন্ধু হওয়া এত সোজা জিনিস নয় নীলা, বারো বছর একসঙ্গে চলাফেরা করেও দেখা যায়, বন্ধুত্বই হল না।

নীলা বোধবুদ্ধি প্রমাণ করতে যুক্তি দেখায়, আবার একদিনেও হয় তো। হয় না?

সুনীল হাসে। এ হাসি সম্মতির হাসি নয়।

ওসব বাদ দাও, সময়ে বুঝতে পারবে, জীবন কোথাও সহজ নয়। কলকাতায় নয়, প্যারিসেও নয়। খানিক থেমে দু পা ছড়িয়ে সামনে, দু হাত ছড়িয়ে সোফার কাঁধে, বলে

কিষানলালের যে মানসিক অবস্থা, যে কোনও সময় সে তোমাকে ডিভোর্স দিতে পারে, তখন তো তোমার কলকাতা না ফিরে উপায় নেই।

টুম্পাকে ঘুম পাড়াতে যাবার জন্য ওঠে চৈতালি, শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, তা হবে কেন, ওর ওই ফরাসি বন্ধু ওকে বিয়ে করলেই তো সব ঝামেলা ফুরোয়।

সুনীলের কাছে সরে এসে নীলা খুব বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মেয়ের মতো কিছু টাকা ধার চায়, যা সে শোধ দিয়ে দেবে, কলকাতা যাবার সময় যে টাকা ধার করেছিল, তাও দেবে, খুব শিগরি, কুড়ি লক্ষ টাকাটা প্যারিস পৌঁছে গেলেই। বেশি নয়, তার পাঁচ হাজার ফ্রাঁ হলেই চলবে। তবে এক্ষুনি লাগছে না, কদিন পরে হলেও চলবে। সুনীল বুঝে পায় না এতগুলো ফ্রাঁ দিয়ে নীলা করবে কী, এ বাড়িতে আছো। বাড়ি ভাড়া নেই, খাওয়ার খরচা নেই। আপাতত তো এখানেই থাকছ। আপাতত নীলা এখানেই থাকছে তা ঠিক। কিন্তু নীলার দরকার আছে টাকার। কিছু পরিকল্পনা আছে তার। খামোকা টাকা চায়নি। আর এও নীলা জানিয়ে দেয়, প্যারিসে ভিখিরি হয়ে থাকতে সে আসেনি। যদি সুনীলের কোনওরকম সন্দেহ হয়, সে নিখিলের কাছে ফোন করে জেনে নিতে পারে কুড়ি লক্ষ টাকা নীলার আছে কি নেই।

চৈতালির পুজোর ঘরে নীলার জন্য বিছানা পেতে দেওয়া হয়। দুর্গা, সরস্বতী, কালী, লক্ষ্মীকে ঘাড়ের পেছনে রেখে নীলাকে শুতে হয়। সারারাত সে এপাশ ওপাশ করে শুয়ে। সকাল হবে, সকাল পার হয়ে দুপুর, দুপুর গেলে বিকেল, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বিকেল যাবে, তারপর সেই আনন্দসাগরে ঝাঁপ দেওয়া, বেনোয়ার বেনো জলে ভেসে যাওয়া। নীলা ঘড়ির কাঁটার দিকে চেয়ে থাকে। কাঁটা এত ধীরে চলতে সে আর দেখেনি। তার তর সয় না।

সারা বিকেল সে বাথটাবে শুয়ে কাটাল। শরীরের আনাচ কানাচে যত ধুলো ময়লা দূর করে ভাল যত পোশাক আছে প্রতিটি পরে আয়নায় নিজেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার দেখে যেটির তুলনা নেই সেটিই শেষ অব্দি নির্বাচন করে, পরে, চোখের ভুরুতে, পাতায়, কিনারে, গালে, ঠোঁটে রং লাগিয়ে; পয়জন-এর সবুজ শিশি উপুড় করে সারা গায়ে ঢেলে নীলা যখন তৈরি, তখন বাজে সাড়ে পাঁচটা। বাকিটা সময় অপেক্ষা, না নড়ে না চড়ে কেবল দুর্গামূর্তির মতো বসে থেকে অপেক্ষা। শুয়ে গড়ালে পোশাকের ইস্ত্রি ভেঙে যাবে, চুলের ঢেউ যাবে নষ্ট হয়ে, কিছু খেলে বা পান করলে, ঠোঁটের রং যাবে উঠে, নীলা তাই কিছুই করল না। কেবল বুকের শব্দ শুনল আর স্থির চোখে দেখল ঘড়ির কাঁটার দ্রুত পার হওয়া।

ক্লজারি দ্য লিলায় ভারতীয় রূপসী নেমে এলে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকা ফরাসি সুদর্শন বিস্ফারিত চোখে সে রূপ দেখে প্রায় উড়ে এসে রূপসিকে বুকে গাঢ় আলিঙ্গনে পিষে গভীর চুমু খেল। চোখে চোখে নয়, কথা হল জিভে জিভে। অমৃতের মতো পান করল একে অপরের প্রেমার্দ্র জিভজল।

ফরাসি চুমুর এমন গা বিবশ করে দেওয়া স্বাদ পেয়ে রূপসি শরীর কাঁপে।

তুমি আমাকে পাগল করে দেবে নীলা। বেনোয়া বলে।

এত যত্নে রাখা ঠোঁটের রং উবে গিয়ে গাঢ় বাদামি রঙের ঠোঁট বেরিয়ে আসে নীলার, সেটি ঢাকতে ঠোঁট বিযুক্ত করে নীলা নাকে পাউডার লাগাতে যায়। ফিরে আসে রক্তাভ ঠোঁট নিয়ে, নিশ্চিন্ত।

বেনোয়ার মুখোমুখি বসে নীলা বলে, এত লোকের সামনে তুমি এই করলে?

কী করলাম?

জানো না বুঝি কী করলে, নীলার ঠোঁটে কামড়, ঠোঁটে হাসি, চোখে শরম।

অন্যায় কিছু করেছি? বেনোয়া ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, নীল তারায় নীলা নিজের মুখটি দেখে।

চুমু খেলে যে!

বেনোয়া হো হো হেসে বলল, তোমার আপত্তি ছিল কি!

নীলা মেনু টেনে নিয়ে মুখ ঢাকল। মেনু সরিয়ে চোখে চোখ, আপত্তি ছিল?

হেসে নামিয়ে নিল চোখ, চিবুক, চিবুকের কালো তিল।

এই, আমার চুমু আমি খেয়েছি, এতে অন্য লোকের কী!

রাস্তায়, পার্কে, মেট্রোয় ছেলেমেয়েদের অহর্নিশি চুমু খেতে দেখে নীলা, দেখতে দেখতে চুমু ব্যাপারটি তার কাছে অনেকটা মেপেল গাছের পাতা অথবা গাছে ঝুলে থাকা আপেল দেখার মতো। কিন্তু চুমু নিজের ঠোঁটে এসে পড়লে সেটি যেন অন্য কিছু, সেটি আর দেখা নয়, অনুভব করা কেবল। শরীরের প্রতি কোষে অনুভব করা। আর সেটি অন্যরকম নিশ্চয়ই, সে চুমু যদি সোনালি চুলের নীল চোখের কোনও সুঠাম সুদর্শন যুবকের হয়, সে চুমু যদি ফরাসি চুমু হয়।

কী খাবে বলো! ফোয়া গ্রা?

এ আবার কী জিনিস?

হাঁসের কলিজা, হাঁসকে খুব করে খাইয়ে তারপব কলিজা বের করে নিয়ে এ জিনিস তৈরি করা হয়।

বর্ণনায় নীলার রুচি চলে যায়।

তাহলে সালাদ নেবে? মোৎজারেলা আর টমাটো?

পনির তো! পছন্দ করি না।

খাবে কী তা হলে?

মাছ টাছ নেই? আমি আবার মাছের দেশের মেয়ে।

সামুদ্রিক মাছ আছে, নিতে পারো!

ধুত, সমুদ্রের মাছে স্বাদ নেই, পুকুরের মাছ নেই?

মেনু দেখতে দেখতে বেনোয়া মাথা নাড়ে, নেই।

এনত্রোকোত নেবে? ও এ তো তুমি খাবে না।

কেন খাব না? আগে একদিন খেয়েছি।

গোরু তো তোমাদের দেবতা!

নীলা হাসি সামলে বলল, ওই এনত্রোকোতই নেব।

তুমি ধর্ম মানো না?

আমার ধর্ম আমার কাছে।

বেনোয়া চোখ নাচিয়ে বলে, তোমার ধর্মে তা হলে গোরু খাওয়া আছে!

নীলা গম্ভীর মুখ করে বলে যায়, হিন্দু ধর্মে গোরু খাওয়া নিষেধ কে বলেছে? বৈদিক যুগে

গোরু খাওয়া হত। তারপর ব্রাহ্মণরা নিজেদের উঁচু জাতকে আলাদা করতে কিছু নিষেধের আয়োজন করল, ব্রাহ্মণ গোরু খাবে না। এরপর ব্রাহ্মণের নীচে যে জাত, সে জাতও গোরু খাওয়া বন্ধ করল, তার নীচের জাতের সঙ্গে নিজেদের আলাদা করার জন্য। এভাবেই যে যত জাতে উঠতে চায়, গোরু না খাওয়া এক ধরনের রীতি করে তুলল!

এখানে কিন্তু জাতে উঠতে গেলে গোরু খেতে হয়। বেনোয়া বলে।

নীলা কপট বিস্ময় কণ্ঠে বলে, এখানেও জাত আছে? ফরাসি বিপ্লব তা হলে কি জাত ফাত দূর করতে পারেনি? ধনী এলাকা গরিব এলাকা একাকার করতে পারেনি?

বিপ্লব বিষয়ে বেনোয়ার আগ্রহ নেই। সে আগ্রহ প্রকাশ করে বরদো ওয়াইনে, পুরো বোতল বরদো দিতে অনুরোধ করে।

খেতে খেতে নীলা বলল, সে বান্ধবীর বাড়িতে থাকছে না, থাকছে রু দ্য রিভলিতে।

বেশ ধনী এলাকা তো রু দ্য রিভলি। কোনও ফরাসির বাড়ি?

না। বলে নীলা থামে, অপেক্ষা করে বেনোয়া তাকে জিজ্ঞেস করবে যদি ফরাসির নয়, তবে কার। বেনোয়ার এতে, নীলা দেখে, কোনও আগ্রহ নেই। অতঃপর নিজেই বলে, বাঙালির। শুনে বেনোয়ার চোখ হঠাৎ মাছের চোখের মতো গোল।

কেন বাঙালিরা বুঝি ধনী এলাকায় থাকতে পারে না?

না সে কথা বলছি না।

বেনোয়া তবে কোন কথা বলছে, তা অবশ্য বলে না।

লাল বরদোর গেলাস উঠিয়ে বেনোয়া সঁতে বলল, নীলাও সঁতে।

ক্লসারি দ্য লিলায় যাঁদের আড্ডাখানা ছিল, পান করতে করতে যাঁরা রাতকে সকাল করতেন, সেই অগুনতি লেখক শিল্পীদের নাম, থালার তলায় কাগজে লেখা। বোদেলেয়ার থেকে শুরু করে এজরা পাউন্ড, এফ স্কট ফিৎজেরাল্ড, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, জর্জ অরওয়েল, স্যামুয়েল বেকেট! কাগজটিতে চোখ বুলিয়ে নীলা উচ্ছ্বসিত। আচ্ছা, এটা কি সেই রেস্তোরাঁ, যেখানে লেনিন আসতেন, ট্রটস্কি আসতেন!

আমার মনে হয় না। বেনোয়া আশপাশ তাকিয়ে বলে।

খানিক ভেবে নীলা বলে, আমার মন বলছে এটা সেই রেস্তোরাঁ যেখানের তেরাসে বসে হেমিংওয়ে তাঁর সান অলসো রাইজেস লিখেছিলেন, মাত্র ছ সপ্তাহে। কাছেই তো ছিলেন, পিকাসোও আসতেন তাঁর কবিবন্ধু এপোলেনিয়েরকে নিয়ে।

পিকাসো! বেনোয়ার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ পিকাসো, কিন্তু হেমিংওয়ের ব্যাপারটা আমি বুঝি না। প্রচণ্ড দারিদ্র্যের মধ্যে থেকেছেন এই প্যারিসে, যখন চুয়াত্তর কার্দিনাল লেমোয়াঁয় থাকতেন। ঠাণ্ডা ঘরে, ঘরে কোনও গরম জল ছিল না। ঘর গরম করার জন্য জ্বালানি কাঠ কেনার টাকা ছিল না। কোনও তয়লেত ছিল না বাড়িতে। একটি বালতি ব্যবহার করতেন, ব্যাস। আর ঠিক ঠিকই ক্যাফে বারে রেস্তোরাঁয় যেতেন, প্লাস শাঁ মিশেলে ক্যাফে দেসামেচ্যুওর-এ বসে ক্যাফে ও লে পান করতেন। এমনকী ঘোড়দৌড়ের বাজিও খেলতেন। কী করে? একটু খটকা লাগে তাই না?

নীলা তাকায় বেনোয়ার দিকে। রামস্টেক চিবোতে চিবোতে সে বড় বড় চোখে নীলাকে দেখছে। নীলার চোখের সামনে গেলাসের টুং টাং শব্দ, চোখের সামনে পাঁড় মাতালের

হুল্লোড়, আর তাজা তাজা শব্দাবলি, গদ্য পদ্য। শতাব্দীর শুরুতে আমেরিকায় মদ নিষিদ্ধ হওয়ার পর মদারু লেখকেরা রাগ করে আমেরিকা ছেড়ে প্যারিসে এসে মদ্যাশ্রয় নিয়ে এই রেস্তোরাঁয় রাতভর চেঁচাতেন, শব্দের ফুলকি ওঠাতেন, দৃশ্যটি নীলার সামনে স্থির হয়ে থাকে, তার চোখের তারাও স্থির হয়। ঢকঢক করে বেনোয়ার বরদো গেলার শব্দে সংবিৎ ফেরে, হেমিংওয়ের ব্যাপারটা দেখো, তার টাকা সবসময় ফুরিয়ে যায় খাবার কিনতে যাবার সময়। অবশ্য বই কেনার সময়ও। যত বই পড়েছেন, বইয়ের দোকান থেকে ধার করে। খালিপেটে পল সেজানের ছবি দেখে চমৎকার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করার পরামর্শও দিয়েছেন। আমি একদিন সালভাদর দালি মিউজিয়ামে খিদেপেটে ঢুকেছিলাম, মাথা চরকির মতো ঘুরছিল। কাছে কোনও গাছ পেলে ওর ডালে আমি দালির ঘড়ির মতো ঝুলে পড়তাম, আমাকে বেরিয়ে আসতে হল, মোমার্তের ওসব পর্যটক ভোলানো রেস্তোরাঁয় আগে খেতে হল। খেয়ে তারপর দালি দেখলাম। খিদেপেটে সেজান দেখলেও ওই হবে আমার।

ওয়াইন ফুরোলে, বেনোয়া আবার ঢেলে দেয় দুটো গেলাসেই, এক চুমুকে অর্ধেক শেষ করে, নীলা বলে, তবে যাই বলো বেনোয়া, হেমিংওয়ে একটি খুব ভাল কথা বলেছেন, প্যারিসে থাকা কখনও বৃথা যায় না। যা কিছুই তুমি প্যারিসকে দাও, প্যারিস তোমাকে তার বিনিময় দেয়। অবশ্য এসব পুরনো সময়ের কথা। প্যারিস পুরনো আমলে এমনই ছিল, এবং হেমিংওয়েরা খুব গরিব ছিলেন এবং খুব সুখী ছিলেন। আজকাল অন্যরকম, আজকাল হাতে কাঁড়ি কাঁড়ি ফ্রাঁ না হলে তুমি দ্বারে দ্বারে ঘোরো, আশ্রয় চাও, ভিক্ষে চাও, তুমি ভোগো, তুমি মরো।

নীলার চোখদুটো কি ভিজে উঠছে! ভিজে উঠছেই তো। ভিজে উঠছে।

না ভিজে উঠছে না, এনত্রোকোতে সে গোলমরিচটা বেশি ঢেলেছে ভুল করে, তাই। বেনোয়া পরিমাণ মতো নুন আর গোলমরিচ নিয়েছে, ওর চোখ খরার মাটির মতো, শুকনো। ওর চোখ, কান কিছুই জ্বালা করছে না, রং বদলে লাল হচ্ছে না, নাকের অগ্রভাগ সামান্য লালচে যদিও, অত্যধিক বরদো পানের কারণে।

হঠাৎ বান্ধবীর বাড়ি থেকে চলে গেলে কেন নীলা? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

নীলা উত্তর দেয় না, দানিয়েলের বাড়ি থেকে চলে এসে, নীলার মনে হয়, একরকম ভালই হয়েছে। নাতালির সঙ্গে দানিয়েলের সম্পর্ক হওয়াতে তার মুক্তি হয়েছে প্রতি রাতের ওই লকলকে জিভের কবল থেকে। চোখের সামনে জিভটি ঝুলতে থাকে, সে জিভ ঠেলে সরিয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে, ভাল না বেসে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্কে যেতে পারো তুমি?

বেনোয়া বলে, নির্ভর করে।

কীসের ওপর?

পরিবেশ, আর...

আর কী?

আবেগ ইত্যাদি ইত্যাদি। বেনোয়ার অস্পষ্ট উত্তর শুনে, নীলা তার না-লালচে নাকটি তুলে স্পষ্ট করে বলে, আমি পারি না।

ভালবাসার উতল হাওয়া নীলাকে কলকণ্ঠ করে, ভালবাসা কখন যে আচমকা আমাকে এমন গ্রাস করে নিল। হঠাৎই, চোখের পলকে। যখন হাঁটি, চলি, কারও সঙ্গে কথা বলি,

একা বসে থাকি, যখন ঘুমোই, যখন জেগে উঠি, আমি স্পষ্ট টের পাই যে কাউকে আমি ভালবাসি।

তুমি যে তোমার এনত্রোকোত খেলে না!

চেষ্টা করেছি খেতে, কিন্তু এক নম্বর, মশলা ছাড়া রান্না মাংস খেয়ে অভ্যেস নেই, দু নম্বর, গোরুর মাংস খেয়ে অভ্যেস নেই।

আর তিন নম্বর, বেনোয়া বলে, দেবতা খেয়ে অভ্যেস নেই। হা হা।

নীলা হাসে।

আইসক্রিমে দেবতা নেই, সেটা নিশ্চয়ই পারো।

আইসক্রিম খেতে খেতে নীলা তার ইচ্ছের কথা বলে, যে সে একটি বাড়ি ভাড়া নেবে, ভাল একটা চাকরি নেবে। স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন তার বহুদিনের।

কোথায় ভাড়া নেবে?

সে এখনও ঠিক করিনি। বাড়ি ভাড়া নিতেও তো শুনেছি মহা ঝামেলা। ধনী লোককে জিম্মাদার হতে হয়।

বেনোয়া বলে, আমার বাড়ির কাছাকাছি ভাড়া নিয়ো, তা হলে বেশ হবে।

বেনোয়া হাত বাড়িয়ে দেয় নীলার হাতের দিকে। সে হাতে, সে জানে, হাত রাখতে হবে। হাত রাখলে, নীলার সরু আঙুলগুলো আঙুলে বুলোতে থাকে বেনোয়া।

কী চমৎকার করে এরা ভালবাসতে জানে, নীলা ভাবে।

রেস্তোরাঁর লোক লাদিসিয়োঁ দিয়ে যায় বেনোয়ার সামনে। নীলা সেটি ছোঁ মেরে তুলে নেয়।

বেনোয়া হাঁ হাঁ করে ওঠে, করছ কী করছ কী এ তো আমি দেব, আমি তোমাকে নেমন্তন্ন করেছি।

তাতে কী।

সাড়ে আটশো ফ্রাঁ টেবিলে রেখে, বলে, গরিব দেশ থেকে এসেছি বলে কি ভিখিরি নাকি!

বেনোয়া বাধা না দিয়ে বলে, ঠিক আছে এর পর আমি খাওয়াব তোমাকে।

লাদিসিয়োঁ বেনোয়ার সামনে দিয়েছে লোকটি, নিশ্চয়ই ভেবেছিল, নীলার দাম মেটাবার যোগ্যতা নেই। একে কালো, তার ওপর মেয়ে! নীলার এক ধরনের গৌরব হয় খাবারের দাম মিটিয়ে।

গৌরবের মূল্য আছে বটে, এটি ঘাড়ে থাকলে বেনোয়ার তৃষ্ণার্ত গোলাপি ঠোঁটে নীলা খুব সহজে ঠোঁট রাখতে পারে।

রেস্তোরাঁ থেকে উঠে কফি খেতে রেনোয়ার রু দ্য রেনের বাড়িতে যেতে হয়; যথারীতি। আবারও সেই কফি খাব না, চা খাব ব্যাপার।

আর চা যদি না দিতে পারি? অন্য কিছু যদি দিই! চায়ের তৃষ্ণা মিটবে তো। দেখো তো মেটে কি না!

বেনোয়া উঠে গানের যন্ত্রটি চালিয়ে দিয়ে, গেলাসে লাল ওয়াইন ভরে চুমুক দিতে দিতে গানের তালে তালে পা বাড়ায় নীলার দিকে! হোয়েন ইউ ওয়ান্ট ইট, হোয়েন ইউ নিড ইট, ইউ উউল অলওয়েজ হ্যাভ দ্য বেস্ট অব মি, আই কান্ট হেল্প ইট, বিলিভ মি...

নীলাকে বিছানায় শুইয়ে জামা পান্তলুন টেনে খুলে ছুড়ে দেয় মেঝেয়, যেন একগাদা বাড়তি জিনিস নীলা গায়ে জড়িয়েছিল। এরপর দীর্ঘ গভীর চুমু ঠোঁটে, ঠোঁটের লাল চুষে খেতে থাকে, যেন কেবল ঠোঁটেই নয়, ঠোঁটের ওই লালেও আছে মধু, ঠোঁট থেকে ঠোঁট না সরিয়ে দুহাতে খুলে ফেলে নিজের পরনের যা কিছু, ওগুলোও বাড়তি। নীলা শরমে চোখে বোজে, চাদর টেনে দেয় নিজের শরীরে। সেটিও টেনে সরিয়ে নেয় বেনোয়া। এবার নীলার হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর রাখা। হাতদুটোও সরিয়ে বেনোয়া মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে নীলার শরীরে। থরথর কণ্ঠ কাঁপে, কী সুন্দর তুমি নীলা!

নীলা পাশ ফিরে নিজেকে লুকোতে গিয়ে বলে, কী আছে আমার, যে সুন্দর!

তোমার রং। বেনোয়ার কণ্ঠে আবেগ উথলে ওঠে।

রং? এ তো সাদা নয়। নীলা বলে।

সাদা নয় বলেই তো সুন্দর।

মিঠুর মুখটি হঠাৎ মনে পড়ে নীলার। আহা মিঠু, একবার যদি দেখতে পেতিস, এই শ্যামল রঙের কারণে আমাকে ভালবাসছে একজন। আহা মিঠু, তোর জীবনেও হয়তো এমন কেউ আসতে পারত, অপেক্ষা করলি না কেন। আহা মিঠু, জীবনের আশ্চর্য সুন্দর এই রূপটি না দেখেই চলে গেলি, আহা মিঠু...

কী অপূর্ব রং তোমার গায়ের। কী মসৃণ ত্বক। কী চমৎকার রং তোমার চুলের। কী গভীর কালো। কী সুন্দর তোমার স্তন। কারও এমন সুন্দর স্তন আমি দেখিনি। যেন দুটো কচি বাতাবি লেবু। আমাকে পাগল করে দেবে তুমি। বলতে বলতে নীলার বুকের ওপর ফোঁটা ফোঁটা ওয়াইন ঢেলে সেই ওয়াইন জিভে শুষে নেয়।

এতে ওয়াইনের স্বাদ গেছে বেড়ে। সত্যি? সত্যি।

ঠিক?

ঠিক।

এরপর বাকি ওয়াইন নীলার বুকে পেটে তলপেটে ঢেলে পান করে বেনোয়া, আর নীলা বেনোয়ার সোনালি চুলের ভেতর ডুবিয়ে দেয় আঙুল, চুল থেকে বেনোয়ার কামানো গালে, কামানো গাল থেকে লালচে নাকের ডগা, ও থেকে ঠোঁট, ঠোঁট বেয়ে চিবুক, চিবুক থেকে আঙুল উঠে যায় নাক বেয়ে কপালে, কপাল থেকে আঙুলের আদর চোখের ভুরুতে, বোজা চোখের পাতায়...ব্রায়ান এডামসের সঙ্গে বেনোয়া তখন গাইছে—আই মে নট অলওয়েজ নো হোয়াটস রাইট, বাট আই নো আই ওয়ান্ট ইউ হেয়ার টুনাইট, গনা মেক দিজ মোমেন্ট লাস্ট ফর অল ইয়োর লাইফ, ওহ ইয়া দিজ ইজ লাভ, এন ইট রিয়েলি মিন সো মাচ, আই ক্যান টেল ফ্রম এভরি টাচ...

স্তনজোড়ায় প্রথম পালকের মতো স্পর্শ আঙুলের। এরপর পাখির ঠোঁটের মতো নাক এসে চুমু খায় দুটোয়, এরপর বেনোয়া জিভের জলে ভিজিয়ে দেয় দুটো, ঘুমিয়ে থাকা কালো স্তনবৃন্তদুটো অল্প অল্প জাগতে থাকে, সেই জাগতে থাকা পলক না ফেলে দেখে, ঠোঁট নেমে আসে জেগে ওঠা বৃন্তে, আলতো করে চুমু খায়, যেন স্তনবৃন্তের চোখের পাতায় চুমু খেল, এই চুমুতে বৃন্ত যখন পুরো জেগে চোখ খোলে, শেষ অমৃতের পাত্র থেকে তলানি নিঃশেষ করার মতো বেপরোয়া বেনোয়া ও দুটো লেহন করে বলতে বলতে যে এ তার চেরি

ফল। বেনোয়াকে বেনোয়া মনে হয় না তার, যেন এপোলো, এপোলো তার আফ্রোদিতিকে ভালবাসছে, গভীর করে ভালবাসছে।

নীলার বুক থেকে পেটে চুমু খেতে খেতে বেনোয়া নীচে নামতে থাকে, লাজুক যৌনাঙ্গে। দু উরু শক্ত করে যুক্ত করে রাখা, দুটোকে দুহাতে বিযুক্ত করতে করতে বেনোয়া বলে, তোমার স্বাদ নিতে দাও নীলা, তোমার স্বাদ নিতে দাও।

না।

কেন?

কী বিচ্ছিরি ব্যাপার!

তোমার কোমল কালো লোমগুলো কী অপূর্ব। তারও নীচে আমি জানি, অমৃত আছে। আমাকে পান করতে দাও।

ধীরে ধীরে দু উরু বিযুক্ত করে বেনোয়া। নীলাকে চোখ ঢাকতে হয় লজ্জায়।

যৌনাঙ্গের ঠোঁটজোড়া জিভের জলে ভিজিয়ে দিয়ে বেনোয়া আরও গভীরে আরও জল উপচে পড়া নদীর দিকে যায়, মোমের মৃদু আলোয় বেনোয়াকে ডুবুরির মতো দেখতে লাগে। সবটুকু জল সে শুষে নিতে থাকে অন্ধ উন্মাদের মতো, যেন অমৃতসাগর সে খুঁজে পেয়েছে, পুরো অমৃত পান না করলে তার মৃত্যু হবে, এমনই তৃষ্ণার্ত তার শরীর।

বেনোয়া ফিসফিস করে বলে, চোখ খোলো নীলা। দেখো আমাকে। স্পর্শ করো। চুমু খাও।

নীলা চোখ খুলে আঁতকে ওঠে, প্রকাণ্ড এক শিশ্ন নীলার চোখের সামনে দপদপ করছে, যেন শিশ্ন নয়, বনাগ্নির লেলিহান শিখা। ভয়ে লজ্জায় সে চোখ বোজে। পুরুষঅঙ্গ, জীবনে দুটোই তাকে ছুঁয়েছে, সুশান্তরটির দিকে লজ্জায় সে তাকায়নি, কিষানেরটির দিকে হঠাৎ চোখ পড়েছিল, কড়ে আঙুলের মতো অথবা নেংটিইঁদুরের লেজের মতো দেখতে। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কিষানের শিশ্ন উইয়ের ঢিবি যদি হয়, বেনোয়ার অঙ্গ হিমালয়। হিমালয়কে শেষ অব্দি স্পর্শ করে নীলা, মুঠো করে ধরেও নখের নাগাল পায় না, হাত থরথর কাঁপে তার। বেনোয়া নীলার ঠোঁটের কাছে লেলিহান শিখাটিকে, বিশাল দৈত্যটিকে আনে, চুমু পেতে।

এমন মড়ার মতো শুয়ে থাকো কেন? কালও চোখ বুজে মড়া হয়ে ছিলে, চোখ খোলো, দেখো, অনুভব করো, আনন্দ করো। হাতে নাও, মুখে নাও, গালে নাও, বুকে নাও, আমাকে জাগাও, আমাকে বাজাও। এ তো আমার একার নয়, এ আনন্দ আমাদের দুজনের।

চিত হয়ে মড়ার মতো শুয়ে থাকাই নীলার অভ্যেস। এ খেলার নিয়মই, সে জানে, এমন। মেয়ে শুয়ে থাকবে চোখ বুজে, আর পুরুষ সেই মৃতপ্রায় শরীরের ওপর চড়ে বসে সুখ নেবে। নিয়ে নেমে যাবে। মেয়ে যদি কিছু পায় তো পেল, না পেলে না পেল।

বেনোয়া নীলার শরীরের ওপর নিজের শরীর ফেলে না, দু হাতে ভর রেখে শরীরকে তুলে রাখে শরীরের ওপর, কেবল সেই দৈত্যটি তার অথৈ জলের কাছে গোড়ালি ভেজাতে থাকে। নীলা ছটফট করে, তীব্র এক তৃষ্ণা তাকে কামড়াতে থাকে, জল ফুসে উঠলে দৈত্যটি তীরের বালুতে দৌড়ে চলে যায়। জল ফুসতে থাকে, ওকে পেতে। ও যাবে না। এ কী খেলা, মুখের কাছে টোপ ঝুলিয়ে রেখেছ, খেতে দাও। নীলা চোখ খুলে দেখে বেনোয়া হাসছে। দুহাতে বেনোয়ার পিঠ আঁকড়ে নিজের দিকে টানে সে।

কী চাও, বলো। বেনোয়া ফিসফিস করে। আবছা আলো এসে পড়েছে অদ্ভুত সুন্দর মুখে। এত গভীর নিকটে এমন সুদর্শন নীলা কখনও দেখেনি আগে। নীলার সারা গা ভালবাসায় কাঁপে।

বলো কী চাও।

লাজে রক্তিম হয় নীলা, সে বলে না সে কী চায়। ডানে কাত করে মাথা, বেনোয়াও ডানে ফেরে, নীলা বামে ঘোরায়, বেনোয়াও বামে।

কী, দেরি সইছে না বুঝি?

দেরি সইছে না তার কিন্তু মুখে এ কথা বলতে সে জানে না, শেখেনি, অভ্যেস নেই। ব্রীড়ার চাদর তাকে আমূল ঢেকে রাখে।

বেনোয়া মিষ্টি মিষ্টি হাসে। দুষ্টু দুষ্টু হাসে। হাসতে হাসতে নীলার ছাতি ফেটে যাওয়া তৃষ্ণা দেখে।

হঠাৎ কোনও কিছু জানান না দিয়ে সেই হিমালয় পাড় বিদীর্ণ করে নীলার থইথই জলে ঢুকে যায়, সবটুকু জল এক অতিকায় তিমির মতো শুষে নেয়। আর্তনাদ করে ওঠে নীলা, ধনুকের মতো বেঁকে ওঠে মসৃণ শ্যামল শরীর।

আর বেনোয়া, সেই এপোলো, সেই ঝড়ের দেবতা, ভেঙে তছনছ করে সব, বলতে বলতে তুমি তো কুমারী মেয়ে, কেউ তোমাকে স্পর্শ করেনি এর আগে, কেবল আমি, কেবল আমি! নীলার পা দুটো বুকের ওপর তুলে ঝড় তোলে, পা দুটোয় চুমু খেতে খেতে, তেড়ে আসে উদ্দাম উত্তাল সর্বনাশের মতো। ঝড়ের গতি দ্রুত বাড়তে থাকে, ভেতরে বাইরে ঝড়ের দেবতা হাসছে। সারা শরীরে তার উথাল পাথাল সুখ, বিদ্যুৎ চমকের তীব্র সুখ।

চিত হয়ে শোয়া নীলাকে ঝটিতে বেনোয়া নিজের কোলের ওপর বসিয়ে দেয়, আর নিজে শ্রান্ত দু হাত দু পাশে ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে।

ঘোড়ার পিঠে চড়েছ কখনও?

না, চড়েনি, ঘোড়া দৌড়োনোর অভ্যেস তার নেই, নিশ্চল বসে থাকে সে।

বেনোয়া তাকে দুহাতে ওপরে তোলে, নীচে নামায়। অশ্বচালনা শেখায়। দুর্বার গতিতে তাকে ছুটতে বলে। কানে কানে মন্ত্র দেয় তুখোড় অশ্বারোহী হবার। টেনে আনে নিজের কাছে, দু স্তন মুঠো করে ধরে, আর সেই চেরিফলের নেশায় মাতাল হতে থাকে।

বিছানার একপাশ থেকে একের গভীরে ঢুকে থাকা আরেক, গড়িয়ে অন্য পাশে যায়। সেই পাশ থেকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে পরস্পরকে আরেক পাশে। গড়াতে গড়াতে দুটো শরীর এবার মেঝেয়।

আবার ফিসফিস করে বেনোয়া, নাচতে জানো?

নীলা নাচতে জানে না। নাচ সে শেখেনি কোনওদিন।

নাচো, ঘুরে ঘুরে নাচো, আমার দিকে পেছন ফিরে নাচো।

শরীরটিকে ঘুরিয়ে দিয়ে নাচায় বেনোয়া। এমন নাচ নীলা নাচেনি কখনও, পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে নীলাকে নাচের তালিম দেয়। এরপর সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিয়ে শুইয়ে দেয় উপুড় করে, সুঠাম সুদর্শন শরীরে ঢেকে দেয় সুশ্রী সুতনু।

ঝড় বইছে পেছনের আঙিনায়। আবার তছনছ।

নীলা চিৎকার করে বিদ্যুৎ চমকে।

সেই ঝড়ো হাওয়া এতটুকু না থেমে, নীলার কটিদেশ তুলে আনে ওপরে। নিতম্বজোড়
বেনোয়ার হাতের মুঠোয়। হাঁটু ভেঙে বসে নীলার সমুদ্রে উত্তাল ঢেউ আনে আবার। আবার
গোড়ালি ভেজাল তো, আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই ঢেউএ, পুরো গা ভিজিয়ে স্নান করে।

নীলা হাঁপাতে থাকে।

মেঝে থেকে তুলে নীলাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে বেনোয়া জল নিয়ে আসে, গেলাসের
অর্ধেক খেয়ে বাকিটা নীলাকে দেয় খেতে। জল খেতে খেতে আড়চোখে দেখে সে, লাল
জিভ বের করে দৈত্যটি তখনও ফুঁসছে। বেনোয়া পাঁজাকোলা করে নীলাকে সোফায় এনে
নিজের কোলে বসায়। সারা শরীরে চুমু খেতে খেতে তাকে চঞ্চল করতে করতে বলে, এত
সুন্দর নিতম্বকে স্থবির করে রাখো কেন, দোলাও, দোলাও আমার জগৎখানা দোলাও।

দোলাতে সে জানে না। দোলাতে বেনোয়াকেই হয়। ঝড়ের বেগ যখন বাড়ে, নীলাকে
কোলের ওপর তুলেই বেনোয়া দাঁড়ায়। শরীরটিকে শূন্যে তুলে, দেয়ালে সেঁটে ঝড় বইয়ে
দেয় ভেতর ঘরে, আবার। নীলার শীৎকারে চিৎকারে ঘর দোলে। বেনোয়া দোলে। দুলতে
দুলতেই, নীলাকে, যেন ছোট্ট শিশু, বাঁ কাতে শুইয়ে দেয় বিছানায়। পেছন থেকে জাপটে
রাখে ক্লান্ত শিশুকে, শিশুর বুকের কচি বাতাবিলেবু দুটোকে, তার ওপরের দুটো
চেরিফলকে। তারপর নতুন উদ্যমে বেনোয়া, সেই ঝড়, সেই তুফান, সেই তছনছ করে
দেওয়া উন্মত্ত উত্তাল উত্তেজনা, প্রবল গতিতে ঢোকে নীলার শান্ত স্নিগ্ধ মন্দিরে, ভেঙে চুরে
সর্বনাশ করে ঘেমে নেয়ে বিদ্যুৎচমক আনে, সেই চমক নীলা থেকে বেনোয়ায় সংক্রামিত
হয়, বেনোয়া থেকে নীলায়। বেনোয়ার সাদা বেনো জলে নীলার দুকূল ভেসে যায়, নীলার
ভুবন ভেসে যায়।

ঘাম ঝরছে বেনোয়ার চুলের গোড়া থেকে, বুক পিঠ থেকে। তখনও সুখে কাঁপতে থাক
নীলার শরীরখানি জড়িয়ে রাখে বেনোয়া, বুকে।

•

মোমবাতি অনেকক্ষণ নিবে গেছে। ব্রায়ান অ্যাডামস অনেকক্ষণ থেমে গেছে। ঘড়ির
কাঁটা এক এক করে তিন ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। মধ্যরাতও পার হয়েছে।

বেনোয়ার বুকের সুগন্ধ নিতে নিতে নীলা তখন খানিক ঘুমে, খানিক না ঘুমে। আঁধার
আঁধার ঘরটিতে বেনোয়াকে সেই রাজপুত্তুরের মতো লাগে, নীলা যে হঠাৎ হঠাৎ ভাবত
একটি রাজপুত্তুর এসে তাকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে যাবে তার প্রাসাদে। এই তো সেই প্রাসাদ
এই সেই রাজপুত্তুর। নীলার সারা শরীরে অদ্ভুত এক প্রশান্তি, সারা হৃদয়ে সুখ। এর চেয়ে
বেশি সুখ, নীলার বিশ্বাস, আর কেউ পেতে পারে না। ভালবাসা এত তীব্র করে এর আগে
কখনও সে অনুভব করেনি। নীলা থরথর কণ্ঠে বলে তোমাকে খুব, খুব ভালবাসি বেনোয়া
বলে না, এক দেখাতেই প্রেম। এমনই হল আমাদের।

বেনোয়া চোখ খোলে, আলতো চুমু খেয়ে নীলার ঠোঁটে বলে, তোমাকে খুব ভাল লাগে
আমার, খুব খুব ভাল লাগে।

নীলা বলে, আমাকে ভালবাসো না?

এখনও না।

চকিতে উঠে বসে নীলা।

কী বললে, আমাকে তুমি ভালবাসো না?

না। শান্ত স্বর বেনোয়ার।

তুমি আমাকে ভালবাসো না, তা হলে কী করে তুমি পারলে এমন নিষ্ঠ প্রেমিকের মতো এত সব করতে! যাকে ভালবাসো না, তাকে দেখে তোমার শরীর কী করে জাগে?

বেনোয়া বলে, ভাল লাগে তোমাকে, ভাল লাগলে শরীর জাগবে না কেন?

আমার নিজের ওপর ঘেন্না হচ্ছে আমার, ছি!

কী বলছ এসব? বেনোয়া উঠে বসে।

ভেবেছ, এ গরিব দেশ থেকে এসেছে, খেতে পায় না পরতে পায় না, একে দুকথা বলে পটিয়ে বিছানায় নিয়ে যাওয়া খুব সহজ!

ভাঁজ জমতে থাকে বেনোয়ার কপালে, চোখে। নীলা তার জামা কাপড় যত দ্রুত সম্ভব পরে নেয়।

তুমি কি বোকা নাকি? এত শিগরি কি ভালবাসা হয়? হয়তো একদিন বাসব। বেনোয়া বলে।

হয়তো বাসবে না।

তুমি কি যাচ্ছ নাকি!

হ্যাঁ যাচ্ছি।

অনেক রাত হয়েছে নীলা। থেকে যাও এখানে।

থেকে যাব? কেন, ভয় পাও না? পাসকাল, যাকে তুমি ভালবাসো, হঠাৎ এসে পড়তে পারে।

উলঙ্গ বেনোয়া তার তৃপ্ত ঘুমন্ত শিশ্নখানা নিয়ে হতভম্ব বসে থাকে, নীলা বেরিয়ে যায়।

অপমান নীলার পেছন পেছন যায়, অপমান নীলার সামনে সামনে হাঁটে, অপমান নীলার ডানে বাঁয়ে। নীলাকে দেয়ালে সেঁটে অপমান নীলার ভেতর বাহির তছনছ করতে থাকে। নীলা স্পষ্ট বুঝতে পারছে, যা ঘটিয়েছে বেনোয়া, ও কোনও সুখের কোনও ব্যাপার ছিল না, সে ভোগ করেছে নীলার শরীর, যেমন করে যে কোনও কামুক ধর্ষক ভোগ করে কোনও অসহায় বেকুব মেয়েকে। ছি! নীলা ছি! তুই মর। তুই মিঠুর মতো গলায় ফাঁস লাগিয়ে মরে যা।

এ কলকাতা নয়, প্যারিস। প্যারিস সারারাত জেগে থাকে। হাত ওঠালেই ট্যাক্সি। হাত বাড়ালেই প্রেমিক।

মরুনি ভেরনেস

নীলা বাড়ি ফিরলে, সুনীল ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করে, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

এক বন্ধুর বাড়ি।

বেনোয়া নামে এক লোক দুবার ফোন করেছে। তুমি ফিরলে ফোন করতে বলেছে, বলে সুনীল চলে যায় শোবার ঘরের দিকে।

নীলাও যায় তার শোবার ঘরে। বাতি নিবিয়ে যখন শুতে যাবে, টেলিফোনের শব্দ, টুম্পার মা মা বলে কেঁদে ওঠার শব্দ, আর সুনীলের শব্দ, নীলা ফোন ধরো।

ফোনে বেনোয়া।

এত রাতে ফোন করেছ কেন? লোক ঘুমোচ্ছে তো।

তোমার সঙ্গে আমার কথা বলা জরুরি।

এখন, এই রাতে?

হ্যাঁ।

না। আমার ঘুম পাচ্ছে। আমি ঘুমোব।

কাল দেখা করবে?

না।

নীলা ফোন রেখে দিল।

ফোন রেখে শোবার ঘরের দিকে যেতে আবার ফোন। নীলা এবার ফোনের তার খুলে রেখে শুতে যায়।

সাতসকালে উঠে নীলা বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে, জানে সে বাড়ি থাকা মানে একশো প্রশ্নের সামনে পড়া, কে এই বেনোয়া, কেন সে গভীর রাতে ফোন করে ঘুম ভাঙাচ্ছে অন্যের, তার সঙ্গে যা কথা আছে, নীলা কেন বাইরেই সেরে আসে না সব। ইত্যাদি ইত্যাদি। বেরিয়ে, নীলা এলোমেলো ঘুরে বেড়ায়, মানুষের ভিড় চারদিকে, মেয়েরা লোম কাটা মসৃণ পা দেখিয়ে হাঁটছে, পেট পিঠ খোলা এমন জামা গায়ে, হাঁটছে আর ওদের স্তন দুলছে, নিতম্ব দুলছে। সারা শীত সালাদপাতা চিবিয়ে চকচকে শরীর বানিয়েছে, যত মেদ ছিল, ঝরিয়েছে, ঝরিয়ে এই গরমে শরীর প্রদর্শন করছে রাস্তাঘাটে বাগানে...। গরমকাল এখন, সুখের কাল এদের। অসহ্য গরমে নীলা ঘামে, ছায়া ধরে হাঁটে, আর অন্যরা হাঁটে রোদে। কুলকুল করে ঘামছে ওরা, তবু রোদ চাই। সাদা ত্বক রোদে পুড়ে লাল হয়ে ওঠে, তবু রোদ চাই। গরমকালে, সূর্য যখন থোকা থোকা আগুন ঢালতে শুরু করে, ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসে সব। সিনেমা থিয়েটারে ভিড় নেই। চার দেয়াল আর মাথার ওপর ছাদ এ জিনিস শীতকালের,

গরমকালের নয়। ক্যাফে রেস্তোরাঁর ভেতরে কেউ বসে না, সব তেরাসে, বাইরে চেয়ার পেতে। বাইরে বসেই রোদ তাপাতে তাপাতে আড্ডা দিচ্ছে, পান করছে, খাচ্ছে। মধ্যাহ্নের গা ঝলসানো রোদে, নীলা দেখে, জারদা তুয়েরিতে একশো ছেলে মেয়ে প্রায় উলঙ্গ শুয়ে আছে। নিজে সে গরম দেশের মেয়ে হয়ে এত গরম সইতে পারে না, কিন্তু শীতের দেশের মানুষ গোগ্রাসে রোদ খাচ্ছে, যেন রোদের চেয়ে সুস্বাদু খাদ্য আর জগতে নেই। হাজার মানুষের ভিড়ে নীলাই একা, বাকিরা জোড়ায় জোড়ায়। চুমুতে শৃঙ্গারে ব্যস্ত জোড়া। তুয়েরি থেকে হেঁটে জারদা দ্য লুক্সেমবার্গেও একই দৃশ্য। ঘাসের ওপর তোয়ালে বিছিয়ে কচ্ছপের মতো শুয়ে শত শত সাদা রোদ তাপাচ্ছে, প্রতিটি লোমকূপে রোদ ঢোকাচ্ছে। গাছের ছায়ায় নীলা ছাড়া আর কেউ নেই বসা। বাগান রঙিন হয়ে আছে ফুলে, এই বাগানের রূপ বদলে যায় প্রতি ঋতুতে, গরমকালে এ সবচেয়ে বেশি রূপবতী হয়ে ওঠে, তখন ভিড় বাড়ে বাগানটিতে, রূপোন্মত্তদের ভিড়।

গরমে প্যারিস কানায় কানায় ভরে ওঠে পর্যটকে। আমেরিকান বুড়ো বুড়ি লম্বা ঢিলে শর্টস পরে, প্যারিস গাইড আর ম্যাপ হাতে নিয়ে শহরের আনাচ কানাচ ঘুরে বেড়ায়। পর্যটকের ভিড়ে অতিষ্ঠ হয়ে প্যারিসবাসী গরমের শেষ মাসে লম্বা ছুটি নিয়ে শহর ছেড়ে দূরে চলে যায়, দক্ষিণের দিকে, আরও গরমের দিকে, ইতালি বা স্পেন বা গ্রিসের দিকে। সমুদ্রতীরের বালুতে কচ্ছপের মতো পুরো গরমকাল শুয়ে থেকে রোদে গা পুড়িয়ে তামাটে করে তবে দেশে ফেরে, নিজের শহরে ফেরে, এই নিয়ম। যে যত কালচে, যত তামাটে, যত বাদামি করতে পারে রং, তত তার অহংকার। নীলার কোনও অহংকার হয় না তার কালচে রং নিয়ে। সে জানে, এই রংটিকে বেনোয়া ভাল লাগে বলেছিল কেবলই শরীর পেতে। যৌনাঙ্গ কালো হোক সাদা হোক, আনন্দ যেহেতু একই দেয়, আপত্তি করেনি বেনোয়া।

লুক্সেমবার্গ বাগান থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে উইলিয়াম এন্ড স্মিথ থেকে কিছু বই কিনে পাসাজ ব্রাদিতে ঢোকে, ভারতীয় খাবার খেতে। যাদের প্রেমিকের কপাল নেই, তাদের বই ছাড়াও গতি নেই, বাগানে ক্যাফেতে বাসে রেলে একা নিজের একাকিত্ব লুকোতেই বইয়ের আশ্রয়। পাসাজ ব্রাদির রেস্তোরাঁয় খেতে খেতে বইয়ে মন দেবে এই তার ইচ্ছে। সারাদিনে যে জিনিসটি সে এই প্রথম দেখে, একা একটি মেয়ে। মেয়েটির গায়ের রং ঘোর কালো, কিন্তু নাক ভোঁতা নয়, চুল কোঁকড়া নয়, আফ্রিকার মেয়ে সে নিশ্চয় নয়। রেস্তোরাঁয় আর কোনও খদ্দের নেই, কেবল মেয়েটিই। মেয়েটির পাশের টেবিলে বসে নীলা ভাবে, এ মেয়ে ভারতীয় না হয়ে যায় না। কিন্তু কোনও ভারতীয় ভাষায় রেস্তেরাঁর কারও সঙ্গে কথা বলার কোনওরকম চেষ্টা না করে মেয়েটি যখন বিশুদ্ধ ফরাসিতে রেস্তোরাঁর লোকের কাছে জল চায়, খাবার চায়, খাবারে ঝাল কম চায়, নীলা বই থেকে চোখ তুলে মেয়েটির আপাদমস্তক নতুন করে লক্ষ করে। দুজনের চোখাচোখি হয় বেশ কবার।

চোখাচোখি হলে এক ধরনের দায়িত্ব নীলা অনুভব করে, দুএকটি বাক্য বিনিময় করা। জিজ্ঞেস করে, আপনার মাতৃভাষা কী?

ফরাসি? মেয়েটি উত্তর দেয়।

নীলা প্রস্তুত ছিল শুনতে তামিল বা মালায়ালাম।

আপনি কি ভারতীয় নন?

মেয়েটি না বলল।

তা হলে কোন দেশি?

ফরাসি।

নীলার কৌতূহল বাড়ে।

কোথায় জন্ম আপনার?

ভারতে।

নীলা হাসে। বিদেশিরা এ দেশের নাগরিকত্ব পেয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের বলতে থাকে ফরাসি, নিজের দেশের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে। নীলা উমবার্তো একোর বই থেকে আঙুল সরিয়ে জিজ্ঞেস করে, ভারতের কোথায়?

সম্ভবত কলকাতায়।

কলকাতায়?

নীলার চোখে মুখে খুশি উপচে ওঠে, বাংলায় বলে, তা কতদিন এখানে আছেন?

মেয়েটি হেসে বলল, আমি ভারতীয় ভাষা জানি না।

আপনি কলকাতার মেয়ে, বাংলা জানেন না? আবারও বাংলায় বলে নীলা।

মেয়েটি ভাবলেশহীন তাকায়।

কম ঝালের খাবার এসে গেলে, মেয়েটি খাওয়ায় মন দেয়। নীলা ঠিক বুঝে পায় না মেয়েটির সঙ্গে সে কথা চালিয়ে যাবে না কি নিজের চরকায় তেল দেবে। চরকা বলতে যদিও কিছু নেই তার, ভবঘুরেদের কোনও চরকা থাকে না। মেয়েটির মায়াকাড়া মুখ, ডাগর চোখ দেখে নীলার বিশ্বাস জন্মে, এ মেয়ে তাকে ইচ্ছে করে এড়িয়ে যাচ্ছে না। আগ বাড়িয়ে বলে, আমি কলকাতার মেয়ে।

মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেয়, আমি মরুনি ভেরনেস।

নীলার খাবারও এসে যায়। সাদা ভাত আর মুরগির ঝোল। সেও খাওয়ায় মন দেয়, কিন্তু টের পায় তার কৌতূহল কমেনি। কৌতূহলের কারণ নীলা কলকাতার মেয়ে জেনেও মরুনি কেন কোনও রকম উৎসাহ দেখাচ্ছে না কথা বলার।

খাওয়া শেষ করে মরুনি একটি সিগারেট ধরায়। কালো একটি টিশার্ট পরা, হাঁটুপকেটঅলা প্যান্ট, পায়ে সাদা কেডস, পিঠের ব্যাকপ্যাক পায়ের কাছে রাখা। উদাস তাকিয়ে আছে পাসাজে।

নীলা বলে, আপনি বোধহয় অনেক আগে এ দেশে এসেছেন তাই না? আপনার বাবা মা এখানেই থাকেন।

মরুনি হ্যাঁ বলে।

কিছু মনে করছেন না তো, জিজ্ঞেস করছি যে আপনাকে এত কথা।

না মোটেই না, মরুনি হাসে। মিষ্টি মুখে মিষ্টি হাসি।

কফি খেতে খেতে মরুনি এবার নিজে থেকে বলে, আসলে আমি ভাল ইংরেজি জানি না। কথা বলতে তাই সংকোচ হচ্ছে।

কে বলল জানেন না, বেশ ভাল তো বলছেন।

মরুনির সংকোচ দূর করতে নীলা ব্যস্ত হয়ে পড়ে, এর চেয়ে খারাপ ইংরেজি সে শুনেছে,

মরুনির ব্যাকরণে কোনও রকম ভুল এখনও সে পায়নি, আর আজকাল ব্যাকরণ ঠিক করে কেউই ইংরেজি বলে না, ইত্যাদি।

আপনি কি এখানেই লেখাপড়া করেছেন? নীলা প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ এখানেই।

কবে এসেছেন প্যারিসে?

সাতাশ বছর আগে।

এরপর মরুনি ভেরনেস ভাঙা ইংরেজিতে বলে যায়, কলকাতার মাদার তেরেসা আশ্রমে ছিল সে, যখন দু মাস বয়স, এক ফরাসি দম্পতি ওকে দত্তক নিয়ে আসে। সেই থেকে, সেই দু মাস বয়স থেকে সে প্যারিসে। আপাদমস্তক প্যারিসিয়ান। আশ্রমের লোকেরা ফুটপাতের ময়লা ফেলার ডাস্টবিন থেকে মরুনির যখন এক মাস বয়স, কুড়িয়ে এনেছিল। মরুনি নামটি ওই আশ্রম থেকেই দেওয়া।

নীলা গালে হাত দিয়ে মরুনির গল্প শোনে।

তারপর?

তারপর আর কিছু না।

তুমি জানো না তোমার বাবা মা কে ছিল?

নাহ।

মরুনি আরেক কাপ কফি নেয়। নীলাও আরেক কাপ চা।

এরপর আর যাওনি, কলকাতায়?

নাহ।

যেতে ইচ্ছে করে?

আর যে কোনও শহরের মতো কলকাতাও একটি শহর তার কাছে। এ শহরের জন্য তার আলাদা করে কোনও ভালবাসা নেই যে তার যেতে ইচ্ছে করবে।

তোমার কখনও কোনও কষ্ট হয় মরুনি? নিজের শহরে নিজের দেশেই তোমার থাকা হল না বলে?

নাহ। কেন হবে? বরং মনে হয়, যা হয়েছে বেশ ভাল, না হলে আমি ওই ডাস্টবিনেই তো মরে থাকতাম।

মরুনি ভুল বলেনি, কিন্তু নীলার বুকের ভেতর মিহি একটি কষ্ট পালকের মতো উড়ে এসে ঢুকে যায়।

কে ফেলেছিল তাকে ডাস্টবিনে, সে জানে না। তার জানার কথা নয়। তার এও জানার কথা নয়, তার কলকাতায় জন্ম বা কিছু। বড় হয়ে তার ফরাসি বাবা মার কাছে শুনেছে সে সব। আশ্রমের কাগজপত্রে শুধু তার নাম লেখা ছিল, জন্মস্থান বা জন্মতারিখের জায়গায় প্রশ্নবোধক চিহ্ন শুধু, বাবা ও মায়ের নামের পাশেও বড় প্রশ্নবোধক।

নীলা বলে, যদি তোমার মা ফেলে দিয়ে থাকে তোমাকে ডাস্টবিনে, কেন ফেলেছে জানো?

মরুনি মাথা নাড়ে, তার কোনও রকম ধারণাই নেই।

নীলা বলে, ফেলেছে তুমি কালো ছিলে বলে। কালো মেয়েদের কেউ বিয়ে করে না।

অথবা তোমার মায়ের বিয়ে হয়নি বলে, বিয়ে না হয়ে বাচ্চা জন্ম দেওয়া ভীষণ রকম অপরাধ, তোমার মার আর সমাজে জায়গা হত না বলে। অথবা তুমি মেয়ে ছিলে বলে, সমাজে মেয়ের জন্ম কেউ চায় না, মেয়ে হল খরচার জিনিস, বিয়ে দিতে পণ লাগে, সম্ভবত তোমার বাবা মা গরিব ছিলেন, হয়তো মেয়েও ছিল বেশ কটা, তাই।

মরুনি হাসে।

ভেবে তোমার রাগ হয় না?

মরুনি হেসে বলে, না।

মরুনির নির্লিপ্তি নীলাকে বিস্মিত করে।

তুমি ভারতীয় খাবার বুঝি পছন্দ করো?

হ্যাঁ, খুব করি।

আমার যদি আজ একটা বাড়ি থাকত এই প্যারিসে, আমি তোমার জন্য বাঙালি খাবার রাঁধতে পারতাম। ভারতীয় রেস্তোরাঁয় কিন্তু আসল ভারতীয় খাবার পাওয়া যায় না। আমার কাছে কলকাতার অনেক ছবি আছে, তোমাকে দেখাব। একটু একটু বাংলা শব্দ যদি শিখতে চাও শেখাব।

নীলার উচ্ছ্বাস দেখে মরুনি হাসে। নীলার মনে হয় না কলকাতার ছবি দেখার অথবা বাংলা শেখার কোনও রকম ঝোঁক মরুনির আছে।

মরুনি উচ্ছল প্রাণবান মেয়ে। দুঃখের একফোঁটা চিহ্ন কোথাও নেই। এমনকী নীলা তাকে বলার পরও কী কারণে তার মা নিজের হাতে নিজের মেয়েকে ডাস্টবিনে ফেলেছিলেন, তা শুনেও এক ফোঁটা দুঃখ এসে তাকে স্পর্শ করছে না।

ভারতীয় কাউকে চেনো এ শহরে?

না।

পরিচিত হতে চাওনি কোনওদিন?

মরুনি কাঁধ ঝাঁকায়। পরিচিত হতে চাওয়া বা না চাওয়ার প্রশ্নটি সে নিজেকে করেনি কোনওদিন।

নীলা অনুমান করে, একজন ভারতীয়র সঙ্গে আর একজন পর্তুগিজের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার মধ্যে মরুনি কোনও পার্থক্য দেখে না।

নীলা ভাবে, মরুনিকে যদি তার মা বা বাবা বা অন্য কেউ রাতের অন্ধকারে ভয়ংকর নিষ্ঠুরের মতো ডাস্টবিনে ফেলে না দিত, যদি সে কলকাতায় বড় হত, বাংলায় কথা বলত, শাড়ি পরত। বয়স সাতাশ ওর, কালো বলে ওর বিয়ে হত না, ওকে সম্ভবত গলায় ফাঁস লাগিয়ে মিঠুর মতো মরতে হত।

তৃতীয় দফা চা কফি শেষ হবার পর এক সাদা ফরাসি ছেলে, মরুনিরই বয়সি, রেস্তোরাঁয় ঢুকে মরুনিকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেয়ে, ডান হাতে ওকে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। যাবার আগে নীলাকে তার ফোন নম্বর দিয়ে গেছে মরুনি, নীলার আপাতত নম্বরটি নিয়েছে। কেবল বেঁচে আছে যে তা নয়, নীলা ভাবে, মরুনি সুখে আছে। ফরাসি ছেলেটি, নীলা অনুমান করে, চুমু খেয়ে খেয়ে দিন পার করবে। মরুনিও আর সব ফরাসির মতো রোদের তলে কচ্ছপের মতো শুয়ে থেকে কালো রং আরও কালো করবে, ও রোদ থেকে গা বাঁচাতে

শেখেনি, গায়ে রূপটান মেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকে রং সামান্য ফরসা করা শেখেনি। সাদা ফরাসি যুবকটি মরুনিকে নিশ্চয়ই শতবার বলেছে, কী চমৎকার রং তোমার মরুনি।

নীলা বাড়ি ফিরে শ্রুতিযন্ত্রে বারোটা কণ্ঠস্বরের এগারোটিই পেল বেনোয়ার। নীলা একবার ফোন করো। আমি তোমার কথা খুব ভাবছি। বাড়িতে এসো, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

চৈতালি আর সুনীল দুজনের কেউই কাজ থেকে ফেরেনি। নীলা বেনোয়াকে মুছে ফেলে শ্রুতিযন্ত্র থেকে।

সন্ধেয় বাড়ি ফিরে দুজনের কেউই কে এই বেনোয়া, কী সম্পর্ক নীলার সঙ্গে এসব প্রসঙ্গ একেবারে ওঠায় না। টুম্পামণি খেলা করতে থাকে ঘরময়, আর পুজোতে দেশে যাবে নাকি প্যারিসেই থাকবে এ নিয়ে সুনীল চৈতালিতে আলোচনা শুরু হয়। প্যারিসে পুজোকমিটিতে দলাদলি শুরু হয়ে গেছে, দেশে যাওয়াই ভাল, চৈতালির মত। আর সুনীলের মত, গত পুজোয় দেশে যাওয়া হয়েছিল, এবার বরং ইয়োরোপের কোথাও যাওয়া হোক। কোথায়? সুনীলের এক কাকা থাকেন লন্ডনে, ওখানে। আর লন্ডনে পুজোও তো ঘটা করে হয়, কলকাতার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

তুমি কী বলো নীলা?

সুনীল নীলার মতামত জানতে চায়।

নীলা ঠোঁট উল্টে বলে, সম্পূর্ণ আপনাদের ব্যাপার। তবে আমাকে যদি বলা হত লন্ডন যাবে না কলকাতা? আমি লন্ডন বেছে নিতাম।

চৈতালি বলল, আত্মীয়স্বজন কলকাতা থাকে, বছরে মাত্র একবার দেখা করার সুযোগ হয়, এ সুযোগ নষ্ট করার মানে হয় না। লন্ডন যেতে হলে, ইয়োরোস্টারে চড়ে বসলে তিন ঘণ্টায় চলে যাওয়া যায়। শুক্রবার গিয়ে দুদিন ছুটি কাটিয়ে আসা যায়, যে কোনও সপ্তাহে।

ঠিক আছে তা হলে বাক্স ভরে বাজার করো। আত্মীয়স্বজনের তো আর শেষ নেই।

বুঝলে নীলা, সবাই আশা করে থাকে। কারও যে অভাব আছে তা নয়। হাতে ছোটখাটো কোনও বিদেশি জিনিস পেলেই খুশি হয়। আত্মীয়স্বজনে বন্ধুবান্ধবে শহর ভর্তি। সবার জন্য তো নেওয়া সম্ভব হয় না। টুম্পার কাপড়চোপড়ই তো এক বাক্স যায়। কারও কারও শুকনো মুখ দেখতে হয়, এ কারণে কি কলকাতা যাওয়া বন্ধ করে দেব।

ঘণ্টা দুই চলে যায়, তখনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় না ছুটিতে কোথায় যাওয়া হবে।

নীলা সে রাতে ঘুমোতে যাবার আগে, অভাবিত একটি ফোন পায়, মরুনির। প্যারিসে বা প্যারিসের বাইরে নীলার যদি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে, কিছু দেখতে ইচ্ছে করে, ঘুরে বেড়াতে চায়, তবে সময় আছে তার, সে দিতে পারে, কারণ আগামী দুটো দিন তার কোনও ব্যস্ততা নেই। নীলা সোল্লাসে রাজি হয়, তার জিভার্নি যাওয়ার শখ, ক্লদ মনের বাগান দেখতে। কখন দুজনের দেখা হবে, কোথায়, মরুনি বলে দেয়। অনেক রাত অব্দি শুয়ে শুয়ে মরুনির কথা ভাবে নীলা। মরুনি তার সঙ্গে যোগাযোগ না করলেও পারত, কেউ তাকে মাথার দিব্যি দেয়নি, রেস্তোরাঁয় এক দুপুরের পরিচয়ের পর কেউ কাউকে এমন বন্ধু করে নেয়, নীলা অন্তত শোনেনি, কলকাতায় ঘটতে পারে এমন ঘটনা, প্যারিসে নয়। মরুনির

স্বভাবে কলকাতার কিচ্ছু নেই, তা হলে কী কারণে মরুনির এই উদারতা নীলার প্রতি! তার মনে হয়, মরুনি স্বীকার না করলেও এক ধরনের আত্মীয়তা সে অনুভব করছে নীলার সঙ্গে। তার এও মনে হয়, যে মা মরুনিকে জন্ম দিয়েছিল, তার কথা মরুনি ভাবে হঠাৎ হঠাৎ, কেমন সে দেখতে, কী তার নাম।

কলকাতার কোথাও নিশ্চয়ই এখনও বেঁচে আছে মরুনির নিজের মা, নিজের নিষ্ঠুরতার জন্য নিজেকে কি কখনও সে ক্ষমা করতে পারে? সে কি কখনও রাতে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে ওঠে না! একই সঙ্গে মানুষগুলো কী ভয়ানক নিষ্ঠুর হয়, আবার কোমল কাদার মতো নরম হয়। কোন চরিত্রটি মানুষের সত্যিকার চরিত্র নীলার কখনও জানা হয় না।

মরুনি পরদিন নীলাকে তার মার্সেডিজে করে জিভার্নি নিয়ে যায়। যখন একশো আশি কিলোমিটার বেগে মরুনি বড় রাস্তায় গাড়ি চালাতে থাকে, মোবাইল বার বার বেজে ওঠে, ডান হাতে মোবাইল, বাঁ হাতে স্টিয়ারিং, পাশে বসে নীলা প্রকৃতি দেখার চেয়ে মরুনিকেই দেখে বেশি। ক্লদ মনের বাড়ির বাগানে ছোট্ট সরোবরটির কাছে দাঁড়িয়ে তিরতির জলের ওপর পদ্মপাতার ভেসে থাকা দেখতে দেখতে সে মরুনিকে ভাবে। মরুনি এখানে ধনী বাবা মার আদরে বড় হওয়া মেয়ে। সরবনে দর্শন পড়েছে, নিজে হয়তো বড় একজন দার্শনিক হবে একদিন। কলকাতায় থাকলে, হয়তো তার অ আ ক খ পড়ারই সুযোগ হত না, হয়তো একবেলা খাবার জুটত না, অনাহারে অর্ধাহারে, অসুখে অভাবে তাকে হয়তো অল্প বয়সে মরে যেতে হত, অথবা সোনাগাছির বেশ্যা হতে হত। বেশ্যা হয়েও সম্ভবত সে খদ্দের বেশি পেত না, কারণ রং তার কালো।

জিভার্নিতে ঘণ্টা দুই কাটিয়ে মরুনি নীলাকে নিয়ে রুয়োতে যায়, রুয়োর সেই বিখ্যাত গির্জাটি দেখায়, ক্লদ মনে সকাল বিকেল সন্ধ্যার আলো পড়া যে গির্জার ছবি এঁকেছেন। জনদাকর্কে পুড়িয়ে মারার জায়গাটিও দেখায়, অন্য এক গির্জার পিছনে। গির্জা দেখায় বটে, কিন্তু বলে, ধর্মে সে বিশ্বাস করে না। নীলা ভাবে মরুনি যদি কলকাতায় বড় হত, সে নিশ্চয় ধর্ম মানত, শিবপুজো করত, কালীঘাটে যেত, গঙ্গার নোংরা জলে স্নান করত।

শিল্পসাহিত্যে নীলার আগ্রহ আছে জেনে পরদিন মরুনি তাকে নিয়ে প্যারিসের বাইরে কুড়ি কিলোমিটার দূরে উভের সুর ওয়াসিতে যায়। ওয়াসি নদীর পারে উভের নামের ছোট্ট শহর। ছোট্ট এই শহরটিতে তখনকার নামী সব শিল্পী, দবিনি, কামিল, পিসারো থাকতেন। পল সেজানও থাকা শুরু করেছিলেন আর ডাক্তার গসেত নামের এক শিল্পবোদ্ধার আমন্ত্রণে ভ্যান গগও। জীবনের শেষ কটা দিন এখানেই কাটিয়েছেন তিনি, রাভোস ইন নামের এক ক্যাফের দোতলায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছিলেন ভ্যান গগ। যে ঘরটিতে বসে সত্তর দিনে সাতাত্তরটির মতো ছবি এঁকেছিলেন। সব ছবিই ঘরে বসে আঁকা নয়, তখন প্রকৃতির নেশা তাঁর খুব। উভেরের গির্জার পাশে দাঁড়িয়ে নীলা রোদ পড়া গির্জাটির রং দেখে নীলাভ, ভ্যান গগের ছবির মতো। ফসল উঠে যাওয়া ভুট্টাখেতের পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নীলা দেখে হলুদে ছেয়ে আছে খেত, কাক উড়ছে মাথার ওপর। হেঁটে ভুট্টাখেতের পাশে কবরখানায় ঢুকে সবুজ লতাগুল্মে ঢাকা ভ্যান গগের বাঁধানো কবরটির কিনারে বসে নীলা, মরুনি বসে

ভ্যান গগের ভাই থিওর কিনারে। বসে নীলা বলে, কারও কি সব স্বপ্ন সাধ পূরণ হয় এক জীবনে?

হয় না। হলে বেঁচে থাকার আকর্ষণ নষ্ট হয়ে যায়, মরুনির ধারণা।

জীবন খুব ছোট, মানুষের আয়ু অন্তত দুশো বছর হওয়া উচিত। নীলা বলে। মরুনির তা মনে হয় না, তার মনে হয় না মানুষের এত দীর্ঘ বছর বাঁচার কোনও প্রয়োজন আছে।

হঠাৎ একটি উদ্ভট প্রশ্ন জাগে নীলার মনে, জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা মরুনি, যদি দেখো দুজন মেয়ে জলে পড়ে মারা যাচ্ছে, আমি আর আরেক জন ফরাসি মেয়ে, তুমি একজনকে বাঁচাতে পারো, সে সুযোগ তোমার আছে, কাকে বাঁচাবে?

মরুনি বলে, তোমাকে।

কেন?

কারণ তোমাকে আমি চিনি।

ধরো ফরাসি মেয়েটিকেও চেনো। ওর সঙ্গে তোমার পরিচয় আছে।

মরুনি হেসে বলে, সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হবে।

ধরো আমার চেয়ে বেশি চেনো ওকে। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব আছে তোমার!

তা হলে ওকে। মরুনি উত্তর দেয়।

ধরো কাউকেই চেনো না। কাউকেই কখনও দেখোনি আগে।

তবে যার বয়স কম, তাকে।

বয়স সমান।

মরুনি উত্তর না দিয়ে হেসে ওঠে। নীলা লক্ষ করে মরুনি বলছে না, ভারতীয় মেয়েটিকে বাঁচাবে সে।

ভুট্টাখেত থেকে লু হাওয়া এসে ওড়াতে থাকে মরুনির একমাথা ঘন কালো চুল। সেদিকে তাকিয়ে লতাগুল্মের ওপর নিজের শরীরটি বিছিয়ে দিয়ে, আকাশের দিকে মুখ করে নীলা গাইতে শুরু করে, ধীরে ধীরে ধীরে বও ওগো উতল হাওয়া।

মরুনি তন্ময় হয়ে শোনে গানটি।

নীলা জিজ্ঞেস করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম মরুনি শুনেছে কি না। শোনেনি সে।

সে কে?

মরুনি বাঙালি মেয়ে, পশ্চিমি সব শিল্পীসাহিত্যের খবর তার নখদর্পণে, অথচ রবীন্দ্রনাথের নাম শোনেনি। ত্বরিতে উঠে নীলা বলে, চলো তোমাকে একটি জায়গায় নিয়ে যাব।

উভের ছেড়ে প্যারিসে এসে এভেনিউ দেতালির দিকে যেতে বলে মরুনিকে। ওখানে একটি ছোট্ট রাস্তায় থেমে মরুনির হাত চেপে ধরে উত্তেজনায়, নীলা বলে দেখো, এ রাস্তার নাম, রু টেগোর, টেগোর—যাঁর গান আমি গাইছিলাম। রাস্তা থেকে নেমে গেলেই স্প্যানিশ শিল্পী মিরোর নামে একটি বাগান, অপর পাশের রাস্তা রুশ শিল্পী মার্ক শাগালের নামে।

মরুনি জিজ্ঞেস করে, টেগোরও কি শাগাল বা মিরোর মতো শিল্পী ছিলেন?

নীলা বলে, ওঁর নাম টেগোর নয়, শুদ্ধ উচ্চারণ হচ্ছে ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইংরেজরা

তাঁর নামের উচ্চারণ করতে পারত না বলে টেগোর বলত।

মরুনি নীলার হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে মিরোর বাগানে হাঁটে, পাশে হাঁটতে হাঁটতে নীলা বলে যায় রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকতেন বটে, তবে তাঁর ছবির চেয়ে অনেক বেশি মূল্যবান তাঁর গান, কবিতা, তাঁর ছোটগল্প। বাঙালির কাছে, তিনি অনেকটা ঈশ্বরের মতো। আজও বাঙালির ঘরে ঘরে রবীন্দ্রসংগীত বাজে, কত নতুন নতুন সংগীতের উদ্ভব হয়, ঝরেও যায় কদিন পর, কেবল রবীন্দ্রসংগীত থেকে যায়। কোনও গীতিকার বা সুরকারের সাধ্য নেই রবীন্দ্রনাথের মতো শিল্পীকে ডিঙিয়ে যাওয়া। তাঁর সংগীত হাজার বছরেও এতটুকু মলিন হবে না।

মরুনি বলে, তুমি কি মিরোর কাজ দেখেছ?

বারসেলোনায় মিরোর শিল্পকর্ম দেখে মরুনি কীরকম মুগ্ধ হয়েছিল, সে কথা পাড়ে। বারসেলোনায় যদি কখনও যায় নীলা, তবে মিরোর কাজ যেন অবশ্যই দেখে আর কিছুতেই যেন গাউদির স্থাপত্য, বিশেষ করে গির্জাটি দেখতে ভুলে না যায়, বলে।

আমি তোমাকে রবীন্দ্রনাথের একটি বই দেব ফরাসি ভাষায়, পড়ে দেখো। আরও পড়তে চাইবে। নীলা বলে।

মরুনি গাড়ির দিকে যেতে যেতে বলে, সে নিৎসের ওপর একটি বক্তৃতা লিখছে, লেখাটি নিয়ে ইদানীং ভীষণ ব্যস্ত সে। রবীন্দ্রনাথের কিছু পড়ার এখন সময় নেই মোটে। সময় হলে সে নীলাকে জানাবে।

নীলার বুকের মধ্যটা হঠাৎ হু হু করে ওঠে, অকারণে।

জ তেম জ তেম জে তেম

নীলা ব্যাঙ্কে খোঁজ নিয়েছে, টাকা এখনও আসেনি।

নিজে সে কলকাতার ব্যাঙ্কে ফোন করে টাকার খোঁজ নিয়েছে। ওরা সাফ বলে দিয়েছে টাকা পাঠানো হয়ে গেছে।

একটা অসহ্য অস্থিরতার মধ্যে নীলা দিন কাটাচ্ছে।

শ্রুতিযন্ত্র থেকে বেনোয়ার প্রতিদিনকার আকুল কণ্ঠ মুছে ফেলছে।

সুনীলকে বেশ কবার তাড়া দিয়েছে, ভাড়া নেওয়ার জন্য একটা বাড়ি খুঁজতে।

সুনীল খুঁজি খুঁজি করেও খুঁজছে না।

কিন্তু যে সকালে সুনীল বেরিয়ে যাবার আগে নীলা আবার আবদার করল বাড়ি খোঁজার, চৈতালি পাশেই ছিল, বলল সুনীলের এত সময় কী করে হবে!

সুনীল হবে বলল। সামনের সপ্তাহেই হবে।

চৈতালি বলল, ভাড়া নেওয়া কি মুখের কথা। জিম্মাদার হবে কে!

নীলার আবদার, সেও সুনীলকে হতে হবে।

চৈতালি ঝাঁজালো গলায় বলে, সুনীল জিম্মাদার হলে, কী হতে আবার কী হয়। ফরাসি কেউ হলে ভাল। তোমার তো ফরাসি বন্ধু আছেই।

না, আমার কেউ নেই। নীলা বলে।

এত বড় ঝুঁকি কী করে নেবে সে? আগের ঝাঁজালো সুরেই বলে চৈতালি।

ঝুঁকির প্রশ্ন আসছে কেন? বাড়িভাড়া দিতে কি আমি বাকি রাখব? টাকা পৌঁছলে সুনীলদা দেখেই না হয় দেবেন! যদি বিশ্বাস না হয়।

সুনীল চোখ টেপে নীলার দিকে। নীলাও টেপে। পাক্কা।

সেদিন দুপুর পার হয়, আর নীলা গরমে হাঁসফাঁস করে ঘরের ভেতর। কোনও পাখার বংশ নেই চালাবে। ঘরের বাইরে গনগনে আগুনের চুল্লি জ্বলছে। জানালায় তাকিয়ে কিছুক্ষণ সে বাইরের উৎসবের ঢেউ দেখে। সারাবছর রোদ না পাওয়া লোকগুলো অর্ধউন্মাদ হয়ে গেছে, রোদ যতক্ষণ আছে, ততক্ষণ এর প্রতিটি কণা ওদের ভোগ করা চাই। নীলার এই সমস্যা নেই, সে জন্ম থেকে রোদে ভুগে আসছে, রোদ তাকে টানে না।

সারাদিনই ঘরে থেকে সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখা নিয়তিবাদ : উদ্ভব ও বিকাশ বইটি শেষ করেছে। শেষ করে চা খেতে খেতে আধশোয়া হয়ে জয় গোস্বামীর কবিতা পড়তে শুরু করে, জোরে। কবিতা সে সশব্দেই পড়ে, নিজেকে শুনিয়ে। এও অভ্যেস তার। কবিতা তার কাছে পড়ার যেমন জিনিস, শোনারও।

নীলার সামনে যখন গরম চা, জয়ের কবিতা, আর মনে অমল আনন্দ, সুনীল ঢোকে

বাড়িতে। একেবারে নীলার শোবার ঘরে। দুর্গার ঘরে, কালীর ঘরে, সরস্বতীর ঘরে।

কী ব্যাপার! এই অসময়ে বাড়ি ফিরলেন! নীলা বলে।

বিছানায় গা এলিয়ে একটি বালিশ টেনে নিয়ে বুকে, সুনীল বলে, আর বোলো না, কিছু ভাল লাগছিল না। কাজ কাজ আর কাজ।

নীলার হাত থেকে কবিতার বইটি নিয়ে চোখের সামনে মেলে সুনীল বলে, তুমি কবিতা পড়ছ! কতদিন আমার কবিতা পড়া হয় না! সেই দিনগুলি কোথায় যে গেল! সেই আমার সোনা রঙের দিনগুলি...

দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় রইল না। গানটি গুন গুন করে গাইতে থাকে নীলা।

সুনীল উঠে বসে, বাহ। বাহ, তুমি যে এত ভাল গান করো, তা তো জানতাম না!

নীলা ভুরু নাচায়, মোটেও না, এককালে ভাল গাইতাম। এখন না গাইতে গাইতে গলা আর নেই!

সুনীল আবার হেলে পড়ে, কবিতার বইটি নীলার দিকে ঠেলে দিয়ে বলে, একটা কবিতা শোনাও তো। জয় গোস্বামী চমৎকার কবিতা লেখে শুনেছি।

নীলা বইয়ের পাতা ওলটায় পড়ার মতো কবিতা পেতে, ডান হাতে। বাম হাতটি রাখা ছিল কোলে, সেটি তুলে নেয় সুনীল। হাতের রেখায় তাকিয়ে বলে, দেখি তো তোমার কটা বিয়ের কথা লেখা আছে।

বিয়ে? আরও? একটি করেই যন্ত্রণা পোহাচ্ছি কত। সুরে বলে নীলা।

আলগোছে হাতটি সুনীলের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে, কবিতায় মন দেয়।

নিঃশ্বাস নিতে দেব না, তোমাকে
নিঃশ্বাস নিতে দেব না।
একবার যদি পাই, পুনরায়
আরবার যদি পাই,
পাঁজরে পাঁজর গুঁড়ো করে দেব—ছাই!

গুড়গুড় করে মনে করে মুচিরাম
জয় রাম বলে জয়রাম বলে
নিইনি কখনও তার নাম মুখে
ভবিষ্যতেও নেব না—
কিন্তু লিখব একবার যদি হাতে পাই একা ছাতে পাই
কিছুতেই ছেড়ে দেব না।

সুনীল মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নীলার দিকে। সুনীল আধশোয়া, নীলাও।

একা একা চা খাচ্ছ! আমার জন্য এক কাপ হবে কি! সুনীল ঠোঁট ফুলিয়ে বলল।

যেন এ বাড়ির অতিথি নীলা নয়, যেন সুনীল। নীলা চা করে আনল, সুনীলের জন্য তো বটেই, নিজের জন্যও আরেক কাপ। এবার আর বিছানায় নয়, চেয়ারে বসে, সুনীলের নাগালের বাইরে, বসে, বলল, বাড়ি কবে ঠিক হবে বলুন!

এত তাড়া কীসের?

তাড়া নেই! তবে এভাবে অন্যের বাড়ি আর কদিন থাকা যায়!

কেন, তোমার কি অসুবিধে হচ্ছে?

আমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। ঘর দখল করে রেখে আমিই বরং আপনাদের অসুবিধে করছি।

আমাদের এত পর ভাবো কেন শুনি?

নীলা জানে, সুনীল ছাড়া এ শহরে আপন তার কেউ নেই। ওকে পর ভাবলে এ বাড়িতে সে নিজের বাড়ির মতো করে থাকতে পারত না।

কোনও একটা চাকরি পেয়ে গেলে স্বস্তি পেতাম। নীলা বলে।

হয়ে যাবে, হয়ে যাবে। নারায়ণকে বলেছি, ও ব্যাটা বেশ কাজের লোক। চাকরি খুঁজছে। তবে ভাষাটা ভাল জানলে ভাল চাকরি পেতে!

আমার ভালর দরকার নেই। যেমন তেমন হলেই হয়।

নীলা হঠাৎ গরম চায়ে চুমুক দিয়ে উহু মাগো বলে কুঞ্চিত করে ঠোঁট, গাল, কপাল চোখ। ছলকে পড়ে চা, কোলের ওপর জয়ের বই, আর বইয়ের ওপর কাপ, আঙুল সরিয়ে নিয়ে কাপের হাতল থেকে তাকায় সুনীলের চোখে। সুনীলের চোখ হাসছে।

কী জিভ পুড়ল তো!

সুনীলের চোখ থেকে চোখ সরিয়ে নীলা মেঝেয় রাখে চোখ, দাবার ছকের মতো মেঝে, সাদা কালো, কালো সাদা। এ পারে হাতি ঘোড়া রাজা মন্ত্রী কিছু নেই, কেবল এক নিরস্ত্র সৈন্য, ওপার থেকে ঘোড়া এল আড়াই ঘর হেঁটে, দেখি পুড়েছে কতটা, জিভ বের করো তো...

সুনীলের লম্বা লাল জিভ নীলার পুড়ে যাওয়া জিভের দিকে যেই এগোয়, নীলা জিভ ঢুকিয়ে নেয় ভেতরে। চেয়ার পেছনে হেলিয়ে সুনীলের জিভের নাগাল থেকে নিজেকে বাঁচায়।

কী হচ্ছে কী! সুনীলকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নীলা উঠে দাঁড়ায়।

দাঁড়িয়ে ওঠা নীলাকে বিছানায় এক ঝটকায় টেনে আনে সুনীল। নীলার হাত থেকে ছিটকে পড়ে চায়ের কাপ, জয়ের বই। নীলার শরীর চেপে রাখে নিজের শক্ত শরীরে, এক হাতে তল থেকে নীলার পাজামার ফিতে খুলে নীচে নামিয়ে, নিজের প্যান্টও হাঁটু অব্দি নামিয়ে নীলার ভেতর ঠেসে ধরে নিজেকে। বাকহীন শক্তিহীন পড়ে থেকে কুৎসিত এই দৃশ্য দেখে নীলা। সারা বাড়িতে আর কোনও শব্দ নেই, কেবল সুনীলের গোঙানো, ও নীলা ও নীলা।

সুনীল কয়েক মুহূর্ত পর নেতিয়ে পড়ে নীলার শরীরের ওপর।

নীলা সুনীলকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য স্পর্শ মাত্র করে না। এক দৃষ্টে সাদা দেয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সুনীল নিজেকে দ্রুত গুছিয়ে দেখে চোখ থেকে জল গড়িয়ে বালিশ ভিজছে নীলার।

কী ব্যাপার কাঁদছ তুমি?

সুনীল আঙুলে চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলে, কাঁদছ কেন?

ওই সাদা দেয়ালে তাকিয়ে থেকেই সে ভাঙা গলায় বলে, আমি কাঁদছি না। আমি কাঁদি না। আমার মা আমাকে একা রেখে চলে গেছেন, আমি কাঁদিনি। কোনও কষ্টই আমার কাছে কষ্ট মনে হয় না। জীবন এরকমই সম্ভবত...এরকমই কুৎসিত। আমার কেবল মনে হল, আমার দাদা নিখিল এইমাত্র আমাকে ধর্ষণ করল।

আমি তোমার দাদার বন্ধু, আপন দাদা তো নই।

আমরা তো দাদার বন্ধুদের দাদাই ভাবতে শিখি সেই ছোটবেলা থেকে।

সেই দাদার বন্ধুদের সঙ্গে তো আবার বিয়েও হয়, হয় না?

হয়, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়নি। কিষানের সঙ্গে মেলে না বলে ওকে ছেড়ে এসেছি, ওকে কখনও আমার আপন বলে মনে হয়নি, এ শহরে আপনিই ছিলেন আমার আপন। এসব অসম্মান সওয়ার চেয়ে আমার সম্ভবত ওর বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভাল। শরীর ভোগ করবে করুক, যত হোক স্বামী সে, দাদা তো নয়।

সুনীল ভারী গলায় বলে, আমি তো জানতাম তোমার সায় ছিল। জয়ের ওই কবিতা পড়তে পড়তে তুমি আমার দিকে কেমন চোখে তাকাচ্ছিলে, তাকাচ্ছিলে না? বলো!

সুনীল বেরিয়ে যেতেই নীলা স্নানঘরে গেল। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করল, আস্ত সাবান ফুরোল ঘষে, শরীর তো নয়, যেন শেয়াল শকুনের ভাগাড় এটি। নীলা থুতু ছুড়ে দেয় নিজের শরীরে। সাবান ঘসে ঘসে লোভ, ঘেন্না, কফ, থুতু বীর্য, রক্ত যা আছে শরীরের অলিগলিতে, সরায়। নিজেকে বারবার সে বলে, না কোনও ঘটনা ঘটেনি, সে এমনিতে সাবান ফুরোচ্ছে, এ তার নিজের কুৎসিত মনের কল্পনা। সুনীল অসময়ে বাড়ি ফেরেনি, তার বিছানায় শোয়নি, তাকে স্পর্শ করেনি, যদি কেউ করেও থাকে, সে অন্য লোক, অথবা নীলা ঘুমিয়েছিল দুপুরে, এ তার নিতান্তই স্বপ্নের মধ্যে ঘটেছে। স্বপ্নদোষ। অথবা প্রতিবেশী কোনও লোক, কোনও দুষ্ট কালো লোক বাড়ি লুঠ করতে এসে নীলাকে একা পেয়ে ধর্ষণ করেছে, অথবা ধর্ষণ করেনি, নীলাই চেয়েছে ধর্ষিতা হতে। সুনীল সন্ধেয় ফিরবে, প্রতিদিনকার মতো। প্রতিদিনকার মতো সন্ধের পর সুনীল চৈতালি আর নীলাকে নিয়ে গল্পের আসর বসাবে, মাছ ভাত খাবে, আর নীলার মনে হতে থাকবে, কেবল এ শহরে নয়, এ জগতে সুনীলই তার সবচেয়ে কাছের আত্মীয়।

স্নানঘর থেকে বেরিয়ে নীলা ফোন করে বেনোয়াকে।

বেনোয়ার ব্যাকুল কণ্ঠস্বর শোনে, এক্ষুনি সে নীলার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কোথায় দেখা হবে? কোথায় দেখা করলে তোমার জন্য সুবিধে?

সুবিধে? শব্দটির নীলা অর্থ জানে না।

সাড়ে পাঁচটায় মোপারনাসের সিলেক্টে বেনোয়ার সঙ্গে দেখা হয় নীলার। বেনোয়া চা বলে নীলার জন্য, নিজের জন্য কফি। তেরাসে রাস্তার দিকে মুখ করে পাশাপাশি বসে দুজন।

নীলার কালো একটি টিশার্ট গায়ে, আর সাদা প্যান্ট। চুল বাঁধেনি, মুখে রং লাগায়নি, ঠোঁট গাঢ় বাদামি। এ রং ঢাকতে নাকে পাউডার লাগানোর ছুতোয় সে আজ যাচ্ছে না কোথাও।

উদাস চোখে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে চায়ে চুমুক দেয়।

কী করেছ আজ সারাদিন?

শুয়ে শুয়ে বই পড়েছি।

বাইরে বেরোওনি?

না।

ফোন ধরোনি, সারাদিন ফোন করলাম।

তার খুলে রেখেছিলাম।

আমার সঙ্গে যেন কথা বলতে না হয়! তাই না! তো কী মনে করে মনে করলে আমাকে?

জানি না।

নীলা, আমার দিকে তাকাও।

তাকায় সে বেনোয়ার গভীর নীল চোখদুটোয়।

এ চোখে কিছু দেখো না?

না।

তুমি কি অন্ধ?

না।

নীলার হাত বেনোয়া তার উষ্ণ হাতে নিয়ে হাতের পিঠে চুমু খায়।

একটি কথা রাখবে?

কী কথা?

রাস্তায় কী দেখছ? আমাকে দেখো।

নীলা আবার তাকায় বেনোয়ার চোখে।

তোমার মন খারাপ?

না।

কী হয়েছে বলো!

কিছু হয়নি।

সেদিন ওই অত রাতে তুমি ওভাবে চলে গেলে, সারারাত আমি ঘুমোতে পারিনি।

নীলা নির্বিকার। বেনোয়ার চোখ থেকে চোখ সরিয়ে আবার তার চোখ রাস্তায়, রাস্তার ওপারে লা কুপলে লোকের ভিড়। প্রতিটি ক্যাফে রেস্তোরাঁ ভিড়ে উপচে পড়ছে। চা কফি না ফুরোতেই ক্যাফের লোক কাপ উঠিয়ে নিয়ে যায়।

নীলার হাত ধরে বেনোয়া হাঁটতে থাকে ফুটপাত ধরে। নীলার ভাল লাগে বিকেলের এই ফুরফুরে হাওয়ায় এভাবে হাঁটতে। এভাবে পাশাপাশি। নীলার ইচ্ছে করে বেনোয়া এভাবেই তার হাত ধরে থাকুক, না ছাড়ুক। রু দ্য রেনে শাঁ প্লাসিদের মোড়ে পাঁচতলা বাড়ির চারতলায় বেনোয়ার এপার্তোমো। ঘরে ঢুকে নীলাকে বসিয়ে, না চুমু না কিছু, বেনোয়া রান্নাঘরে ঢোকে। নীলা নিশ্চিত গেলাসে লাল ওয়াইন নিয়ে ঢুকবে বেনোয়া, উলঙ্গ করে সে ওয়াইন ঢালবে তার শরীরে, পান করবে। সে যেমনই হোক, সুনীল দ্বারা ধর্ষিতা হওয়ার চেয়ে এ ঢের ভাল। ইচ্ছের বাইরে বেনোয়া নীলার সঙ্গে কোনও যৌনসম্পর্কে যায়নি।

নীলাকে চমকে দিয়ে বেনোয়া দু কাপ চা নিয়ে ঘরে ঢোকে।

চা তো তোমার ঘরে নেই জানতাম।

আর্ল গ্রে কিনে রেখেছি, তোমার জন্য। এতে চলবে? শান্ত সুন্দর স্বর বেনোয়ার।

নীলা হাসে, চলবে।

বেনোয়া উঠে আসে নীলার পায়ের কাছে। নীলার কোলের ওপর মাথা রাখে।

কোলের মাথাটিকে সে ঠিক বুঝে পায় না কী করবে।

কিছুই করে না সে। চা পান করতে থাকে। গরম চায়ে চুমুক দিয়ে আবার জিভ পোড়ায় সে। হঠাৎ অসচেতনে উহ মাগো শব্দ বেরিয়ে আসে, বুক কেঁপে ওঠে তার, এই বুঝি বেনোয়া এখন পোড়া জিভ দেখার ছলে লম্বা লাল জিভ নিয়ে এগোবে।

বেনোয়া মাথা তোলে, কী হয়েছে?

কিছু না।

জিভ পুড়েছে কি না জিজ্ঞেস করে না। নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে নীলার চা খাওয়ার দিকে, বলে, জ তেম।

চায়ের কাপটি কেঁপে ওঠে, ওটিকে দুহাতে ধরে, জিজ্ঞেস করে, কী বললে?

জ তেম। তোমাকে ভালবাসি।

অদ্ভুত শান্ত স্বর বেনোয়ার। আগের সেই অস্থিরতা নেই বেনোয়ার মধ্যে। নীলাকে হাতের কাছে পেয়ে শরীরী আনন্দে মেতে ওঠার সেই মাতলামো নেই। এ কদিনে সে অনেক বেশি পরিণত, অনেক ধীর স্থির। কাঁপা চায়ের কাপটি টেবিলে রাখতে নীলা ওঠে, আসলে চমক সামলাতেই ওঠে সে। উঠে জানালার কাছে যায়, রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তার মানুষ দেখে কিছুক্ষণ, আবার ফিরে আসে। বেনোয়া থেকে দূরে বসে। চায়ের কাপটি আবার হাতে নেয়, যেন সে যেমন চা খাচ্ছিল, তেমনই খাচ্ছে, মাঝখানে জ তেম বলে কোনও শব্দ সে শোনেনি।

নীলার ভয় হতে থাকে, সুনীল যা করে গেছে তার শরীরে আজ, জেনে, বেনোয়া এই জ তেম আর বলবে না। চোখ বুজে দাঁতে দাঁত চেপে মুঠো শক্ত করে অন্তস্থ করে সে তার একাকিত্ব, অসহায়ত্ব, তার গোপন সব যন্ত্রণা। বেনোয়ার ভালবাসা তার সবচেয়ে বড় অহংকার। বেনোয়াকে সে নিজের কোনও গ্লানির গল্প শোনাবে না। নীলা সব হারিয়েছে, হারাতে হারাতে হারিয়েছে হারাবার সব বেদনাকে। বেনোয়াকে সে হারাতে চায় না। এক বেনোয়ার ভালবাসাই যদি তাকে বাকি জীবন বাঁচিয়ে রাখে। নীলা প্রাণপণ বাঁচতে চায়। এই নিষ্ঠুর কুৎসিত পৃথিবীতে নীলা সুন্দরের হাত ধরে হেঁটে যাবে তার এতকাল লালন করা স্বপ্নের দিকে।

পা পা করে এগিয়ে এসে সে বেনোয়ার পেছনে হাঁটু গেড়ে বসে। একটি হাত রাখে বেনোয়ার কাঁধে, সেই হাতটির ওপর বেনোয়া আলতো করে নিজের একটি হাত রাখে।

দুটো হাতের স্পর্শ শুধু, বেনোয়ার ওই আলতো করে রাখা হাতটি থেকে সুখ নেমে আসে নীলার হাতে, হাত থেকে ছড়িয়ে পড়ে সমস্ত শরীরে।

সত্যি ভালবাসো?

বেনোয়া ঘুরে তাকায়। স্বপ্নালু দুটো চোখ তার। গভীর নীল।

নীলাকে নিজের কোলের ওপর বসিয়ে জড়িয়ে ধরে গভীর করে চুমু খেয়ে বলে, জ

তেম, জ তেম।

এখন সে বেশ জানে ফরাসিরা ভালবাসি শব্দটি সহজে বলে না। ভালবাসলেই কেবল উচ্চারণ করে শব্দটি। দূরের এক ছাদে দাঁড়ানো কোনও মেয়েকে দেখেই এক পলকে যেমন বাঙালি ছেলেরা ভালবেসে ফেলে, ভালবেসে রাত জেগে একশো পদ্য লিখে ফেলে, চেনা নেই জানা নেই, বোঝা নেই, ভালবেসে জীবন দিয়ে দেয়, এরকম এখানে নয়। এদের ভালবাসা সত্যিকার ভালবাসা। আর এ সত্যিকার ভালবাসা নীলার জন্ম সার্থক করে। অর্থহীন জীবনকে অর্থময় করে।

বেনোয়ার কোল থেকে উঠে গিয়ে বিছানায় শোয় নীলা। ভালবাসা তাকে পালকের মতো নরম করে তুলছে, জানালা দিয়ে তার উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে, শহরের প্রতিটি লোককে তার বলতে ইচ্ছে করছে, সে আর একা নয়, তাকে আর লোকে ভোগ করার জন্য ভোগ করছে না, কেউ তাকে ভালবাসে, কেউ তার প্রেমে সত্যিকার পড়েছে। বেনোয়া নীলার পাশে শুয়ে বলে, তুমি ফরাসি ভাষা শিখতে চাইছিলে না? জানো এ ভাষা কী করে শিখতে হয়?

কী করে?

শিখতে হয় প্রেমিকের কাছ থেকে, বালিশ থেকে বালিশে, শুয়ে।

নীলাকে বুকে জড়িয়ে নীলার চুলের সুগন্ধ নিতে নিতে বেনোয়া বলে, তুমি কি আমাকে ভালবাসো?

বাসি। নীলা বলে।

তবে বলো, জ তেম।

জ তেম।

এল, এমব্রোসো মো।

এমব্রোসো মো।

বলো, লা ভি এ বেল।

লা ভি এ বেল।

সা সে লা ভি।

সা সে লা ভি।

বেনোয়া চুমু খায় নীলাকে আবার।

বেনোয়া শান্তিপুরি চপ্পল খুলে নীলার পায়ে চুমু খায়, পায়ের প্রতিটি আঙুলে, সুশান্তর কথা ভাবে নীলা, সুশান্তও তো তাকে ভালবাসে বলে বলত, কিন্তু কখনও তো এভাবে বেনোয়ার মতো আদর করেনি। বেনোয়ার ভেতরে এক শিল্পী বাস করে, বেনোয়াই পুরো জগতের আর সব পুরুষ থেকে আলাদা না কি সব ফরাসি পুরুষই এমন চমৎকার করে ভালবাসে তাদের প্রেমিকাদের। নীলা বোঝে না, না বোঝা চোখে থই থই করে প্রেম।

আমি তোমার বয়সে বড় জানো তো। আমাদের দেশে বয়সে বড়দের দিদি বলে ডাকে। বোনকে যেমন দিদি বলে। নীলা বলে।

তুমি যদি চাও তোমাকেও দিদি বলব।

ও কাজটি কোরো না। তা হলে তোমাকে আমি চুমুই খেতে পারব না।

বেনোয়া আবার চুমু খায় নীলার ঠোঁটে জিভে। চুমু খেয়ে মুখটি উঠিয়ে বলে, দিদি।

আবার চুমু খেয়ে আবার দিদি বলে।

বয়সে বড় তুমি? তাতে কী হয়েছে?

আমাদের সমাজে প্রেম করো বা বিয়ে করো, ছেলেদের হতে হবে বড়, মেয়েদের বয়সে ছোট।

এ তো তোমাদের সমাজ নয়। এ আমাদের। ভাল যে এ আমাদের, নয়তো তোমাকে আমার পাওয়া হত না। বেনোয়া হেসে বলে।

এই যে কচি কচি ফুটফুটে মেয়েগুলো সারা শহর দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, তোমার ইচ্ছে করে না কাউকে জ তেম বলতে?

ঠোঁট ওলটায় সে, না।

তুমি তো বলেছ, বাদামি রং নাকি পছন্দ, রোদে পুড়ে ওরাও তো এই রং পাচ্ছে, তবে?

বেনোয়া অনেকক্ষণ হেসে বলল, ও রং তো ওদের কদিন পর চলে যাবে, কৃত্রিম রং। ছো!

বেনোয়া আবার চুমু খায়, নীলাকে জড়িয়ে।

তুমি বয়সে বড় তো। এ ভাল, তোমার কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে।

আমার চেয়ে তুমি অনেক বেশি জানো।

কী জানি তোমার থেকে বেশি?

নীলা বেনোয়ার নাক নাড়ে দু আঙুলে, তুমি জানো তুমি কী জানো।

না জানি না, বলো।

বলব না।

বলবে না?

না।

কেন?

ইচ্ছে।

আমারও একটি ইচ্ছে আছে।

কী, শুনি।

এ শোনার জিনিস নয়!

তবে কীসের জিনিস।

অনুভবের।

নীলা চোখ বোজে।

চোখ বুজে সে অপেক্ষা করে বেনোয়ার স্পর্শের, বেনোয়ার বেনো জলের, প্রলংকরী ঝড়ের।

অনেকক্ষণ কোনও স্পর্শ নেই। চোখ খুলে নীলা দেখে বেনোয়া তার পাশেও নেই, হাসছে মেঝেয় শুয়ে, নীলার নাগাল থেকে দূরে।

কিছু অনুভব করেছ?

দুষ্টুমি হচ্ছে, না? নীলা বিছানা থেকে নেমে বেনোয়ার পাশে বুকের ওপর মাথা রেখে শোয়।

বেনোয়া এক হাতে নীলাকে জড়িয়ে রাখে। সাদা বুকে বাদামি আঙুল বুলোতে বুলোতে চুমু খায়, বুক থেকে নীলার ঠোঁট বেনোয়ার গলায়, চিবুকে, ঠোঁটে।

দু বাহুতে নীলাকে শক্ত করে বেঁধে বেনোয়া বলে, জ তেম, জ তেম, জ তেম।

এখানেই জগৎ থেমে যাক। শ্বাস বন্ধ করে রাখে সে। তৃষ্ণার জন্য এক ফোঁটা তার প্রয়োজন ছিল, বেনোয়া উজাড় করে গোটা সমুদ্র তাকে ঢেলে দিচ্ছে, এত তার প্রাপ্য ছিল না, নীলা তাড়া খাওয়া, আত্মীয়হীন বন্ধুহীন, আশ্রয়হীন একটি অসহায় প্রাণী, মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়া, কুঁকড়ে যাওয়া, কুঁচকে যাওয়া, তলিয়ে যাওয়া।

আবেগে সে চোখ বোজে। সেই বোজা চোখের ওপর বেনোয়ার ঠোঁটের স্পর্শ। বেনোয়ার ভালবাসা নীলা সমস্ত শরীরে অনুভব করে। সমস্ত হৃদয়ে। যত গভীরে যায় বেনোয়া, যত অতলে, নীলা টের পায়, এ নিছক সঙ্গম নয়, শরীর শরীর খেলা নয়, এ গভীর গহন ভালবাসা। এ শরীরকে শুদ্ধ করে, স্নিগ্ধ করে, শীতল করে। এ হৃদয়কে প্রফুল্ল করে, প্রশস্ত করে, প্রোজ্জ্বল করে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দুজন রাতে, ঘড়িতে রাত, অথচ আকাশ জুড়ে আলো। এ প্রকৃতির ক্ষতিপূরণ, শীতকালে আলো কেড়ে নেয় বলে গ্রীষ্মে এসে তার পূরণ করে দেয়। শাঁজ এলিজের ঘাসের ওপর ঘন হয়ে বসে থাকে, হৃদয়ে আনন্দধারা বইতে থাকে নীলার। একটি সাদা ঘাসফুল তুলে, ঘাসফুলের নাম মার্গারিত, পাপড়িগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে বেনোয়া বলতে থাকে, জ তেম, ওঁ প, বকু, প্যাশনোমো, আলা ফলি, পা দু তু। তোমাকে ভালবাসি, অল্প, বেশি, অত্যধিক, পাগলের মতো, একটুও না। শেষ পাপড়িটি যেটিতে এসে থামবে, সেটিই ধরে নিতে হবে মনের কথা। এই পাপড়ি ছেঁড়া খেলায় বেনোয়ার শেষ পাপড়িতে হয় আলা ফলি, নীলার হয় পা দু তু। বেনোয়া বলে, দেখলে তো আমি তোমাকে পাগলের মতো ভালবাসি, তুমি আমাকে একটুও না।

তাই মনে হয় তোমার? নীলা হেসে বলে।

নীলাকে চুমু খায় প্রথম, পরে বলে, না। আমি জানি তুমি আমাকে খুব ভালবাসো।

আর তুমি কি সত্যিই আলা ফলি?

আমি সত্যিই আলা ফলি।

ক্যাফেতে বসে রাতের খাবার খেতে খেতে মানুষের ঢল দেখে নীলা, আলোয় ভাসছে মানুষ, উচ্ছল উজ্জ্বল প্রাণবন্ত মানুষ। শাঁজ এলিজে সারারাত জেগে থাকে, হাজার মানুষের ভিড় সারারাত। ক্যাফের ভেতর সেজেগুজে ষাট সত্তর বছর বয়সের মহিলারা বসে আছে। দেখে নীলা বলে, বুড়োবুড়ি কারওরই ঘুম নেই!

ওই ধনী বুড়িগুলো বসে আছে জিগোলো পেতে। বেনোয়া নীলার কানে কানে বলে।

জিগোলো পেতে মানে? গলা চেপে নীলা।

যুবকেরা আসবে, যে যাকে পছন্দ করবে, তার সঙ্গে সেঁটে যাবে এরা।

বলছ কী?

দেখোই না।

নীলা ঘন ঘন পেছন ফেরে।

ঘটনা সত্যিই ঘটে। বয়সে বড় মহিলারা বয়সে ছোটর হাত ধরে মহা সুখে বেরিয়ে যায়, যেন মা বেরোচ্ছে ছেলের হাত ধরে।

এখন কী হবে?

মহিলা তার বাড়িতে নেবে ছেলেটিকে। তারপর আনন্দ করবে। ছেলেটিকে উপহার টুপহার কিনে দেবে, খাওয়াবে। একসঙ্গে নাচবে। শোবে। ছেলেটি টাকা পয়সা চাইলে টাকা পয়সা দেবে।

নীলা জিভে কামড় দেয়। ও মা কী কাণ্ড।

শাঁজ এলিজের এক মাথা থেকে আরেক মাথা অব্দি, অর্ক দ্য ট্রয়ম্ফ থেকে কনকর্ডের ঘুরন্ত চাকা অব্দি যায়, আবার ঘুরে আসে, পরস্পরের কোমর জড়িয়ে, যেন স্বর্গের উদ্যানে হাঁটছে, দুজন হাঁটে। কখনও আবার আইসক্রিম খেতে বা কফি চা, কোনও ক্যাফের তেরাসে বসে, আবার হাঁটে। টুকরো টুকরো হালকা কথা তুলোর মতো হাওয়ায় ওড়াতে থাকে দুজন, কার কোন রং পছন্দ, নীলার নীল, বেনোয়ার হালকা সবুজ, কার কী খেতে পছন্দ, রুইমাছ ভাত, ক্যানার আর আলু, কোন শহর কার সবচেয়ে পছন্দ, নীলার প্যারিস, বেনোয়ার রোম, রোম কি গেছে কখনও সে, যায়নি। বৃষ্টি ভাল লাগে? নীলার লাগে, বেনোয়ার লাগে না। আকাশ? মেঘলা আকাশ, নীলাকাশ। ছোটবেলার দুঃখের স্মৃতি? ইস্কুলের পরীক্ষায় খারাপ করার পর অনির্বাণ পিটিয়ে তাকে আধমরা করেছিলেন। মাদাম দুপঁ বলেছিলেন চকোলেট এত খেয়ো না, খেলে দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। সুখের স্মৃতি? পরীক্ষায় ভাল করলে সে একটি লাল ফ্রক উপহার পেয়েছিল। বেনোয়ার সুখের স্মৃতি যখন সে বারো বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে অস্ট্রিয়ার স্কি করতে গিয়েছিল।

ফুটপাত ধরে হাতে হাত ধরে হাঁটছে সব বয়সের ছেলেমেয়ে, কেবল ছেলে মেয়েও নয়, মেয়ে মেয়ে, ছেলে ছেলেও। চুমু খাচ্ছে, ঝরনায় স্নান করছে। গান গাইছে। প্রাণ খুলে হাসছে। কারও ইচ্ছে হল ঢুকে যাচ্ছে সিনেমায়। হাতে হাতে বিয়ারের কৌটো। বেনোয়া যখন ঢোকে ভারজিন নামের এক দোকানে, রাত তখন তিনটে। কড়া আলোয় ভেসে যায় নীলা, ভারজিনে চড়া স্বরে গান বাজছে, বেনোয়া জ্যাক ব্রেলের একটি সি ডি কিনে নীলাকে দিয়ে বলে, এই সিডির একটি গান শুনবে, ভাববে যে আমি গাইছি এটি।

কোনটা?

ন মে কিত পা।

ন মে কিত পা, আমাকে ছেড়ো না। বেনোয়াকে নীলা ছাড়বে কেন! বাঁচতে গেলে যে হাওয়া দরকার হয় শ্বাস নেবার, নীলার জন্য বেনোয়া সে হাওয়া। বেনোয়া ছাড়া, নীলা কল্পনা করে, তার জীবন ধুলোর মতো, ধুলোয় পড়ে থাকা এক টুকরো দুর্গন্ধ মল।

নীলা যখন ক্লান্ত, যখন ঘুমে চোখ ঢুলে আসছে, বেনোয়া জিজ্ঞেস করে, বাড়ি যাবে তো!

যাব। মনে মনে বলে, বাড়ি গিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোব। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে ঘুমোব।

নীলা ভেবেছিল, প্রাস দ্য লা কনকর্ড থেকে সেইন পার হয়ে বুলোভার্ড শাঁ জার্মা ধরে রু দ্য রেনে যাচ্ছে বেনোয়া। কিন্তু অনেকটা দূর চলে এলেও নীলা দেখে সেইন পড়ছে না সামনে, কনকর্ড থেকে সোজা সে রু দ্য রিভলির রাস্তায়। ডানে জারদা দ্য তুয়েরি, ডানে ল্যুভর।

নীলা জিজ্ঞেস করে, কোথায় যাচ্ছ?

তোমাকে পৌঁছে দিতে।

ও।

ওরা তোমাকে খুব ভালবাসে, তাই না?

নীলার বলতে ইচ্ছে করে, ওরা আমাকে একটুও ভালবাসে না। বলতে ইচ্ছে করে আমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও, চরম লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করো আমাকে, আমাকে বাঁচাও। নীলা বলতে চায়, কিন্তু কে যেন তার কণ্ঠনালী শক্ত করে চেপে রাখে, কণ্ঠে কোনও স্বর ওঠে না।

নিশ্চয়ই খুব ভালবাসে, না হলে এতদিন ধরে কি ওরা রাখছে নীলাকে। এ যুক্তির কথা বটে।

ওদের ঘুম নষ্ট হবে না তুমি ঢুকলে?

না, আমার কাছে চাবি আছে। নীলা বলে।

তা হলে পা টিপে টিপে ঢুকে যেয়ো আমার বেড়ালসোনা।

নীলাকে নামিয়ে চুমু খেয়ে, বেশ কবার জ তেম বলে, মনে করিয়ে দিয়ে কবে কোথায় আবার দেখা হচ্ছে, বেনোয়া চলে যায়।

বড় দরজায় তিন শূন্য এ পাঁচ নয় দুই টিপলে বন্ধ দরজা খুলে যায় ভেতর থেকে, দোতলা অব্দি উঠে আর উঠতে ইচ্ছে করে না নীলার। ইচ্ছে করে না ও বিছানায় গিয়ে আবার শুতে। দোতলার সিঁড়ির কাছে শুয়ে পড়ে সে, শুয়ে শুয়ে বাকি রাত পার করে ভেবে, বেনোয়া কেন তাকে বলেনি চলো আমার বাড়ি চলো। এমন তো নয় যে বেনোয়ার বউ, পাসকাল, অদৃশ্য প্রেতের মতো ঘুরে বেড়ায় ও বাড়িতে! শরীরের ও মনের ক্লান্তি নীলার আপাদমস্তক আবৃত করে রাখে। শেষ রাতে কিছু পায়ের শব্দে সে ধড়ফড়িয়ে ওঠে, এই বুঝি কেউ ধর্ষণ করতে আসছে তাকে। ভয়ে সে কুঁকড়ে যেতে থাকে। সারারাত হল্লা করে ভোরবেলা বাড়ি ফিরতে সে আগেও দেখেছে ফরাসিদের। তাকে দেখে কেউ কোনও প্রশ্ন করে না, কেন সে এখানে শুয়ে আছে, কোথায় তার বাড়ি, ইত্যাদি। এ কারণেই প্যারিসে তার এক ধরনের স্বস্তি হয়, কারও ব্যক্তিগত জীবনে কেউ নাক গলায় না। কারও ইচ্ছেতে বাধা দেওয়া কারও স্বভাব নয়। নীলার ইচ্ছে করছে এখানে শুয়ে থাকতে, যেখানে শুয়ে আছে, শুয়ে থাকার অধিকার তার একশো ভাগ আছে, যতক্ষণ না অন্যকে সে বিরক্ত করছে।

ভোরের রাস্তায় শীতল স্নিগ্ধ হাওয়ায় নীলা একা একা হাঁটে। পৃথিবীর সব দেশে, ভোরই বুঝি সবচেয়ে সুন্দর সময়। এ সময় প্রত্যেককে দেখতে বড় শিশুর মুখের মতো নির্মল দেখায়। ক্যাফেতে চা খেয়ে সকাল দশটা পার করে নীলা। প্যারিসে এ তার ভাল লাগে, সাতসকালে সব ক্যাফে খুলে যায়, ভোরবেলা আপিসে যাবার পথে লোকেরা সার

সার দাঁড়িয়ে ক্যাফেতে কফি খেয়ে দিন শুরু করে। নীলার দিন শুরু করার কিছু নেই। কোনও আপিস নেই তার, কোথাও যাবার নেই, দিনের কোনও শুরু নেই, শেষ নেই। দিন আসে দিন যায়, নীলা নীলাই থেকে যায় কেবল বেনোয়াই যা তরঙ্গ তোলার তোলে তার নিস্তরঙ্গ নীরস জীবনে। তার মলিনাহীন জীবনে। বেনোয়ার সঙ্গে দেখা হলে তার দিন শুরু হয়, বিচ্ছিন্ন হলে শেষ হয় সে দিন। বাকি যে সময় পড়ে থাকে, তা কেবল অন্ধকার। বিচ্ছিরি অন্ধকার। যে অন্ধকারে শেয়াল শকুন ওত পেতে থাকে অন্যের সর্বনাশ করার আশায়। যে অন্ধকারে চুপচাপ মরে যায় মানুষ।

দশটার পর নিশ্চিত হয়ে বাড়িতে কেউ নেই, ঢুকে নীলা তার নিজের সুটকেস গুছিয়ে নেয়। টেলিফোন বই দেখে খোঁজ করে হোটেলের। যেদিকে যে হোটেলেই ফোন করে, সব কমপ্লেত, নয়তো চড়া দাম। খুঁজে পেতে রু দ্য লা কভোঁসিওঁতে কোনও এক স্টুডিয়ো হোটেলে একটি ঘর পায় ফাঁকা, তিনশো ফ্রাঁ ভাড়া, ক্রেডিট কার্ডের ওপর ভরসা করে ওটিতেই যাবে ঠিক করে ট্যাক্সি ডাকে। ট্যাক্সি তিন মিনিটের মধ্যে দাঁড়াবে নীচে, বলে। জয় গোস্বামীর বইটি পড়ে ছিল মেঝেয়, সেটি কুড়িয়ে সুটকেস নিয়ে দরজার কাছে যেই পৌঁছয় সে ফোন বাজে। বেনোয়া ভেবে নীলা দৌড়ে ফোন ধরে, বেনোয়া নয়, ওপাশে দানিয়েল।

কেমন আছো ভাল আছি জাতীয় কথাবার্তার পর দানিয়েল বলে, তোমার একটি চিঠি এসেছে, মনে হচ্ছে জরুরি, ব্যাঙ্কের চিঠি।

চিঠিটি আমার দরকার, নীলা রীতিমতো উত্তেজিত।

তোমার স্বামীর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, কেউ ধরেনি, তারপর রিভলিতে তোমার বন্ধুর বাড়িতে খবর দেব বলে করলাম। বললে, তোমার ওই বন্ধুর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিতে পারি চিঠিটি।

না। আমার কোনও বন্ধু নেই। এ লোক আমার দাদার বন্ধু ছিল জানতাম, আসলে বন্ধু নয়, শত্রু। এ বাড়ি থেকে আমি এখন চলে যাচ্ছি।

দানিয়েল ঠাণ্ডা গলায় বলে, চিঠিটি তবে আমি ব্যাঙ্কের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিচ্ছি।

খুলে পড়বে? কী লেখা? নীলা কাঁপে, আবেগে, রাগে।

দানিয়েল খোলে। টাকা এসেছে ভারত থেকে। তোমার একাউন্টে এখন দু লক্ষ নব্বই হাজার সাতশো আশি ফ্রাঁ।

নীলা জানত যে এ টাকা আসবে, কিন্তু টাকা এসে সত্যিকার পৌঁছোনোর পর মনে হচ্ছে তার, এ টাকা হঠাৎ চমকে দেওয়া টাকা, লটারিতে জিতে পাওয়ার টাকা।

দানিয়েল তুমি আমাকে বাঁচালে। নীলার কণ্ঠে উত্তাপ, উত্তেজনা।

দানিয়েলের নিরুত্তাপ স্বর, তুমি তো মরছিলে না যে আমি বাঁচিয়েছি! তুমি বেশ ভাল বেঁচে আছ, অনেকের চেয়ে ভাল।

এরপর দানিয়েল নিজের কথা খানিক বলে, সে করের ঝামেলায় পড়েছে। ইদানীং অর্ধেক টাকাই বেরিয়ে যাচ্ছে কর দিতে গিয়ে, দিন দিন সাধারণ মানুষের জন্য সরকারি সাহায্যগুলো কমে যাচ্ছে এ দেশে। কারণ সরকার ব্যস্ত গরিব দেশগুলোয় দান খয়রাত করতে। এ নাকি ধনী দেশেরই স্বার্থে, স্বার্থে না ছাই, দানিয়েল বলে, ধনী দেশের

গরিবদের করের টাকা যায় গরিব দেশের ধনীদের হাতে। গরিব গরিবই থাকে।

খাবার টেবিলের ওপর চাবি রাখে নীলা, যেভাবে কিষানের বাড়িতে সে চাবি রেখেছিল। সেভাবেই পা বাড়ায় বাইরে, যেভাবে নতুন আরেকটি জীবনের দিকে আগেও পা বাড়িয়েছিল। সে জীবন অনিশ্চিত জেনে আগেও সে দ্বিধা করেনি, এখনও না।

আমি আকাশের নীলে, বাতাসের পাখায়,
সরোবরের জলে, ঘাসের শরীরে, ঘাসফুলে
তোমার নাম লিখি স্বাধীনতা।

—জেক্রি ত নম লিবার্তে।

স্টুডিয়ো হোটেলের ঘরে লম্বা একটি ঘুম দিয়ে পরদিন সকালে ওঠে নীলা। খিদেয় চোঁ চোঁ করছে পেট। হাতে তার কার্তে ব্লু, ব্যাঙ্কে টাকার অভাব নেই, সে বেরিয়ে পড়ে কোনও ভাল রেস্তোরাঁয় খেতে। কভোঁসিওঁ এলাকায় আগে সে কখনও আসেনি। ঘুরে ফিরে এলাকাটি তার মন্দ লাগে না, ক্যাফে রেস্তোরাঁ সিনেমা মেট্রো বাসস্টপ গ্রসারি বুলনজেরি সব হাতের কাছে। বৃহস্পতিবার। কভোঁসিওঁর দুপাশের ফুটপাতে বাজার বসেছে খাট পালঙ্ক, কাপড়চোপড়, বই, ভিডিও, মাছ মাংস, ফুল ফল সবজি, তিনশো রকম পনির, মদ সবই বিক্রি হচ্ছে। আস্ত আস্ত ভাজা মুরগি আর খরগোশ চেঁচিয়ে বিক্রি করছে একটি মেয়ে। গরম লোহার শিকে মুরগি আর খরগোশ ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরছে। নীলা একটি খরগোশ কেনে। বাজারি উৎসবে সে ভিড় কেটে কেটে হেঁটে দু বোতল ওয়াইন কেনে। কিছু কমলালেবু, কামেবেয়ার পনির আর একটি সেদিনের পারতিকুলিয়ে, বাড়িভাড়ার বিজ্ঞাপনের কাগজ। ও নিয়ে হোটেলে ফিরে ফোন করে বেনোয়াকে।

বেনোয়া ফোন করেছিল সুনীলের বাড়িতে বেশ কবার। নীলা নেই, কোথায় কেউ জানে না। না জানিয়ে নীলার এমন হঠাৎ হাওয়া হয়ে যাওয়া বেনোয়ার ভাল লাগে না।

কোথায় তুমি রহস্যময়ী?

তুমি খরগোশ খেতে পছন্দ করো, বলেছিলে না?

তা করি। তুমি কি খরগোশ হয়ে গেছ? বলো, তা হলে নুন আর গোলমরিচের গুঁড়ো নিয়ে এসে যাই তোমার কাছে।

এসে যাও।

হোটেলের ঠিকানা দেয় সে বেনোয়াকে।

বেনোয়া না আসা তক নীলা পারতিকুলিয়ের বাড়ি ভাড়া যেগুলো পাঁচ থেকে সাত হাজারের মধ্যে, দেখে বাড়িঅলাদের ফোন করে। দুপুরের আগেই বেশির ভাগ বাড়ি ভাড়া হয়ে গেছে। বাকি কয়েকটি, যা এখনও ভাড়া হয়নি, কথা বলে সময় ঠিক করে নেয় কখন সে দেখতে যাবে।

বেনোয়া হোটেলের ঘরে ঢুকে ধপাস করে বসে চেয়ারে। নীলা কেন হোটেলে উঠেছে, এ তার কিছুতে মাথায় ঢুকছে না।

ও বাড়িতে কোনও অসুবিধে ছিল?

ছিল না। এমনি।

চমক কাটলে বেনোয়া জল খায়, নীলার হোটেলে ওঠার কারণ অনুমান করে বলে, অবশ্য নিজের স্বাধীনমতো থাকা যায় একা থাকলে।

হ্যাঁ। তোমার যেমন আছে। নীলা বলে।

খরগোশ ওয়াইন পনির পড়ে থাকে টেবিলে। বেনোয়া তৃষ্ণার্ত, সে ওয়াইন পান করে তার তৃষ্ণা মেটাবে না। চুমু খেয়ে মেটাবে। বেনোয়া ক্ষুধার্ত, তবে মৃত খরগোশে তার রুচি নেই, খাবে জ্যান্ত খরগোশ। দীর্ঘ দীর্ঘ সময় নিয়ে সে তার মধ্যাহ্নভোজন সারে।

বিকেলে ঝরনার জলে লুটোপুটি করে স্নান করে বেরোয় দুজন। এভিন্যু এমিল জোলায় একটি বাড়ি দেখতে যায়, ভাড়া আট হাজার। নীলার বেশ পছন্দ হয় বাড়িটি।

নেব নাকি? জিজ্ঞেস করে বেনোয়াকে।

বেনোয়া কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে, তোমার ইচ্ছে।

ঠিক বলেছে সে, নীলা বাড়ি নেবে, নীলার ইচ্ছেতেই হতে হবে, এতে বেনোয়ার কিছু যায় আসে না, কিছু বলার নেই তার।

নীলার ইচ্ছে হলেই যে সব হবে তা নয়। বাড়িঅলা নাকচ করে দেয়, কারণ নীলা কোনও চাকরি করে না।

ব্যাঙ্কে টাকা আছে। বাড়িঅলা বলে, তাতে কী?

নাকচ।

রু দ্য ভজিরায় আরেকটি বাড়ি দেখে পছন্দ হওয়ার পর কবে নতুন বাড়িতে উঠবে তা জানতে চাইলে, নীলার মাসিক আয়ের কথা জিজ্ঞেস না করে বাড়িঅলা জিজ্ঞেস করে, জিম্মাদার হওয়ার লোক আছে কি না।

নীলা করুণ চোখে তাকায় বেনোয়ার দিকে।

বেনোয়ার নির্লিপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা মাথা নাড়ে, নেই।

নাকচ।

বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে বেনোয়া বলে, গ্যারান্টি না পেলে বাড়ি ভাড়া পাবে না প্যারিসে।

এমন কী আমি লাখপতি হলেও না?

না।

কোটিপতি হলেও না?

না।

কী করতে পারি তবে?

নীলা আশা করে বেনোয়া বলবে, জিম্মি সে হবে। বলে না বেনোয়া। নীলার কেবল আশায় বসতি।

তোমার তো চেনা আছে ভারতীয়, ওদের বলো।

না, ওদের কাছে চাইতে ইচ্ছে করে না।

রিভলিতে তোমার বন্ধুকে বলো।

সে আমার বন্ধু নয়।

তার বাড়িতে এতদিন ছিলে, সে বন্ধু নয়। এ কেমন কথা!

নীলার জিভে এসে যায়, তুমি জিম্মি হও বেনোয়া। তুমি তো আলকাটেলে ভাল বেতনের চাকরি করো।

বলে না, কারণ আশঙ্কা হয় তার, বেনোয়া বুঝি ভাবছে, এ মেয়ে আজ এখানে, কাল সেখানে করে বেড়াচ্ছে, কখন আবার বাড়ি ভাড়া না দিয়ে পালাবে, তখন বিপদ হবে আমার।

যদি এরকম কোনও দুর্ভাবনা উঁকি দেয় বেনোয়ার মনে, দূর করতে নীলা বলে, যে, তার মা তাকে প্রচুর টাকা দিয়ে গেছে। তিন বছর কোনও চাকরি বাকরি ছাড়াই সে প্যারিসে বেশ স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে। বেনোয়া শোনে। কেবল শোনেই।

নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমার মা চাননি আমি বিদেশে থাকি। কলকাতায় থাকলে বাড়ি ভাড়া পেতে কোনও অসুবিধে হত না। ওখানে এরকম জিম্মির প্রশ্ন ওঠে না। ভাড়াটের টাকা থাকলে কোনও বাড়িঅলা না করে না।

বেনোয়া বলে যায় প্যারিসে এ নিয়ম অনেকদিনের। বাড়িঅলারা কেন এ নিয়ম করেছে, তাও সে বলে।

বাড়িভাড়া নেওয়ার এবং দেওয়ার একশো নিয়ম গড়গড় করে বলে যায়। রু দ্য রেনের বাড়িটি সে কিনেছে, না কিনলে তারও ভাড়া নেওয়ার সমস্যা হত, বলে।

বেনোয়াকে স্বস্তি দেয় নীলা কোনওরকম প্রশ্নে না যেয়ে। বেনোয়াও কিছু জিজ্ঞেস করে না নীলা কী করে বাড়ি ভাড়ার ব্যবস্থা করবে।

পিগালের রাস্তায় গাড়ি থামিয়ে সন্ধের আলো ঝলমল রাস্তায় হেঁটে হেঁটে বারবার বলে সে জ তেম।

রাস্তার দুপাশে লাল নীল রঙের বাতি জ্বলছে নিবছে, যৌনখেলনার দোকানগুলোয় কৃত্রিম শিশ্ন, কৃত্রিম নারীযোনি দেদার বিক্রি হচ্ছে। সঙ্গম প্রদর্শনী চলছে ছবির নয়, পুতুলের নয়, মঞ্চে রক্তমাংসের নারীপুরুষের।

একা এই রাস্তায়, নীলা জানে, তার পক্ষে সম্ভব হত না হাঁটা। ভয় এবং লজ্জা তার পা সম্পূর্ণ অচল করে দিত। বেনোয়া আছে বলে সে নির্ভাবনায় পিগালের রাস্তায় হাঁটে। ভয় লজ্জা পেছনে নিশ্চল পড়ে থাকে।

চলো মুলা রুজে যাই। নীলা বলে।

ওরে বাপ। ওখানে খরচা করার টাকা নেই আমার।

আমার আছে, চলো। তুলুজ লট্রেস কী নাচ দেখতেন দেখে আসি।

সেই নাচ কি আর আছে!

সেই নাচ নেই জেনেও নীলা ঢোকে ভেতরে। জেনেই ঢোকে যে মুলা রুজ পর্যটক ধরার ফাঁদ ছাড়া কিছু নয়। নীলার ইচ্ছে করে বেনোয়াকে দেখিয়ে মোটা টাকার লাদেসিওঁর মেটাতে তার কার্তে ব্লু বের করতে। সে দেখুক, নীলা কোনও পথের ভিখিরি নয়, সে যা বলেছে, তাকে প্রচুর টাকা দিয়েছে তার মা, এ কথা মিথ্যে নয়।

বেনোয়া বুঝুক, নীলা মিথ্যে বলে না।

মুলা রুজ থেকে বেরিয়ে উৎফুল্ল বেনোয়া বলে, জানো, এত মেয়ে দেখেছি, তোমার মতো প্রাণবন্ত কাউকে দেখিনি। জীবন কী করে উপভোগ করতে হয়, তুমি জানো। তোমার মতো হৃদয়াবেগ আর কারও নেই। তোমার তুলনা তুমিই। ফরাসি মেয়েরা বিষম হিসেবি।

ফরাসি ছেলেরা নয়? নীলা জিজ্ঞেস করে।

বেনোয়া নীলার স্তুতিতে এতই বিভোর ছিল, শোনেনি নীলার প্রশ্ন।

সে রাতে বেনোয়া নীলার হোটেলঘরে রাত কাটায়। রাত কাটে ভালবেসে, আদরে আহ্লাদে, চুমুতে সঙ্গমে। সকালে বেনোয়া আপিস চলে গেলে, নীলা বেরোয়। বাড়ির দালালেরা যে ঝকঝকে দোকান পেতে বসে ব্যবসা করছে, ওসবে ঢুকে সে জিজ্ঞেস করে, বাড়ি পাওয়া যাবে কি না। বাড়ি পাওয়া যাবে, চাও তো এক্ষুনি নাও, তবে লোক কে আছে তোমার, যে জিম্মি হবে! প্লাসদিতালি আর রু দ্য ভুইয়ে-তে দুটো বাড়ি দেখে এসে সে হোটেলে শুয়ে থাকে অসহায়, বাড়ির দালালদের তার মোটা টাকার কাগজ দেখিয়ে কোনও লাভ হয়নি। যে বেনোয়া তার হৃদয় জুড়ে, সে নীলার অসহায়ত্ব দেখছে, কিন্তু সহায় হওয়ার কোনও আশা দিচ্ছে না। যে বেনোয়া তার সমস্ত জীবন জুড়ে, সে নীলার ধ্বসে পড়া জীবন দেখছে, কিন্তু ধ্বস থামাতে এতটুকু হাত বাড়াচ্ছে না।

যেহেতু দানিয়েল ব্যাঙ্কের চিঠি আসার খবর নীলাকে দিয়েছে, যেহেতু সে ইজেল আর ছবির মতো ডাস্টবিনে ফেলে দেয়নি চিঠি, রাগ তার পড়েছে, এই ভরসায় আর আশায় সে ফোন করে দানিয়েলকে।

দানিয়েল বলে, সে আগামী সপ্তাহে নিকল আর মিশেলের সঙ্গে সুইডেন যাচ্ছে, রিতার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু ছবি তৈরির কাজে তাকে ইজরাইল যেতে হচ্ছে বলে সম্ভব হচ্ছে না। মারিয়া সুয়েনসন তাদের নেমন্তন্ন করেছে ইউসতেরো দ্বীপে ওর নতুন বাড়িতে। নিজের হাতে বাড়িটি বানিয়েছে মারিয়া। বাল্টিক সমুদ্রের ধারে লাল কাঠের বাড়ি।

নিজে বানিয়েছে?

হ্যাঁ নিজে। ওখানে লোকেরা নিজেই নিজের বাড়ি বানায়।

মারিয়া ওদের নিয়ে উত্তরে যাবে, ল্যাপ জাতি যেখানে বাস করে। ওখানে মধ্যরাতের সূর্য দেখবে ওরা।

দানিয়েল একবারও জিজ্ঞেস করে না, নীলা যেতে চায় কি না মধ্যরাতের সূর্য দেখতে। মারিয়া যে নীলাকে ছাড়া সে রাতের আর সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, সে বেশ স্পষ্ট।

নীলাকে অবশেষে সৌজন্য করেই সম্ভবত, জিজ্ঞেস করে কেমন চলছে তার জীবন।

হোটেলের জীবন তার, ভ্যান গগ না হয় সাড়ে তিন ফ্রাঁএ ঘর পেয়েছিলেন, একশো বছর পার হয়েছে মাঝখানে, দামও একশো গুণ বেড়েছে।

তোমার আর চিন্তা কী, টাকা তো আছেই! অত টাকা আমার জীবনে আমি কখনও উপার্জন করিনি। দেখিওনি।

নীলা বলে, কলকাতায় যা দেখেছ, তা আমার বাবার আর দাদার। মা কিছু টাকা দিয়েছেন, এই আমার সারাজীবনের সম্বল। টাকায় শুনেছি বাঘের দুধও কেনা যায়, কিন্তু এই প্যারিসে একটি বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।

নীলা এরপর কাতর মিনতি করে, ভাড়া নেওয়ার কোনও একটা ব্যবস্থা করে দিতে।

বাড়ি ভাড়া কত?

ধরো, ছ হাজার।

তা হলে যে চার ছয়ে চব্বিশ হাজার ফ্রাঁ মাসে আয় করে, তার কাছে যাও। আমি অত টাকা আয় করি না। আমি কোনও কাজে লাগব না তোমার।

তোমার ওই বন্ধুরা, নিকল, রিতা, মিশেল? কেউ যদি দেয়।

আমার মনে হয় না কেউ দেবে। তুমি তোমার ওই বাঙালি বন্ধুকে বলছ না কেন! সে তো ভাল কামায় বলেছিলে।

সুনীলের সঙ্গে কথা বলার কোনও ইচ্ছে তার হয় না। নীলা শুয়ে থাকে। বেনোয়া আপিস শেষে চলে আসে হোটেলে রাত কাটাতে। বেনোয়ার স্পর্শ তার স্বপ্নকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তোলে, একটি বাড়ির, একটি সংসারের স্বপ্ন। বেনোয়া যত জ তেম বলে, তার তত ইচ্ছে জাগে পায়ের নীচে মাটি পেতে, দাঁড়াতে, যেন প্রতিটি দিন প্রতি নিশ্বাসে সে বেনোয়ার জ তেম এর ঘ্রাণ আরও গভীর করে নিতে পারে। মলিনার মতো ভালবাসাহীন বেঁচে থাকতে তার ভয় হয়।

বেনোয়া যখন শিশুর মতো নীলাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমিয়ে থাকে, নিদ্রাহীনতার কোলে শ্রান্ত মাথা রেখে নীলা তাকিয়ে থাকে অসহ্য সুন্দরের দিকে। মাঝে মধ্যে তার ইচ্ছে যে করেনি, বেনোয়াকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দিতে, ঘাড় ধরে ঘর থেকে বের করে দিতে, তা নয়। করে তার, কিন্তু তার পরের অন্ধকার জীবন সে দেখে চোখের সামনে, ভালবাসাহীন, আশাহীন, সুনীলের ভোগের শিকার হওয়া দিনের পর দিন, অসহায় অবলা মেয়েমানুষের মতো বাঁচা। বেনোয়া তাকে ভালবাসে ঠিকই, কিন্তু তাকে এখনও বিশ্বাস করে না। নিশ্চয়ই করে না। এক অবোধ অভিমান নীলাকে স্তব্ধ করে রাখে।

ইচ্ছের বাইরে সে নিজের মায়ের শ্রাদ্ধ করেনি, কিন্তু পরদিন সকালে সে সুনীলকে ফোন করে, কেবল তাই নয়, লা মারেতে সুনীলের ক্লিনিকে অব্দি যায় দেখা করতে।

ওভাবে চলে গেলে কেন? চৈতালিও বলছিল, এরকম না বলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। সুনীল, যেন অশোভন কোনও আচরণ সে নীলার সঙ্গে কোনওদিন করেনি, এমন ভালমানুষি সুরে জিজ্ঞেস করে।

চৈতালিকে বলেননি, আমার চলে যাওয়ার কারণ? নীলার তিক্ত বিরক্ত কণ্ঠ।

কী কারণ?

নীলা মুঠো শক্ত করে। লোকটির মুখ সে কোনওদিন দেখতে চায়নি, কণ্ঠ শুনতে চায়নি, দম টানা হাসির শব্দ সে পেতে চায়নি, কিন্তু আর কোনও উপায় নেই তার, নিজের একটি বাড়ি তার দরকার।

নিজের কণ্ঠস্বরে নীলা নিজেই চমকে ওঠে, যখন সে সুনীলকে অনুরোধ নয়, আদেশ করে জিম্মি হতে।

তুমি কি প্যারিসেই থাকবে ভাবছ? তবে আগে কাগজের ব্যবস্থা করো। কিষান ডিভোর্স দিলে কী করবে? অবশ্য তোমার তো আবার ফরাসি প্রেমিক আছে। তা বিয়ে টিয়ে করছ

নাকি?

নীলা ধমকে থামায় সুনীলকে। আবারও সেই আদেশ কণ্ঠ।

শেষ অব্দি বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়। রু দ্য ভুইয়েতে বাহাত্তর বর্গমিটার, চারটে ঘর, ভাড়া সাত হাজার। দু মাসের অগ্রিম ভাড়া আর দালালকে সাত হাজার, মোট একুশ হাজার দিয়ে, সুনীলের কাগজপত্র আর মুচলেকা দেখিয়ে নীলা চাবি পায় দরজার। রু দ্য ভুইয়ের বাড়ির চারতলায় ঢুকে, বড় একটি শ্বাস নেয়, ফুসফুস ভরে স্বাধীনতার ঘ্রাণ নেয়। সুনীল বলেছিল, এত বড় বাড়ি দিয়ে একা মানুষ তুমি কী করবে! কোনও একটা স্টুডিয়ো ভাড়া নিলে পারতে। নীলা পারত অনেক কিছু, সরকারের অবাসযোগ্য ঘোষণা করে দেওয়া পোড়াবাড়িগুলোয় উদ্বাস্তুরা দখল করে যেমন বিনা ভাড়ায় দিব্যি বছরের পর বছর ধরে থেকে যাচ্ছে, গরমজল নেই, আলো নেই, তেমন থাকতে পারত সে। মোজাম্মেল যে এলাকায় থাকে, সেই বেলভিলে, সেই তাবৎ কালো বাদামি লোকদের এলাকায় সস্তায় কোনও ঘর ভাড়া নিতে পারত। নীলা হয়তো অনেক কিছু পারত, জিম্মির দরকার হয় না এমন কোথাও সে যেতে পারত, কোনও শহরতলির ভাঙাচোরা কোনও বাড়ি। নীলা করতে পারত অনেক কিছু, করেনি। করেনি বলে তার কোনও অনুতাপ হয় না। সে ভাবতে থাকে চারটে ঘর সে কী করে সাজাবে, সাজানো বাড়িটিতে ঢুকে কেমন চমকাবে বেনোয়া, চমকে নীলাকে জড়িয়ে ধরে কী করে চুমু খাবে আর বলবে তোমাকে যত দেখি তত মুগ্ধ হই। এত তুমি পারো কী করে!

ঘরগুলোর সব জানালা দরজা খুলে দিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে থাকে নীলা। হু হু করে হাওয়া ঢোকে ঘরে, বারান্দার রেলিঙে একটি একা পাখি এসে বসে, পাখিটি বিষ্ঠা ত্যাগ করে উড়ে যায়। সুনীলের পাওনা সে মিটিয়ে দিয়েছে, নীলার মনে হতে থাকে, সুনীলও সম্ভবত তার পাওনা মিটিয়েছে। সুনীলকে অমনই দেখিয়েছে, দেনাপাওনা শোধ হবার পর লোকের ঠোঁটের কোণে প্রশান্তি ঝিলিক দেয় যেমন।

নীলার বমি হয়ে যায় যা খেয়েছিল শে লুলুতে।

নতুন জীবন

জীবনের কী মূল্য আছে, জীবন যদি যে কোনও সময় ফুরিয়ে যায়, যে কোনও মুহূর্তে মলিনার মতো ফুরিয়ে যায়।

নীলা জানে জীবনের কোনও অর্থ নেই। জেনেও সে হাবিতাত থেকে, ফন্যাক, বি এইচ ভি থেকে, গ্যালারি লাফায়েত থেকে ঘর সাজাবার জিনিস কেনে। প্রয়োজনের তো বটেও, প্রয়োজনের বাইরেও অনেক। টাকা থাকলেও বাড়ি ভাড়া হয়তো পাওয়া যায় না, কিন্তু বাড়ি সাজাবার যা কিছু আছে, সবই পাওয়া যায়। বালিগঞ্জের বাড়িটি মলিনা কখনও পছন্দ মতো সাজাতে পারেননি। সোফা কোথায় বসবে, বিছানাগুলো জানালার কাছে না কি দেয়ালের কাছে, কোন আলমারি কোনদিকে, খাবার টেবিল এদিকে না কি ওদিকে, এসব সিদ্ধান্ত সব অনির্বাণই নিতেন। এমনকী রান্নাঘরের সিদ্ধান্তও। আজ খিচুড়ি হবে নাকি সাদা ভাত হবে, মাংস হবে না মাছ হবে, মাছ হলে মাছের সঙ্গে কি আলু যাবে না পটল, তাও। মলিনা ছিলেন আদেশ পালন করার জন্য। অনির্বাণ বুঝিয়ে দিতেন, এ বাড়ি মলিনার নয়, বাড়ি অনির্বাণের, সুতরাং অনির্বাণ যেভাবে ইচ্ছে করেন, সেভাবেই এ বাড়ির প্রতিটি প্রাণী, বাড়ির প্রতিটি কীটপতঙ্গ, ইটপাথর, গাছপাতা, লতাগুল্ম অব্দি সে ভাবে চলবে। চলেছেও সেভাবে। ততদিন পর্যন্ত চলেছে, যতদিন না নীলা দেশ ছাড়ল আর মলিনা জগৎ।

বিকেলে দোকানের লোকেরা এসে বাড়িতে জিনিসপত্র রেখে যায়, নীলা যেভাবে যেখানে চেয়েছে রাখতে, ঠিক সেখানেই। আরও দুদিন যায় তার বাড়ি পুরো সাজাতে। বারান্দায় নানা রঙের ফুলের টব বসিয়ে দেয়। খাবার টেবিলের ওপর অর্কিড, সোফা-টেবিলের ওপর লিলি আর যে টেবিলটিতে কম্পিউটার রেখেছে, বেনোয়ার কখনও যদি প্রয়োজন হয় কম্পিউটার, সে টেবিলের ফুলদানিতে রাখে দশটি তাজা লাল গোলাপ।

বাড়ি সাজিয়ে নীলা নিজেই ঘরে ঘরে হাঁটে আর মুগ্ধ হয়। একটি শোবার, একটি বসার, একটি লেখাপড়া করার, আর একটি অতিথির শোবার। এরপর কী নীলা? সব তো হল! নীলা নিজেকেই বলে। নিজেকেই উত্তর দেয়, সব কই হল। একা লাগছে তো!

স্নান সেরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার লোক দেখতে দেখতে নীলা ভাবে কাকে তার চাই। কে হলে তার এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগবে। এরকম যদি হত, দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ, দরজা খুলে সে দেখবে মলিনা দাঁড়িয়ে আছেন! প্যারিসে কেমন আছে নীলা, মলিনা দেখতে এসেছেন। মলিনাকে জড়িয়ে ধরে, নীলা বলবে, তোমাকে আমি ভালবাসি মা, যা কোনওদিনই তার বলা হয়নি। মলিনাকে বিছানায় শুইয়ে নিজেও সে শোবে পাশে, তারপর জগতের নিষ্ঠুরতার কথা সে বলবে, সব বলবে মলিনাকে। আর কাউকে তো বলা হয় না,

নিজের ভেতর জমিয়ে রাখতে রাখতে, মাঝে মাঝে তার বুক এমন ভারী হয়ে থাকে যে শ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

সব আয়োজন শেষে, স্নান শেষে, ক্লান্ত নীলা মলিনার সঙ্গে মনে মনে কথা বলে। ভুলে যায় বেনোয়ার জন্য তার অধীর ব্যাকুলতার কথা। দিন পার হয় ভুলে থেকে, আর রাত যখন শকুনি শরীরে করে ঝুপঝুপ অন্ধকার নিয়ে আসতে থাকে, এ ঘর ও ঘর একা একা হাঁটে নীলা আর নিজের ছায়াটিই দীর্ঘ হতে হতে যখন তার দিকেই এগোতে থাকে, বেনোয়াকে সে তার নতুন জীবনের নতুন ঠিকানা জানায়।

তুমি কী করছ না করছ, আমাকে জানাবে না, আমি কি তোমার কেউ হই না নাকি?

বেনোয়ার অভিযোগের কোনও উত্তর নীলা দেয় না।

বেনোয়া বাড়িতে ঢুকে থতমত খায়, কার বাড়ি এটি?

কী মনে হয়?

আমি জানি না কার বাড়ি এটি। তুমি খুলে বলো।

আমার। নীলা হাসে।

তোমার? বেনোয়া সোফায় বসে চারদিক দেখতে দেখতে ভ্রু কোঁচকায়।

হ্যাঁ আমার।

তুমি আবার বাড়ি পেলে কোথায়? তুমি না ভাড়া নেবার জন্য বাড়ি দেখছ! আমি তোমাকে সাহায্য করছি ভাড়া নিতে!

তুমি সাহায্য করছ?

করছি না? তোমাকে এমিল জোলার বাড়ি দেখাতে নিলাম, ভজিরায় নিলাম।

ও।

আর কে কে থাকবে এই বাড়িতে।

আমি।

আর?

আর তুমি।

আমি? আমি থাকব কী করে?

নীলা বলে, যদি না চাও, থাকবে না। আমি একা থাকব। ব্যাস।

একার জন্য এত বড় বাড়ি নিয়েছ?

আসলে কী জানো, কলকাতায় বড় বাড়িতে থেকে অভ্যেস। রক্তে কোথাও সম্ভবত অভ্যেস এখনও কিলবিল করে।

চাকরি বাকরি করছ না, এত ভাড়া দেবে কী করে!

তোমাকে আগেও বলেছি চাকরি না করেও আমার চলবে। ভয় পেয়ো না।

হুম।

বেনোয়া মুখ শুকনো করে বসে থাকে।

নীলা বেনোয়ার শুকনো মুখের সামনে নিজের হাসি মুখ তুলে ধরে, তুমি খুশি হওনি?

খুশির কী আছে বলো?

খুশির কিছু নেই? এতদিন দেখেছ আমি এক উদ্বাস্তু ছিলাম, এর বাড়ি ওর বাড়ি

থাকতাম। দানিয়েল, আমার সেই বান্ধবী, আমাকে ওর বাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়েছে। ভাল আমি সুনীলের বাড়িতে ছিলাম না। লোকটি আমাকে যাচ্ছেতাই ভাবে অপমান করেছে। আমার আসলে সত্যিকার কোনও আশ্রয় ছিল না। এমনকী উপায় না দেখে হোটেলে উঠেছি। এখন নিজের একটি বাড়ি হল, নিজের বাড়ির স্বাদ কেমন, তুমি তো জানো, তোমার নিজের বাড়ি আছে, তুমি তো বোঝো। বোঝো না, নিজের একটি বাড়ি থাকা কী ভীষণ প্রয়োজন! কী শান্তি এতে। ধরো যতই আমরা পরস্পরকে ভালবাসি না কেন, তুমি যদি বলো তোমার বাড়িতে যেতে এবং থাকতে, তবেই আমার অধিকার আছে তোমার বাড়িতে যাওয়ার এবং থাকার। তুমি যদি রাত তিনটের সময় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বলো, এখন বেরিয়ে যাও, আমার বেরিয়ে যেতে হবে। হবে না, বলো?

বেনোয়া গলা উঁচু করে, তুমি কি পাগল হয়েছ? আমি তোমাকে বেরিয়ে যেতে বলব কেন?

বলোনি, বলতে তো পারো। আমিও পারি। পারি না?

তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছ?

সোফার হাতলে বসে বেনোয়াকে জড়িয়ে ধরে বলে সে

না। মোটেই না। আমি সারাক্ষণ তোমাকে চাই। দিনেও যেমন চাই, রাতেও চাই। জেগে যখন থাকি, চাই, ঘুমোই যখন, চাই।

বেনোয়া চারদিক তাকিয়ে বলে, তুমি কি লটারি জিতেছ নাকি?

হালকা সবুজ পর্দা জানালায়, হালকা সবুজ সোফার রং, বিছানার চাদরও হালকা সবুজ রঙের।

তোমারও বুঝি হালকা সবুজ রং পছন্দ।

নীলা হেসে বলল, না, আমার পছন্দ নীল রং।

তবে সব হালকা সবুজ কেন?

সে তোমার পছন্দ বলে।

বেনোয়া ঠোঁট কামড়ে মিষ্টি হাসি হাসে।

তর্জনীতে বেনোয়ার ঠোঁট ছুঁয়ে নীলা বলে, বাসলে আমি এভাবেই বাসি ভাল, একশো ভাগ।

তুমি কি জাদু জানো নাকি! এই কদিনে কী কাণ্ড করে ফেললে বলো তো।

নীলা তুড়ি বাজায়। তুড়ি বাজালেই সব হয়।

অবশ্য টাকা থাকলে দুদিনে কেন দু মিনিটে সব হয়। বেনোয়া বড় শ্বাস ফেলে।

উঠে সে শোবার ঘরে যায়, কোমরে হাত রেখে হালকা সবুজ বিছানা, বিছানার দু কিনারের দুটো টেবিল, টেবিলের ওপর দুটো ঢাকনাঅলা বাতি, দেয়াল জুড়ে কাঠের আলমারি দেখে আর জিভে চুক চুক করে, ইকিয়া থেকে কিনলে খুব সস্তায় কেনা যেত। অপেক্ষা করলে পারতে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারতাম ইকিয়ায়।

টোকা মেরে খাটের, টেবিলের, চেয়ারের, আলমারির কাঠ পরখ করেও চুক চুক করে, এসব তো ভাল কাঠের দেয়নি। তুমি রীতিমতো ঠকেছ। কোত্থেকে কিনেছ?

হাবিতাত।

হাবিতাত কোনও দোকান হল? বাজে জিনিসপত্র সব। এসব কেনার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে না! উফ। কী যে বোকামো করো তুমি!

বেনোয়ার হাত টেনে আলমারির কাছে এনে নীলা বলে, খোলো এটা, দেখো। বেনোয়া খুলে বলল, এটা কত দিয়ে কিনেছ? নিশ্চয় এ টাকায় অন্য দোকানে আরও ভাল পেতে।

ভেতরে দেখো কী আছে?

বেনোয়া দেখল, ছেলেদের জামাকাপড়, এমনকী জুতো, শেভিংএর জিনিসপত্র, অডি তয়লেত।

কার এসব?

অনুমান করো তো!

কিষানের?

প্রশ্নই ওঠে না।

তা হলে কার?

অনুমান করো।

সুনীলের?

সুনীলের জিনিসপত্র এখানে থাকবে কেন?

তবে কার?

অনুমান করো।

পারছি না।

নীলা হাসে, বেনোয়ার বুকে আঙুল বুলিয়ে নিবিড় কণ্ঠে বলে, তোমার।

নীলা, তোমার কি মাথা টাথা খারাপ হয়েছে? খেঁকিয়ে ওঠে বেনোয়া।

কেন?

আমার তো সব আছে এগুলো। ধপাস করে সে বসে বিছানায়। হালকা সবুজ বিছানায়। তার পছন্দের রঙের বিছানায়।

তাতে কী! তবে জুতো নিয়ে খানিকটা সন্দেহ আছে। দেখো তো এ জুতো পায়ে লাগে কি না। কালো একজোড়া ইতালিয়ান জুতো প্যাকেট খুলে বেনোয়ার পায়ের কাছে রেখে বলে নীলা।

জুতো? মাপ কী?

মাপ জানি না, চোখের অনুমানে মনে হল এ হবে তোমার।

বেনোয়া জুতোর পেছনে নম্বর দেখে সরিয়ে রাখে জুতো, না এ আমার মাপের নয়।

এসব তুমি আমার জন্য কিনেছ? কেন? বেনোয়ার প্রশ্ন, পনেরো ভাঁজ কপালে, চোখে।

বেনোয়ার পাশে ঘন হয়ে বসে কাঁধে মাথা রেখে নীলা বলে, তোমাকে ভালবাসি, তাই।

আরও একটি চমক এখনও বাকি। নীলা যখন শেষ ঘরটিতে বেনোয়াকে নিয়ে গেল, বইয়ের তাকে সারি সারি বই, টেবিলে কম্পিউটার।

বেনোয়া চোখ নাচিয়ে বলে, তুমি বুঝি কম্পিউটারও ব্যবহার করবে?

না, যন্ত্রে আমি মোটেও অভ্যস্ত নই, এ তোমার জন্য।

আমার জন্য? আমার তো কম্পিউটার আছে। বেনোয়া শব্দ করে হাসার চেষ্টা করে।

তা জানি, আছে।

রিভলভিং চেয়ারে বসে বৃত্তাকারে নিজেকে ঘোরাতে থাকে বেনোয়া। গোলাপের কিনার থেকে দুটো কালচে পাতা সরিয়ে নিতে নিতে নীলা বলে, এ বাড়িতেও যদি ইচ্ছে হয় তোমার কম্পিউটার ব্যবহার করতে!

কত গি'গাবাইট এতে?

তা জানি না।

র‍্যাম কত আছে তা জানো?

তাও জানি না।

বেনোয়া আবারও জিভে চুক চুক শব্দ করে।

নীলা চেয়ারের পেছনে দাঁড়িয়ে বেনোয়ার চুলে আঙুল ডুবিয়ে দেয়, চুমু খায় ঘন সোনালি চুলে।

তোমার পছন্দ হয়নি?

আচ্ছা তুমি যে এটি কিনলে, বোতাম টিপে কম্পিউটার চালু করে, বলে বেনোয়া, তুমি কি আমার চেয়ে কম্পিউটার ভাল জানো?

আমি তো তা বলছি না আমি তোমার চেয়ে বেশি জানি। তুমি ব্যবহার করবে বলে কিনলাম। নীলা মিষ্টি হেসে বলে।

আমি তো এই ধরনের কম্পিউটার ব্যবহার করি না। খামোকা টাকা খরচ করলে। আবার চুক চুক।

টাকা খরচের কথা ভেবো না। কোন ধরনের পছন্দ করো বলো, আমি এটা পালটে নেব।

তুমি বললেই ওরা পালটে দেবে নাকি? বেনোয়ার কপালে চোখের কোণে সেই পনেরো ভাঁজ।

ঠিক আছে কম্পিউটার তোমার পছন্দ হয়নি, ফুলগুলো?

নীলা ঘ্রাণ নেয় গোলাপের। ফুলগুলো দেখতে ভাল, বেনোয়া বলে কিন্তু ঘ্রাণ নিতে এগোয় না। ফুল পশ্চিমিদের কাছে বেশির ভাগই দেখার জিনিস, ঘ্রাণ শোঁকার নয়, নীলার মন বলে।

এসব বই প্যারিস থেকে কিনেছ? বইয়ের তাকের কাছে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করে বেনোয়া।

কিছু এখান থেকে, কিছু কলকাতা থেকে আনা।

সব তো দেখছি ক্লাসিক।

সব নয়। কিছু। নিজের একটি বাড়ি হবে, নিজের একটা বইয়ের ঘর হবে, এ শখ আমার অনেক দিনের।

ইউলিসিস-এর দিকে আঙুল তুলে, ওটা পড়েছ।

নীলা ঠোঁট ওলটায়, কোনওদিনই কুড়ি পাতার বেশি পড়তে পারি না, সম্ভবত পারবও না।

বেনোয়া উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলে, কফি খেতে হবে আমার, আছে?

পেছন পেছন হাঁটতে হাঁটতে নীলা বলে, নিশ্চয়ই।

রান্নাঘরের দরজায় হেলান দিয়ে বলে, তবে কী জানো, কফি আমি বানাতে জানি না।

বেনোয়া নিজেই কফি বানাতে শুরু করে। নীলা পাশে দাঁড়িয়ে বলে, আমি হলাম চা খোর, তুমি তো জানোই।

নীলা শিখে নেয় কী করে মেশিনে কফি বানায়, বেনোয়া বলে বলে দেয়। প্রথম ফিল্টার দেবে, তারপর কফি, তারপর এদিকটায় জল, ফিল্টার চুঁইয়ে চুঁইয়ে কফি এসে তলে জমা হবে।

খাবার টেবিলে কফি নিয়ে বসে বেনোয়া, নীলা নিজের জন্য এক কাপ চা করে নিয়ে মুখোমুখি বসে। চোখ হাসছে তার, ঠোঁট হাসছে। বেনোয়া চামচে কফি নাড়তে নাড়তে বলে, আচ্ছা তুমি টম ক্লেন্সির বই পড়েছ?

না।

স্টিভেন কিং?

না।

এড ম্যাকবেইন? টরি ব্রুকস?

না।

তারপর ধরো, বেনোয়া সময় নেয়।

নীলা বলে, আসলে বিদেশি সাহিত্য আমি বেশি পড়িনি। বেশির ভাগই বাংলা।

এলমোর লেনার্ড?

না।

জর্জ সিমেনো?

না।

ডেভিড এডিংস?

না।

বেনোয়া কফিতে চুমুক দেয়।

টেরি প্র্যাটচেট পড়েছ?

নীলা শুকনো মুখে বলে, না পড়িনি।

তুমি টেরি প্র্যাটচেটের বই পড়নি?

না।

বলো কী? এত বিখ্যাত লেখকের বই পড়নি।

দু একটা নাম বলো তো!

জাদুর রং, পিরামিড, মজার সময়, আত্মার সংগীত।

নীলা মাথা নাড়ে।

নামও শোনোনি?

না।

বই পড়তে ভালবাসো, অথচ, ঠিক আছে ভেবো না, তোমাকে আমি টেরি প্র্যাটচেটের বই দেব কিছু।

বেনোয়া আরও কফি ঢেলে নেয় কাপে।

কী ধরনের উপন্যাস লেখেন তিনি? নীলা খালি চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বসে থাকে।

সে কী বলব, তুমি যদি শুরু করো, শেষ না করে উঠতে পারবে না।

এমনই?

হ্যাঁ এমনই।

বেনোয়ার চোখ হাসে, গা হাসির দমকে কাঁপে, সে কাঁপুনিতে কফির কাপ নড়ে ওঠে, ছলকে কফি পড়ে টেবিল ভিজিয়ে দেয়। বেনোয়া খেয়াল করে না, বলে যায় পৃথিবী হচ্ছে, বুঝলে, চেয়ার সরিয়ে হঠাৎ উঠে যায়, দৌড়ে শোবার ঘরের দিকে, ফিরে আসে হাতে একটি সি ডি নিয়ে, বসে, হেসে, বলে, এর মতো দেখতে।

মানে?

পৃথিবীর আকার আকৃতি এর মতো। তবে এত ছোট নয়, অনেক বড়।

নীলা হাত বাড়িয়ে ফলের ঝুড়ি থেকে একটি কমলালেবু হাতে নিয়ে বলে, পৃথিবী তো জানি এটির মতো দেখতে।

ধ্যুৎ, নীলাকে থামিয়ে, শোনোই না তারপর। চারটে বিশাল হাতির কাঁধে এই পৃথিবীটা। চারটে হাতি আবার দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশাল কচ্ছপের ওপর, কচ্ছপটি শূন্যে ভাসছে।

কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে, বেনোয়ার তখনও শেষ হয়নি গল্প, নীলা বলে, তুমি এসব বিশ্বাস করো?

বিশ্বাসের কিছু নেই। এ গল্প, মজার গল্প।

এরকম মজার গল্প আমি অবশ্য ছোটবেলায় পড়েছি। ঠাকুরমার ঝুলি?

কী ঝুলি?

ঠাকুরমার ঝুলি!

এ আবার কী?

এ বাচ্চাদের গল্পের বই। অবশ্য বাংলায়।

বাংলায়, সে বলো। বেনোয়া জোরে হাসে। বাংলা বই সম্পর্কে জানার কোনও কারণ আমার নেই।

নীলা দুটো হাত টেনে নেয় বেনোয়ার। বলে, দেখবে না আর কী অপেক্ষা করছে তোমার জন্য?

বেনোয়া ঠাণ্ডা গলায় বলে, কী?

ময়েট এন্ড শ্যানডন শ্যাম্পেন এনে সে হাতে দেয় বেনোয়ার।

নতুন বাড়িতে প্রথম যা করতে হয়, শ্যাম্পেনে ভেসে যাওয়া। কী বলো?

গাড়ি চালাতে হবে, এ সময় মদ খাওয়া ঠিক হবে না।

নীলা চমকায়। বেনোয়াকে এত সতর্ক হতে আগে কখনও দেখেনি সে।

তুমি তো মদ খেয়েও গাড়ি চালাও!

হয়তো চালিয়েছি, কিন্তু উচিত না।

আজ এ নতুন বাড়িতে, শ্যাম্পেন খুলতে গিয়ে উচিত অনুচিত দেখছ! আরে খোলো তো শ্যাম্পেন, কিচ্ছু হবে না।

নীলা দুটো শ্যাম্পেনের গেলাস সামনে রাখে।

বেনোয়া বড় শ্বাস ফেলে, তুমি চাইছ, খুলতে তো হবেই।

মলিন মুখে বেনোয়া শ্যাম্পেন খোলে। সশব্দে উপচে পড়ে ফেনা। নীলার উল্লাসধ্বনি সেই শব্দকে ম্লান করে দেয়।

শ্যাম্পেনের গেলাস হাতে নীলা বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। বেনোয়াও।

কী চমৎকার হাওয়া বইছে তাই না?

হ্যাঁ বইছে অথবা না বইছে না শব্দগুলোর আগে ফোনের শব্দ হয়, বেনোয়ার পকেটে। কথা বলতে সে ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। নীলা দাঁড়িয়েই ছিল, ফুরফুরে হাওয়ায় চোখ বুজে। ফিরে এসে বেনোয়া বলে, পাসকাল কাল প্যারিসে ফিরছে।

হাতে শ্যাম্পেনের গেলাস নড়ে ওঠে, নীলা দ্রুত চুমুক দেয় গেলাসে।

শ্যাম্পেনটা বেশ ভাল, তাই না?

নীলা, পাসকাল কাল প্যারিসে ফিরছে।

শুনেছি।

শুনেছ, কিছু বলবে না?

আমি কী বলব, বলো।

তুমি কি জানো পাসকালকে আমি আমাদের কথা সব বলেছি!

না তুমি বলোনি আমাকে।

এখন বললাম, পাসকাল আমাদের সম্পর্কের কথা জানে।

তো আমাকে কী করতে হবে, বলো।

তুমি কি জানো, আমার আর পাসকালের একটি মেয়ে আছে, নাম জ্যাকলিন?

জানি।

তুমি কি অনুমান করতে পারছ পাসকালের জন্য আমাদের এ সম্পর্ক মেনে নেওয়া অসম্ভব একটি ব্যাপার!

গেলাসে আরও শ্যাম্পেন ঢালতে নীলা ভেতরে যায়। পেছন পেছন বেনোয়া।

কী ব্যাপার উত্তর দিচ্ছ না যে!

নীলা শ্যাম্পেন ঢালে নিজের গেলাসে। বেনোয়ার গেলাসে ঢালতে গেলে, সরিয়ে নেয় সে গেলাস, টেবিলে শব্দ করে রেখে দেয়।

কাঁধ ধরে ঝাঁকায় সে নীলার, কিছু বলছ না কেন? তুমি কি বোবা হয়ে গেলে হঠাৎ, এতক্ষণ তো বেশ কথা বলছিলে? বাড়ি ঘর দেখালে, কত দামি জিনিস কী কী কিনেছ সব দেখালে। এখন বলো!

নীলা বসে ঢকঢক করে জল পান করার মতো শ্যাম্পেন পান করে, করে বেনোয়ার চোখে তাকায়। সেই চোখে, সেই নীল চোখে, তার ভালবাসার চোখে।

আমি জানি, নীলা বলে, পাসকালের পক্ষে এ মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। তুমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও। তারপর আমার সঙ্গে আর যোগাযোগ কোরো না। আমিও করব না।

বেনোয়া আর খালি গেলাসটি মেঝেয় ছুড়ে ফেলে চেঁচিয়ে ওঠে, এই কি তুমি চাও?

নীলা কেঁপে ওঠে বেনোয়ার বিকট শব্দে।

টেনে তাকে চেয়ার থেকে ওঠায়, সামনে দাঁড় করিয়ে বেনোয়া বলে, আমার চোখের দিকে তাকাও।

নীলা মেঝেয় টুকরো কাচের দিকে তাকিয়ে থাকে।

ওদিকে কী দেখছ? তোমার দামি গেলাস ভেঙে দিয়েছি?

বেনোয়ার চোখে তাকায় সে, চোখে উৎকণ্ঠা কাঁপে।

তুমি কি আমাদের সম্পর্ক শেষ করে দিতে চাও? এ তোমার মনের কথা?

নীলার চোখের কোনায় দুফোঁটা জল থমকে থাকে। চিবুক উঁচু করে ধরে চোখের জল দেখে বেনোয়া, যতক্ষণ না সে জল গড়িয়ে নামে।

ভাঙা কণ্ঠে নীলা বলে, না আমি চাই না।

নীলাকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে বেনোয়া উন্মাদের মতো চুমু খায়। শরীর অবশ হতে থাকে নীলার।

অবশ হতে থাকা শরীরটিকে বিছানায় নিয়ে বুকে মুখ ঘসতে ঘসতে বেনোয়া বলতে থাকে, জ তেম জ তেম জ তেম।

স্বস্তির শ্বাস ফেলে নীলা। মলিনাকে কি কখনও এভাবে ভালবেসেছেন অনির্বাণ! যেভাবে তাকে জড়িয়ে ধরে আছে বেনোয়া, অনির্বাণ কখনও মলিনাকে এভাবে জড়িয়ে ধরেননি, কখনও বলেননি, যে তিনি মলিনাকে ভালবাসেন। মলিনা যদি পাখি হয়ে বসতেন ওই জানালায়, একবার দেখতেন কেউ তাঁর কন্যাকে ভালবাসছে...।

এই, কী ভাবো?

নীলার চিবুক ধরে নিজের দিকে ফেরায় বেনোয়া।

নীলা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, কিছু না।

কিছু তো নিশ্চয়ই। আমাকে বলো।

তুমি আমাকে সত্যিই ভালবাসো বেনোয়া?

কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছ, বোঝো না?

মাঝে মাঝে...

কী মাঝে মাঝে?

মাঝে মাঝে আমার কাছে অবাক লাগে, যে তুমি আমাকে ভালবাসো। আমি কে, বলো? আমি কিছু না। কেউ না। আত্মীয় বলো, বন্ধু বলো, কেউ নেই আমার। ভাঙাচোরা জীবন আমার।

তোমার আমি আছি তো! আমি তোমাকে সব দেব, সব দেব।

বেনোয়া নীলাকে সব দেয়। শরীরে যতটা নীলার প্রয়োজন, তারও চেয়ে বেশি দেয়। একবার নয়, বারবার দেয়। সারারাত দেয়।

ভোরের আলো নীলার কপালে ঠোঁট ছোঁয়ালে নীলা বলে, এই ঘুমোবে না নাকি! সাতবার হল কিন্তু।

বেনোয়া বাঁ হাতের ওপর মাথার ভর রেখে কাত হয়ে ডান হাতে তার প্রিয় চেরিদুটো নিয়ে খেলা করতে করতে বলে, তুমি আমার ঘুম কেড়ে নিয়েছ নীলা। কী যে আশ্চর্য সম্পদ

তোমার ভেতরে, যত ভেতরে যাই, তত ইচ্ছে করে যেতে, প্রতিবার যেন প্রথমবারের মতো যাচ্ছি, প্রতিবার যেন নতুন করে দেখছি তোমাকে, যত তৃষ্ণা মেটাই, তৃষ্ণা আরও বাড়ে। সবচেয়ে ভাল লাগে তুমি যখন আনন্দে কাতরাতে থাকো, দেখতে। তুমি যখন আমার পিঠ খামচে ধরো প্রচণ্ড সুখে, পৌরুষ সার্থক মনে হয় আমার।

সকালে নীলাকে নরম স্পর্শে জাগায় বেনোয়া। সুপ্রভাত মাদাম। বেনোয়ার হাতে ট্রে, ট্রেতে কোয়াসোঁ, আর চা। সকালের স্নিগ্ধতা বেনোয়ার সারা মুখে।

নীলা বিছানায় শুয়ে চা পান করে না তো করে অমৃত পান।

বেনোয়া বলে, কাল আমার মাথার ঠিক ছিল না নীলা। আমি খুব দুঃখিত।

নিজের কফি নিজেই বানিয়ে নিয়েছে বেনোয়া, নীলা দেখে আর ভাবে, একদিনও সে অনির্বাণকে বা কিষানলালকে দেখেনি নিজে কফি বা চা বানাতে। কোনওদিনও শোনেনি, কোনও ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে। নীলা মুগ্ধ চোখে বেনোয়াকে নয়, দেখে নিজেকে। নিজের সৌভাগ্যকে।

সকালবেলা অনেকক্ষণ দেখেছি তোমার ঘুমন্ত মুখ। কী সুন্দর শিশুর মতো ঘুমোচ্ছিলে। তোমার যেন ঘুম না ভাঙে, পা টিপে উঠে শ্যাম্পেনের ভাঙা গেলাস সরালাম, তোমার যেন পা না কাটে, ও জায়গাটা ভাল করে ঝাড়ু দিয়ে দিলাম। তারপর স্নান করলাম, বুলনজেরি থেকে কোয়াসোঁ কিনে আনলাম, চা বানালাম, তারপর তোমাকে ডেকে তুললাম।

গুনে গুনে নীলাকে একশো চুমু খেয়ে, বাড়ির দরজার দুটো চাবির মধ্যে থেকে একটি তুলে নিয়ে, বেনোয়া আপিসে যায়। আপিস থেকে ঘণ্টায় দুবার ফোন করে জানায়, সে নীলাকে ভালবাসে। শেষে এও জানায়, পাসকালকে তুলে আনতে আজ আপিস ছুটির পর তার ইশটিশনে যেতে হবে। ইশটিশন থেকে সোজা রু দ্য রেনে। আর পাসকালের জন্য না হলেও জ্যাকলিনের জন্য তাকে বাড়ি থাকতে হবে। দেখা হচ্ছে না।

নীলা দিন পার করে শুয়ে বসে, দুএকটি বইয়ের কিছু পাতা পড়ে, সন্ধের পর টেলিভিশন খোলে, বন্ধ করে। শুয়ে থাকে, উঠে বসে। জ্যাক ব্রেলের গান শোনে। গান বন্ধ করে। বারান্দায় দাঁড়ায়, ফিরে আসে। রান্নাঘরে ঢোকে। রান্না করতে ইচ্ছে করে না। ফোনের কাছে যায়, রিসিভার হাতে নেয়, রেখে দেয়। বালিশে মুখ গোঁজে, চাদরে মুখ মাথা ঢাকে, চাদর সরিয়ে ফেলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটি একটি করে পরনের কাপড় খোলে, নিজেকে দেখে, কাপড় পরে আয়নায় নিজেকে ভেংচি কেটে, কাঁদো মুখ করে, স্মিত হেসে, হা হা হেসে, সরে আসে। একা বসে গান গাইতে গীতবিতান হাতে নেয়, গাইতে গিয়ে লক্ষ করে গলার স্বর বুজে আসছে, গীতবিতান রেখে দেয়।

আর রাত হলে বিছানায় শুয়ে সে খোলা জানালায় কালো আকাশ দেখতে দেখতে ভাবে, বেনোয়া পাসকালকে চুমু খাচ্ছে, ঠিক যেমন করে চুমু খায় নীলাকে। জ্যাকলিনকে ঘুম পাড়িয়ে পাসকাল শোবার ঘরে এসেছে, আর তাকে জড়িয়ে ধরে বেনোয়া বলছে জ তেম জ তেম জ তেম। জ তেম প্যাশনোমো, জ তেম সিরিয়াসোমো। তারপর ঠিক যেমন করে নীলাকে উলঙ্গ করে বেনোয়া, তেমন করে করছে পাসকালকে। নীলার স্তনবৃন্ত দুটোর নাম

যদি চেরি হয়, পাসকালের ও দুটো লিঙমবেরি তবে। পাসকালের সাদা ত্বক স্পর্শ করে বেনোয়া উল্লাসে ফেটে পড়ছে আর বলছে, কী সুন্দর রং তোমার, কী মসৃণ তোমার ত্বক, ঠিক যেমন করে নীলার রং দেখে সে বলে। পাসকালের ভেতর ঢোকার জন্য বেনোয়ার পুরুষ অঙ্গ ফুলে ফেঁপে উঠেছে, ফুঁসছে। সারারাত পাসকালকে ঠিক তেমন করে সুখ দিচ্ছে, যেমন করে নীলাকে দেয় বেনোয়া।

পাসকাল নামের এক অদৃশ্য আততায়ীর উত্তপ্ত শ্বাস নীলার সারা গা পোড়াতে থাকে।

পাঁচটা থেকে সাতটা

পরের সপ্তাহে প্রতিদিনই বেনোয়া বিকেল পাঁচটায় আসে নীলার বাড়িতে, সাতটায় চলে যায়। যেতে হয়, কারণ পাসকালের সঙ্গে তার রাতের খাবার খেতে হবে। যেতে হয়, কারণ জ্যাকলিনের সঙ্গে তার ভূত ভূত খেলতে হবে। কোনওদিন আবার ওদের নিয়ে রেস্তোরাঁয় যেতে হয়, কোনওদিন বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন।

নীলা সারাদিন বাড়িতেই থাকে। কোথাও যাবার নেই তার। বেনোয়া পাঁচটায় আসবে এই অপেক্ষায় তার সারাদিন কাটে। আর সন্ধেয় বেনোয়া চলে যাবার পর সারা শরীরে বেনোয়ার গন্ধ স্পর্শ আগলে রেখে বাকি রাত কাটায় সে।

শুক্রবার বিকেলে বেনোয়া এসে যখন প্রতিদিনকার মতো চুমু খেতে যায়, নীলা সরিয়ে নেয় নিজেকে।

কী ব্যাপার, হল কী তোমার?

পাসকালকে কি এভাবেই চুমু খাও?

এসব জিজ্ঞেস করছ কেন? তুমি তো সব জেনেই আমাকে ভালবেসেছ। তুমি তো জানতেই যে আমি বিবাহিত।

নীলা অস্বীকার করতে পারে না। সে অস্বীকার করতে পারে না সব জানার পরও তার ইচ্ছে করে বেনোয়ার চুমুতে অবশ হতে, ইচ্ছে করে বেনোয়ার বেনো জলে ভাসতে, ডাল পাতা ভেঙে নেওয়া ভীষণ ঝড়ের কবলে পড়তে।

আর বেনোয়া সেই ঝড়ের দূত হয়ে নীলার শরীরে ঝুঁকতেই নীলা সরে যায়। জিজ্ঞেস করে, তুমি কি পাসকালের সঙ্গে এসব করো?

বেনোয়া দুহাত ছড়িয়ে চিত হয়ে শুয়ে পড়ে। ওর নীল চোখ দুটো পাপড়িতে ঢাকা, কেবল শিশ্নের লাল চোখ আকাশপানে।

নীলা অপেক্ষা করে বেনোয়ার উত্তরের।

তুমি কি জানো না যে আমি পাসকালকে ভালবেসে বিয়ে করেছি?

জানি।

তবে কেন এসব জিজ্ঞেস করো।

তোমাকে কারও সঙ্গে ভাগ করতে আমার কষ্ট হয়।

নীলা, এত স্বার্থপর তুমি!

নীলা দমে যায়। সে টের পায় নিজের স্বার্থপরতা।

একবার পাসকালের কথা ভাবো, ও আমাকে ভালবাসে।

তুমিও তো ওকে ভালবাসো, তাই না?

শোনো নীলা, আমি মিথ্যে বলি না। অন্য যে কোনও বিবাহিত পুরুষ তার প্রেমিকাকে

বলে আমি আমি আমার বউকে ঘেন্না করি, কেবল তোমাকেই ভালবাসি। কিন্তু, নীলা, আমি এ নিয়ে ভেবেছি অনেক, কাকে আমি ভালবাসি, তোমাকে না পাসকালকে। আমি, সত্যি কথা, দুজনকেই ভালবাসি।

দুজনকে ভালবাসা যায়?

যাবে না কেন? নিশ্চয়ই যায়।

আমি তো কল্পনা করতে পারি না অন্য কোনও পুরুষকে ভালবাসার, তার সঙ্গে শোয়ার!

কিছু কিছু বাস্তবতার মুখোমুখি না হলে সেগুলো কল্পনারও অতীত থেকে যায়। লাল চোখ জানালাপানে। তুমি বুঝবে না নীলা, তুমি ভালবেসে বিয়ে করোনি, তোমার কোনও সন্তান নেই। তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভবও নয়।

বেনোয়া ওভাবেই উলঙ্গ উঠে গিয়ে মেঝেয় ফেলা প্যান্টের পকেটে থেকে ওয়ালেট বের করে আনে।

ওয়ালেটের ভেতরের খোপ থেকে চারটে রঙিন ছবি বের করে, জ্যাকলিন আর পাসকাল, জ্যাকলিন চুমু খাচ্ছে পাসকালের গালে, আর একটিতে বেনোয়া পেছন থেকে পাসকালকে জড়িয়ে ধরে আছে, পাসকাল হাসছে, পাসকালের কোলে বসে হাসছে জ্যাকলিন। আর একটিতে পাসকাল আর বেনোয়া। আরেকটি একা জ্যাকলিন, দু বছর আগের। ছবিগুলো নীলা দেখে, নীলার চেয়ে বেশি সময় নিয়ে দেখে বেনোয়া। লাল চোখ বুজে আসতে থাকে।

দেখো, জ্যাকলিন দেখতে ঠিক আমার মতো হয়েছে, ঠিক না?

নীলা অনেকক্ষণ দেখেও সামান্য মিল খুঁজে পায় না দুটি মুখে।

দেখো, ওর নাক, একেবারে আমার নাক যেন বসিয়ে দেওয়া।

তাই কি? ওর নাক তো ছোট। নীলা আস্তে বলে।

তা ছোট! কিন্তু বড় হতে কদিন।

কানদুটো দেখো তো! কান প্রসঙ্গে নীলা আর কিছু বলে না, জ্যাকলিনের কান বড় হয়ে বেনোয়ার কানের মতো হতে আর কতদিন।

তোমার চুল তো সোনালি, ওর চুল কেমন লালচে লাগছে না!

পাসকালের চুল লাল তো, তাই। কিন্তু পাসকাল বলেছে, জ্যাকলিনের চুলের রং নাকি লাল আর থাকছে না, ধীরে ধীরে সোনালি হচ্ছে।

ও।

কী অদ্ভুত সুন্দর জ্যাকলিন, দেখেছ!

নীলা ছবিটি হাতে নেয়, লাল ফুটিতে গাল ভর্তি, ফিনফিনে কটি লাল চুল মাথায়, হাসিতে লাল মাড়ি বেরিয়ে আছে, আর দুটো পোকা খাওয়া দাঁত।

হ্যাঁ দেখেছি। নীলার নিরুত্তাপ স্বর।

পৃথিবীতে এত সুন্দর আর কোনও শিশু নেই নীলা, নেই।

ছবিটি বুকের ওপর নিয়ে বেনোয়া তৃপ্তির হাসি হাসে।

আমার বেঁচে থাকার কারণ হচ্ছে জ্যাকলিন। আমার জীবনের যদি কোনও অর্থ থাকে সে জ্যাকলিন।

চকিতে উঠে, বেনোয়া প্রশ্ন করে, জ্যাকলিনকে তোমার দেখতে ইচ্ছে করে না?

নীলা ঠিক বুঝে পায় না কী উত্তর সে দেবে। জ্যাকলিন তার কাছে আর যে কোনও শিশুর মতো। দল বেঁধে সাদা শিশুদের নীলা প্রায়ই দেখে বাসে চড়ে মাস্টারদের সঙ্গে জাদুঘর দেখতে যাচ্ছে। এদের যে কোনও একটি শিশুই জ্যাকলিন।

জ্যাকলিন আমার অস্তিত্বের একটি অংশ নীলা, আমাকে যদি ভালবাসো, জ্যাকলিনকেও তোমার ভালবাসতে হবে।

জ্যাকলিনের সঙ্গে আমার কখনও দেখা হয়নি। ভালবাসা তো আকাশ থেকে গড়িয়ে নামে না, যে কোনও সম্পর্কই ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে। নীলা শান্ত কণ্ঠে বলে।

একটি দুধের শিশুকে তুমি ভালবাসতে পারো না নীলা, ছি। মানুষ তো যে কোনও শিশুকে ভালবাসে। তুমি হিংসে করো জ্যাকলিনকে!

বাজে কথা বোলো না তো। জ্যাকলিনকে আমি হিংসে করতে যাব কেন!

তাই তো অবাক হচ্ছি, একটি শিশুর সঙ্গে তো তোমার কোনও বিরোধ নেই। তুমি তো অনায়াসে একটি শিশুকে ভালবাসতে পারো। পারো না?

পারি, সে শিশু যদি চমৎকার হয়।

জ্যাকলিন যে চমৎকার নয় সে জানো কী করে?

জ্যাকলিন চমৎকার নয়, সে তো আমি বলছি না। জ্যাকলিন হয়তো খুব চমৎকার একটি মেয়ে, ওর সঙ্গে সম্ভবত ভাল বন্ধুত্ব হবে আমার। ওকে হয়তো ভালবাসব খুব। ভালবাসব ওকে, ও চমৎকার বলে, তোমার মেয়ে বলেই যে ওকে আমার ভালবাসতে হবে, এ ঠিক নয়। এ কৃত্রিমতা। জোর করে আর যাই হোক, ভালবাসা হয় না।

ধরো তোমার যদি একটা মেয়ে থাকত, তুমি কি চাইতে না ওকে আমি ভালবাসি, ওকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতো ভালবাসি?

চাইতাম, কিন্তু তোমাকে জোর করতাম না।

আমি তাকে ভালবাসলে তোমার ভাল লাগত তো!

হ্যাঁ লাগত।

তবে বোঝো না কেন, জ্যাকলিনকে তুমি যদি ভালবাসো, তাহলে আমারও ভাল লাগবে। পরস্পরের কী ভাল লাগে, কী পেলে কী হলে আমরা খুশি হই, আমাদের তো তাই দেখতে হবে। তুমিও তো তাই দেখেছ! আমি হালকা সবুজ রং পছন্দ করি বলে, তুমি ওই রঙের জিনিস কিনেছ। কেনোনি? তোমাকে তো জোর করেনি কেউ!

নীলা বিছানা ছেড়ে যায়। তার মনে হয় বেনোয়া এরপর আবদার করবে পাসকালকে ভালবাসার জন্য। পাসকালকে নীলার ভালবাসতে হবে, কারণ পাসকাল বেনোয়ার বউ, ঈশ্বর যার সঙ্গে বেনোয়ার জুটি গড়ে দিয়েছেন, বেনোয়াকে ভালবাসলে পাসকালকেও ভালবাসতে হবে, না হলে নীলা হবে হিংসুটে কুচুটে একটি মেয়ে।

বেনোয়া হাত বাড়িয়ে নীলাকে কাছে টানে। বুকের ওপর নীলার মাথাটি রেখে দীঘল চুলের ঘ্রাণ নেয়, বলে, তুমি একটা বাচ্চা চাও না নীলা? একটা বাচ্চা, সারা ঘর জুড়ে খেলবে, আমরা দেখব, আমাদের বাচ্চা। ফুটফুটে, সুন্দর। তোমার জীবন পূর্ণ হবে, একটি শিশুর জন্ম দিয়ে। নিষ্পাপ একটি শিশু।

নীলা চোখ বোজে। একটি পুতুল পুতুল সাদা শিশু, সোনালি চুলের শিশু, মিষ্টি হাসির শিশু দৌড়ে আসছে নীলার দিকে মা মা বলে, শিশুটিকে কোলে তুলে নিচ্ছে সে, শিশুটি নীলার কোল থেকে ঝাঁপিয়ে বেনোয়ার কোলে যাচ্ছে, বুকে জাপটে ধরে বেনোয়া তাকে আদর করছে।

নীলার ইচ্ছে করে, এভাবে বেনোয়ার বুকের ওপর, এভাবে মাথা রেখে, দীর্ঘ বছর কাটিয়ে দিতে। বেনোয়া তার কানে কানে এভাবে একটি সন্তানের কথা বলবে। নীলাকে স্বপ্ন দেখাবে, যে স্বপ্ন নীলাকে বাঁচিয়ে রাখবে। নীলার আর আছে কী এ সংসারে!

তুমি ছেলে চাও?

যে কোনও, ছেলে হোক, মেয়ে হোক। বেনোয়া বলে। নীলার মুখটি তুলে চুমু খায়। বেনোয়ার নীল সাগরে নীলা হারিয়ে যেতে থাকে। কূল নেই কিনার নেই।

কিন্তু কী হবে সে ছেলে বা মেয়ের পরিচয়?

আমাদের ভালবাসার সন্তান। এই কি সবচেয়ে বড় পরিচয় নয়?

আমাদের তো বিয়ে হয়নি! বলে নীলা জানালায় তাকায়। জানালার ওপারে কিচ্ছু নেই, ঝাঁজালো রোদ্দুর শুধু।

তুমি তো একদিন বলেছ, তুমি বিয়েতে বিশ্বাসী নও, তুমি ভালবাসায় বিশ্বাসী। এখন হঠাৎ বিয়েতে বিশ্বাসী হয়ে উঠলে!

বেনোয়া নীলার মুখ নিজের দিকে ফিরিয়ে বলে, ভারতীয় রক্ষণশীলতা ঘৃণা করো বলেছ। এখন তো দিব্যি মেনে নিচ্ছ।

আমাকে কেন ভালবাসো বেনোয়া? তোমার বউ আছে বাচ্চা আছে, সুখের সংসার তোমার। খামোখা... নীলা ভাঙা কণ্ঠে বলে।

কেবল পাসকালকেই ভালবাসি তাই জানতাম। কিন্তু কী যে ঘটল আমার ভেতর। তুমি হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে এলে। তুমি ছাড়া এখন আর উপায় নেই আমার, তোমাকে আমি চাই, তোমাকে আমার প্রয়োজন, তোমাকে আমি ভালবাসি। সারাদিন তোমার কথা ভাবি। রাতে ঘুম থেকে হঠাৎ জেগে উঠি তোমাকে স্বপ্ন দেখে। পাসকাল আজ সকালেও আমাকে বলেছে ঘুমের মধ্যে নাকি আমি নীলা নীলা বলে ডাকি।

বেনোয়ার দুবাহু থেকে আলগোছে নিজেকে সরিয়ে নীলা বলে, বলেছ, ও জানে আমার কথা।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বেনোয়া, জানে। ও যে কী রকম কষ্ট পাচ্ছে এ আমি বুঝি। আমাকে কিচ্ছু বলে না। ওকে জানাবার পর আমাকে দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করেনি তোমার কথা। আমারও কষ্ট হয় ওর জন্য। কিন্তু কী করতে পারি আমি বলো। পাসকালকে ছাড়া আমার চলবে না, ও আমার জ্যাকলিনের মা। তোমাকে ছাড়াও আমার চলবে না, তুমি আমার বাঁধনছেঁড়া আবেগ। তুমি না হলে আমি একটি মৃত মানুষ।

নীলা উঠে রান্নাঘরে যায়।

নিবে যাওয়া কুঁচকে যাওয়া লাল চোখ বেনোয়ার উরুসন্ধিতে ঝুলে থাকে যখন সে রান্নাঘরে নীলার পেছনে দাঁড়ায়, কী হঠাৎ উঠে এলে যে!

চা করতে।

কিছু বলার নেই তোমার?

আমার মনে হয় বেনোয়া, আমাদের এই সম্পর্কটি বেশ জটিল হয়ে যাচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কাকে সত্যিকার ভালবাসো, কার সঙ্গে জীবন যাপন করতে চাও। অবশ্য তুমি বলছ যে দুজনকেই ভালবাসো। দুজনকেই তোমার চাই। কাল যদি দেখো যে আরও এক মেয়ে তোমার জীবনে হঠাৎ আলোর ঝলকানি নিয়ে এল, কী করবে? তাকেও নিশ্চয়ই চাই তোমার জীবনে, তাই না?

আমি আর কাউকে ভালবাসতে পারব না। বেনোয়ার উদাস স্বর।

আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তো তুমি পাসকালকে তাই বলতে, বলতে না? নিশ্চয়ই বলতে যে ওকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। তারপর কী হল, আমাকে বললে আমাকে ভালবাসো। অবশ্য জানি না এ সত্যিই ভালবাসা না কি অভিনয়। বাড়তি একটি শরীর ভোগ করার সুযোগ তুমি ছাড়তে চাও না তাই। ভুলিয়ে ভালিয়ে...একটি বোকা মেয়েকে...

ছি নীলা ছি।

বেনোয়া দ্রুত সরে যায়, শোবার ঘরে ঢুকে কাপড়চোপড় পরে নেয়। নীলা যখন চা নিয়ে ঘরে ঢোকে, বেনোয়া জুতোর ফিতে বাঁধছে।

কী ব্যাপার চললে নাকি? আমি তোমার জন্য রান্না করেছি। বাঙালি খাবার। বরগোন ওয়াইনও কিনেছি, তুমি পছন্দ করো বলে।

তুমি খাও ওগুলো।

তুমি না খেয়ে যাবে? ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই তোমার। কী খেয়েছিলে দুপুরবেলা?

স্যান্ডুইচ।

স্যান্ডুইচে সারাদিন? এসো খাবে। নীলা হাত ধরে টানে বেনোয়ার। হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বেনোয়া বলে, খাওয়া দাওয়া আমার কাছে বড় কোনও ব্যাপার নয়, এ তোমার কাছে বড় ব্যাপার। না খেয়ে মরে তো তোমার দেশে সব, তাই ভাতের চেয়ে মূল্যবান তোমার কাছে আর কিছু নেই।

বেনোয়া বেরিয়ে যাবার পর নীলা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে। যে তীব্র সুখ তার জীবনে হঠাৎ এসেছিল, সে অনুভব করে, দূরে সরছে তা, নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে।

রাতে ঢাউস একটি বই নিয়ে সে সোফায় বসে। বেনোয়ার কথা আজ রাতে সে আর ভাববে না, নিজের জীবনের জটিল অঙ্কের কোনও সমাধান সে জানে না, তার চেয়ে হোমার ওয়েলসই ঢের ভাল, এতিমখানায় জীবন শুরু করেছিল হোমার, অস্পৃশ্য অদ্ভুত হোমার। নীলার নিজেকেও হোমারের মতো এতিম মনে হয়, কেউ তাকে নেয় না, কোথাও তার জায়গা হয় না।

অনেক রাতে ফোনের শব্দে নীলা লাফিয়ে ওঠে। এতিমখানা, হোমার ওয়েলস গড়িয়ে পড়ে মেঝেয়।

জ তেম নীলা।

এপাশে নীলা থামিয়ে রাখে জিভের ডগায় এসে যাওয়া মুয়া উসি।

কী করছিলে?

পড়ছিলাম।

কী পড়ছিলে?

তেমন কিছু না। আপেলের মদ বানায় এক বাড়িতে, সেখানে অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটে—

জানো, কী ঘটেছে আজ রাতে? বেনোয়া এমন স্বরে বলে, যেন পাসকালের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

কী ঘটেছে? উত্তেজিত নীলা।

আমি খাইনি।

ও।

আমার ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে খাব।

নীলা মেঝে থেকে এতিমখানার গল্প তোলে। শেষ পাতায় চোখ বুলিয়ে বইটি বন্ধ করে রাখে।

তুমি কি আমাকে ভালবাসো নীলা? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

তুমি কি জানো না?

জানি। তবু শুনতে ভাল লাগে।

বেনোয়ার শুনতে ভাল লাগে বলে নীলাকে জ তেম বলতে হয়।

পরদিন সকালে বেনোয়ার স্পর্শে ঘুম ভাঙে নীলার। সাতসকালে বাড়িতে ঢুকেছে বেনোয়া। তার ইচ্ছে করে বেনোয়াকে বলতে, চলে যাও। তার একার জীবন সে একাই যাপন করবে। বেনোয়ার জিভ যখন খুঁজতে থাকে নীলার জিভ, খুঁজতে খুঁজতে গভীরে যেতে থাকে, খুঁজতে থাকে চেরিফল, ছাই সরিয়ে অমূল্য ধন পাবার মতো সে ফল মুখে নেয়, বেনোয়ার রোদ জ্বলা শরীর যখন উন্মাদের মতো খুঁজতে থাকে নীলার অতল সরোবর, সে সরোবরের জল যেন অমৃত পান করছে এমন করে পান করে, আর বেনোয়ার মেদহীন মাংসল শরীরের নীচে যখন নীলা সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে যায়, একার জীবন একা যাপন করার শক্তি লোপ পায় তার। নীলার মনে হতে থাকে কেবল পাসকালকে কেন, একশো মেয়েকে বেনোয়া এমন করে ভালবাসুক, ক্ষতি নেই। যদি বেনোয়ার শতভাগের একভাগ নীলা পায়, ছিটেফোঁটা সামান্য, এইই তার জন্য অনেক। যার কিছু নেই, তার যদি কিছু জোটে তবে আর পুরোটা পাইনি কেন বলে অভিমান করার অর্থ হয় না। বেনোয়াকে পুরোটা নিজের করে পাওয়ার যোগ্যতা তার নেই, সে জানে।

বেনোয়া সারাদিন নীলার সঙ্গে কাটাবে। কারণ পাসকাল চলে গেছে সারাদিনের জন্য তার এক বন্ধুর বাড়ি, গাড়ি নিয়ে গেছে, বেনোয়া মেট্রো করে এসেছে, রু দ্য রেন থেকে কভোঁসিওঁ, ওখান থেকে পরিচ্ছন্ন হাওয়ায় হেঁটে হেঁটে এখানে, রু দ্য ভুইয়েতে, পথে বুলনজেরি থেকে একটি বাগেতও নিয়ে এসেছে কিনে। বগলে একটি বাগেত আর হাতে একটি ওয়াইনের বোতল নিয়ে ফরাসিরা হেঁটে বাড়ি যায়, ঘামের গন্ধঅলা বাগেত ছিঁড়ে ছিঁড়ে বাড়িসুদ্ধ লোক খায়, এরকমই অভ্যেস এদের। মদ আর রুটি, প্রভু যিশুর রক্ত আর

মাংস, এ না খেলে ধর্ম থাকে না, অন্তত ফরাসি ধর্ম।

বাইরে সূর্যকিরণ রেখে যারা ঘরে বসে থাকে, তাদের মতো হতভাগা আর নেই কেউ, বেনোয়া মনে করে। সুতরাং চলো চলো। বেনোয়ার সঙ্গে মহা আনন্দেই নীলা বেরোয়। কথা, প্রথম কার্তে লাতা, তারপর টইটই। কার্তে লাতার বাড়িতে কে থাকে? জঁ জ্যাক। জঁ জ্যাক মাত্র কদিনের জন্য এসেছে প্যারিসে, থাকে মারসেই-এ, মারসেইলেস, ফরাসি উচ্চারণে মারসেই। ফরাসিরা বেশির ভাগ অক্ষরই, বিশেষ করে লেজের দিকের অক্ষরগুলো উচ্চারণ করে না, গিলে ফেলে। এদের ভাষায় বর্ণ কম নেই, কিন্তু অর্ধেক বর্ণই খামোখা। বর্ণগুলো মুখে ব্যবহার করে না, কিন্তু শব্দের শেষে বসিয়ে দেয়, সম্ভবত বর্ণগুলো দিয়ে কী করবে তা বুঝে পায় না বলেই বসিয়ে দেয়, বর্ণে জং ধরল না, রইল। রইল কিন্তু রইল না। জঁ জ্যাক খুবই গুণী লোক। গুণী লোকের অভাব নেই এ দেশে, সুতরাং নীলা আর খুঁটিয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না জঁ জ্যাকের গুণের কথা। বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে সোজা কার্তে লাতায় রু পিয়ের-এ মাদাম কুরির ছ তলা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়ি দেখে ঠিক এগারোটা পাঁচ বাজলে বেনোয়া ওপরে উঠে তিন তলার দরজায় কড়া নাড়ে। একটি লম্বা চুল দাড়িঅলা লোক দরজা অল্প খুলে বড় বড় চোখ করে আগন্তুকদের দেখে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়। মিনিট দুই পর অন্য একটি লোক, এ লোকের হাসি মুখ, দরজা হাট খুলে বিনীত ভঙ্গিতে বেনোয়া আর নীলার সঙ্গে হাত মেলায়। বেনোয়া নিজের পরিচয় দেয়। নীলা অনুমান করে এ বাড়ির কাউকে চেনে না বেনোয়া, জানে না কোন লোকটি জঁ জ্যাক। হাসিমুখের লোকটি আগন্তুকদের আমন্ত্রণ জানায় ভেতরে ঢুকতে। বেনোয়া নীলার হাত শক্ত করে ধরে আছে, নীলার হাতের ভেতর ঘামছে তার হাত। নীলার কৌতূহল হয় জানতে কী কারণে এই অচেনা লোকের বাড়ি এসেছে বেনোয়া।

বেনোয়াকে কোনও প্রশ্ন করার কোনও সুযোগ পায় না সে। হাসিমুখের লোকটি দুটো আসবাবহীন ঘর পেরিয়ে ছোট একটি প্রায় অন্ধকার ঘরে ওদের নিয়ে যায়, দুটো মোড়া মতো পাতা, আর একটি সোফা। সোফায় লোকটি বসে, অন্ধকারে তার লাল নাকের ডগা আর লাল দেখাচ্ছে না। মুখের হাসি নিবিয়ে ভারী গলায় বলে, আপনি তো বেনোয়া দুপঁ।

ঠিক।

জন্ম অরলেওঁয়।

ঠিক।

উনআশির অক্টোবরে।

ঠিক।

ছোটবেলা থেকেই গাঁট্টাগোট্টা ছিলেন।

ছিলাম।

এই মেয়েটির সঙ্গে দেখা হঠাৎ।

ঠিক।

মেয়েটিকে ভালবাসেন।

বাসি।

অথচ বউ আছে।

একটি কন্যাও।

কন্যার বয়স তো বেশি নয়।

তিন।

যান্ত্রিক স্বর বেনোয়ার।

জ্যাকলিনের তো একটা অসুখ আছে, না? জঁ জ্যাক একটি কলম মুখে নিয়ে মাথাটি কামড়াতে থাকে।

তীক্ষ্ণ চোখ। হঠাৎ বেনোয়ার মাথার ওপর আলো জ্বলে ওঠে। তীব্র আলো। সবুজ আলো। বেনোয়ার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

বেশ পুরনো অসুখ। জঁ জ্যাক আবার বলে।

হ্যাঁ, কানে।

কানে কম শুনছে তো!

বেনোয়া বলে, হ্যাঁ মাঝে মাঝে এরকম হচ্ছে।

বেনোয়াকে উদ্বিগ্ন দেখায়।

আপনার বউয়ের নাম কী? ফাবিয়ান? ফ্রাসোয়াজ? পাসকাল?

পাসকাল।

এই মেয়েটি, নীলার দিকে ফেরে জঁ জ্যাক, হবে এর সঙ্গে হবে, চালিয়ে যান। মেয়ে ভারতীয়, ভারতীয় মেয়েদের কাণ্ডজ্ঞান থাকে। যা করে বুঝে শুনেই করে। হুজুগে চলে না। হা হা।

জঁ জ্যাক হাসছে আর বেনোয়ার মাথার ওপর আলো নিবে যাচ্ছে।

একেবারে অন্ধকার হয়ে গেলে ঘর, বোমা ফাটার মতো শব্দ হয়।

বলুন কী অসুবিধে? হঠাৎ সেই তীব্র আলো আবার, এবারের আলোর রং লাল।

লাল আলোর নীচে বেনোয়াকে শ্মশানের ভূতের মতো দেখায়। গলার স্বর আরও যান্ত্রিক হতে থাকে।

বেনোয়ার একটি হাত নীলা নিজের হাতে নেয়। ঠাণ্ডা হয়ে আছে হাতটি।

আলকাটেল লোক ছাঁটাই করছে, তাই তো?

তাই।

এরিকসনএও তো চাকরি নেবার কথা ভাবছেন।

আবেদন করেছি।

আলকাটেলেই থাকতে চাচ্ছেন, তাই তো?

তাই। আমার পদোন্নতি হওয়ার কথা এখানে।

কিন্তু এখনও হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখছেন না। তাই না?

তাই।

লোকটি শার্টের বুক পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে। সাফল দিয়ে টেবিলের ওপর উলটো করে বিছিয়ে দেয়।

বেনোয়াকে একটি তাস তুলতে হবে। কাঁপা হাতে তোলে সে ইস্কাপনের ছয়। তাসটি জঁ জ্যাকের দিকে বাড়াতেই বাতি নিবে যায়। ঘর শীতল নৈঃশব্দ্যে ডুবে যেতে থাকে।

বেনোয়ার শ্বাসের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই ঘরে।

নীলা বলে, এসব কী হচ্ছে, চলো বেরোই।

বেনোয়া নীলার হাতে শক্ত চাপ দিয়ে শব্দ করে শশশশশশ।

লাল নয়, সবুজ নয়, অন্য একটি আলো জ্বলে ধীরে ধীরে। বেনোয়ার মাথার ওপর নয়, এবারের আলোটি জঁ জ্যাকের পায়ের কাছে জ্বলছে। কাঠের মেঝের ফাঁক দিয়ে। আগরবাতির গন্ধ ঘরের বাতাসে।

নীলার অস্বস্তি হতে থাকে।

বেনোয়া কপালের ঘাম মুছে আগের চেয়ে স্বাভাবিক হয়।

জঁ জ্যাক বেনোয়ার চোখে তীক্ষ্ণ তাকিয়ে বলে আজ সন্ধেয় এক কিলো ভুট্টার গুঁড়ো কোনও একটি জঙ্গলে ছড়িয়ে দেবেন। আর ঠিক এক সপ্তাহ পর, দু কিলো ভুট্টার গুঁড়ো একই রকম ভাবে অন্য এক জঙ্গলে ছড়াবেন। প্যারিসের ভেতরে জঙ্গলে চলবে কি না ভাবছেন তো? না, তা হবে না, যেতে হবে প্যারিসের বাইরে।

দু হাজার ফ্রাঁ লোকটির হাতে দিয়ে বেরোয় বেনোয়া। সিঁড়ির কাছে পৌঁছতেই নীলা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কী ব্যাপার হাসছ কেন?

তুমি গণকের কাছে গেছ?

বেনোয়া দ্রুত সিঁড়ি পেরিয়ে রাস্তায় নামে।

নীলা পেছন পেছন।

কী ওরকম চেঁচাচ্ছিলে কেন সিঁড়িতে। আর বোকার মতো হাসছিলে। বেনোয়া বিরক্ত কণ্ঠে বলে।

দু হাতে হাসি আড়াল করে নীলা বলে, তুমি এসবে বিশ্বাস করো?

নিশ্চয়ই। বেনোয়ার গম্ভীর স্বর।

মজা করছ। নীলা হাসে।

মজা না নীলা। অনেকে এই লোকের কাছে গেছে। ফল পেয়েছে।

তুমি বিশ্বাস করো যে তুমি ভুট্টার গুঁড়ো ছিটোলে আলকাটেল থেকে ছাঁটাই হবে না?

হয়তো হব না। বেনোয়া হাঁটা শুরু করে।

সামনে দাঁড়িয়ে পথ আগলে আবার জিজ্ঞেস করে নীলা, তুমি ছিটোবে গুঁড়ো?

পাশ কেটে হেঁটে যায় বেনোয়া, নিশ্চয়ই।

নীলা দাঁড়িয়েই থাকে, গলায় রঙিন স্কার্ফ জড়ানো ছিল, ঢিলে হয়ে খসে পড়ে!

হঠাৎ খেয়াল হয় যে বেনোয়া একা এগিয়ে যাচ্ছে, দৌড়ে বেনোয়ার কাছে পৌঁছে ওর হাতটি হাতের মুঠোয় নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে কোথায় যাচ্ছ?

চলো তোমাকে প্যানথিওঁ দেখাব।

বেশ তো। আমি আবার ভাবছিলাম, তুমি বুঝি গুঁড়ো ছিটোতে যাচ্ছ।

বেনোয়া এর উত্তর দেয় না। তবে বলে তুমি এত বেখেয়ালি, কী বলব। যখন মাদমোজেল মাদমোজেল ডেকে পেছনে এক ভদ্রলোক নীলার স্কার্ফটি দু আঙুলে ধরে

এগোতে থাকে।

প্যানথিওঁ। সতেরোশো চুয়াল্লিশ সনে পঞ্চদশ লুই মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে, জীবন ফিরে পেয়ে এমনই উচ্ছ্বসিত ছিলেন যে শাঁ জনোভিভের উদ্দেশে একটি গির্জা বানাবেন বলে স্থির করলেন। নয়া ক্লাসিক্যাল ধরনে ফরাসি স্থপতি জ্যাক জার্মা কুড়ি বছর পর গির্জার কাজ শুরু করে দিলেন, কাজ শেষ হতে পঁচিশ বছর লাগল। কাজও শেষ হল, ফরাসি বিপ্লবও শুরু হল। বিপ্লবীরা তখন দেশের গির্জা ভেঙে দিচ্ছে সব, তবে এই শাঁ জনোভিভ গির্জাটিকে না ভেঙে, করা হল প্যানথিওঁ, যেখানে ফরাসি মনীষী আর দার্শনিক ফরাসি জাতির গৌরব, ঘুমোবেন। যাঁরা আগে থেকেই ঘুমিয়ে আছেন, কেবল তাঁরাই। ভিক্টর উগো, এমিল জলা, ভলতেয়ার, রুশো, মাদাম কুরি, পিয়ের কুরির কফিন মাটি খুঁড়ে তুলে এনে রাখা হল প্যানথিওঁতে। নেপোলিয়ন এটিকে আবার গির্জা করে দিয়েছিলেন, আঠারোশো ছয় সালে। আশি বছর প্যানথিওঁকে অপেক্ষা করতে হল, পুরোপুরি প্যানথিওঁ হতে। আশি বছরে আরও একবার অগির্জা হয়েছিল এটি, আরও একবার গির্জা। প্যানথিওঁর মেঘছোঁয়া উঁচু ডোম থেকে একটি দীর্ঘ পেণ্ডুলাম ঝুলছে, ফরাসি পদার্থবিদ লিও ফুকো উনিশ শতকের মাঝামাঝি যে পেণ্ডুলাম দেখিয়ে বলেছিলেন পৃথিবী নিজের অক্ষপথে ঘুরছে। মেঝের তলায়, পাতালে গেলে মন ধাধাঁনো সব ফরাসি গৌরব।

মাদাম কুরির কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে নীলা বলে, এ তো পোলিশ গৌরব, ফরাসি নয়।

বেনোয়া বলে মাদাম কুরি ফরাসি গৌরব, কারণ যে দেশেই তাঁর জন্ম হোক না কেন, এ দেশে তিনি বাস করেছিলেন।

নীলা ধীরে বলে, আমি তো এ দেশে বাস করছি। আজ যদি সাংঘাতিক কিছু একটা আবিষ্কার করি আমি, খুব বড় কিছু, আমাকে কি ফরাসি গৌরব বলে ভাবা হবে?

বেনোয়া উত্তর দেয় না।

নীলাই উত্তর দেয় তার প্রশ্নের, ভাবা হবে। আর যতদিন না বড় কিছু ঘটাচ্ছি, ততদিন ভারতীয়ই থাকব। গরিব দুঃখী ভারতীয়, খেতে না পাওয়া ভারতীয়, শূন্য থালা হাতে ভিক্ষে করা ভারতীয়। ফরাসি সংস্কৃতি নষ্ট করা, বিনাশ করা অনুপ্রবেশকারী।

নীলা শব্দ করে হেসে ওঠে। বেনোয়া সতর্ক করে দেয়, এখানে এত জোরে হাসার নিয়ম নেই।

ফুঁপিয়ে কপট কেঁদে বলে, কাঁদা কি চলবে?

না, তাও চলবে না।

ভলতেয়ারের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে নীলা বলে, কিন্তু ওই কফিনের ভেতর কি ভলতেয়ারের মৃতদেহ আছে?

বেনোয়া হেসে ওঠে, মৃতদেহ কি আর এতদিন থাকবে, হাড়গোড় আছে।

নীলাও হাসে, তাই তো। কিন্তু আমার মনে হয় কী জানো, এখানে ভলতেয়ারের কিচ্ছু নেই।

নিশ্চয়ই আছে।

কিন্তু যদ্দুর জানি ধর্মান্ধ খ্রিশ্চানরা ভলতেয়ারের মৃতদেহ চুরি করে নিয়েছিল এখান থেকে, কেটে ছিঁড়ে আবর্জনার স্তূপে ফেলে দিয়েছে। হৃৎপিণ্ডটা অবশ্য আছে এখনও,

বিবলিওটেকে, মস্তিষ্ক অকশনে বিক্রি হতে হতে এখন লাপাত্তা।

বেনোয়া হেসে উড়িয়ে দেয় নীলার গল্প।

প্যানথিওঁ থেকে বেরিয়ে বেনোয়া বলে, আমার অবশ্য ভলতেয়ারকে তেমন বড় কিছু মনে হয় না।

কেন বড় কিছু মনে হয় না ভলতেয়ারকে, তা বেনোয়া খোলসা করে বলে না, বলে দেকার্তকে মনে হয় বড় কিছু। তারপর গড়গড় করে দেকার্তের অঙ্ক কষার অসাধারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে, দীর্ঘ সময় নিয়ে বর্ণনা করে দেকার্তের জ্যামিতি বিশ্লেষণ তত্ত্ব। নীলার মন পড়ে থাকে ভলতেয়ারে।

কগিতো আরগো সাম। বেনোয়া দুবার বাক্যটি আওড়ায়।

এ আবার কী? নীলা জিজ্ঞেস করে।

দেকার্তের বিখ্যাত লাতিন উক্তি।

নীলা জানে না। বেনোয়া অর্থ বলে দেয়, আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি।

দেকার্তের তো ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল। নীলা বলে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যা কিছু সব ঈশ্বরের তৈরি। মানুষের মন হচ্ছে ঈশ্বরের মতো, ভাবে। মানুষের আকার আছে, ঈশ্বর নিরাকার। কিন্তু মানুষ মরে যায়, মানুষের ভাবনা থেমে যায়, ঈশ্বর থাকেন, তাঁর ভাবনা থাকে, তাঁর থাকার জন্য তাঁকে নির্ভর করতে হয় না তাঁর সৃষ্টিকর্তার ওপর। বেনোয়া মুখস্থ বলে যায়।

বেনোয়ার চোখ মাঝে মাঝে আকাশে, ঈশ্বরের গল্প করলে অনেকে আকাশের দিকে তাকিয়ে করে, ভেতরে একটি ছবি ভাসে সম্ভবত, আকাশের ওপর কোথাও কোনও সিংহাসনে বসে আছেন স্বয়ং ঈশ্বর। অবশ্য বেনোয়ার ধারণায় ঈশ্বর নিরাকার। নিরাকার ঈশ্বরের তো কোথাও বসার কথা নয়।

নীলা বলে, মুসলমানরা বিশ্বাস করে ঈশ্বর নিরাকার। আবার এও বিশ্বাস করে ঈশ্বর আকাশে বাস করেন। রীতিমতো ভ্রমণ করেন এক আকাশ থেকে আরেক আকাশে। তোমার দেকার্তের ঈশ্বর কি আকাশে থাকেন?

বেনোয়া হাতের মুঠো থেকে নীলার হাত খসিয়ে দেয়, কী ব্যাপার, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস করো না?

নীলা হেসে বলে, আমি ফ্রাসোয়া মারি আরোয় বিশ্বাস করি।

এ আবার কে? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

এ হচ্ছে এক ফরাসি লোক, জন্মেছেন প্যারিসে।

প্রেমে পড়েছ নাকি তার?

হ্যাঁ। অনেকদিন। নীলা হাসে।

দেখতে কেমন?

সুন্দর। ছিপছিপে শরীর। মেদহীন।

শুয়েছ ও ব্যাটার সঙ্গে?

না শুইনি এখনও।

নীলা বেনোয়ার আঙুলের ফাঁকে আঙুল ঢুকিয়ে হাতটিকে বন্দি করে।

আমার চেয়ে বয়সে বড় না ছোট? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

তোমার চেয়ে বড়, খানিক ভেবে, বেশি না, তোমার চেয়ে দুশো পঁচাশি বছর বড়।

বেনোয়া হো হো করে হাসে। নীলাও।

তো তাকে বিশ্বাস করার কারণ কী তোমার? বেনোয়া উদগ্রীব জানতে।

সে অনেক কারণ। ফ্রাসোয়া জীবনে ভুগেছেন অনেক। ফরাসি সরকারের সমালোচনা করে কবিতা লিখেছিলেন, সরকার তাঁকে বাস্তিলে বন্দি করে রাখল এগারো মাস। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর তিনি লিখতে শুরু করলেন। বেশ চলছিল। হঠাৎ একদিন তিনি এক নামকরা লোককে, সমাজের উঁচুতলার কোনও এক লোক হবে, বিষম অপমান করলেন। এর শাস্তি পেতে হবে ফ্রাসোয়াকে। হয় জেল নয় নির্বাসন। ফ্রাসোয়া নির্বাসন বেছে নিলেন। নির্বাসনে পাশের একটি দেশে গেলেন, নাম বলব না। সে দেশে বছর তিনেক ছিলেন, প্যারিসে ফিরে এসে সে দেশের বেশ গুণ গেয়ে একটি বই লেখেন। সে দেশের সঙ্গে ফ্রান্সের শত্রুতা বহুকালের...

বুঝেছি ইংলন্ড। আচ্ছা লোকটি কে? দ্রফুস? আলফ্রেড দ্রফুস?

দ্রফুসের চেয়ে দুশো পঁচাশি বছর ছোট হলে তুমি এখনও জন্ম নাওনি। আর ইংলন্ডে কোনও শয়তানের দ্বীপ নেই, যে দ্বীপে দ্রফুস ছিলেন। নীলা বলে যায়। যা বলছিলাম, তো ফরাসি সরকার তা মেনে নেবে কেন? ফ্রাসোয়ার শাস্তির ব্যবস্থা হল আবার। এবারও ফ্রাসোয়াকে নির্বাসনে যেতে হল। এবার তিনি দেশের খুব দূরে যাননি, কাছাকাছিই ছিলেন। মানে কোনও সমুদ্র পাড়ি দিতে হয়নি।

বেলজিয়ামে ছিলেন?

না।

ইতালিতে?

না।

স্পেনে?

না। সেই নির্বাসনে বসে তিনি প্রচুর বই লিখতে লাগলেন। অন্ধত্বর বিরুদ্ধে, যুক্তির পক্ষে। তারপর তিরাশি বছর বয়সে যখন তিনি দেশে ফিরে এলেন, তাঁকে বিরাট সংবর্ধনা দেওয়া হল। বয়স অনেক, মারা গেলেন প্যারিসে। কিন্তু কোনও গির্জার ভেতরে তাঁর কবর দেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ গির্জার বিপক্ষে তিনি বেশ সোচ্চার ছিলেন। শেষে যাই হোক শঁপাঁর এক অ্যাবিতে কবর দেওয়া হল। তারপর আঠারো শতকের শেষ দিকে তাঁকে প্যারিসে নিয়ে আসা হয়, অবশ্য বেশ সম্মানের সঙ্গেই।

বেনোয়াকে লক্ষ করে নীলা, অন্যমন।

এই দালানটা দেখো। বিশাল একটা বাড়ির দিকে চিবুক তুলে বেনোয়া বলে, এটা আমার ইস্কুল। একোল নরমাল সুপেরিয়রের। ফ্রান্সের সবচেয়ে নামকরা ইস্কুল। এই ইস্কুলের সার্টিফিকেট পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। তুমি যদি পড়ার সুযোগ পাও, তোমাকে নব্বই হাজার ফ্রাঁ করে বছরে দেওয়া হবে। আমিও তা পেয়েছি। এখানে লেখাপড়া করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছে অনেকে। তুমি লুই পাস্তুরের নাম শুনেছ?

নীলা মাথা নাড়ে, শুনেছে।

মিশেল ফুকো? জ পল সার্ত্র? রমা রলাঁ? আঁরি বারগসন?

নীলা এঁদের নামও শুনেছে।

সব এই ইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। বেনোয়া নীলাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। খুব সুখী দেখায় তাকে।

খাকির ওপর হালকা সবুজ টিশার্ট পরেছে বেনোয়া। গরমের পোশাকই এমন, যত পাতলা হওয়া যায়, যত ছোট হওয়া যায়। নীলার পরনে ছোট একটি স্কার্ট, অর্ধেক উরু খোলা, আর একটি আঁটসাঁট কালো জামা। চুল পিঠে গড়াচ্ছে। পায়ে উঁচু জুতো, উঁচু পরেও বেনোয়ার কাঁধের নীচেই পড়ে থাকে তার কাঁধ। ভরা বুক। পেটে চিকন মেদের ভাঁজ, এই মেদ নিয়ে নীলার শরম ছিল, বেনোয়াই বলেছে, ওটুকু মেদ না থাকলে মেয়েদের ভাল দেখায় না। আজকালকার মেয়েরা যে হারে না খেয়ে থাকে মেদ কমাতে, না খেয়ে না খেয়ে কঠিন অসুখ বাধিয়ে ফেলে, মরেছেও তো অনেক এই করে। স্তন বলতে কিছু নেই, উরুতে মাংস নেই, জীবিত কঙ্কাল সব। শুনে মনে জোর পেয়েছে নীলা। নিজে সে এমন আঁটো জামা পরে উরু খুলে বেশ নিশ্চিন্তে বাইরে বেরোয়। ফরাসি পুরুষেরা, নীলা লক্ষ করে, মেয়েদের পা আর উরুর দিকে তাকায় বেশি, যদি তাকায়। ভারতীয় ছেলেদের চোখ পড়ে মেয়েদের স্তনে। স্তন শাড়ির আড়ালে থাক কি ওড়নার আড়ালে থাক, বা ঢিলে পোশাকের তলে থাক, চোখ আগে যাবেই ওদিকে। পা, সে যত সুডোল হোক, মসৃণ হোক মেয়েদের, ভারতীয় পুরুষের কাছে এ বিদঘুটে বিশ্রী জিনিস। পুরুষের যৌনবোধ দু দেশে ভিন্ন রকম। নীলা মাঝে মাঝে ভেবে পায় না, কেন। ভারতে যে মোটা তাজা শরীরকে ভাল স্বাস্থ্য বলা হয়, তা এখানে অসুস্থ বলে বিবেচিত। অসুস্থ কারণ মেদহীন নয় শরীর। নীলাকে কলকাতার লোকেরা বলে, হাড়গিলে মেয়ে। আর প্যারিসে, দিব্যি তাকে বলা হয় ভাল স্বাস্থ্যের মেয়ে, অবশ্য ক্যাথারিন নীলাকে এক বা দু কিলো ওজন কমালে ভাল দেখাবে বলেছিল।

দুপুরের খাবার খেতে দুজন কার্তে লাতায় এক ব্রাসারিতে ঢোকে। এই এক মজা প্যারিসে, যেখানেই হাঁটো, যে রাস্তাতেই, ক্যাফে পাবেই, রেস্তোরাঁ পাবেই। রেস্তোরাঁয় নীলা শুধু সালাদ চাইল খেতে।

কী ব্যাপার, তুমি ওই হাড়গিলে মেয়েদের মতো হতে চাও নাকি?

খানিকটা যে চায় না নীলা তা নয়। পেটের ওই চিকন মেদ, মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, না আবার বেড়ে যায়। রাস্তায় বেঢপ আকারের শরীর দেখেনি সে তা নয়। বেশির ভাগই, নীলা দেখেছে, একা। বোধহয় বেনোয়া একদিন বলবে, ধুর কী শরীর বানিয়েছ বলো তো। পাসকালের ওজন, কম করে হলেও নীলার চেয়ে পাঁচ কিলো কম, নীলার বিশ্বাস।

রেস্তোরাঁয় বসে ওই সালাদই খেতে খেতে নীলা জিজ্ঞেস করে, তুমি এমন ভাল বিজ্ঞানের ইস্কুলে পড়েছ, তুমি গণকে বিশ্বাস করো কেন? লোকটি তো ভণ্ড।

না জেনে মানুষকে ভণ্ড বোলো না নীলা। কী করে সে আমার বয়স, পাসকালের নাম, জ্যাকলিনের অসুখের কথা জানল বলো?

নিশ্চয় কারও কাছ থেকে খবর নিয়েছে।

না। আমার এক সহকর্মীর ভাইয়ের বন্ধুর বোন গিয়েছিল জঁ জ্যাকের কাছে। সহকর্মীটি কোনওদিন যায়নি। সে কেবল ঠিকানা জোগাড় করে দিয়েছে। আর ওর ভাই বা ভাইয়ের

বন্ধু কেউ আমাকে চেনে না।

রাদেভুঁ নেওয়ার সময় তোমার নাম তো বলেছ। সে এই নামের লোকের তথ্য কোথাও থেকে বের করেছে।

প্যারিসে সম্ভবত কয়েক হাজার বেনোয়া দুপঁ আছে। জঁ জ্যাক পারিসের লোকও নয়। দেখলে না মারসেই-এর উচ্চারণে ফরাসি বলছিল সে। বেনোয়া নীলাকে ঠকিয়ে দিয়ে বলে।

এদের চর থাকে, জানো তো! চর খোঁজ দেয় কে আসছে দেখা করতে, কোথায় বাড়ি, কী করে, কী অসুবিধে সব। আর অন্য উচ্চারণে কথা বলা, এ তো কোনও ব্যাপারই নয়।

বেনোয়া সবেগে মাথা নাড়ে দুপাশে। না।

বাইবেলেই আছে এসব কথা। এলিশা সিরিয়ার রাজার যুদ্ধ পরিকল্পনা জানতে তার শোবার ঘরে ঢুকেছিলেন। জনদার্ক কে তো জানো, তার তো অশরীরী কিছুর সঙ্গে দেখা হত। অশরীরী কিছুই আগাম বলে দিয়েছিল, কোন তরবারি দিয়ে যুদ্ধ করলে সে ইংরেজদের তাড়াতে পারবে। শাঁ আলফোনসুসের নাম শুনেছ? তিনি বলেছিলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই এই হবে, ঠিক তাই তাই হয়েছে, রোমে পোপের মৃত্যুশয্যায় তাঁর শরীর পাওয়া যাবে বলেছিলেন, পাওয়া গেছে। তুমি তো আবার সাহিত্য নিয়ে মাথা ঘামাও, হ্যামলেটের ব্যাপারটা দেখো, হ্যামলেটের সঙ্গে কি অপার্থিব কিছুর দেখা হয়নি? হয়েছে। আজ প্যানথিওঁতে ভিক্টর উগোর কফিন দেখে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করলে, জানো ভিক্টর উগো কী করতেন? অশরীরী আত্মার সঙ্গে দেখা করতেন। মস্ত মস্ত খাতায় লিখে রেখেছেন, ওদের সঙ্গে সংলাপগুলো। কিছু একটা কোথাও আছে। তা না হলে জগতের বড় বড় মনীষী, বিজ্ঞানী অলৌকিক ব্যাপারগুলোকে উড়িয়ে দিতেন, দেননি কিন্তু।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে নীলাকে অবাক করে এক কিলো ভুট্টার গুঁড়ো কিনে প্যারিসের বাইরে বোয়া দ্য বোলোনে গিয়ে ঠিক ঠিকই নির্জন জঙ্গলে ছড়িয়ে দিল বেনোয়া।

বাড়ি ফিরে নীলা সারাদিনের চমক সামলাতে বাথটাবের ফেনা তোলা জলে নেমে পড়ে। বেনোয়াও নামে। টাবের কিনারে দুজনের জন্য দু গেলাস বোরগোন ওয়াইন রাখা। কড়া বাতি নিবিয়ে কেবল দুটো মোম জ্বালানো। মায়াবী আলোয় ডুবে দুজনেই অল্প অল্প ওয়াইন পান করে। বেনোয়া হাততোয়ালেতে তরল সাবান ঢেলে নীলার শরীরে বুলিয়ে দেয়। নীলার ভাল লাগতে থাকে, সারাদিনের তার ভাল না লাগার ঘটনাগুলো একটু একটু করে দূরে সরতে থাকে। সাদা ফেনার তলে ডুবে থাকে নীলার শরীর, কেবল চেরিদুটো উঁকি দেয়। চেরি খেতে বেনোয়া ঝুঁকে আসে নীলার দিকে। জিভ বাড়াতেই চেরি ডুবে যায় ফেনার তলে। লুকোচুরি খেলা চলে জিভের জলে আর চেরিতে। বেনোয়ার শরীর ফুঁড়ে জেগে উঠতে থাকে আরেক শরীর। সে শরীরটির স্পর্শ নীলা তার গায়ে পায়ে পেতে থাকে, শ্বাস ঘন হতে থাকে তার, বেনোয়ারও। নীলার পা দুটো জলের ভেতর থেকে তুলে আনে ওপরে, যেন পা নয়, অতল জলে হারিয়ে যাওয়া কোনও রহস্য, বেনোয়া মুগ্ধ চোখে দেখে ভেজা মসৃণ পা, বাদামি পা। বেটোফেনের বাজনার তালে তালে বেনোয়ার শরীর ওঠে নামে নীলার শরীরে, যতক্ষণ না অসুরের চিৎকারের মতো মোবাইল বাজে।

রাত এগারোটায় বেনোয়া বেরোয়। যাবার সময় আরও একটি চমক দেয়। সে কাল

আসছে না, কেবল কাল নয়, দশ দিন তার আসা হবে না, রিভিয়েরায় যাবে বউ বাচ্চা নিয়ে, ছুটি কাটাতে, সমুদ্র পারে রোদ পোহাতে। আর নীলা কী করবে? বেনোয়ার কথা ভাববে, ভাববে যে সে তাকে ভালবাসে, ভাববে যে সে যেখানেই থাকুক, যতদূরেই, নীলা সারাক্ষণ তার হৃদয়ে আছে।

দরজা বন্ধ করে জানালা বন্ধ করে আলো বন্ধ করে বেটোফেন বন্ধ করে অতল নৈঃশব্দ্যের ভেতর নীলা যখন তার দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনছে কেবল, দরজায় কড়া নড়ে।

বেনোয়া, সিঁড়ির মুখ থেকে ফিরে এসেছে যে জিনিসটি জানা হয়নি, জানতে।

তোমার ওই ফ্রাসোয়াটা কে?

ভলতেয়ার।

সন্ধে বরদোর স্রোতে ভাসে, রাত ওড়ে গুলোয়াজের ধোঁয়ায়

মরুনি আর দানিয়েলের নেমন্তন্ন নীলার বাড়িতে। নিজের বাড়ি হলে মরুনিকে বাঙালি খাবার খাওয়াবে, এরকম ইচ্ছে ছিলই নীলার। দানিয়েলকে ডাকার পেছনে কারণ, এক, দুজনের পক্ষে অতিরিক্ত খাবার তৈরি করা হয়ে গেছে, দুই দানিয়েল বন্ধু হিসেবে এক সময় মন্দ ছিল না, তিন, দানিয়েল দেখে যাক নীলা পরনির্ভর নয় আর।

আমার বাড়ির তুলনায় এ তো দেখছি প্রাসাদ। দানিয়েল ঘরগুলো দেখে আর বলে।

কেবল দারিদ্র্যই ঘোচেনি, নীলা প্রেমে পড়েছে এবং সুখে আছে এ দুটো খবরও শ্যাম্পেনের বুদবুদের মতো নীলা থেকে বেরোয়।

রাতে ঘরের বাতি নিবিয়ে খাবার টেবিলে প্রথামতো মোম জ্বেলে দেওয়া হল, ভারতীয় খাবারের সঙ্গে ভারতীয় সংগীত হলে মন্দ হয় না, রবীন্দ্রসংগীত চালিয়ে দেওয়া হল। নীলা লক্ষ করে গানের দিকে কান কারও পাতা নেই। নীলাই কান পেতে কান পেতে রই শোনে, শোনে ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান...আর বলে মরুনি, তুমি যদি বাংলা জানতে, কাঁদতে গান শুনে।

মরুনি জোরে হেসে ওঠে।

থালা সাজিয়ে গেলাসে ওয়াইন ঢেলে দিয়ে নীলা পরিবেশন শুরু করে।

আমরা নিজেরা নিয়ে নিতে পারব, ঠাকুরমা, তুমি বসো। দানিয়েল বলে।

দানিয়েলের অভিজ্ঞতা আছে বাঙালির সপ্তব্যঞ্জনের। মরুনির নেই, ঠোঁট টিপে হাসে টেবিল ভরা খাবার দেখে।

মনে হচ্ছে, পঞ্চাশ জনের খাবার রান্না করেছ।

তুমি যদি কলকাতা থাকতে মরুনি, তা হলে ঠিক এই রাঁধতে, আমি যা রেঁধেছি।

বাঙালি খাবার মাছ ভাত, কাঁটা ছুরিতে খেতে নীলার ইচ্ছে করে না, সে হাতে শুরু করে। মরুনি হাঁ হয়ে নীলার হাতে খাওয়া দেখে।

ভাত নিয়ে সেই ভাতের সঙ্গে সবজি মাছ মাংস সব একবারেই ওরা নিয়ে নেয়। থালার কিনারে নুন নেওয়ার মতো করে মরুনি ভাত নেয়, মাছ আর মাংসের পরিমাণ বেশি। হলে কী হবে, রুইয়ের একটি টুকরো খেতে নিয়েই সে টের পায়, মাছ তার পক্ষে খাওয়া সম্ভব হবে না, কাঁটা। কাঁটা বলে দানিয়েলও মাছ ছুঁল না, মাংসের ওপর ঝড় গেল। ভাত ভাতের মতো পড়ে রইল। তলবিয়াকের চিনে দোকান থেকে কেনা রুই তেলাপিয়া, কই নীলার জিভেই রুচল কেবল।

নীলা হাতে মাছের ঝোলে ভাত মাখতে মাখতে মরুনিকে বলে, কখনও দেখোনি কাউকে হাতে খেতে?

মরুনি দেখেনি, কখনও চোখের সামনে দেখেনি, যা দেখেছে পর্দায়, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষ

দেখায় যখন টেলিভিশনে, তখন।

হাতে খাওয়ার স্বাদই অন্যরকম। খেয়ে তৃপ্তি হয়। নীলা বলে।

দানিয়েল কাঁটা ছুরি ফেলে বাঁ হাত ডুবিয়ে দিল খাবারে। নীলা আঁতকে ওঠে দেখে।

বাঁ হাতে খেতে হয় না, ডান হাতে খাও। নীলা চেঁচিয়ে বলে।

আমি তো বাঁ হাতি, দানিয়েল বলে।

বাঁ হাতে খেতে হয় না কেন? মরুনি জিজ্ঞেস করে।

নীলা বলে, বাঁ হাতে নোংরা কাজ করা হয়, তাই।

নোংরা কাজ?

মল মূত্র ত্যাগের পর বাম হস্তে আমরা আমাদের গোপন অংশগুলো ধৌত করি কিনা।

দানিয়েল বলে, কিন্তু আমরা তো ধৌত করি না। কাগজ ব্যবহার করি।

তবু দেখতে যেন কেমন বিচ্ছিরি দেখায়। নীলার নাক কুঁচকে ওঠে, যেন দানিয়েলের বাঁ হাত থেকে ভুরভুর করে দুর্গন্ধ বেরিয়ে সোজা তার নাকে ঢুকছে।

ডান হাতে খেলে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে না, বাঁ হাতে খেলে দেখাবে তা দানিয়েল যেমন বোঝে না, মরুনিও না।

দানিয়েল বাঁ হাতে লেখে, বাঁ হাতে টেনিস খেলে, বাঁ হাতে বাজারের ব্যাগ হাতে নেয়, বাঁ হাতে সিগারেট নেয়, বাঁ হাতে ওয়াইনের গেলাস ধরে, দেখতে বিচ্ছিরি লাগে কি? লাগে না।

নীলা এর উত্তর জানে না। আসলে যুক্তি নেই। দেখার অভ্যেস নেই, তাই।

হাতে খাওয়ার অভ্যেস নেই বলে দানিয়েলকেও হাত গুটোতে হয়। ও যতবারই হাতে ভাত নিচ্ছিল, ভাত গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল হাত থেকে। মুখ অব্দি ভাত ওঠাচ্ছিল হাত ভাঙা রোগীর মতো।

মরুনি তুমি পারবে? নীলার কৌতূহল হয়।

মরুনি সাহস করে না। আবদারের পর সে হাতে ভাত তুলতে গেলে থালা গড়িয়ে পড়ে যায় খাবারসহ ওর কোলের ওপর। বেচারার জামা ঝোলে লাল হয়ে থাকে।

মরুনিকে একটি জামা এনে দেয় নীলা, পরতে। জামাটি পরে কোন দেশের জামা এটি ভারতের নাকি জিজ্ঞেস করায়, নীলার ইচ্ছেটি হয়, মরুনিকে শাড়ি পরানোর।

নীলার ইচ্ছের কথা শুনে হাতে তালি লাগায় দানিয়েল। ওঠে দানিয়েল।

খাবার অর্ধেক ফেলে নীলা মরুনিকে নিজের একটি শাড়ি পরাল। নীলার কুচি কাটা দেখে নয়ন জুড়োল ওদের।

তোমার ওই বুট জুতোজোড়া খোলো তো। মানাচ্ছে না।

নীলা একজোড়া চটি দেয় পরতে মরুনিকে।

হেঁটে আয়নার সামনে যাও। মরুনি হাঁটতে গিয়ে উপুড় হয়ে পড়ল চেয়ারে।

ধীরে বন্ধু ধীরে।

দু বছরের শিশুকে শাড়ি পরিয়ে নীলা হাঁটাচ্ছে, এমনই বোধ হল তার।

আয়নার সামনে ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে থাকে মরুনি।

খুব সুন্দর লাগছে। লাগছে না। একবারে বাঙালি মনে হচ্ছে তোমাকে। নীলা উত্তেজিত।

কেমন লাগছে তোমার? বলো তো।

মরুনি চুপ করে থাকে।

নীলা বলে, যদি ফ্রান্সে না আসা হত, মরুনি ভেরনেস না হয়ে মরুনি পাল বা মরুনি দাস হতে, এরকম শাড়ি পরতে, রবীন্দ্রসংগীত গাইতে।

নীলা মরুনির কপালে লাল একটি টিপ পরিয়ে দেয়।

কী, দেখেছ নিজেকে, কী সুন্দর লাগছে, তাই না!

মরুনি মুখ খোলে, শাড়িটি ভাল সুতোয় বানানো, কিন্তু শাড়িতে তাকে মানাচ্ছে এ তার মনে হয় না। সে তার পান্তলুনেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ভারতীয় মেয়েরা এ পরে কী করে হাঁটে! মরুনি শাড়ি খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে।

কেবল হাঁটে? দৌড়োয়, ট্রেনে চড়ে, বাসে চড়ে। চর্চায় কী না হয়।

ভারতীয় সংস্কৃতি, মরুনিকে টানছে না, নীলা টের পায়। শাড়ি না পরে, এ সময় জাপানি কিমোনো পরলেও মরুনির একই রকম অনুভূতি হত। ভারতীয় খাবার না রেঁধে আজ মেক্সিকান বা চিনে খাবার রাঁধলেও মরুনির একই রকম আনন্দ হত। নীলা বিশ্বাস করতে শুরু করে মরুনি আগে যা বলেছিল, ভারত তার কাছে যে কোনও একটি দেশ, কলকাতা যে কোনও একটি শহর। নীলার কাছেও কি তাই নয়? নীলা ভাবে।

মাদার তেরেসা কেবল কি মরুনিকেই, এরকম কত লক্ষ মানুষকে বাঁচিয়েছে। দানিয়েল বলে। মরুনিও মাথা নেড়ে সায় দেয়।

মাদার তেরেসার গুণ গাইছে যখন ওরা, নীলা বাধা দেয়, এত গুণ গেয়ো না তো, রাগ লাগে।

নীলার কেন রাগ হয় তা জানতে ওরা আগ্রহী।

নীলার রাগ হয় এই কারণে যে মাদার তেরেসা তাঁর প্রভু যিশুকে খুশি করতে যা করার প্রয়োজন বোধ করেছেন, করেছেন, মানুষের জন্য মায়ায় বা মমতায় কিছু তিনি করেননি। দরিদ্রের দুর্দশা তিনি দূর করতে চাননি, কারণ দুর্দশা ঈশ্বরের দেওয়া। রাস্তা থেকে অসুস্থ মানুষ তুলে এনেছেন নিজের আশ্রমে, খেতে দিয়েছেন, বিছানা দিয়েছেন, আরাম করে মরার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, আর জগৎসুদ্ধ নাম কামিয়েছেন। যারা মাদার তেরেসার গুণ গায় তারা জানে না, কোনও একটি রোগীর জন্যও তিনি ডাক্তার ডাকেননি। চিকিৎসা হলে বেঁচে থাকতে পারত ওরা, তেরেসার আশ্রমে চিকিৎসাহীনতায় মরতে হয়েছে ওদের! রাস্তায় পড়ে থাকলে বরং ভাল হত, একসময় কোনও দরদী লোক, একটি রিকশা করে অথবা টেনে হিঁচড়ে হলেও অন্তত হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারত, সে সুযোগ ছিল! রাস্তায় পড়ে মরতে থাকা রোগীদের মাদার তেরেসা আশ্রমে তুলেছেন, রাস্তায় না মরে বিছানায় রোগীরা মরেছে, এই হল পার্থক্য। যন্ত্রণায় সে সব রোগী চিৎকার করেছে, কিন্তু কাউকে তিনি একটি ব্যথা কমার ওষুধ দেননি। বলেছেন, যন্ত্রণা সইতে, কারণ প্রভু যিশু এই যন্ত্রণা দিচ্ছেন।

আর নিজের বেলায়, তাঁর অসুখের সময় কিন্তু চিকিৎসার অভাব হয়নি। সর্বাধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে তাঁর জন্য, যিশুর দেওয়া যন্ত্রণা তাঁর পোহাতে হয়নি।

মারা তো গেলেন। দানিয়েল বলে।

ভালই তো হল। তাঁর প্রভুর কাছে গেলেন। প্রভু তাঁকে বিরাট পুরস্কার দেবেন। সারাজীবন এই প্রভুকে তুষ্ট করে গেছেন। পুরস্কারের লোভেই তো করেছেন। এ জগতের নোবেলও পাওয়া হল, ও জগতের নোবেলও হল।

মরুনি সিগারেট ধরায়। ধোঁয়া ছেড়ে বলে, এ তুমি ঠিক বলছ না নীলা। নিজের ভোগ বিলাসিতার কথা মাদার তেরেসা ভাবেননি।

নীলার উত্তপ্ত উচ্চ কণ্ঠ, বলো কী? কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ব্যাঙ্কে। সে টাকায় নিজের নামে এখানে ওখানে আশ্রম খুলছেন। পৃথিবীর তাবৎ লোক তাঁকে মহা সম্মান করছে। বিরাট তারকা তিনি। মানুষের প্রশংসা তিনি প্রতি মুহূর্তে ভোগ করেছেন।

দানিয়েল বলে, গরিব দেশের মানুষের দুঃখ দূর করতেই তিনি জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাই তিনি কলকাতা গেছেন।

নীলা বলে, আলবেনিয়া এমন কোনও ধনী দেশ ছিল না। আর ভারতে এসে ভারতের দারিদ্র্য ঘোচাতে তিনি বিন্দুমাত্র কিছু করেননি। সমাজের শ্রেণীভেদ সম্পর্কে কখনও তিনি প্রশ্ন তোলেননি। ধনী দরিদ্রের বৈষম্য নিয়ে কখনও না। ভারতের বড় বড় দুর্নীতিবাজদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন। দিয়েছেন বলেই নিয়েছেন। কারা দিচ্ছে কেন দিচ্ছে, টাকাটা কী থেকে উপার্জন, তা একবারও দেখেননি, দেখতে চাননি। হাইতির স্বৈরাচারি জেনারেলের কাছ থেকেও তো টাকা নিয়েছেন। ভারতের কালোবাজারি, লুটেরা, বদমাশদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে সমাজে ওদের সম্মানের জায়গায় বসিয়ে গেছেন। কারণ মাদার তেরেসাকে টাকা দিলে পুণ্যের কাজ করা হয়, সাত খুন মাপ হয়, কালো টাকা সাদাও হয়। আর কী জানতে চাও? ভারতের দারিদ্র্যের বড় একটি কারণ জনসংখ্যার আধিক্য। যেখানে জনসংখ্যা রোধ করা খুব জরুরি একটি ব্যাপার, সেখানে তোমাদের মাদার তেরেসা জন্মরোধের বিপক্ষে সোচ্চার হয়েছেন, ভারতের মতো দেশে। কনডম চলবে না, পিল চলবে না, যিশু মন খারাপ করবেন। এবরশন? তা তো চলবেই না, যিশু হার্টফেইল করবেন।

দানিয়েল আর মরুনি দুজনই উচ্চস্বরে হাসে।

ওয়াইন এক এক বোতল করে শেষ হয়, আর স্বর উঁচুতে উঠতে থাকে তিনজনেরই। সবচেয়ে বেশি ওঠে নীলার। দানিয়েল বলে, কেবল ওয়াইনের কারণে নয়, বাঙালিরা ওয়াইন না খেয়েও জোরে কথা বলে।

নীলা বলে, আমাদের বলতে হয়, প্রচুর জনসংখ্যা তো, এক বাড়িতে এগারোজন করে বাস করে। কিচিরমিচির হাউ মাউ লেগেই আছে। ঘরে মানুষ বাইরে মানুষ, যানবাহনের চিৎকার, ধুলোয় বাতাস ভারী হয়ে থাকে। চিৎকার না করলে কেউ কারও কথা শুনতে পাবে না। অভ্যেস।

নীলার এই হয়। পেটে ওয়াইন পড়লে বিরামহীন বকে যায়।

আবার নীলা মরুনিতে ফেরে, ধরো, এই মরুনির মা, তার বিয়ে হয়নি, বিয়ে না হয়ে বাচ্চা জন্ম দিয়েছে, আর এ এমনই পাপ, যে কোলের বাচ্চাকে আবর্জনায় ফেলে দিতে হয়েছে তার। কিন্তু এবরশন করার সুযোগ হলে, তাকে ওই ন মাস বাচ্চা বইবার কষ্টটা ভোগ করতে হত না। আর একটি দুধের শিশুকে ছুড়ে ফেলার কষ্ট নিয়েও তাকে সারাজীবন বাঁচতে হত না।

মরুনি হেসে ওঠে, ও প্রভু, তা হলে আমার কী হত! ও মহিলা এবরশন করে ফেললে আমার তো জগৎ দেখা হত না।

জগৎ বলে যে একটা ব্যাপার আছে, তা তো জগতে এসে বুঝেছ। কয়েক সপ্তাহের ভ্রূণ মরুনি মারাটা অনেক ভাল, এক মাসের মানুষ মরুনিকে মারার চাইতে।

দানিয়েল থামায় নীলাকে, থামায়, কিন্তু, দানিয়েল কিছু বলার আগে মরুনি বলে, এবরশন করার সুযোগ হলেই কি সমাজে একটা বড় বিপ্লব ঘটে গেল। বিয়ে হয়নি বলে বাচ্চা জন্ম দেওয়া অপরাধ, এই নিয়মটি পালটানোর কথা বলছ না কেন নীলা!

নীলা এবার দুজনের উদ্দেশেই গলা নামিয়ে বলে, আমি তো বলছি না এ নিয়ম ভাল। মরুনির মা, তার বিয়ে হয়নি বলে, বা মেয়ে জন্মেছে বলে, বা মেয়ে কালো বলে সে কোনওরকম দুঃখ করবে না, এমন একটা সমাজই তো চাই।

দানিয়েল কাঁধ ঝাঁকায়, মুখ বাঁকায়, এরকম সমাজ চাই ওরকম সমাজ চাই, তা বললেই তো হয় না। সে সমাজ গড়ার জন্য কিছু করা চাই। কী করেছ তুমি নীলা? কিছু করেছ?

নীলার শান্ত কণ্ঠ, না কিছু করিনি।

পালিয়ে এসেছ এই তো।

হ্যাঁ পালিয়ে এসেছি। সুখে থাকতে এসেছি। যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াতে এসেছি।

মরুনির হাতের সিগারেটটি নিয়ে নীলা ফোঁকে। ধোঁয়ার রিং বানাতে বৃথা চেষ্টা করতে করতে বলে, ফরাসি বিপ্লবের মতো একটা বিপ্লব দরকার ভারতে।

বিপ্লবে তুমি কী অংশ নেবে? বুর্জোয় পরিবারে জন্ম তোমার, সুবিধে ষোলো আনা পাচ্ছ। দানিয়েল চোখ টিপে বলে।

নীলা হাসে, বুর্জোআজি ছাড়া ফরাসি বিপ্লব সম্ভব হত না।

খানিকক্ষণ ফরাসি বিপ্লব নিয়ে নীলা একা বকে গেল। এ নিয়ে কারও কথা বলার, নীলা লক্ষ করে, আগ্রহ নেই।

চৌদ্দই জুলাইয়ে কে কী করছে সে জানতে চায়। কেউ শাঁজ এলিজেতে কুচকাওয়াজ দেখতে যাবে না, মারণাস্ত্রের প্রদর্শনী দেখবে না, শিরাখের কৃত্রিম আর জসপার অকৃত্রিম হাসি দেখতে ওদের কারও উৎসাহ নেই। দানিয়েল আর নাতালি যাবে মিমিজঁ, আতলান্তিকের পারে, রোদ পোহাতে, সাঁতার কাটতে। মরুনি এখনও ঠিক করেনি কোথায় যাবে।

আর নীলা কী করবে? নীলা বসে বসে বেনোয়ার কথা ভাববে, ভাববে যে সে তাকে ভালবাসে, ভাববে যে সে যেখানেই থাকুক, যতদূরেই, নীলা সারাক্ষণ তার হৃদয়ে আছে।

এরকম ঘরে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে না। একটা চাকরি টাকরি করলে ভাল হত। আর বসে খেলে তো রাজার ধনও ফুরিয়ে যায়। নীলা বলে।

তা ফুরোক। হাতে যখন টাকা আছে, যত পারো ঘুরে বেড়াও। যা আনন্দ করার করে নাও। বসে সময় নষ্ট করবে কেন! টাকা ফুরোলে তারপর চাকরি খুঁজো। আমার যদি এত টাকা থাকত, এই চাকরি ছেড়ে দিতাম। বেরিয়ে পড়তাম বিশ্ব ভ্রমণে। ভ্রমণ শেষ করে তারপর সাধারণ জীবনে ফিরতাম। যদি নটা পাঁচটা চাকরি করো, ভ্রমণের সময় এবং খরচা কোনওটাই জোগাড় করতে পারবে না। আর ওই বাক্সবন্দির মতো জায়গায় কাজ করে এত

বড় বাড়িতে থাকা, হা হা স্বপ্ন। দানিয়েলের ঠোঁট বেঁকে থাকে।

নীলার একবার মনে হয় দানিয়েল তাকে ঈর্ষা করছে। আরেকবার নিজেকে শুধরে দেয় সে, না করছে না।

দানিয়েল বলে, কী ব্যাপার, একবারও তো জিজ্ঞেস করলে না সুইডেনে কেমন কাটালাম?

নীলার জিজ্ঞেস করতে হয় না, দানিয়েল নিজেই বলে সুইডেনের উত্তরে ল্যাপল্যান্ডে এবসুলুত পান করতে করতে রাত বারোটায় মাথার ওপর সূর্য দেখতে কেমন লেগেছিল। নিকল বুঝে পায়নি কখন রাত আর কখন দিন। চব্বিশ ঘণ্টাই আলো থাকলে বোঝা অসম্ভব বটে। শীতের সময় যেমন চব্বিশ ঘণ্টা ও জায়গা অন্ধকার, গরমে তার উলটো। যে জিনিসটি দেখে নিকল, মিশেল আর দানিয়েল হেসে বাঁচেনি তা হল, জেব্রা ক্রসিং-এ ভুল করে গাড়ি থামিয়ে ফেলে, রাস্তায় কোনও লোক ছিল না, কিছু না, কারও কোনও ক্ষতি হয়নি, কিন্তু মারিয়ার নিজে গিয়ে পুলিশকে তার ট্রাফিক নিয়ম ভঙ্গের কথা জানিয়ে জরিমানা দিয়ে আসা। যে জিনিসটিতে দানিয়েল মুগ্ধ হয়েছে তা হল সুইডেনে কোনও জেলখানা নেই, যা আছে তা হল ত্রুটি সংশোধন কেন্দ্র অথবা বয়স্ক শিক্ষায়তন। খুন করার পর বিচারে খুনির শাস্তি হলে পুলিশ এসে খুনিকে অনুরোধ করে, ত্রুটি সংশোধন কেন্দ্রে যেতে। খুনি যদি বলে তার সময় হবে না, তবে কবে সময় হবে জিজ্ঞেস করে। যেদিন সময় হয় সেদিন পুলিশ তাকে কেন্দ্রে ভর্তি করে দেয়, কেন্দ্রে দামি আসবাবে ভরা বাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় আত্মীয়স্বজন নিয়ে থাকার, বাদশাহি খানা দেওয়া হয়। এই আয়েসি জীবনযাপনের বাইরে যা করতে হয়, তা হল রুটিন মতো ক্লাস করা। মাস্টাররা আসে নিয়মিত। ক্লাস নেয়। পরীক্ষা নেয়। পাশ করলে ব্যাস ছুটি। কারও ছুটি হয় দশ দিনে কারও তিন মাস লাগে। মাস্টারদের কাজ কেন লোকটি খুন করেছে, তার মনে কী সমস্যা ছিল, কীসের অভাব ছিল তার, তার শৈশব কেমন ছিল, ভালবাসা পরিমাণ মতো পেয়েছে কি না, তার গড়ে ওঠায় কোনও রকম ত্রুটি ছিল কি না এ সব খুঁটিয়ে দেখে বিশ্লেষণ করে, সমস্যার গভীরে গিয়ে সমস্যার সমাধান করা।

সুইডেনের গল্প শুনতে নীলার ইচ্ছে হয় না। এ সব গল্প তাকে মনে করিয়ে দেয় সে ক্ষুদ্র তুচ্ছ একটি মানুষ, যে কোথাও যাবার আমন্ত্রণ পাবার যোগ্য নয়। অহংকার করার একটি গল্পই তার আছে, সে বেনোয়া দুপঁ।

নীলা বলে, একবারও তো তুমি জিজ্ঞেস করলে না আমার প্রেমের কাহিনী!

দানিয়েল আগ্রহ দেখায় না, কিন্তু নীলা বেনোয়া দুপঁর সঙ্গে তার প্রথম দেখা, কাছে আসা, ভালবাসা, বেনোয়ার আলা ফলি প্রেম, বেনোয়ার বেনো জলে তার ভেসে যাওয়া ইত্যাদি বর্ণনা করে। দানিয়েলের প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য এ তার বলতে হয় যে বেনোয়ার স্ত্রী কন্যা আছে।

শেষ অব্দি বেনোয়ার রক্ষিতা হয়ে জীবন কাটাতে শুরু করেছ! বাহ বাহ বাহ! অভিনন্দন। দানিয়েল জোরে তালি বাজায়।

নীলা দাঁতে দাঁতে চাপে, এত জোরে তালি বাজিয়ো না। প্রতিবেশীদের ঘুমের অসুবিধে হবে। উফ মাদাম সুজান দুগের আজ রাতে বুঝি ঘুম হল না।

ঠিক তখনই বেনোয়ার ফোন।
কী করছ?
আড্ডা দিচ্ছি, দুজন বন্ধুর সঙ্গে।
বন্ধু? ছেলে না মেয়ে?
মেয়ে।
সমকামী।
একজন। আরেকজন নয়।
তো কতক্ষণ আড্ডা দেবে?
জানি না।
ওরা যাবে তো? না কি থেকে যাবে তোমার বাড়ি?
জানি না।
নিশ্চয় জানো।
না জানি না।
আমার কথা জানে ওরা?
কেন?
বলো। বলো যে তোমার একজন প্রেমিক আছে।
কেন?
কেন নয়? লুকোতে চাও। আমি তো লুকোই না।
লুকোও না? কাকে কাকে বলেছ, আমার কথা?
বলেছি অনেককে।
কী বলেছ, বলেছ তোমার এক রক্ষিতা আছে, তাই না?
বাজে কথা বোলো না নীলা।
বাজে কথা নয়। সত্যি কথা।
খটাস।

আড্ডা গড়াতে গড়াতে আরও দূর যায়। নীলার মিমিজাঁ যাবার শখ হয়। মরুনিরও হয়। দল বেঁধে না হোক তিজেভি ঘন ঘন যাচ্ছে বোরদো, চড়ে বসলেই হয় আজ বা কাল, দেখা হবে সাগরপারে।

রাত দুটোয় দানিয়েল বেরোয়। মরুনি আরও কয়েক গেলাস শেষ করে তিনটেয় ওঠে।

এত রাতে যাচ্ছ যে, তোমার ভয় লাগবে না রাস্তায়?

মরুনি আকাশ থেকে পড়ে, ভয় লাগবে কেন?

নীলা নিজেকে আবার শুধরে দেয়, এ কলকাতা নয় নীলা, এ প্যারিস।

কোনও এক সম্ভবত প্রতিমা পাল অথবা সরস্বতী দাসের মেয়ে মরুনির জন্য নীলা লক্ষ করে, অযথাই মায়া হচ্ছে তার। মরুনিকে চন্দনকাঠের একটি হাতি উপহার দিয়ে বলে, এর সুগন্ধ কোনও দিন যাবে না। কাছে রেখো।

মরুনি ধন্যবাদ বলে, চুমু খায় নীলার দু গালে। তারপর আলো থেকে আলোয় বেরিয়ে

যায়। নীলা একা অন্ধকার বারান্দায় বসে চেয়ারে দুলতে দুলতে কল্পনা করে মরুনি ওই হাতিটির সুগন্ধ নিচ্ছে, ওই হাতিটিকে সে তার বিছানার কাছের টেবিলটিতে রাখবে, হাতিটি দেখতে দেখতে তার হয়তো একদিন মনে হবে কোথাও একটি দেশ আছে তার, সে দেশে এক দুঃখিতা গোপনে কাঁদছে তার হারিয়ে যাওয়া মেয়ের জন্য। সারাজীবন কেঁদে যাবে সেই দুঃখিতা। মরে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও কাঁদবে সে।

মরে গেলে কেউ কি কাঁদে, নীলা ভাবে। মলিনা কি কোথাও বসে চোখের জল ফেলছেন নীলার জন্য!

চৌদ্দই জুলাই

চৌদ্দই জুলাইয়ের উৎসব শুরু হয়ে গেছে প্যারিসে। ফরাসি বিপ্লব নীলাকে উত্তেজিত করে ভীষণ, ফরাসিদের যে খুব একটা করছে তা মনে হচ্ছে না তার। বেনোয়া বলে ফরাসি বিপ্লব পালন করা মনে হয় সেই দিনটিকে পালন করা যেদিন আমার টাইফয়েড জ্বর হয়েছিল। বেনোয়া প্যারিস ছেড়ে রোদ পোহাতে চলে গেছে রিভিয়েরায়। ফরাসি বিপ্লবকে বিপ্লব বলেই মানে না সে, বলে খুনোখুনি। শাঁ জার্মা দি প্রের গির্জা দেখিয়ে একদিন বলেছিল, এখানে ওই খুনোখুনির সময় গির্জার কত লোকদের নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে! নীলা বলেছে, বেশ ভালই করেছে। গির্জার লোকেরা তো সুবিধে ভোগ করত সবচেয়ে বেশি। রাষ্ট্র আর গির্জাকে আলাদা করে বিপ্লবীরা মহৎ একটি কাজ করেছে। ওই ধর্মবাদীদের খুন না করলে বিপ্লব টিকে থাকত না। বেনোয়া বিড়বিড় করে, একদিকে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা হল, অন্যদিকে গির্জার সম্পত্তির ওপর মানুষের অধিকার কেড়ে নেওয়া হল, বৃক্ষ কেটে বন উৎপাদনের মতো।

নীলা শাঁ জার্মার কোলাহলে দৃষ্টি ছড়িয়ে বলেছে, অবশ্য রাজা খেদিয়ে পরে আবার রাজা মেনে নেওয়াটা আমার কাছে একটু কেমন কেমন যেন লাগে। নেপোলিয়নও তো বেশ বিপ্লবীর মতো উড়ে এসে জুড়ে বসে সেই রাজাগিরিই শুরু করেছিলেন। আর বিপ্লবী ফরাসিরাও তা মেনে নিয়েছিল।

নেবার অবশ্য কারণ আছে। আর...গির্জার সবাই তো আর বিপ্লবের বিপক্ষে ছিল না। পক্ষেও ছিল অনেকে। বেনোয়ার চোখ তখনও ফিরে ফিরে দি প্রের গির্জায়।

নীলা বেনোয়ার কথার পেছনে কথা বলেই যাচ্ছিল পাশে বসে, পক্ষে ছিল কারণ ছোট জাতের ছিল তো। বড় জাতের মার খেয়ে ছোট জাত শত্রু দলে ভেড়ে।

তুমি তো গির্জা দেখে বেড়াও, তো গির্জার বিরুদ্ধে কেন বলো। বেনোয়া কঠিন স্বরে প্রশ্ন করেছে। কঠিনের উত্তর নীলা নরম করে দিয়েছে, প্যারিসের চব্বিশটি নতরদাম দেখা হয়ে গেছে। দেখেছি এ সবের স্থাপত্যসৌন্দর্য, আর কিছু নয়।

আচ্ছা তুমি কি সত্যিই বলতে চাও যে তুমি ধর্মে বিশ্বাস করো না? সে দিনও বেনোয়া জিজ্ঞেস করেছে। নীলা বলেছে, আমি ইগালিতে, লিবার্তে আর ফ্র্যাতারনিতেয় বিশ্বাস করি।

তুমি খুব প্রশ্ন এড়িয়ে যাও, নীলা।

বেনোয়ার অভিযোগের কোনও উত্তর নীলা দেয়নি।

নিস থেকে বেনোয়া ফোনে খবর নেয় নীলার, নীলা কেমন আছে, কী করছে, কী ভাবছে। বেনোয়া বলে সে তীরের বালুতে তোয়ালে পেতে শুয়ে আছে, চোখে রোদ চশমা, পাশে পাসকালও শুয়ে আছে, এল ম্যাগাজিন পড়ছে, ওর নিম্নাঙ্গে এক টুকরো কাপড় শুধু, বাকিটা

খোলা। পাসকালের গায়ে সে সানটান মেখে দিয়েছে খানিক আগে। জ্যাকলিন বালুতে খেলছে। একফোঁটা মেঘ নেই আকাশে, পরিষ্কার নীল আকাশ। আকাশ দেখতে দেখতে বেনোয়ার নীলাকে মনে পড়ছে।

কদিন থেকে সামুদ্রিক মাছই খাচ্ছে বেনোয়া।

কাল মণ্টে কারলো যাবে।

পরশু মনাকো।

বেনোয়ার কণ্ঠে সুখ ফেনিয়ে উঠছে।

নীলার ইচ্ছে করে না বেনোয়ার সুখের গল্প শুনতে। তার ভয় হয় বেনোয়া হয়তো নিখুঁত বর্ণনা করে বসবে জ্যোৎস্নারাতে পাসকালের সঙ্গে সে কী করে ভালবাসা ভালবাসা খেলেছে অর্ধেক জলে অর্ধেক বালুতে। একবার সে বলেওছিল তাকে যে, গরমকালে ঘরে সম্ভোগে মজা নেই, মজা বনে, সমুদ্রপারে। চাঁদের আলোয় পাসকালকে নিশ্চয় অপ্সরীর মতো লেগেছে, আর বেনোয়া তার নোনা জলের ঢেউয়ের সঙ্গে নেচেছে।

ভয়ে অথবা শোধ নিতে, নীলার বিশ্বাস শোধ নিতেই, সে বাড়ি থেকে বেরোয়, মিমিজঁ অনেকটা ঘোরের মধ্যে পৌঁছে। পথে অতলান্তিকের চেয়ে ভূমধ্যসাগরই ঢেউ তুলেছে বেশি। এভিন্যু দু ল্যাকে একটি হোটেল নিয়ে সারা দুপুর সে শুয়ে থাকে। রোদ খানিকটা নরম হলে বেরোয় সমুদ্রপারের দিকে। উচ্ছল উদ্দাম উলঙ্গ নারী পুরুষের ভিড় চারদিকে, দীর্ঘ বালুতীরে সাদা শরীরের মেলা। নীলা একা বোধ করে। কেউ তার দিকে ফিরে তাকায় না, যদি তাকায় কেউ, নীলা বেমানান বলে তাকায়। সমুদ্রপারে শরীর ভরে কাপড়চোপড় পরে গরমকালে কেউ আসে না। গাছের ছায়ার বেমানান নীলা একা বসে থাকে। নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয় নিজেব কাছেই। বেনোয়া অন্তত আকাশের দিকে তাকিয়ে নীলার কথা ভাবে। কোথাও তো আর কেউ নেই তাকে ভাবার। যে ভাবে, সে যদি আরেকটি শরীরে বুঁদ হয়, হোক। নীলা ঠকে যায়, এর নাম শোধ নেওয়া নয়, শোধ নেওয়া হতে পারত সে যদি কোনও সুদর্শন পুরুষকে সঙ্গী করে মিমিজঁ আসত, একা নয়, সে যদি জ্যোৎস্নারাতে সেই পুরুষকে বলতে পারত জ তেম, যদি সে নোনা জলে আর সাদা বালুতে মিশে ভালবাসার গোপন খেলা খেলতে পারত। বেনোয়া ছাড়া আর কোনও পুরুষকে তার গভীর নিকটে কল্পনা করতে চেষ্টা করে, ভেবে তার গা গুলিয়ে ওঠে অন্য এক পুরুষকে সে জ তেম বলছে।

নীলা ফিরে যায় হোটেলের ঘরে। একা জানালায় বসে সমুদ্রের নীলের সঙ্গে আকাশের নীলের সঙ্গম দেখে।

সন্ধেয় মরুনির সঙ্গে কথা হয় নীলার। বন্ধু নিয়ে গতকাল মিমিজঁ পৌঁছেছে সে।

দানিয়েলের সঙ্গে মরুনির কথা হয়েছে, দানিয়েল আর নাতালি গানের উৎসবে গেছে।

তুমি কি সেখানে যেতে চাও?

ঠিক জানি না।

কী করবে তা হলে?

ঠিক জানি না।

হোটেলে বসে থাকতে মিমিজঁ এসেছ।

ঠিক জানি না।

মরুনি হেসে ওঠে। কী ভাষায় হাসে মরুনি, নীলা ভাবে। হাসি বা কান্নার কোনও ভাষা আছে কি।

নীলা বেজোড়, জোড়দের আনন্দক্ষণে বেজোড় আস্ত আপদ ছাড়া কিছু নয়।

আপদটিকে মরুনি উপেক্ষা করে না। সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে বেরোয় সাগরপারে। সাগর জলে ঢেউয়ের উৎসব, পারে উৎসবের ঢেউ। হাঁটতে হাঁটতে রক্ত আর গৌরবের উৎসবে নীলার গতি শ্লথ হয়। মরুনি দ্রুত হাঁটে। বোহা রেকর্ডসের সিডি বিক্রি হচ্ছে মঞ্চের কাছ থেকে।

জিনস, বুট, বোম্বার জ্যাকেটের টাটুঅলা, ন্যাড়ামাথা ছেলের দলের উদ্দাম উৎসবে অভিভূত চোখ নীলার। বড় ব্যানারে ওআই, স্কা, ছোটতে স্কিন্স, কিডন্যাপ, তলবিয়াক টোডস, ওয়ারিওর কিডস, কমিটারন সেক্ট, দ্য হেরবেরটস। আর ছোটবড় ব্যানারের মধ্যিখানে নীলা। সমুদ্রের গর্জন ছাপিয়ে উঠছে ন্যাড়াদের গর্জন, ল ভলনত দ্য লা নেশন এরিয়েন। নীলা দু হাতে কান চেপে মরুনির দিকে এগোতে থাকে, তখনই রেনজারস্কিনের ধাক্কা, ডক মারটেনের মুহুর্মুহু লাথি নীলার পিঠে, উপুড় হয়ে পড়ে নীলা, পড়ে ফ্যানজাইনে। মরুনি দৌড়ে নীলাকে তুলতে আসে যেই, সেও পড়ে উপুড় হয়ে। কটি গোলাপি আর সবুজচুলো পাংক ভিড় ঠেলে নীলা আর মরুনিকে ওঠায়, নীলার গালে সেঁটে থাকে ফরাসি চুমুর মতো ফ্যানজাইনের গৌরব আর মরুনির দু হাতে রক্ত।

এই বুঝি লিবার্তে ইগালিতের উৎসব! একটি গোলাপি পাংক চেঁচিয়ে বলে।

সবুজ পাংক মরুনিকে পাঁজাকোলা তুলে দৌড়ে যায় রাস্তার দিকে। পেছন পেছন বাকিরা।

ওদিকে গোলাপি পাংক রাইট রাইট করে চেঁচাচ্ছিল। পরিষ্কার ইংরেজিতে গোলাপিকে উত্তর দেয় এক দশাসই ন্যাড়া, দে হ্যাভ দ্য গড গিভন রাইট টু বিলিভ হোয়াটএভার দে ওয়ান্ট, বাট আই হ্যাভ দ্য গড গিভন রাইট টু কিক দেয়ার অ্যাস।

মরুনি যখন অপারেশন থিয়েটারে, হাসপাতালে নীলাব বিছানার পাশে বসে নাতালি, দানিয়েল আর ফ্রেডেরিক—মরুনির প্রেমিক বর্ণনা করে যায় ন্যাড়াদের দৌরাত্ম্য। নাতালি কদিন আগেই নাকি দেখেছে এক ন্যাড়াকে সেইনের জলে ধাক্কা দিয়ে এক মরক্কান ছেলেকে ফেলতে। ফ্রেডেরিক দেখে এসেছে বোহা রেকর্ডস-এব দুই ন্যাড়া পুলিশকে ধমকে বসিয়ে দিচ্ছে। এদিকে নীলার বোকামো দেখে বোকা বনে যাচ্ছে দানিয়েল, ন্যাড়াদের ভিড়ে মরতে যেতে নীলাকে কে বলেছিল।

নীলা শোনে।

নীলার চৌদ্দই জুলাই কাটে।

এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে

সমুদ্রস্নান সেরে ফিরে বেনোয়া নীলাকে নিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। ভেরসাই বাগানের হাওয়া বেশ সুস্বাদু হাওয়া। লা নত্রের বানানো দু হাজার একর জমির ওপর অসম্ভব সুন্দর বাগানটিতে হাঁটতে হাঁটতে ফোয়ারার জলে আধেক ভিজে গ্র্যান্ড ক্যানেলের পাশে বসে দুজন, সূর্যরাজার প্রাসাদের দিকে মুখ করে।

যাবে দেখতে প্রাসাদ? সূর্যরাজার শোবার ঘর, রানি মারি তেরেসের ঘর?

নীলা সবুজ ঘাস ছিড়ে দাঁতে কাটতে কাটতে বলে, রাজা রানির শোবার ঘর আলাদা ছিল কেন!

বেনোয়া বলে এত বড় প্রাসাদ। ঠেলাঠেলি করে থাকার কী দরকার!

ঘাসের একটি ডগা বেনোয়ার ঠোঁটে ছুঁইয়ে নীলা বলে নাকি তিন তিনটে রক্ষিতা নিয়ে তোমাদের লুইয়ের সময় কাটত বলে।

নীলাকে চুমু খেয়ে বেনোয়া বলে, আমাদের লুই তাঁর রক্ষিতাকে বিয়েও করেছিলেন।

নীলা ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে মুখ করে বলে, বিয়ে করে সেই বউয়ের শোবার ঘরও আলাদা করে দিয়েছিলেন।

বাদ দাও। যাবে নাকি প্রাসাদের ভেতর? বেনোয়া তাড়া দেয়।

নীলা তেমন শুয়ে থেকেই বলে, বাদ দাও, ওসব ঝকঝকে তকতকে প্রাচুর্য দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে।

কেন শিউরে ওঠে?

নিজেকে এক দরিদ্র দীন হীন প্রজার মতো মনে হয়। মনে হয় রাজাদের চাবুকের মার খাচ্ছি। অকারণে।

বেনোয়া দু হাতের কনুইয়ে ভর রেখে পেছনে গা হেলিয়ে বলে, চলো যাই ভেরসাই চুক্তির আয়নাঘরটা অন্তত তোমাকে দেখিয়ে আনি।

নীলা বেনোয়ার বাঁ হাতটি হাতে নিয়ে আঙুলগুলো নিজের গালে ছোঁয়ায়। গালে বেনোয়ার তর্জনীর সোনার অঙ্গুরির স্পর্শ, বেনোয়ার সঙ্গে পাসকালের বন্ধনের স্পর্শ।

ওই আয়নাঘর দেখে কী লাভ? ভেরসাই চুক্তি তো কোনও শান্তি আনেনি, বরং আরেকটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে।

বেনোয়া উঠে বসে, উলটোপালটা না বকে বলো, এখান থেকে উঠতে ইচ্ছে করছে না।

হাওয়ায় নীলার চুল ওড়ে। চুলে বুক ঢেকে যায়, মুখ ঢেকে যায়। উঠে হাতখোঁপা করে বলে যে সে ওই প্রাসাদে যাবে না, যাবে বারো নম্বর রু দ্য শাতিয়ে তে।

ওখানে কী আছে?

ওখানে প্রাসাদ নয়, ভাঙা একটি বাড়ি আছে। সে বাড়িতে এককালে এক কবি থাকতেন।

খুব বড় কবি।

কী নাম সেই কবির?

মধুসূদন দত্ত।

বেনোয়া বলে, এ আবার কী অদ্ভুত নাম? এ তো ফরাসি নাম নয়।

অসকার ওয়াইল্ডও তো ফরাসি নাম নয়। গারট্রুড স্টাইনও নয়, হেনরিক ইবসেনও নয়। এই নামগুলো কি অদ্ভুত লাগে তোমার কাছে? নিজেই উত্তর দেয় সে লাগে না।

মধুসূদন দত্ত বাঙালি ছিলেন। নীলা বলে।

ও সে কথা বলো। বাঙালি!

বেনোয়া শ্বাস ফেলে বড় নিশ্চিন্তে, বাঙালি কবির নাম না জানা আর আমাজান জঙ্গলের কোনও ক্ষুদ্র কীটের নাম না জানা একই কথা, কিছু যায় আসে না।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদনের নাম জানবে কেন? ভারতের কারও নাম যদি জানো, জানবে সাঁইবাবার নাম, দীপক চোপড়ার নাম, স্বামী প্রভুপাদের নাম। যতসব প্রতারকের নাম।

বেনোয়া মধুসূদন সম্পর্কে জানার আগ্রহ না দেখালেও নীলা বলে যায় মধুসূদন কে ছিলেন, নীলা নিজেকেই শোনায় মধুসূদনের গল্প। মধুসূদন জমিদারপুত্র ছিলেন। খুব অল্প বয়স থেকেই ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির প্রতি অন্ধ মোহ ছিল ওঁর। নিজের পোশাক ছেড়ে ইয়োরোপীয় পোশাক পরতেন। বাংলা ছেড়ে ইংরেজিতে কবিতা লিখতে শুরু করলেন এক সময়। হিন্দুধর্ম ছেড়ে ক্রিশ্চান হয়েছিলেন। নিজের সংস্কৃতিকে এমনই ঘৃণা করতেন যে বলেছিলেন, ঈশ্বর অ্যাংলো স্যাক্সনকে জগতে পাঠিয়েছেন হিন্দুদের উদ্ধার করতে, সভ্য করতে, এক কথায় ক্রিশ্চান করতে। মাদ্রাজে থাকাকালীন ফরাসি মেয়ে হেনরিয়েটার প্রেমে পড়ে ওঁকে বিয়েও করলেন। জাত কুল সব গেল, বাবা তাড়িয়ে দিলেন বাড়ি থেকে। ইংল্যান্ডে এসে ব্যারিস্টারি পাশ করেছেন। চরম অভাবে অনাহারে দিন কাটাতেন এখানে, এই ভেরসাইয়ে, কলকাতা থেকে বন্ধুরা টাকাপয়সা পাঠিয়ে মধুসূদনকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। এ দেশে এসে তিনি প্রথম দিকে বেশ আনন্দে ছিলেন কারণ ফরাসিরা তাঁকে ড্যাম নিগার বলে অন্তত গাল দেয় না, ইংরেজরা যেমন দেয়, বরং ফরাসি সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞীকে কুর্নিশ করলে পালটা কুর্নিশ পাওয়া যায়, বলতেন। ইওরোপীয় ভাষায় সাহিত্য রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করবেন যে স্বপ্ন ছিল তাঁর, কাটে। মোহ কেটে যায়। অতীতে ফেরেন, সাগরদাঁড়িতে তাঁর শৈশবের নদ কপোতাক্ষের কথা মনে পড়ে তাঁর,

> সতত যেমতি লোক নিশার স্বপনে
> শোনে মায়া মন্ত্রধ্বনি তব কলকলে
> জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!
> বহু দেশে দেখিয়াছি বহু নদ-দলে,
> কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
> দুগ্ধ স্রোতরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে!...
> এ প্রবাসে মজি প্রেম-ভাবে
> লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে!

কেবল নদ নয়, মনে পড়ে ফেলে আসা নদীতীরের বটবৃক্ষ, ভাঙা শিবমন্দির, বউ কথা কও পাখি, অন্নপূর্ণার ঝাঁপি, রামায়ণ, মহাভারত, গৌরবজ্জ্বল প্রাচীন ভারত।...ভেরসাইয়ে থাকাকালীন ইতালিয়ান কবি পেত্রার্কার সনেটের অনুকরণে কিছু সনেট লিখেছিলেন। পেত্রার্কার সঙ্গে মধুসূদনের বেশ মিল ছিল বলতে হবে। পেত্রার্কার বাবা ছিলেন আইনজীবী, পেত্রার্কাকে আইন পড়িয়েছিলেন, কিন্তু সব ছেড়ে ছুড়ে পেত্রার্ক ডুব দিয়েছিলেন ধ্রুপদী ভাষা ও সাহিত্যের বিশাল সমুদ্রে। মধুসূদনও তেমন। অবশ্য পার্থক্য যা ছিল, তা হল, পেত্রার্কা যেমন তাঁর প্রেমিকা লরাকে নিয়েই সনেট লিখতেন, মধুসূদন তা মোটেও করেননি। বোদলেয়ারের সঙ্গেও কিছুটা মেলে, বোহেমিয়ান ছিলেন, ভোগ বিলাসের নেশা ছিল, ধার করে মদ খেতেন। ভেরসাই থেকে তিনি কলকাতা ফিরে যান, ভাগ্যিস ফিরে গিয়েছিলেন, না ফিরলে বাংলা সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করত কে! মধুসূদনের ভুল স্বপ্ন কেটেছিল বলেই বাংলা সাহিত্য আজ সমৃদ্ধ তাঁর চতুর্দশপদী কাব্যে, মেঘনাদ বধ কাব্যে। হিন্দু পৌরাণিক কাহিনীকে তিনি নতুন করে গড়েছেন, দৈবশক্তির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রামের জয়গান গেয়েছেন। নীলা বারো নম্বর রু দ্য শাঁতিয়ের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পাথরের ফলকটি দেখে

LE POETE INDIEN

MICHAEL MADHUSUDAN DATTA
(1824-1873)

A DEMEURE DANS CATTE MAISON
DE 1863 A 1865
ET Y A COMPOSE EN BENGALI
DES SONNETS ET DES FABLES

বাড়িটির সামনে উবু হয়ে ধুলো নিয়ে কপালে ছোঁয়ায়। দেখে হেসে ওঠে বেনোয়া, এ কী করছ?

মধুসূদনকে কুর্নিশ করলাম।

মধুসূদনকে কুর্নিশ করলে না কি ফ্রান্সের মাটি কপালে ছোঁয়ালে?

এ মাটিতে মধুসূদন একদিন হেঁটেছিলেন, সে কারণেই করা। নীলা শাতিয়ের রাস্তায় উদাস হাঁটতে হাঁটতে বলে।

সে মাটির ওপর কত মাটি পড়েছে। কত লুই কত ফিলিপ, কত ভালেরি কত,

বেনোয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে নীলা বলে, কত বেনোয়া, কত পাসকাল, কত জ্যাকলিন...

প্রসঙ্গে পালটে বলে, তা কেমন কাটালে সমুদ্রপারে?

বেনোয়া উত্তর দেয় না।

গাড়িতে উঠে বেনোয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে, তুমি খুব বদলে গেছ নীলা।
কী করে বুঝলে। নীলা বলে।
সবসময় আমার হাত ধরে হাঁটতে, আজ হাতই ধরোনি।
বেনোয়ার অভিযোগ সে খণ্ডায়, মনে করিয়ে দেয় সে প্রাসাদের বাগানে বসে তার হাত নিয়েছে হাতে, সুন্দর সাদা আঙুলে সোনার অঙ্গুরিটি চমৎকার মানিয়েছে, দেখেছে।
নীলা তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ! বেনোয়া ক্ষীণ স্বরে বলে।
আমি দুর্বল, দীন, হীন, ক্ষীণ, তোমাকে বোকা বানাবার সাধ্য আমার হবে কেন!

প্যারিসে ফিরতে ফিরতে নীলা ভাবে, বেনোয়া চৌদ্দই জুলাইয়ের ঘটনার কথা রিভিয়েরা থেকে ফেরার পর আর তুলছে না। যদিও বলেছিল প্যারিস ফিরে এসে সে এ নিয়ে কথা বলবে। প্রথম রাতেই ঘটনা জানিয়েছিল নীলা, বিস্তারিত শোনার পর বেনোয়ার প্রথম প্রশ্ন ছিল, কেন তুমি মিমিজাঁ গেছ?

নীলা বলেছে সে মিমিজাঁ গেছে, কারণ তার ইচ্ছে হয়েছিল। বেনোয়া অবাক হয়েছে নীলার অদ্ভুত ইচ্ছের কথা শুনে, একা একা সমুদ্রপারে কারও কি ইচ্ছে করে যেতে, বেনোয়া কি রিভিয়েরা একা যেত, যদি না বউ বাচ্চা না থাকত সঙ্গে! যেতে পারত নীলাকে নিয়ে, একা নয়। ওসব জায়গায় সঙ্গী ছাড়া যাওয়ার কোনও মানে হয় না।

অপেক্ষা করতে পারতে। আমি তোমাকে নিয়ে যেতাম মিমিজাঁ। হঠাৎ হঠাৎ কী যে সব কাণ্ড ঘটাও তুমি নীলা।

নীলা নিজের চেয়ে মরুনির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বেশি। বেনোয়া বলেছে, মরুনিটা আবার কে? এর নাম তো তোমার মুখে আগে শুনিনি!

তারপর মরুনির সঙ্গে কী করে পরিচয় হল, কোথায় হল ইত্যাদি খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছে।

শেষে অবশ্য সান্ত্বনা দিয়েছে, ভিড়ের মধ্যে এ সব হই হট্টগোলে পড়লে কত রকম দুর্ঘটনা ঘটে। এই এখানেই তো জ্যাকলিনের বয়সি একটা বাচ্চা হারিয়ে গেল সেদিন বিকেলে। ঘণ্টা চারেক পর বাচ্চাটির খোঁজ পাওয়া গেছে। ছিল একটি ক্যান্ডির দোকানে।

নীলা যখন তার লাথি খাওয়া আর মরুনির পেটে ছুরি খাওয়ার সঙ্গে বাচ্চা হারিয়ে যাওয়ার দুর্ঘটনা এক নয় বোলে বলে এবং স্পষ্ট করে বলে, ওরা বর্ণবাদী ছিল, বেনোয়া ঠিক নিশ্চিত হতে পারেনি। বলেছে, মোটা বুটের কথা বলছ তো! ও সব কিন্তু সমকামীরাও পরে।

আর যদি বর্ণবাদী ওরা হয়েই থাকে, তবে খুব ছোট দল এরা। গান বাজনা করে, বুদ্ধি শুদ্ধি এখনও হয়নি, ভাল শিক্ষা পায়নি, অথবা শৈশবে এদের অভিভাবক এদের মন মানসিকতা সুস্থ করে গড়ে তোলার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেননি, এ সব নানা কারণ দেখিয়েছে। নীলা বেনোয়ার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ মন দিয়ে শুনেছে, শুনেছে কারণ সে বেনোয়া, তার প্রেমিক, সুদর্শন, সুপুরুষ, একোল নরমাল-এর ছাত্র, বিজ্ঞানী, হাই টেক, হাই ফাই, সাদা। আর বেশি কী গুণ থাকতে পারে একজন মানুষের!

ওই ঘটনার আর নতুন কোনও ব্যাখ্যা নীলা এখন শুনতেও চায় না। ফুটো পেট সেলাই

হবার পর মরুনির পাশে সারারাত জেগে বসেছিল নীলা, নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য ক্ষমা চেয়েছে। মরুনি হেসে বলেছে, ক্ষমা চাচ্ছ কেন, ও কি তোমার দোষ ছিল, তুমি কি জানতে ওখানে কারা কী করছে? আমার বরং দূর থেকে অনুমান করা উচিত ছিল। সমুদ্রের হাওয়া খেতে এসেছিলাম কি এত সতর্ক থাকার জন্য! যাক, ভাল যে বেঁচে গেছি।

নীলাও বেঁচেছে, নীলারও তো হাড়গোড় ভাঙতে পারত, বুটের চাপে ফুসফুস ফেটে যেতে পারত, হৃৎপিণ্ড ফুটো হতে পারত। হয়নি। দানিয়েল এক্সরের কাগজ হাতে নিয়ে সুখবর সুখবর বলে চেঁচিয়েছিল। সুখবরই বটে।

নীলার হাতের ওপর কালো কোমল হাত রেখে মরুনি বলেছে, যে এক মাসের বাচ্চা আবর্জনার স্তূপে চাপা পড়ে মরেনি, সে কেন সুস্থ সবল হবার পর আপেল কাটার সামান্য ছুরির আঘাতে মরবে?

ফ্রেডেরিক মরুনিকে নিয়ে পরদিন প্যারিসে রওনা হয়ে যাবার পর নীলার আর থাকতে ইচ্ছে করেনি, সেও মিমিজঁ থেকে প্যারিসে ফিরেছে, দানিয়েল আর নাতালি অবশ্য আরও দুদিন কাটিয়ে তবে ফিরেছে।

প্যারিসে ফেরার পর রিভিয়েরা থেকে প্রতিদিনই বেনোয়া নীলাকে ফোনে জ তেম বলেছে। প্যারিসের আবহাওয়ার খবর নিয়েছে, নীলা কী খেয়েছে, কী পরে আছে, বেনোয়াকে মনে পড়েছে কি না, ওকে ভালবাসে কি না এ সব জিজ্ঞেস করেছে। নীলা বলেছিল ওই ঘটনার কথা সে ভুলতে পারছে না, রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে দেখে বুক ধড়ফড় করছে, গা ঘামছে। বেনোয়া তখন বলেছিল, ও প্যারিস ফিরে এ নিয়ে কথা বলবে।

পথে গাড়ি থামিয়ে যখন ক্যাফেতে বসল, নীলা ভেবেছিল, বুঝি অতলান্তিকের পাড়ে ঘটে যাওয়া ঘটনা বা দুর্ঘটনার কথা পাড়বে বেনোয়া। এখনও নীলার হাঁটুর কাছে ফুলে আছে, পিঠে নীল দাগ পড়ে আছে, কাঁধ নাড়লে এখনও টনটন করে, এ সব কথা নীলারও বলা বাকি রয়ে গেছে। কফি খেতে খেতে বেনোয়া মনাকোর গল্প করে। মনাকোতে যারা আছে সুখে আছে। কর দিতে হয় না। যা উপার্জন করো, তা ভোগ করো। ফরাসি সরকারকে উপার্জনের তিরিশ পঁয়ত্রিশ ভাগ দিয়ে থুয়ে থাকে কী! মনাকোতে থাকলে টাকাটা বাঁচত। কফি খেয়ে শহরে দু চার পাক ঘুরে পঁ নফের কাছাকাছি গাড়ি রেখে হেঁটে যায় দুজন, হাঁটতে হাঁটতে নতরদাম সেতুতে, সামনের যে সেতুর ওপর দাঁড়ালে নতরদাম দ্য পারির আগপাশতলা দেখা যায়, সেখানেই দাঁড়ায় নীলা সেইনের জল দেখব বলে, সেইন দেখলে যা হয় ওর, জলে জনদার্কের ছাই ভাসতে দেখে, এত বছর আগের ছাই, ভেসে গেছে কোথায়, তবু তার মনে হয় সেইন জানে, সেইনের প্রতি বিন্দু জল জানে, কোনও একদিন সাহসী এক কিশোরীর গা পোড়ানো ছাই এসে পড়েছিল এই জলের শরীরে, আসলে ছাই তো দেখে না, গোটা জনদার্ককেই দেখে জলে, সেইনের আর গঙ্গার জলে কোনও কি তফাত আছে, প্রশ্নটি হঠাৎই একটি পালকের মতো যেন উড়ে এল, গঙ্গার জলও তো দেখতে এমন, ঘোলা, জগতের সব জলই আসলে এক, এরকম একটি উত্তর মতো ভাবতে ভাবতে সেতুর রেলিং থেকে সরে আসে নীলা, জল থেকে চোখ সরে এসেছে, জনদার্ক থেকেও, চোখ তখন পাথরের সেতুতে, মন তখন গঙ্গায়, নাহ! গঙ্গা অন্যরকম, গঙ্গার জল বাঁধনছেঁড়া, আর সেইন যেন একোয়রিয়াম, সেইনের সঙ্গে জীবনযাপন হয় না, যা হয় গঙ্গার

সঙ্গে, জগতের সব জল এক নয়। গঙ্গার জল ছাপিয়ে মন তখন নয়েল ক্যাথারিনে। ক্যাথারিন গ্র্যান্ডও এখানে, ঠিক যেখানে নীলা দাঁড়িয়েছিল কোনও একদিন। নীলার মতো ক্যাথারিনও ছিল কলকাতার মেয়ে, চন্দননগরের ফরাসি বড়কর্তার অসাধারণ রূপসি কন্যা, মর্তের মানবী নয়, স্বর্গের অপ্সরা, কলকাতার ইংরেজ ফরাসি যুবকদের নিদ্রা হরণ করা ক্যাথারিন। সেই অপ্সরার বিয়ে হয়ে গেল বেশি বয়সের এক ইংরেজ অফিসার ফ্রান্সিস গ্র্যান্ডের সঙ্গে, চন্দননগরের গির্জায়। ফরাসি বিপ্লব তখনও শুরু হয়নি। ক্যাথারিনের প্রেমে উতলা ফরাসি যুবক ফিলিপ রাতের অন্ধকারে পাঁচিল টপকে গিয়েছিল ক্যাথারিনের শোবার ঘরে, জানাজানি হয়ে গেল ফিলিপের কীর্তি, ফ্রান্সিস মামলা করে ফিলিপকে পঞ্চাশহাজার সিক্কা টাকা জরিমানা দেওয়াল, ঢি ঢি পড়ে গেল চন্দননগরে, কলকাতায়, ক্যাথারিনকে হতে হল তার ফরাসি প্রেমিক ফিলিপের রক্ষিতা। হায় ক্যাথারিন। অপ্সরার কপালে রক্ষিতা হওয়াই ছিল! এক পুরুষের হাত থেকে আরেক পুরুষে চালান হল বেচারি, কলকাতা থেকে লন্ডন এসেও, প্যারিস এসেও রক্ষিতার ভাগ্য বদলায়নি। নীলার বয়সেই প্যারিসে এসেছিল সে আর হোটেল দ্য ভিল থেকে হাঁটতে হাঁটতে একদিন এই সেতুতে, সেতুটি তখন কাঠের, সেতুর ওপর কত কিসিমের লোক বসে থাকত, ফেরিঅলা, ভিখিরি, মদ্যপ...ক্যাথারিনের জামা ধরে টেনেছিল এক দুষ্ট লোক, আর আরও কিছু দুষ্ট লোক তা দেখে হা হা হেসেছিল। ক্যাথারিনের অস্তিত্ব নীলা অনুভব করে নিজের ভেতর, যদিও দুজন দেখতে এক নয়, ক্যাথারিন ছিল গোরা, ক্যাথারিনের ছিল সোনালি চুল, নীল চোখ, নীলার রং বাদামি, কালো চুল, কালো চোখ, কালো মখমল চোখ! হাত থেকে হাতে গড়িয়ে, শেষে ক্যাথারিন গড়িয়ে পড়ল তালেরঁর কোলে। মসিয়েঁ তালেরঁর রক্ষিতা হয়ে। তালেরঁ তখন পররাষ্ট্র সচিব। বিদেশি দূতের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় আলাপ আলোচনা তালেরঁর চেয়ে ক্যাথারিনেরই বেশি হয়। প্যারিসেও ঢি ঢি পড়ে গেল, নেপোলিয়ন বললেন এ কী কাণ্ড তালেরঁ! রক্ষিতা দিয়ে রাষ্ট্রের কাজ চালাচ্ছ! ক্যাথারিন শেষ দিকে দুষ্টুর সঙ্গে দুষ্টুমিও করেছে, নেপোলিয়ানকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলেছে, তালেরঁর সন্তান আমার গর্ভে। নেপোলিয়ান তখন সন্তান বলতে অজ্ঞান, সন্তান হচ্ছে না বলে শখের বউ জোসেফিনকে ত্যাগ করে মারি লুইসকে বিয়ে করার কথা অব্দি ভাবছেন। তক্ষুনি তালেরঁকে আদেশ করলেন রক্ষিতাকে বিয়ে করার, নেপোলিয়ানের আদেশ অমান্য করার বুকের পাটা তালেরঁর ছিল না। শেষ অব্দি জীবনভর রক্ষিতা হিসেবে পড়ে থাকার দিন শেষ হয় ক্যাথারিনের, কলকাতার টানে ফরাসি বলা মেয়ে, এর ওর রক্ষিতা হয়ে জীবনের অনেক বছর কাটানোর পর হল পড়ন্ত বয়সে এক মন্ত্রীর বউ। ওই দুষ্টুমিটুকু না করলে অবশ্য রক্ষিতা হয়েই বাকি জীবন তার বেঁচে থাকতে হত। নীলার মনে হয় যেন দুশো বছর পর সেই ক্যাথারিনই আবার এসে দাঁড়িয়েছে এই সেতুতে।

শহরভর্তি মানুষ, মানুষের কাঁধে কাঁধে মানুষ, পায়ে পায়ে কুকুর, কাউকে নীলার চেনা লাগে না। অন্য কোনও গ্রহ থেকে নেমে আসা এরা, না কি সে নিজেই অন্য গ্রহের। না কি নীলারই এমন, আর কারও নয়, খালি খালি লাগে! পাছে পাতা ধরলেও মনে হয় ধরেনি, ফুলগুলোকেও মনে হয় ফুল নয়, যখন ঘাসে হাঁটে, ঘাসগুলোকে পাথর মতো লাগে, মেঘগুলোকেও ঠিক মেঘ মনে হয় না, চাঁদকেও চাঁদ না। রোদ্দুর গড়াচ্ছে গায়ে, তবু মনে

হয় প্রতি কণা ত্বক সেঁধিয়ে গেছে লোমকূপের অন্ধকারে। রাতে নিয়ন আলোর নীচেও এক শরীর অন্ধকার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে, আর ওই দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতেই পাথরের শরীরে, তার মনে হয়, ঢুকে যাচ্ছে তার নিজের শেকড়। নীলা, নিজের কাছেই দিন দিন কেমন অচেনা হয়ে যাচ্ছে। শহরটিও, শহরের মধ্যিখানে ঘোলা জলের নদীটিও। যে নদীটির ধারে উদাস বসে থাকতে নীলার এত ভাল লাগে, সেটিকে, সেতু পার হতে হতে বলে ওলো সেইন, তোমাকে খুব পাথর-মতো লাগে।

বেনোয়ার স্পর্শে নীলার মগ্নতা ভাঙে। নতরদামের পেছনে ইল সা লুই দ্বীপটিতে উত্তুরে হাওয়ায় উদাস হাঁটতে হাঁটতে হোটেল লজোঁর সামনেও নীলা আবার মগ্ন হয়, এটির কি এককালে নাম ছিল হোটেল পিমোদাঁ? এখানে কি একসময় শার্ল বোদেলেয়ার থাকতেন?

বেনোয়া নীলাকে সরিয়ে আনে, আবহাওয়া খারাপ হচ্ছে, বাড়ি চলো।

নীলা আকাশে কালো মেঘ দেখে খুশিতে নেচে ওঠে।

এ তো চমৎকার আবহাওয়া। একে খারাপ বলছ কেন? চলো ভিজি।

নীলার বৃষ্টিতে ভিজতে ইচ্ছে করে। বেনোয়ার করে না। গনগনে সূর্যের তলে তার জন্ম নয়, মেঘ-বৃষ্টি সুধা তার কাছে পৌঁছে না। বাড়ি পৌঁছোনোর পর বেনোয়াকে পায় যৌনতায়, নীলাকে কবিতায়। বোদেলেয়ারের ফ্লর দু ম্যল হাতে নিয়ে সোফায় বসে নীলা জিজ্ঞেস করে, মালাবারের মেয়ে নিয়ে বোদেলেয়ার কবিতা লিখেছেন কেন?

বেনোয়া বইটি সরিয়ে নীলাকে জড়িয়ে প্রেমকাতর চোখ নীলার চোখে রেখে বলে, কারণ বোদেলেয়ার মালাবারের মেয়েকে ভালবেসেছিলেন। ভালবেসে কী করতেন বোদেলেয়ার, দেখবে?

উত্তপ্ত চুম্বন নীলার ঠোঁটে। দক্ষিণী উষ্ণতা বহন করে এনেছে বেনোয়া, সূর্যের সবটুকু আগুন ঠোঁটে করে এনেছে নীলাকে পোড়াতে।

আবার ফ্লর দু ম্যল হাতে নিয়ে নীলা বলে, মালাবারে তো বোদেলেয়ার যাননি!

বইটি কেড়ে নিয়ে মিষ্টি হাসে বেনোয়া, যাননি তোমাকে বলেছে কে?

গিয়েছিলেন?

হ্যাঁ। বেনোয়া মাথা নাড়ে।

না যাননি। বোদেলেয়ারের সৎবাবা তাঁকে ধরে বেঁধে জাহাজে তুলে দিয়েছিলেন ভারতে যাবার জন্য, ১৮৪১ সালের ৯ জুনে। মরিশাসের কাছে এসে বোদেলেয়ার জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন, তিনি যাবেন না ভারতে, পরের বছর ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি প্যারিসে ফিরে এলেন। বোদেলেয়ারের তো মালাবার বন্দরে পা দেননি।...

আমাদের বোদেলেয়ার সম্পর্কে তো বেশ জানো দেখছি!

জন দুভালের মতো কালো রেশমি চুল ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে নীলা। গা থেকে সুগন্ধ বেরোচ্ছে তার। এ সুগন্ধ বেনোয়াকে এমন মাতাল করছে যে সে নীলার শরীরের গভীরে উন্মত্ত অস্থির প্রেমের কবিতা রচনা করতে চাচ্ছে।

বেনোয়ার হাত থেকে বইটি নিয়ে নীলা পাতা ওলটাতে থাকে। বেনোয়া প্রশ্ন করে, মালাবার ভারতে নাকি?

তুমি জানো না মালাবার কোথায়?

নাহ্! বেনোয়ার নাহ্-টি বেশ স্বাধীন, আক্ষেপের লেশ নেই, জানে না বলে একধরনের অহংকারও যেন ঠোঁটের ওপর বসে।

নীলা বলে, আশ্চর্য।

আশ্চর্য কেন?

আশ্চর্য এই জন্য যে তোমাদের কবি কোন মালাবারের মেয়েকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন, সেই মালাবার কোথায় কোন দেশে, মালাবারের মেয়েকে কি মালাবারে দেখেছেন নাকি কল্পনায়, এ নিয়ে ভাবোনি?

বেনোয়া নীলার পাশ থেকে উঠে অন্য সোফায় বসে। সে ভাবেনি, কারণ ভাবার তার অন্য জিনিস আছে।

কী আছে? মনাকো আছে?

জিভের লালায় ভিজে ওঠে পাসকাল আছে, জ্যাকলিন আছে?

বেনোয়া হঠাৎ কোনওরকম প্রসঙ্গ ছাড়া জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা নতরদাম কবে বানানো হয়েছে জানো?

তেরোশো চৌত্রিশ সালে।

হল না, তারও আগে।

কাজ শুরু হয়েছিল এগারোশো সালের মাঝামাঝি, শেষ হয়েছে তেরোশো চৌতিরিশে।

এগারো সালের কখন শুরু হয়েছিল বলো।

তা জানি না।

বেনোয়া মুচকি হেসে বলে, তোমাদের তো আছে ওই এক তাজমহল। ভারতে খুব পুরনো কিছু কিন্তু দেখলাম না...কলকাতায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল দেখলাম, তাও তো ইংরেজের করা।

নীলা উঠে বসে জিজ্ঞেস করে, তুমি কি মহেঞ্জোদারো হরপ্পার নাম শুনেছ?

এ আবার কী?

এ হল সভ্যতা। তোমাদের যিশুর জন্মের আড়াই হাজার বছর আগে সে সভ্যতা ছিল ভারতবর্ষে, সেটির কথা বলছি।

বেনোয়া কাঁধ ঝাঁকায় এ সব তার জানার কথা নয়।

নীলা বলে, ভেবো না, এ ভারতবর্ষের ব্যাপার, তোমার না জানলেও চলবে। এ পৃথিবীর ইতিহাস।

ইতিহাস আমার জানতেই হবে কেন?

বেনোয়া শব্দ করে সোফা ছেড়ে ওঠে। শব্দ করে হাঁটে। শব্দ করে শ্বাস নেয়, ছাড়ে। চেঁচায়,

তুমি কি ভেবেছ, সবাই সবকিছু জানে? আমার যে বিষয়ে জানার আগ্রহ আমি সে বিষয়ে জানি। নিজেকে তুমি সবজান্তা ভাবো নীলা। তোমার অহংকার খুব বেশি।

নীলা হাসে, হেসে ধীরে নিচু স্বরে বলে, অহংকার থাকা খারাপ নাকি! যদি জ্ঞান থাকে, তা নিয়ে কুঁকড়ে থাকব কেন। বলি যে হ্যাঁ আছে জ্ঞান।

নীলাকে টেনে সোফা থেকে উঠিয়ে, ফ্লুর দ্য ম্যল মেঝেয় ছুড়ে ফেলে, নীলাকে টেনে নেয় বেনোয়া লাইব্রেরি ঘরে, কম্পিউটারের গায়ে জোরে থাপড় মেরে বলে জগৎ এখন কম্পিউটারে চলছে, এত জ্ঞানের বড়াই যখন করছ বলো তো টেন বেস টু টারমিনেটরের সঠিক ভ্যালু কত? জানো না তো! পাঁচশো ওমস। কিবোর্ডে কী আই আর কিউ আছে? নীলা জানে না। বেনোয়া জানে, পাঁচ। বলো, এস সি এস আই বাসে কতগুলো এস সি এস আই নম্বর সম্ভব? আট। ম্যাক এড্রেসে কতগুলো বাইট থাকে বলো। পারবে? জানি পারবে না। তোমার জ্ঞান হল গোল্লা এ সবে। ছটি বাইট থাকে।

শক্ত করে ধরে রেখেছে সে নীলার হাত। টেনে নীলাকে আবার বসার ঘরে এনে সোফায় ছুড়ে দেয়।

নীলা হেসে ওঠে। হাসতে হাসতে বলে, বইটা তুলে দাও।

বেনোয়া ঘন ঘন শ্বাস ফেলে। বই সে তুলবে না।

বই কে ফেলেছে? আমি না তুমি? নীলা জিজ্ঞেস করে।

আমি। বেনোয়া বলে।

তা হলে ভাল ছেলের মতো বইটা তুলে আমার হাতে দাও। তুমি তো দুষ্টু ছেলে নও। দুষ্টু ছেলেদের গড গিভন রাইট আছে বই ফেলে দেবার। তোমার তো নেই। নাকি আছে?

বলে হাসে নীলা।

বেনোয়া চেঁচায় হাসছ কেন?

হাসছি কারণ আমার গড গিভন রাইট আছে হাসার।

নীলা সোফার হাতলে চুল ছড়িয়ে আবার আগের মতো শোয়। আগের মতো সুগন্ধ ছড়িয়ে। বেনোয়া পেছনের সোফায়।

গলা নামিয়ে বলে, নীলা আমার দিকে মুখ করে বসো, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে, জরুরি।

নীলা ধীরে, নরম গলায় বলে যায়, আগে বইটি আমাকে তুলে দাও, একটি কবিতা আমার পড়তে ইচ্ছে করছে, পড়াটা জরুরি।

আমার কথা শোনার চেয়ে কবিতা পড়ার গুরুত্ব বেশি? বেনোয়ার কণ্ঠে বিস্ময়।

নীলা বলে, হ্যাঁ বেশি।

তোমাকেও জাতে ওঠার রোগে ধরেছে। আমাদের দেশে এই হয়, বাইরে থেকে লোক এসে আমাদের শিল্প সাহিত্য নিয়ে আমাদের চেয়েও বেশি মেতে ওঠে হঠাৎ।

জানালার ওপারে রোদেলা বিকেলের দিকে চোখ রেখে বলে, আমি মেতেছি কারণ আমার রক্তে কবিতা।

রক্তে কবিতা! হা হা বেনোয়া অদ্ভুত স্বরে হাসে।

তোমাদের ফ্রান্স যখন বরফের তলে ডুবে ছিল, তখন আমাদের কবিরা কবিতা লিখত। দৃশ্যটি ভাবো, তোমার বর্বর পূর্বপুরুষেরা কামড়াকামড়ি করে কাঁচা মাংস খাচ্ছে, ওদিকে আমার দার্শনিক পূর্বপুরুষেরা কবিতা আওড়াচ্ছে।

বেনোয়ার গায়ে ঝড়ের গতি, বইটি তুলে সে জানালায় ওপারে ছুড়ে দেয়।

থাকো তোমার রক্ত আর গৌরব নিয়ে, পড়ো কবিতা।

ঝড় চলে যায়।

স্নিগ্ধ হেসে শুদ্ধতম নারী মখমল চোখ বোজে। সে চোখে একটি স্বপ্ন এসে বসে, নিজেকে সে দেখে মালাবারের তীরে, হাওয়ায় চুল উড়ছে, শাড়ি উড়ছে, সূর্যাস্তের সবটুকু রং গায়ে মেখে হাসছে সে, দৌড়োচ্ছে খালিপায়ে, জলের সঙ্গে খেলছে লুকোচুরি খেলা, জল ছুঁয়ে দিচ্ছে তার সুতনু শরীর আর হাওয়া তার কানে বলছে

ও মালাবারের মেয়ে,
তোমারই হাতের মতো সুকুমার তোমার পা দুটি,
জঘনে জাগাও ঈর্ষা ব্যক্ত করে শ্বেতাঙ্গীর ত্রুটি,
ভাবুক শিল্পীর চোখে কম্র কান্ত তোমার শরীরে
আরও গাঢ় কালো জ্বলে মখমল চোখের গভীরে।
সেই নীল আতপ্ত হাওয়ার দেশে, যেখানে কবিতা
তোমাকে দিলেন জন্ম—কৌটো ভরে লঙ্কা তেজপাতা
তুলে রাখো, কুঁজোয় ঠাণ্ডা জল, আয়েশি ভর্তার
কলকেতে তামাক সাজো, ঠেকাও মশার হল্লা, আর
যখন ভোরের গান ঝাউবনে ওঠে কেঁপে কেঁপে
কিনে আনো সদ্য বাজার থেকে আনারস, পেঁপে
খোলা পায়ে, যেখানে সেখানে তুমি বেড়াও স্বাধীন
অচেনা পুরনো সুর গুনগুন করে, সারাদিন।
আর লাল সন্ধ্যার আঁচল যেই খসে পড়ে দূরে,
দাও গা এলিয়ে স্নেহে বারান্দায় নরম মাদুরে,
পাখির কুঞ্জনে পূর্ণ তোমার স্বপ্নেরা ভাসমান
এবং পুষ্পল রূপে নিরন্তর তোমারই সমান।

•

মালাবারের মেয়ে তপ্ত হাওয়ায় ওড়ে, বাড়ির কাছে বইয়ের দোকানে ঢুকে ফ্লর দু ম্যল খোঁজে। বোদেলেয়ার, র‍্যাবোঁ, পল এলুয়ার, পল ভারলেইন, পল ভালেরি, রেনে শাস কাচের বাক্সে সাজানো। ঝুঁকে বাক্স খুলে বইয়ে হাত বাড়িয়ে নীলা বলে ওরা বাক্সে বন্দি কেন?

কবিতা সপ্তাহ চলছে। দোকানির নিরুত্তাপ কণ্ঠ।

প্রতিটি সপ্তাহই কি কবিতার নয়। প্রতিটি দিনই?

দোকানি হাসে, কবিতার দিন শেষ মাদমোজেল।

নীলার কলকাতায় কবিতার দিন কখনও শেষ হতে দেখেনি। প্রতিটি দিনই কবিতার, প্রতিটি মুহূর্ত কবিতার। মঞ্চে দাঁড়িয়ে হাজার লোকের সভা যে সবচেয়ে বেশি মাতায়, সে কবি। মেলায় মাঠে যাকে দেখতে লোকের ভিড় উপচে পড়ে, সে কবি। রাস্তায় বাজারে যে লোকটির পায়ের ধুলো নেয় আবালবৃদ্ধবনিতা, সে কবি। যাকে ফিরে ফিরে লোকে মোহিত চোখে দেখে, সে কবি। প্রতিটি কিশোরই কবিতা লেখে, প্রতিটি কিশোর। প্রেমে পড়লে লেখে, প্রেমে না পড়লেও। বৃষ্টি হলে, বৃষ্টি না হলেও। মাতালের সব মাতলামো ক্ষমা করে

দেয় লোকে কলকাতায়, সে যদি কবি হয়। দুষ্টু লোকেরা বলে, কলকাতায় কাকের চেয়ে কবি বেশি, কচুরিপানার মতো ছড়িয়েছে কবি। সুশান্তর প্রেমে পড়ে নীলা নিজেও কবিতা লিখেছে। কবিতা ছাড়া মানুষ বাঁচে কী করে! এই ফরাসি দেশকে কবিতার দেশ বলে জানত সে, এখানে কবিতার বই ছাপাতে আর বিক্রি করতে একটি বিশেষ সপ্তাহের আয়োজন করতে হয়, দাম কমিয়ে রাখতে হয়। নীলা চুক চুক করে দুঃখ করে দেশটির জন্য। বইটি বুকে চেপে বাড়ি ফিরতে ফিরতে নীলার মনে হতে থাকে, বাড়ির দরজা ভেতর থেকে খুলে দেবেন মলিনা, মাদুর বিছিয়ে তাকে খেতে দেবেন ঝিঙেপোস্ত, সুক্তো, ভাপাইলিশ, তেলকই। পাশে বসে হাতপাখায় বাতাস করবেন আর কপালের ঘামচুল সরিয়ে দিতে দিতে বলবেন, শুকিয়ে একেবারে দড়ি দড়ি হয়ে গেছিস, তৃপ্তি করে খা রে। কদ্দিন খাসনে বল তো মায়ের হাতের রান্না! জিভে জল চলে আসে নীলার। গ্রস্তের মতো বাড়ি ফিরে দরজায় কড়া নাড়ে। কেউ নেই নীলার জন্য অপেক্ষা করে, নিজেকেই দরজা খুলে ফাঁকা ঘরে ঢুকতে হয়। মা মা ডেকে নিজের গলার স্বরে নিজেকে চমকাতে হয়।

শান্ত স্তব্ধ ঘরে নীলা বইটিকে আঁকড়ে ধরে শক্ত করে, যেন কেউ এটি কেড়ে নিতে না পারে, যেন কেউ এটিকে আবার জানালা দিয়ে দূরের রাস্তায় ফেলে দিতে না পারে। বাড়িটিতে জৌলুসের স্তূপ, কিন্তু মরুর বালু উড়িয়ে হু হু করে উড়ছে আগুনে হাওয়া, তপ্ত বালুতে চোখ ঢেকে যায় নীলার, দু চোখ, কুঁকড়ে যেতে থাকে সে।

কেউ নেই পিঠে একটি কোমল হাত রাখার, কারও হাতভরা কাচের চুড়ি রিমঝিম করে মন ভরানো সংগীতের মতো বাজে না। কারও দারুচিনি ঘ্রাণের শাড়ির আঁচল এসে ঝেড়ে দিচ্ছে না চোখে পড়া বালু। নীলা অন্ধের মতো অন্ধকারে পথ হাতড়ায়। কেউ তাকে ছায়াবীথিতলে টোনাটুনির সংসারের স্বপ্ন দিচ্ছে না আর। সেই তপ্ত বালুতে, আগুনে হাওয়ায় কারও নিশ্বাসের শব্দ টের পায় ঠিক ঘাড়ের পেছনে, ক্লেদজ কুসুমের ঘ্রাণ ঘরময়, কে যেন করোটির ভেতর এক আকাশ রাত্তির নিয়ে পেছনে দাঁড়িয়েছে, যে হাসে না, কাঁদে না, সমুদ্রকে যার বড় ঘৃণা, অরণ্যে যার ভয়, নিঝুম স্বরে বলছে

হায় রে, দুলালী, কেন বেছে নিলি আমাদের এই
জনকাতর ফ্রান্স, যেখানে দুঃখের শেষ নেই?
কেন তোর আজন্মের আদরিণী তেঁতুলতলারে
বিশাল বিদায় দিয়ে নাবিকের বাহুর বিস্তারে
সঁপে দিলি জীবন, যৌবন? কোনওদিন যদি পড়ে মনে
পাতলা মসলিনে কেঁপে শীত, শিলা, তুষার বর্ষণে—
দেখিস মধুর খেলা, ছেলেবেলা, আকাঙ্ক্ষার পটে,
তবুও চোখের জল ঠেলে রেখে, নিষ্ঠুর করসেটে
পিষ্ট স্তনে, ভিনদেশি অঙ্গের আঘ্রাণ ফেরি করে
অন্ন খুঁটে খেতে হবে প্যারিসের পঙ্কিল খর্পরে—
এদিকে, কুয়াশা ক্লেদ ছিঁড়ে তোর খিন্ন পথচাওয়া
খোঁজে, সেই সুদূর সুপুরিদের ক্ষীণ প্রেতচ্ছায়া।

আচ্ছন্ন দিনগুলি

নীলা তখন ঘোরে, মালাবারে, আর ঘরে বিকশিত ধবল দন্তরাজি—সহাস্য সুশান্ত, স্নাত সুগন্ধিত, আয়েশি ভর্তার মতো হস্তদ্বয় প্রসারিত করে শোভনাঙ্গী স্বৈরিণীর পিনোন্নত পয়োধরে। সুখদ সম্মোহে সম্ভোগে সম্মত নীলা, মহাসুখসম্প্রাপ্তি সমাপনে সুশান্ত শ্রান্তপ্রশান্ত।

মেঘ সরে যেতে দুধেল পূর্ণিমায় নক্ষত্র বিভ্রম কাটে, নেকড়ের জ্বলন্ত চোখ ঝলসে দেয় তার সর্বাঙ্গ।

থিরথির কাঁপে শীতে, পায়ের কাছের কাঁথাটি গায়ের ওপর টানতে গেলেই ওটি কেড়ে নেয় এক হিংস্র থাবা, যেন হাত থেকে আঙুল কেড়ে নিচ্ছে কোনও আততায়ী, আর্তনাদ করে ওঠে নীলা।

তোমার গায়ে জ্বর। কাঁথায় ঢেকো না। চোখের সামনে মূর্তিমান সুনীল।

ধীরে বালিশে মাথা রেখে ক্ষীণ কণ্ঠে বলে নীলা, আপনি এখানে কী করছেন?

সুনীল দম টেনে হাসে, অদ্ভুত শোনায় সে হাসি।

আশঙ্কায় কুকুরকুণ্ডুলি হয়ে নীলা শোনে, কিষানের খবর রাখো? ও তো ডিভোর্সের ব্যাপারে উকিলের সঙ্গে কথা বলেছে।

কুণ্ডুলির চতুষ্পার্শ্বে আরও মুঠো মুঠো শব্দ ছুড়ে দেয় সুনীল, চৈতালির সঙ্গে সম্পর্কটা তার ভাল যাচ্ছে না। ওর মেজাজ আজকাল বেশ খিটখিটে হয়ে উঠছে। রাতে এক বিছানায় শোয়া হয় বটে, স্পর্শ করে না পরস্পরকে। এভাবে কোনও পুরুষমানুষের যে চলে না, তা চৈতালির বোঝা উচিত। অনেকক্ষণ থেমে সরু গলায় বলে, ওকে আসলে বিয়ে করাই উচিত হয়নি আমার। খুব অন্য প্রকৃতির মেয়ে। এ বাড়ির জন্য কাগজপত্র দেওয়াতে চৈতালি খুব রাগ করেছে। তোমার জন্য চাকরির খোঁজ করতেও বাধা দিচ্ছে। বলে, বউ বাচ্চা সংসার ফেলে এত নীলা নীলা করো কেন, কানের কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর আছেই। উফ...

সুনীলের উফ শেষ না হতেই দরজায় শব্দ। তড়িঘড়ি জামা চড়িয়ে, কুণ্ডুলির ওপর কাঁথা ছুড়ে সুনীল দরজা উদোম করে, বেনোয়া।

কুণ্ডুলির ওপর কোমল একটি হাতের স্পর্শ। ওদিকে আসি বলে স্বচ্ছন্দে চলে গেছে সুনীল। টেবিলের ওপর রেখে গেছে কলকাতা থেকে নিখিলের পাঠানো চিঠি।

বেনোয়ার হাতে রঙিন কাগজে মোড়া উপহার, আর লাল একটি গোলাপ।

সুদূর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠ নীলার, ওই লোকটি আমাকে ধর্ষণ করেছে।

নীলাকে, নীলার সমস্ত উত্তাপ বুকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদে বেনোয়া।

আঙুলে বেনোয়ার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে নীলা বলে, জানি না, হয়তো আমিই

চেয়েছিলাম। মাথার ঠিক ছিল না।

আমার ওপর রাগ করে, আমি জানি।

কণ্ঠে ভরা আবেগ নিয়ে বেনোয়া বলে, এই আমি তোমার পাশে আছি, আমি ছাড়া আর কেউ তোমাকে ছুঁতে পারবে না। আমি তোমাকে সব দেব, সব।

সত্যি দেবে? আলুথালু বেশ, উড়োখুড়ো চুল, যেন ধুলোর ঝড়ে পড়া মেয়ে নীলা, কাতর স্বরে উদ্ধার ভিক্ষে চাইছে।

বেনোয়া কথা দেয়, নীলাকে ছেড়ে আর সে কোথাও যাবে না। নীলাকে নিরাপত্তা দেবে সে।

রঙিন কাগজ আর ফিতে খুলে নিলে বের হয় বোদেলেয়ারের সবগুলো কবিতার বই। নীলার তপ্ত শুষ্ক ওষ্ঠ সিক্ত হয় প্রেমার্দ্র চুম্বনে। আরও সিক্ত হতে চায় নীলা, প্লাবনে ভাসতে চায়। বেনোয়া বলে, আগে সেরে ওঠো, তারপর।

বেনোয়ার হাতটি নিয়ে নীলা তার কপালে রাখে, ইচ্ছে এভাবে কপালে হাত রেখে বেনোয়া বলুক, জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা। জ্বর হলে মলিনা যেরকম ক্ষণে ক্ষণে হাত রাখতেন কপালে, আর বলতেন ইস জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে গা, নীলার ইচ্ছে করে বেনোয়া বলুক অমন উদ্বিগ্ন স্বরে, জলপট্টি দিক কপালে মলিনা যেমন দিতেন, গলায় তোয়ালে পেঁচিয়ে মাথাটি বিছানার কিনারে এনে বদনিতে জল ঢালতেন মাথায়, জল গড়িয়ে নীচের বালতিতে পড়ত। নীলার ইচ্ছে করে বালিশের কাছে থোকা থোকা আঙুর এনে বেনোয়া রাখুক অনির্বাণ যেমন রাখতেন, দুর্বল হাতে একটি একটি করে সে আঙুর মুখে দেবে। মলিনা যেমন শিংমাছের পাতলা ঝোলের সঙ্গে জাউভাত করে এনে মুখে লোকমা তুলে দিতেন, তেমন দিক বেনোয়া।

কপাল থেকে হাতটি সরিয়ে বেনোয়া বলে, তুমি কি অসুস্থ বোধ করছ?

নীলা বলে, সে ঠিক আছে।

ইচ্ছেগুলো চেপে রেখে জিজ্ঞেস করে জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে আমার গা তাই না?

ও তা তো জানি না। তুমি কি দেখতে চাচ্ছ তোমার জ্বর কত? ঠিক আছে আমি তোমাকে জ্বর মাপার যন্ত্র এনে দিচ্ছি।

জ্বর মাপার যন্ত্রটি স্নানঘরে রাখা ওষুধের বাক্স থেকে এনে নীলার দিকে বাড়াতেই নীলা হাঁ করে মুখ, সেই হাঁয়ের দিকে হাঁ হয়ে তাকিয়ে যন্ত্রটি বেনোয়া হাতে দেয় নীলার। হাতে দিয়ে তোমার সেবায় জীবন সঁপিনু ভঙ্গির একটি হাসি হাসে। ওই হাসি দেখে যন্ত্রটি মুখের ভেতর ঢুকিয়ে মুখ থেকে প্রায় বেরিয়ে আসা ইচ্ছের লাগাম টেনে রাখে।

সে রাতেই বেরিয়ে দুটো ভরা সুটকেস নিয়ে বাড়ি ফেরে বেনোয়া। নীলাকে ছাড়া তার জীবন অর্থহীন, এ সে বুঝে গেছে, তাই এ সিদ্ধান্ত।

আর ওদিকের সম্পর্কটা?

সে ধীরে ধীরে চুকিয়ে ফেলব।

কত ধীরে, তা জানার তার ইচ্ছে করে না। বেনোয়ার এই সব ছেড়ে ছুড়ে তার কাছে চলে আসায় গভীর জ্বরের চেয়ে আরও বেশি কেঁপেছে নীলা, কেঁপেছে সুখে। সে এখন স্পষ্ট জানে বেনোয়া তাকে ভালবাসে। বেনোয়ার কাছে নীলার আর চাওয়ার কিছু নেই। তার

বুকের সুগন্ধ নিতে নিতে নীলা পরম নিশ্চিন্তে চোখ বোজে। বাড়িটির পেছনে অঢেল টাকা খরচা করা তার সার্থক হয়েছে, মনে তার স্বপ্ন ছিলই এ বাড়িতে বেনোয়াকে নিয়ে একটি সংসার পাতার। স্বপ্ন এখন নীলার হাতের মুঠোয় রক্ত মাংসসহ জীবন্ত। অনিশ্চিত জীবনের বোঝা কাঁধে বয়ে বেড়াবার দিন ফুরিয়েছে তার, আজ থেকে জীবন আমূল বদলে গেল। বেনোয়ার হাত ধরে রাজনন্দিনীর মতো সে এখন পথ চলবে, কোনওদিন আর কোনও বর্ণবাদী টুঁ শব্দ করার সাহস পাবে না। সরকারের বিদেশি তাড়ানো মন্ত্রণালয় নীলার জন্য ফরাসি যুবকের আত্মত্যাগ দেখে ধারালো দাঁত নখ গুটিয়ে নেবে। কিষানের কুচুটেপনা নীলাকে স্পর্শ করতে পারবে না, সুনীলের করুণাকে আঁস্তাকুড়ে ছুড়ে দেবে সে। তার বেনোয়া আছে। বেনোয়া তার একার, আর কারও নয়, সে কোনও রক্ষিতা নয় কারও। বেনোয়া তার জ্বর কপালে হাত না রাখুক, না দিক জলপট্টি, না দিক মাথায় জল, না কিনে আনুক আঙুর, তবু বেনোয়া তাকে ভালবাসে, পাশ্চাত্যের ভালবাসা এমনই, হাতে জ্বর মাপের যন্ত্র দেওয়াই কি কম দেওয়া নাকি!

বেনোয়া নিজে রান্না করে, রান্না বলতে কাসুলের একটি টিন উপুড় করে ঢেলে দেওয়া কড়াইয়ে, গরম হলে ঢেলে দেওয়া থালায়, কাঁটা ছুরি আর মুখ মোছার রুমাল থালার পাশে রাখা, ওয়াইন ঢেলে দেওয়া গেলাসে, আর লম্বা বাগেত ফালি ফালি করে কেটে রাখা। টেবিলে সাজিয়ে নীলাকে ডাকে বেনোয়া, মোমের শিখার ওপারে নীলা দেখে বেনোয়ার হাসি মুখ। সিমের বিচির সঙ্গে ভেড়ার মাংস সেদ্ধ, ভেড়ার গায়ের গন্ধ মাংসে, নীলার খেতে রুচি হয় না। বেনোয়া পা নাচিয়ে বেশ স্বাদ হয়েছে তাই না বলে চিবোয়। নীলা একটি দুটি সিমের বিচি কাঁটায় তুলে মুখে দিয়ে হ্যাঁ বেশ স্বাদ বলে। বলে, কারণ সংসারী বেনোয়াকে হতাশ করতে নীলার আশঙ্কা হয়।

বেনোয়া জিজ্ঞেস করে, আমার ছোটবেলা কী করে কেটেছে, শুনবে?

ছোটবেলার গল্প করে সে। মন দিয়ে শোনে নীলা, ছ বছর বয়সে রেলে করে ইতালি গিয়েছিল বাবা মার সঙ্গে, রোমের রাস্তায় দেখেছিল জনতার ঢেউ, কীসের উৎসব ছিল, মনে করতে পারে না, উৎসবের একটি ছেলে থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা বেনোয়ার হাত ধরে টেনেছিল, এসো, বাজিফোটানো হবে। বেনোয়া যায়নি, পরে তার বারবার মনে হয়েছে গেলেও পারত। সেই বাজির উৎসব দূর থেকে দেখেছে সে, আর বুক ফেটে গেছে আফসোসে।

পরের রাতেও ছোটবেলার গল্প বলতে গিয়ে ওই একই গল্প বলে বেনোয়া।

বেনোয়ার সঙ্গে নীলার সত্যিকার সংসার শুরু গেছে। সংসারে এক গল্প বারবার শুনলে এমন কিছু ক্ষতি নেই, নীলার একরকম আনন্দই হয় বেনোয়ার শৈশব কৈশোরের খুঁটিনাটি জানতে, কবে কোন ইস্কুলের মাস্টার তাকে বাহবা দিয়েছে, কবে কোন বন্ধুর নাকে ঘুষি লাগিয়ে অরলেওঁর গির্জায় পুরোহিতের কাছে গোপনে নিজের দোষ স্বীকার করে এসেছে সে। তার ছোটবোন ভালেরি লেখাপড়ায় বেনোয়ার মতো ভাল ছিল না, তাই বরাবরই সে হিংসে করে এসেছে তাকে, ছোটবেলায় বেনোয়ার ইস্কুলের বইখাতা প্রায়ই কুটি কুটি করে ছিঁড়ে মাটির তলে পুঁতে রাখত। ভালেরি এখনও তাকে হিংসে করে, নিজে সে শখের ওকালতি করে, ও করেই নাকি বেনোয়ার চেয়ে বেশি কামায়। বিয়ে করেছে, বাচ্চা হয়েছে,

দাবি করে বাচ্চাটির স্বভাব চরিত্র নাকি জ্যাকলিনের চেয়ে ভাল।

রাতে বিছানায় শুতে আসে বেনোয়া উলঙ্গ হয়ে।

তোমার এভাবে জামা কাপড় গায়ে ঘুম আসে! বেনোয়া নীলার জামা কাপড় পরে শোয়ার দিকে ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

ঘুম আসে। বরং উলঙ্গ হয়ে ঘুমোনোর অভ্যেস আমার কোনওকালেই নেই।

নীলার সহসা মনে হয় নীলার উলঙ্গ শরীরে বুঁদ হতে চাইছে বেনোয়া, তাই এই ইঙ্গিত, কিন্তু পাশে ঘন হয়ে শুয়ে নীলাকে সেন্তেক্সোপেরির ছোট্ট রাজকুমারের গল্প শোনায় বেনোয়া অর্ধেক রাত অব্দি, বেনোয়ার শীতল শরীরে শীতল শিশ্ন ঝুলে থাকে। পরের রাতেও শুতে এসে শেয়াল আর বাঘের গল্প বলে। গল্প শেষ হলে বিছানা ছেড়ে জানালায় দাঁড়িয়ে থাকে।

কী হল কী! নীলা জিজ্ঞেস করে।

বেনোয়া বলে, না কিছু না।

কিছু তো নিশ্চয়ই।

জানালা থেকে চোখ না ফিরিয়ে বেনোয়া বলে, জ্যাকলিন নিশ্চয়ই আমাকে খুব মনে করছে।

কাল তুমি ও বাড়িতে গিয়ে জ্যাকলিনকে দেখে আসতে তো পারো!

জানালা থেকে ফিরে এসে নীলাকে চুমু খেয়ে, চোখে চিকচিক আনন্দ, বলে, সত্যি বলছ?

নিশ্চয়ই, তোমার ইচ্ছে করলে তুমি যাবে না কেন?

তাই তো, বেনোয়াও বলে, যাবে না কেন? জ্যাকলিনের শরীরে তারই রক্ত বইছে, জীবনে তার যা কিছু ঘটুক না কেন, সন্তানের প্রতি পিতার যে কর্তব্য তা সে নিশ্চয়ই করে যাবে।

জ্বর রাতের বেলা ভীষণ বেড়ে ওঠে নীলার, সারারাত কঁকায়। সকালের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লে বেনোয়াকে কাছের ফার্মেসি থেকে কিছু এমক্সিসিলিন কিনে আনতে বলে। না হবে না, ডাক্তার না লিখে দিলে ফার্মেসি থেকে এ ওষুধ কেনা যাবে না। বেনোয়া আপিসে চলে গেলে, নীলা রান্নাঘরে ঢুকে দেখে ধুয়ে মুছে সব ঝা তকতকে করে রেখেছে বেনোয়া। পুরো দিন তার যায় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে, বেনোয়ার ফিরতে আর ক'ঘণ্টা ক'মিনিট ক'সেকেন্ড বাকি আছে, তা হিসেব করতে করতে।

ওই অপেক্ষার সময়েই দানিয়েলের ফোন আসে।

জ্বর শরীরেও নীলা উচ্ছ্বাস আটকে রাখতে পারে না। বেনোয়ার সঙ্গে তার সংসারের নতুন খবর দেয়। সে যে রক্ষিতা নয়, এ কথাটি বার বার বলে।

চলে এসো দানিয়েল, দেখে যাও কীরকম সুখে আছি আমি।

দানিয়েল আগ্রহ দেখায় না নীলার সুখের সংসার দেখার।

অন্তত জ্বর দেখতে আসো। মনে হচ্ছে টাইফয়েড।

টাইফয়েড এদেশে হয় না। অন্য কোনও জ্বর সম্ভবত। জ্বরের মধ্যে এসে কী করব, জ্বর সারুক তোমার। তারপর আড্ডা দিতে যাব।

নীলার চেতন ফেরে, এদেশ ভারত নয়, কারও অসুখ দেখতে কেউ কারও বাড়ি যায় না।

সুস্থ হও, উচ্ছল হও, প্রচুর জীবনশক্তিতে টইটম্বুর হবে যখন, তখন কিছু পান করে আসব। আর যদি অসুখ বিসুখ হয়ে মরো, কালো জামা পরে তোমার সৎকার উৎসবে গিয়ে তোমার উদ্দেশে পান করব আর নাচব। ব্যাস।

দু'চার কথার পর আগামী সপ্তাহে মিউচুয়ালিতে নারীবাদীদের একটি অনুষ্ঠানে নীলা যদি যেতে চায়, যেতে পারে ধরনের একটি আমন্ত্রণ জানায় দানিয়েল।

ফোনে কথা শেষ করে সুনীলের রেখে যাওয়া খামটি খোলে নীলা। খুলে প্রথম সে অনির্বাণের চিঠিটি পড়ে, কিষানের মুখে যাহা শুনিলাম, তাহাতে আমার মানসিক অবস্থা কী প্রকার হইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই অনুমান করিতে পারো। বিদেশের মাটিতে যাহা ইচ্ছা তাহা করিবার সুযোগ হয়তো তুমি পাইতেছ, কিন্তু একদিন নিশ্চয় তোমার বোধোদয় হইবে, তখন সময় থাকিবে না আর শুধরাইবার। এ যাবৎ অনেক ভারতীয় আক্ষেপ করিয়াছেন কেন তাহারা বিদেশের কুকুর ধরিয়াছিল স্বদেশের ঠাকুর ফেলিয়া। সুতরাং সময় থাকিতে সঠিক পথ বাছিয়া নাও। কিষানের সহিত যদি মীমাংসা না করো, তবে অতি শীঘ্রই দেশে ফিরিয়া আসো। এখনও সময় আছে নিজের ভুল ত্রুটি সংশোধন করিয়া, সমাজের দশটা লোকে যেন আর অধিক মন্দ না বলিতে পারে, দেশে আসিয়া সেই মতো জীবন যাপন করো।

নিখিলের চিঠির বক্তব্যও প্রায় একই। একটিই পার্থক্য, চিঠিটি চলিত ভাষায় লেখা।

রাত সাতটায় বেনোয়া ফোন করে জানায়, আপিস থেকে সোজা সে রু দ্য রেনে গেছে। পাসকাল আর জ্যাকলিনকে নিয়ে রেস্তোরাঁয় খেতে যাবে, খেয়ে ওদের পৌঁছে দিয়ে, জ্যাকলিনকে গল্প বলে ঘুম পাড়িয়ে তবে বাড়ি ফিরবে।

বেনোয়া রাত্তিরে সুখী মুখ নিয়ে বাড়ি ফেরে। সঙ্গে সুখী একটি কুকুরের বাচ্চা, কলকাতার রাস্তায় নেড়িকুকুরের পড়ে থাকা বাচ্চার মতো। ও বাড়িতে দুটো কুকুর, যেটি তার খুব ন্যাওটা, সেটিকে নিয়ে এসেছে। কুকুরটি নীলাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে বিছানায় লাফিয়ে ওঠে। একে বিছানা থেকে নামাও, নোংরা করে ফেলছে বলে তাড়াতে হাত তুলতেই করো কী করো কী বলে বেনোয়া ছুটে এল। ওয়াল্ডাকে বুকে নিয়ে বিছানায় গড়িয়ে ওয়াল্ডার একটি হাত বাড়িয়ে নীলার দিকে বলল, আমার প্রেমিকার সঙ্গে হাত মেলাও ওয়াল্ডা। নীলা সংসারের তিন নম্বর সদস্যকে স্বাগতম জানাল।

ওয়াল্ডা বাচ্চা নয়, রীতিমতো প্রাপ্তবয়স্ক। আকারে ছোট, ছোট জাত বলে, এর চেয়ে বড় এ জাতের কুকুর হয় না। এই ছোট জাত কুকুরের মূল্য বড় জাতের কুকুরের চেয়েও বেশি। ওয়াল্ডা কী খেতে ভালবাসে, ঘুম থেকে কখন ওঠে, উঠে তার কী কী করা চাই, কখন তার হাওয়া খেতে যাওয়া চাই, কখন খাওয়া খেতে ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করে বেনোয়া প্রতি রাতের মতো জামা কাপড় খুলে বিছানায় আসে। নীলাকে চুমু খায় আর বলে, জ্যাকলিন তো আমাকে ছাড়তেই চাচ্ছিল না, ওকে বলেছি তোমার কথা। ও তোমাকে দেখতে চাইছে।

বেনোয়া এরপর নীলাকে আরও একটি চুমু খেয়ে হেসে বলল, আর একটা কী কথা বলেছে জানো?

কী কথা?

বলেছে ও একটা ভাই চায়।

বেনোয়ার চোখে উথলে ওঠা আবেগ, কী দেবে না জ্যাকলিনকে একটা ভাই?

নীলার একটি হাত নিজের উত্থিত শিশ্নের ওপর রেখে বলে, চলো আজই ভালবেসে রোপণ করি স্বপ্ন।

নীলা প্রায় জিজ্ঞেস করতে নেয়, কার স্বপ্ন? তোমার? আমার? নাকি জ্যাকলিনের? কিন্তু করে না, আশঙ্কায়, যদি সে বলে বসে, তোমার মন এত ছোট, ছ বছর বয়সের একটা শিশুর সঙ্গে হিংসে করছ, ছি!

উত্থিত শিশ্নের আগাগোড়া স্পর্শ করেও শরীরে তার বান ডাকে না। স্তনবৃন্ত প্রেমিকের আঙুলের, ঠোঁটের, জিভের স্পর্শেও চোখ মেলে না। বেনোয়া বলে, তোমার অসুখ সারুক, তারপর না হয়।

বেনোয়াকে অনিশ্চিত অপেক্ষার মধ্যে ফেলতে নীলার আশঙ্কা হয়, যদি নীলার শরীরই একমাত্র আকর্ষণ বেনোয়ার কাছে, তবে এ শরীর সে ভোগ করুক, করেও তাকে ভালবাসুক। নীলা তার শরীর মেলে দেয় বেনোয়ার তৃপ্তির জন্য। বেনোয়া সে শরীরে রোপণ করে জ্যাকলিনের স্বপ্নের বীজ। রোপন করার সময় অবশ্য দুবার বিছানায় লাফিয়ে উঠেছে ওয়ান্ডা, লেজ নাড়তে নাড়তে ন্যাংটো মনিবের চাষ দেখেছে।

লজ্জার মুখ লুকিয়ে নীলার বুকে বেনোয়া বলে, দুঃখিত, তাড়াতাড়ি এসে গেলাম!

না, ঠিক আছে।

তুমি রাগ করোনি?

কেন?

তুমি যে পাওনি!

একদিন না হয় না পেলাম। নীলা মধুর হেসে বলে।

নীলা শীর্ষসুখে পৌঁছয়নি বলে অপরাধী মুখ করে অনেক রাত অব্দি বসে রইল বেনোয়া আর বারবারই ব্যাখ্যা দিতে লাগল, খুব ধকল গেছে আপিসে, মোটে বিশ্রাম নেওয়া হয়নি, সে কারণেই সম্ভবত, অথবা অনেক দিন বাদে বলে।

বেনোয়ার শেষোক্ত ধারণাটি নীলাকে স্বস্তি দেয়, অন্তত সে ভাবতে পারছে, জ্যাকলিনকে ঘুম পাড়িয়ে পাসকালের সঙ্গে সে সঙ্গম সেরে আসেনি। কেবল স্বস্তি নয় চমকিত হয় দেখে যে, পুরুষ নিজের তৃপ্তির চেয়ে সঙ্গিনীর যৌনতৃপ্তির ব্যাপারে সচেতন। অন্তত ভারতবর্ষে এমন সচেতনতার খবর সে শোনেনি। নীলার প্রেমিকপ্রবর সেই সুশান্তর সঙ্গে প্রথম মিলন হওয়ার পর একবারও সে জিজ্ঞেস করেনি সারা শরীরে আমি যেমন অদ্ভুত এক আনন্দ পেয়েছি, তুমিও পেয়েছ তা। ভারতবর্ষের বেশির ভাগ মানুষ, নীলার বিশ্বাস, মনে করে ব্যাপারটি পুরুষের, পুরুষের তৃপ্তির পর যে জিনিসটি মিলবে মেয়েদের, সে হল সন্তান। মাতৃত্বই যেহেতু নারীর জীবন সার্থক করে, পুরুষের অনুকম্পায় নারী তার জীবন সার্থক করার সুযোগ পায়, এ নিয়ে নারী যেমন কৃতজ্ঞ থাকে পুরুষের প্রতি, পুরুষেরও গৌরব করার সুযোগ হয়।

জ্বরে তিনদিন ভোগার পর বেনোয়া তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যায়। ডাক্তার নীলাকে পরীক্ষা করে ওষুধ লিখে দেয়, সে ওষুধ কিনে বাড়ি পৌঁছে নীলা দেখে শিশির গায়ে গাছ

পাতা আঁকা। অবাক হলে বেনোয়া বুঝিয়ে বলে, এ সব গাছগাছালির ওষুধ, আজকাল কেমিকেল কেউ খায় না, বোকা ছাড়া। কৃত্রিমভাবে ফলানো জিনিস খেয়ে লোকের অসুখ করছে। গাছগাছালির ডাক্তারের কাছেই এখন সচেতন মানুষের ভিড়। ঝিমঝিম করে নীলার মাথা, জ্বরের কারণে নয়, গাছগাছালির কারণে। এ সব ওষুধ সে খেতে দেখেছে কলকাতার অশিক্ষিত অজ্ঞান লোকদের, যারা প্রতারকের খপ্পরে হামেশা পড়ছে, হামেশা নিঃস্বান্ত হচ্ছে, রোগে শোকে নিঃশব্দে মরে যাচ্ছে। দেখেছে তাদের, যারা চোখে ঠুলি এঁটে, কুসংস্কারের কালো চাদরে ঢেকে রেখেছে আপাদমস্তক। প্রাচ্যদেশে যুক্তি আর বিজ্ঞানের পক্ষে দাঁড়ানো নীলা বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে দেখে পাশ্চাত্যের সভ্য শিক্ষিত উচ্চ সমাজের মুখ অন্ধকারের দিকে অযুক্তির দিকে ফেরানো। চোখে হেথা নয়, হোথা নয়, অন্য কোথার আকুলতা। গাছের শেকড় আর বাকল বেটে রস বানানো ওষুধের শিশি বেনোয়াকে লুকিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দেয়। পাশের বাড়ির ছাদের ওপর শিশি দুটো ভেঙে শত টুকরো হয়ে প্যারিসের শত ফোয়ারার মতো ছলকে ওঠে।

নীলার জ্বর এমনিতেই সাত দিন পর সেরে যায়।

জ্বর সারার পর নীলা নতুন উদ্যমে নতুন সংসারে মন ঢেলে দেয়। অর্ধেক দিন ধরে সপ্তব্যঞ্জন রেঁধে, স্নান করে সেজেগুজে বেনোয়ার অপেক্ষায় ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে চোখের মণি আর মন আটকে যায় যখন, বেনোয়া জানায়, পাসকাল আজ রাতে তাকে নেমন্তন্ন করেছে, আজ তার বাড়ি ফিরতে রাত হবে, নীলা যেন খেয়ে নেয়।

কিন্তু আমি যে এত কিছু রান্না করলাম তোমার জন্য।

আগে বলবে তো। কিন্তু পাসকালকে তো কথা দিয়ে ফেলেছি, যেতে হবে আমার।

নীলার মেনে নিতে হয়, যত হোক পাসকাল তার স্ত্রী। বেনোয়ার ওপর পাসকালের দাবি নীলার চেয়ে বেশি।

নীলা একা একা এ ঘর ও ঘর করে। কম্পিউটারের টেবিলটি বেনোয়া নিজের জন্য সাজিয়ে নিয়েছে, দু এক ফাইল কাগজপত্র, আর টেবিলের ওপর দুটো ফ্রেমে বাঁধানো ছবি, একটি পাসকালের, আরেকটি জ্যাকলিনের। পাসকালের ছবিটি হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নীলা। কোনও কোণ থেকে পাসকালকে তার অসুন্দরী ঠেকে না, ঘাড় অব্দি লাল চুল, পাতলা গোলাপি ঠোঁট, টিকোলো নাক, বসা গালের, সবুজাভ চোখের সুন্দরী পাসকালকে না ভালবাসার কোনও কারণ, নীলার মনে হয়, বেনোয়ার থাকতে পারে না।

সারাদিন চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করেছে ওয়াভা। তার মনিব অনেক রাতে ফিরে ওয়াভাকে কোলে তুলে ওরে সোনারে, ওরে পুতুলরে বলে আদর করে কুকুর ছোঁয়া গন্ধ হাতে নীলার গায়ে হাত বুলোতে থাকে।

নীলা ঘুমোয়নি, কিন্তু ভঙ্গি ঘুমেরই করে।

ঘুমিয়ে গেছ। তা হলে ঘুমোও, বিরক্ত করব না।

হঠাৎ শব্দ শুনে ঘুম ভেঙেছে ধরনে উঠে নীলা বলে, ও তুমি! এই মাত্র ফিরলে?

অনেকক্ষণ ফিরেছি। তুমি ঘুমিয়েছ বলে জাগাইনি।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে হাই তোলে, অনেক দেরি করে ফিরলে, অপেক্ষা আর কতক্ষণ

করা যায়...

বেনোয়ার তাজা কণ্ঠ, নানারকম বিল এসে রয়েছে বাড়িতে, সব মেটাতে হল।

নীলা ঘুমের স্বরে বলে, থেকে গেলেই পারতে।

বেনোয়া জুতো খুলতে খুলতে বলে, ভেবেওছিলাম থেকে যেতে। কিন্তু পাসকালই বলল, যাও নীলা অপেক্ষা করছে।

এ মুহূর্তে নীলার সম্ভবত পাসকালের কাছে কৃতজ্ঞ হতে হয়।

ও তোমাকে অন্য এক মেয়ের কাছে যেচে পাঠায়, এ কেমন? নীলার ঘুম কেটে যাওয়া স্বর। ও কি তোমাকে ভালবাসে না কি বাসে না?

নিশ্চয় বাসে।

তবে এই যে আমার সঙ্গে থাকছ, ও রাগ করে না? আমি তো পারতাম না বলতে যাও তোমার অন্য প্রেমিকার কাছে যাও। ও কী করে পারে?

ও খুব ভাল মেয়ে নীলা। বেনোয়া জোর দিয়ে আরও বলে, ওর মতো ভাল মেয়ে আমি পৃথিবীতে দুটি দেখিনি।

তা হলে এত ভাল মেয়েকে ছেড়ে এলে কেন?

তুমি তো জানো কেন? তোমার জন্য। জানো না?

তোমার নিজের জন্য কী ইচ্ছে করে, শুনি, কার সঙ্গে থাকতে, কোন বাড়িতে?

আমার নিজের জন্য যা ইচ্ছে করে, তা আমি করছি।

বিছানায় নয়, চেয়ারে বসে বলে বেনোয়া। নীলার চোখের দিকে চোখ ফেলে। আবছা অন্ধকারে বসা সে, আর নীলার ওপর আলো, বিছানার পাশের ছোট টেবিলের ছোট আলো।

আমার মনে হচ্ছে তুমি এখনও নিশ্চিত হওনি, তুমি কী চাও। নীলা বলে।

আমি তোমাকে আগেই জানিয়েছি আমি কী চাই। বলেছি, তোমাকে ছাড়া আমার জীবন চলবে না। বেনোয়া নরম স্বরে বলে।

আমাকে ছাড়া তোমার জীবন কী হবে, শুনি? তুমি কি খাবে না, দাবে না, ঘুমোবে না, চাকরি করবে না? জীবনের কী চলবে না তোমার?

আমি হয়তো সব করব কিন্তু সে আমি এই আমি হব না। জীবিত থেকেও মৃত। নীলা তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করো না? তুমি জানো না তোমাকে কতটুকু ভালবাসি। তুমি জানো না, কতটুকু ভালবাসা থাকলে একটি সুখের সংসার ছেড়ে আসা যায়। আমার আর পাসকালের মধ্যে কোনওদিন এতটুকু কথা কাটাকাটি হয়নি। তোমার ঘটনা আমি সব ওকে খুলে বলেছি। ও মেনে নিয়েছে। আমি কোনও কিছু লুকোই না ওর কাছে। ও আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু নীলা। ও আমাকে ভীষণ ভালবাসে, ভালবাসে বলেই আমি যা করতে পছন্দ করছি, তাতে ও বাধা দেয় না। ভালবাসার মানুষের জন্য ত্যাগ আর দেখেছ কোথাও এমন? পাসকালই পারে। ওকে আমি ভাল যেমন বাসি, শ্রদ্ধাও করি। তোমার জন্য আমি আমার সবচেয়ে ভালবাসার মানুষদের, আমার পাসকালকে, আমার জ্যাকলিনকে ছেড়ে দিয়েছি, এতেও তুমি খুশি হও না?

নীলা একটি বই মুখের সামনে তুলে ধরে। বেনোয়া কঠিন স্বরে বলে, বইটি সরাও, আমি তোমার চোখ দেখতে পাচ্ছি না।

চোখ দেখার দরকার কী তোমার।

আমি তোমার সঙ্গে কথা বলছি। আমার কথার উত্তর দাও, তুমি কি খুশি হওনি যে আমি তোমার কাছে আমার স্ত্রী কন্যা ছেড়ে চলে এসেছি? বলো।

নীলা বইটি মুখের সামনে ধরে রেখেই বলে, কেন বলো যে ছেড়ে এসেছি। তুমি তো ছেড়ে আসোনি। সে এখনও তোমার স্ত্রী। তোমাদের প্রতিদিন ফোনে কথা হচ্ছে। প্রায়ই ওর কাছে যাচ্ছ। ছেড়ে আসা বলো কেন? এর নাম ছেড়ে আসা নয়। তোমাদের ভালবাসার আংটি এখনও তোমার আঙুলে, তোমার টেবিলে ওর ছবি, লোকে যেখানে আদরের বউয়ের ছবি রাখে।

বেনোয়া চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। নীলার সামনে বসে, বইটি বাঁ হাতে সরিয়ে বলে, তুমি কী চাও বলো তো! তুমি চাও আমি ও বাড়িতে চলে যাই?

তোমার যদি ইচ্ছে হয়, নিশ্চয়ই যাবে। আমি বাধা দেব কেন? আমি তোমাকে এ বাড়িতে আসতে বলিনি। তুমি নিজে এসেছ। ও বাড়িতে যখন ছিলে, তোমার আমার সম্পর্ক কিছু খারাপ ছিল না। পার্থক্যটা কী?

বেনোয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আজ যদি অন্য কোনও লোক হত আমার জায়গায়, বলত আপিসে কাজের চাপ ছিল, অথবা মিটিং ছিল, অথবা আপিসের কাজে রাতের খাবার ছিল, তাই দেরি হয়েছে। আমি সত্য কথা বলি, কিছু লুকোই না তোমার কাছে। আমার সততার এই মূল্য দিচ্ছ তুমি, নীলা? তোমার মন এত ছোট কেন, আমি বুঝি না।

নীলা ধীরে শান্ত কণ্ঠে বলে, আমার মন ছোট নয় তো। মন বড়। বড় বলেই আমি বলছি তুমি পাসকালের সঙ্গে থাকো গিয়ে। ওর সঙ্গে সুখের সংসার করো, যেমন করছিলে। তুমি ওকে ছেড়ে আসোনি। তুমি ওকে ছাড়তে পারবে না, তার সবচেয়ে বড় কারণ কী জানো, ওকে তুমি ভালবাসো।

বেনোয়া তার হাঁটুর ওপর দু কনুইয়ের ভর রেখে দু হাতে মাথা চেপে ধরে।

বেনোয়ার পিঠের ওপর একটি হাত রেখে নীলা বলে, আমি জানি তুমি সত্য কথা বলছ। কিন্তু ওর কথা ভেবেই আমি বলছি। আজ যদি তুমি আমার স্বামী হতে, আর তুমি যদি আমাকে ছেড়ে অন্য মেয়ের সঙ্গে থাকতে, আমার কী রকম কষ্ট হত, সে আমি অনুমান করতে পারি। পাসকালকে আর কষ্ট দিয়ো না। নিজেকেও আর কষ্ট দিয়ো না। তোমাকে হারিয়ে আমার খানিকটা কষ্ট হবে তা ঠিক। এ নিয়ে ভেবো না, কষ্ট পেয়ে আমার অভ্যেস আছে। কষ্ট পেয়ে আমার মারও অভ্যেস ছিল।

বেনোয়া উঠে ঘরের উজ্জ্বল বাতি জ্বেলে দেয়। নীলার বুকে ধক করে শব্দ হয়। এই বুঝি বেনোয়া গুছোতে শুরু করছে তার সুটকেস। এই বুঝি নীলাকে একা করে দিয়ে জন্মের মতো চলে যাবে তার একটি মাত্র আশ্রয়। আলো জ্বেলে বেনোয়া বিছানায় মুখোমুখি বসে নীলার, বলে, সত্য করে একটা কথা বলো। নীলা, তুমি কি মন থেকে বলছ কথাগুলো? তুমি কি সত্যি চাও আমি চলে যাই?

নীলা উত্তর দেয় না।

বেনোয়ার মুখে হাসি ফোটে, আমি জানি, তুমি মন থেকে ও সব বলছ না। তুমি বলতে পারো না। তুমি আমাকে ভালবাসো, তুমি আমাকে হারাতে চাও না।

নীলার কণ্ঠের কাছে এক থোকা কষ্ট এসে বসে। দাঁতে ঠোঁট চেপে ঢোক গিলে সে কষ্টের গতিকে নিম্নমুখী করে।

বেনোয়া নীলাকে বুকে জড়িয়ে দুলতে থাকে ডানে বামে। বলতে যাকে জ তেম জ তেম জ তেম।

নীলা জানে একা থাকা কাকে বলে। বেনোয়া চলে গেলে এই বাড়িটিতে নিজের ছায়া দেখে নিজে চমকে উঠবে। কেউ তাকে এভাবে আলিঙ্গন করবে না, কেউ বলবে না, জ তেম। প্রেমিক তাকে সঁপে দিচ্ছে জীবন, আর সে হেলা করে দূরে সরাবে, এত স্পর্ধা সে কোথায় পাবে। এত শক্তি!

বেনোয়া বলে, যেদিন তোমার বই ছুড়ে চলে গেলাম, ভেবেছিলাম, তোমার আমার সম্পর্ক এই শেষ। পাসকালের কাছে ক্ষমাও চেয়েছিলাম, কিন্তু যখনই কল্পনা করেছি, তুমিহীন আমার জীবন, আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল, তুমি আমার প্রাণবায়ু নীলা। আমি তখনই বুঝেছি। তখনই বুঝেছি ঈশ্বর আমাদের তৈরি করেছেন পরস্পরের জন্য। আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করছিল, ছুরি নিয়েওছিলাম হাতে। পাসকাল আমাকে তখন ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেল।

কীসের ডাক্তার?

সাইকিয়াট্রিস্ট।

নীলা চমকায়। ওই সাধারণ বাগ্‌বিতণ্ডার কারণে মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যেতে হয়েছে বেনোয়াকে! বেনোয়ার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে আলগোছে সরিয়ে বেনোয়ার আবেগে নিমীলিত চোখে তাকিয়ে সে প্রশ্ন করে, তারপর তোমাকে ওই ডাক্তার বলল বোদেলেয়ারের বই আর একটি গোলাপ নিয়ে এখানে আসতে?

বেনোয়ার ঠোঁটে তেঁতো হাসি, তুমি কি ভেবেছ আমার ইচ্ছে করেনি তোমার কাছে আসতে? ডাক্তার বলেছে বলে এসেছি।

নীলার ভয় হয়, সুস্থ হোক কি অসুস্থ হোক, মানসিক রোগের ডাক্তারের কাছে যাওয়া ফরাসিদের যেহেতু নাপিতের কাছে চুল কাটতে যাওয়ার মতো নৈমিত্তিক, হয়তো ডাক্তার একদিন বলে বসবে, যাও পাসকালের সঙ্গে মন দিয়ে সংসার করো গিয়ে। বেনোয়া তাই করবে।

কী ব্যাপার, তুমি মনে করছ আমার মাথার অসুখ আছে? বেনোয়া জিজ্ঞেস করে।

নীলা হেসে উত্তর দেয়, না। মোটেই না। আমার মনে হয় আমার মাথার অসুখ আছে। আমার শিগরি ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হবে।

কেন, তোমার আবার কী হয়েছে।

আমারও মাঝে মাঝে কেমন শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। বলে নীলা।

ঘুমের নীলাকে একটু একটু করে জাগায় বেনোয়া, কানের কাছে ফিসফিস করে, আমার সঙ্গে যাবে এক জায়গায়?

কোথায়?

যাবে কি না আগে বলোই না।

এই রাত্তিরে?

হ্যাঁ। তুমি বললে আমি এক্ষুনি তোমাকে নিয়ে যাব।

যাব। বলো এবার, কোথায়।

সাত আকাশে।

বেনোয়া নীলাকে সাত আকাশে নেয়। পালকের মতো ওড়ে সে সাত আকাশে। বেনোয়া তাকে যত সুখ দেয়, পৃথিবীর আর কেউ কোনওদিন দেবে বা দিতে পারবে বলে নীলার মনে হয় না।

বেনোয়ার হারেমেই নিজের অদৃষ্ট কল্পনা করে নেয় নীলা।

সপ্তম আকাশ জুড়ে ভ্রমণও শেষ হয়, রাতও ফুরোয়। নীলার ক্লান্ত শরীর যেই না ঘুমের অতলে ডুবেছে, বেনোয়ার রেডিয়োর খবর তাকে পারে ওঠায়। রেডিয়ো এলার্ম বেনোয়ার। ওয়ান্ডা ছুটে এসে নীলার গায়ের ওপর বসলে লাফিয়ে নেমে যায় সে। কুকুরটির গায়ের বোটকা গন্ধ আর কানের কাছের রেডিয়োর চিৎকার, নীলার ঘুম সপ্তম নয়, চৌদ্দতম আকাশে উড়িয়ে নেয়। উঠে সে বেনোয়ার জন্য কফি বানিয়ে রুটি জেলি মাখন যা আছে বের করে টেবিলে রাখে। কফিতে দু চুমুক শুধু। খাওয়ার সময় নেই।

এত তাড়া কীসের?

মেট্রো ধরতে হবে।

মেট্রো কেন? গাড়ি কোথায়?

ও তোমাকে বলিনি। গাড়ি তো কাল পাসকালকে দিয়ে এসেছি। ও ব্যবহার করবে এ গাড়ি। বেনোয়ার সহজ স্বাভাবিক কণ্ঠ।

তা হলে তুমি কী ব্যবহার করবে? নিজের জন্য চায়ের জল চাপিয়ে নীলা বলে।

আপাতত মেট্রো আর বাসেই চলাফেরা করতে হবে।

আপাতত। তারপর?

আসলে কী জানো নীলা, মেট্রো আর বাসে চলাফেরা করতেই আমার ভাল লাগে। গাড়ি নিয়ে প্যারিসে কী রকম অসুবিধে দেখেছ তো। পার্কিং পাওয়ার জন্য সারা শহর ঘুরতে হয়। একটু এদিক ওদিক হল তো জরিমানা।

নীলা মাথা নাড়ে। সে বুঝেছে গাড়ির অসুবিধের কথা। চুক চুক কোরে দুঃখ করে বলে, তা হলে পাসকালেরও বিষম ভুগতে হবে গাড়ি নিয়ে।

ওর দরকার বেশি আমার চেয়ে। জ্যাকলিনকে ইস্কুলে দিয়ে আসা নিয়ে আসা।

ও।

শুনে খুশি হলে না মনে হয়? বেনোয়া তির্যক দৃষ্টিতে তাকায়।

তুমি খবর জানালে আমি শুনলাম। এটুকুই। খুশি হওয়ার না খুশি হওয়ার কোনও ব্যপার ঘটেনি।

নীল জিনসের ওপর একটি টিশার্ট পরে নেয় বেনোয়া। পায়ে ছালওঠা মোটা জুতো। টাই সে পরে না আদৌ, শার্ট কদাচিৎ। নীলার কেনা শার্টগুলো বলেছে বাইরে কোথাও ভাল জায়গায় বেড়াতে গেলে পরবে, টাইগুলো আলমারিতে অব্যবহৃত পড়ে আছে। অডি

কোলনও। নীলার পছন্দ করা সুগন্ধী সে ছোঁয়নি, নিজের এরামিস মাখে গায়ে। এরামিস তার পছন্দ, কারণ এ নাম তিন মাসকেটিয়েরের একজনের।

গায়ে সুগন্ধ ছড়িয়ে নীলার সামনে দাঁড়ায় বেনোয়া, বলে, শোনো, মন দিয়ে শোনো, আগেই বলেছি আমি, পাসকালকে ছেড়ে এসেছি সত্য, কিন্তু ওর খরচপত্র সব আমাকে বহন করতে হবে। জ্যাকলিনকে ও সময় দিতে পারছিল না চাকরির কারণে, আমিই ওকে বলেছি স্টারসবুর্গের চাকরিটি ছেড়ে দিতে। দিয়েছে। ও বাড়ির খরচ সবই আমাকে দিতে হবে। পাসকাল এবং জ্যাকলিনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমার। বুঝলে?

নীলা বুঝল। নীলা আগেই বুঝেছিল।

তার ইচ্ছে করে বলতে, আমিও তো চাকরি করি না, আমার দায়িত্ব কে নেবে?

কিন্তু আবারও মুখের লাগাম টেনে রাখে।

বেনোয়া চলে গেলে লাইব্রেরিঘরে জে এম কোয়াতেজির ডিসগ্রেস বইটি নীলা হাতে নেয়। বইয়ের নামটি তাকে আকর্ষণ করে, আগে এই লেখকের কোনও বই সে পড়েনি। পড়তে গিয়ে চোখ বারবার চলে যায় পাসকালের ছবিতে। দৃষ্টি দমন করে বইয়ের প্রতিটি শব্দে চোখ ফেলে সে অর্ধেক বই শেষ করে, হঠাৎ খেয়াল হয়, বইয়ে তার মোটেও মন নেই, মন পাসকালে। ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড় বড় শ্বাস নেয় নীলা। কেবল বেনোয়ার সঙ্গে সংসার করছে না সে, করছে বেনোয়ার পুরো পরিবারের সঙ্গে। বড্ড ভিড়ের সংসার।

নীলার ওই শ্বাস বন্ধ হওয়া সময়ে বেনোয়া ফোন করে, ওয়ান্ডাকে খাবার দিয়েছ?

না।

কেন?

মনে ছিল না।

মন যে কোথায় আজকাল থাকে তোমার...যেভাবে বলে দিয়েছি, ঠিক সেভাবে সেভাবে দাও। ছোট্ট একটা কুকুর আর...

আর কী, নীলা বলে, তাকেও হিংসে করছি?

না সে কথা বলছি না, ভাবছি ওর কষ্ট হচ্ছে নিশ্চয়ই।

নীলা ফোন রেখে ওয়ান্ডার তিন বাটিতে তিন রকম খাবার দিল, জলের বাটিতে জল বদলে দিল।

দিয়ে বারান্দায় এসে বড় বড় শ্বাস নিল আবার।

খানিক পর বেনোয়া আবার জিজ্ঞেস করে, দিয়েছ ওয়ান্ডাকে খেতে?

না দিইনি। নীলা ঠাণ্ডা গলায় বলে।

কেন? ওদিকে উত্তেজিত বেনোয়া।

দিইনি কারণ ওয়ান্ডার খাবারগুলো আমি খেয়ে ফেলেছি। নীলার শান্ত স্বাভাবিক গলা।

এ সব কী বলছ তুমি?

ঠিক বলছি। আমি গরিব দেশের মেয়ে, কুকুর বেড়ালকে এত ভাল ভাল খাবার খাওয়ানোর অভ্যেস নেই। এত ভাল খাবার মানুষের জোটে না। তাই লোভে খেয়ে

ফেলেছি।

খটাস।

টেলিফোনের খটাসের সঙ্গে একটি কাচভাঙা শব্দ এসে মেশে। কাচ ভাঙাটি কোন ঘর থেকে, সেটি খুঁজতে গিয়ে দেখে টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে লেজ নাড়ছে ওয়াম্ভা, আর মেঝেয় পড়ে টুকরো হয়ে আছে পাসকালের ছবির ফ্রেম। ছবিটি মেঝে থেকে তোলে না, ঠিক যেভাবে ছিল সেভাবে রেখেই বেরিয়ে যায় সে। বেরোতে গিয়েই দেখে পাশের এপার্টমেন্ট থেকে পুলিশ একটি মৃতদেহ বের করছে। মাদাম সুজান দুগের মৃতদেহ। বয়স পঞ্চাশ হবে সুজান দুগের। নীলার সঙ্গে দেখা হত প্রায়ই সিঁড়িতে, করিডোরে। প্রথামত বজুঁ নীলাও বলেছে, সুজানও। সম্পর্কটুকু বজুঁতেই ছিল, একদিন সুজান কেবল যেচে কথা বলেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, অনেক রাত অব্দি তিনি গান শোনেন, গানের শব্দ নীলার কোনওরকম অসুবিধে ঘটায় কি না। নীলা না বলেছে, গানের কোনও শব্দই সে পায়নি কখনও বলেছে। সুজান দুগে বলেছিলেন, আসলে একা থাকলে গান শুনে সময় পার করা ছাড়া আর উপায় থাকে না। পুলিশের কাছে জিজ্ঞেস করে নীলা জানে, সুজান দুগে এ ঘরে মরে পড়ে আছেন বেশ ক'দিন হল, কনসিয়েজ করিডোর পরিষ্কার করতে এসে বিশ্রী গন্ধ পায়, সুজানের ঘর থেকে বেরোচ্ছে, দরজা ধাক্কিয়ে কারও কোনও সাড়া শব্দ না পেয়ে পুলিশে জানিয়েছে, পুলিশ এসে দরজা ভেঙে আবিষ্কার করেছে সুজানের ফুলে ওঠা মরা দেহ।

সুজানের ফুলে ওঠা পচে ওঠা মুখটি দেখে নীলার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। সে চোখ নাক কান বুজে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেয়ালে হেলান দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে যায়, প্রায় দৌড়ে জর্জ ব্রাসাঁ পার্কে, সরোবরের কিনারে, ঘাসের ওপর শুয়ে আকাশের দিকে মুখ করে, শুয়ে থাকে। তার ভয় হয়, সুজানের মতো সেও একদিন একা ঘরে মরে পড়ে থাকবে।

ঘণ্টাদুয়েক পর জর্জ ব্রাসাঁ থেকে বেরিয়ে শহরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ায়। বিকেলে বাড়ি ফেরে, একটি নতুন ফ্রেম হাতে। পাসকালের ছবিটি ওতে লাগিয়ে ভাঙা কাচ সরিয়ে নিয়ে হাঁসের মাংস রান্না করে, বেনোয়া হাঁস খেতে ভালবাসে।

·

বিকেলে আপিস থেকে ফিরে বেনোয়া বলে, আজ তার মায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে ফোনে। বেনোয়া বলেছে সে নীলাকে নিয়ে যাবে তাঁকে দেখতে। পারলে আজই।

যেন কনে দেখাতে নিচ্ছে বেনোয়া, নীলার সেরকম বোধ হয়। নীলা সাজলও সেরকম, চুল বাঁধল, মুখ সাজল, উঁচু জুতো পরল, পশ্চিমে যা মানায়, লম্বা কালো জামা পরে, গায়ে সুগন্ধী ছড়িয়ে বেনোয়ার হাত ধরে বেরোল।

গার দ্য অস্তারলিজ থেকে অরলেওঁ। পথে এক ঘণ্টা বেনোয়া একাই কথা বলে, বলে নীলার সঙ্গে সম্পর্কটি যদি দুদিনের সম্পর্ক মনে করত, তা হলে তাকে নিয়ে সে তার বাবা মার কাছে যেত না। তারপর আগেও যা বলেছে, তাই নতুন করে বলে, বেনোয়া তার সংসারে অসুখী ছিল না, বরং অতি সুখের সংসার ছিল তার, অত সুখ দেখে তার বন্ধুরা প্রায়ই বলেছে, এমন আদর্শ জুটি তারা এ সমাজে আর দেখেনি। পাসকাল তার অবাধ্য হয়নি কোনওদিন, লক্ষ্মী বউয়ের মতো সে স্বামীর সেবা করে গেছে। স্বামীকে সুখী করার জন্য সে এমন কিছু নেই যে করেনি। সুতরাং এ ভাবার কোনও কারণ নেই, যে বেনোয়া বউয়ের

যন্ত্রণায় তিক্ত বিরক্ত হয়ে অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে। বেনোয়ার গল্প অন্য লোকদের মতো নয়, ভিন্ন। বেনোয়ার জীবনে হঠাৎ বিদ্যুৎচমকের মতো নীলার উপস্থিতি সব কিছু অন্যরকম করে দিয়েছে। এ ঘটেছে বলে বেনোয়া এত পাষণ্ড নয় যে পাসকালকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করবে। পাসকালের যে কোনও প্রয়োজনে সে পাশে দাঁড়াবে। আপিস থেকে বেনোয়ার মাসের বেতন সোজা চলে যাবে পাসকালের অ্যাকাউন্টে, অল্প কিছু সে নিজের হাতখরচের জন্য রাখবে শুধু। এই ত্যাগটি নীলার জন্যই করছে সে। আর সামনের শনি রোববার রু দে রেনের বাড়িতে তার কাটাতে হবে, কারণ পাসকাল বলেছে, জ্যাকলিনও। বুঝলে?

বুঝতে চেষ্টা করছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নীলা। ফুসফুস ভরে শ্বাসের বাতাস সে সংগ্রহ করেছে। কিছু খরচ করলে ক্ষতি নেই।

ইশটিশনে বেনোয়ার বাবা দাঁড়িয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে। দুজনকে তুলে সোজা বাড়ি। বাড়িতে বেনোয়ার মা স্বাগতম জানালেন বেনোয়া আর তার প্রেমিকাকে, গালে গাল লাগিয়ে চকাস চকাস চুমু। বেনোয়ার মাকে নীলা শাশুড়ি জ্ঞান করে মা বলে ডাকতে যাচ্ছিল, শুধরে মাদাম দুপঁ বলে। মাদাম করিন দুপঁ ছোটখাটো ভারী শরীরের হাসিখুশি মধ্যবয়সি, কারখানার শ্রমিক ছিলেন, অবসর নিয়েছেন। আর মসিয়েঁ দুপঁ নীলাকে পাশে বসিয়ে নিজের জন্মের কাহিনী বলে নেন প্রথম, তিনি হচ্ছেন মাঝ চল্লিশ দশকের বেবি বুম-এর একজন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে সৈন্যরা ঘরে ফিরে বউদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে যা ঘটিয়েছিল ইয়োরোপে, তিনি তার ফল। পনেরো বছর বয়সে করিনের মতো তিনিও কারখানার কাজে ঢুকেছিলেন, পরে ভাল লাগে না বলে চলে গেলেন মারসেইয়ে, ওখানে জাহাজে কাজ করলেন দু বছর, তারপর ট্যাক্সি চালালেন কিছুদিন, সে কাজ ছেড়ে আঙুর চাষ করলেন আলসাসে, তাও একসময় ভাল লাগেনি, ছেড়ে পুলিশ হলেন, কোমরে মাঝে মাঝে ব্যথা হয় বলে চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। বেশ আছেন এখন, খান দান, ঘুমোন, কম্পিউটারে তাস খেলেন, দামি পাইপে তামাক টানেন, আর একটি পর্স গাড়ি কেনার স্বপ্ন দেখেন। চারটে গেলাসে পর্তো ঢেলে দিয়ে জুতোর একটি বাক্স আনলেন, বাক্সের ভেতর রাজ্যির ছবি। কোনটি ঠাকুরদা, কোনটি ঠাকুরদার বাবা, ঠাকুরদার ঠাকুরদা ইত্যাদি তো দেখালেনই, কয়েকশো আত্মীয়র ছবিও দেখালেন, আর শেষে বেনোয়ার ন্যাংটোকালের কিছু ছবি। আত্মীয় যারা বেঁচে আছে, তাদের সঙ্গে হঠাৎ কোনও বিয়ে বা সৎকারউৎসবে দেখা হয়, এরপর যে যার জীবনে চলে যায়। বেনোয়াই এ বাড়িতে এসেছে আড়াই বছর পর। বেনোয়া বাড়ি থেকে বেরিয়েছে তেরো বছর বয়সে। লেখাপড়া করেছে এক ক্যাথলিক ইস্কুলে। তারপর বাকেলেরিয়া পাশ করেছে। সরকারই খরচ চালিয়েছে লেখাপড়ার। বাবা মার সঙ্গে যা যোগাযোগ হত, বেশির ভাগই চিঠিতে। পাসকালের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়ার পর ওকে নিয়ে এ বাড়িতে এসেছে, বেনোয়ার বাবা মা পাসকালকে খুবই পছন্দ করেন, জ্যাকলিন জন্ম নেওয়ার পর আবার এসেছে, আর এবার নীলাকে নিয়ে। প্যারিস থেকে মাত্র এক ঘণ্টার পথ, অথচ বেনোয়ার বাবা মাকে দেখতে আসা হয় না, ছুটিছাটায়ও আসা হয় না। জীবন যার যার তার তার। কারও ইচ্ছে নেই অতীত নিয়ে পড়ে থাকার। মসিয়েঁ এবং মাদাম দুপঁর আলাদা জীবন আছে, ছেলেমেয়েকে বারোত্তীর্ণ করে দিয়েছেন, দায়িত্ব পালন শেষ। সন্তান যদি শারীরিক

বা মানসিক ভাবে বিকলাঙ্গ না হয়, তবেই বিরক্ত কম করবে। কোনও সুখবর যদি থাকে, দূর থেকে একবার ফোনে বা চিঠিতে জানিয়ে দিলেই ওঁরা সন্তুষ্ট। বেনোয়ার নতুন প্রেমও মসিয়েঁ এবং মাদাম দুপঁর জন্য সুখবর। বেনোয়া নিজে সুখবরটি বয়ে এনেছে। নীলা দেখতে সুন্দরী কি পেঁচি, নীলার আচার ব্যবহার বানরের মতো নাকি মানুষের মতো, এ তাঁরা বিচার করছেন না। নীলা যে রকমই হোক, তাঁদের পুত্রধন একে নিয়ে সুখী, সেটিই বড় কথা। বেনোয়া যদি এক শাকচুন্নি এনে বলত, এর প্রেমে আমি পড়েছি, একে নিয়ে আমি আনন্দে আছি, মসিয়েঁ দুপঁ শাকচুন্নির গেলাসে পর্তো ঢেলে দিতেন, এবং জন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা শেষে জুতোর বাক্সও আনতেন সামনে। অন্যের পছন্দের ওপর নাক এরা বাঙালির মতো গলায় না। বাঙালি তার ভোঁতা নাক আদিকাল থেকে গলাচ্ছে, যদি নাক গলালে নাকের কিছু ক্ষয় হত, নাক বলতে বাঙালির সম্ভবত আর কিছু অবশিষ্ট থাকত না। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়স অব্দি বেনোয়া যে কীর্তিকাণ্ড করেছে সোৎসাহে তার বর্ণনা করে যান বেনোয়ার বাবা মা। গল্পে গল্পে যা হয়, অরলেওঁ থেকে শেষ রেলগাড়িটি চলে যায় প্যারিসের দিকে, সুতরাং সে রাত থেকে যেতে হয়। বেনোয়া ছোটবেলায় যে ঘরটিতে থাকত, সে ঘরে ছোট বিছানা, ছোট টেবিল, ছোট আলমারিতে ছোট ছোট কাপড় চোপড় এখনও সাজানো, সেই ঘরের বিছানায় নীলাকে নিয়ে বাকি রাত স্মৃতি ও সঙ্গমে পার করে বেনোয়া। শীৎকারের তীব্র শব্দ, নীলা অনুমান করে, বাকি মানুষদুটোর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে। বেনোয়া পরোয়া করে না।

ভোরবেলা অরলেওঁ ছেড়ে জন দার্কের স্মৃতি ছড়ানো শহর ছেড়ে, প্রাণোচ্ছল দুপঁ দম্পতি ছেড়ে প্যারিসের পথে নীলা রেলের জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলোর দিকে। দিগন্ত বিস্তৃত খেত, হঠাৎ হঠাৎ খেতের কিনারে খামারবাড়ি, হৃষ্টপুষ্ট গাভীদের হৃষ্টপুষ্ট দুধের ওলান। কৃষকেরা মাঝে মধ্যে গাড়ি করে সাঁ সাঁ ছুটে যাচ্ছে, হাতে বিয়ারের কৌটো, আনন্দে উৎসবে মেতে আছে। কেউ গোরু চরায় না খেতে, মেশিন বীজ ছড়ায়, মেশিন ফসল কেটে নেয়, মেশিন জড়ো করে। শহর কলকাতা থেকে বেরোলেই নীলা দেখে শীর্ণ গোরু নিয়ে শীর্ণ কৃষকেরা লাঙলে জমি চাষ করে, হাতে ফসলের চারা বোনে, হাতে ফসল কাটে। সারা বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর দুবেলা পেট পুরে খাবার মতো খাবার জোটে না। আর এদেশে কৃষকদের সরকার কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা দেয় ফসল না ফলানোর জন্য, দুধ না উৎপাদন করার জন্য, ভেড়া বা শূকর না বাড়ানোর জন্য। এত ফসল, এত দুধ, এত মাংসে বাজার উপচে পড়ে। এ দেশে উৎপাদন ঘটালে যে খরচা হয় তার চেয়ে অনেক কম খরচায় অন্য দেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানি করা যায়। কৃষক গোঁফ পাকাতে পাকাতে হয়তো হাঁক দিল, আমার যে জমি আছে, ওতে ফসল ফলালে বছরে দশ লক্ষ টাকা আয় হবে, সরকার বলবে তোমাকে আমি কুড়ি লক্ষ টাকা দেব বছর বছর, ফসল ফলিয়ো না।

নীলা হঠাৎ হেসে ওঠে।

কী ব্যাপার হাসছ কেন?

মাঝে মাঝে আমার খুব হাসি পায় বেনোয়া। মানুষের অবস্থার কী পার্থক্য দক্ষিণে আর উত্তরে। কোথাও সম্পদের আধিক্য, কোথাও অভাব। কেউ ধোঁকে, কেউ আনন্দ করে। পুরো ব্যাপারটা কেমন কৌতুক বলে মনে হয়।

নীলা আবার অন্যমন।

বেনোয়া নীলার ধ্যানে টোকা দিয়ে বলে, কী ভাবছ এত।

না তেমন কিছু না।

তেমন কিছু না মানে। আমাকে বলো।

বলার মতো কিছু না।

বলার মতো না হলেও বলো।

বেনোয়ার কণ্ঠে দাবি, প্রেমিকের দাবি। প্রেমিকা অন্যমনে কিছু ভাবলেও তা শোনার বা জানার দাবি সে করতেই পারে, কারণ নীলা বেনোয়াকে জীবন সঁপে দিয়েছে। জীবন সঁপে দিলে শরীর যেমন দেওয়া হয়, মনও দিতে হয়, রেলের কামরায় বসে ভাবা টুকরো টুকরো উদাসীন ভাবনাগুলোও।

জঁ পল সার্ত্রের কথা ভাবছি। নীলা বলে।

আমাদের জঁ পল সার্ত্রের কথা?

হ্যাঁ তোমাদের জঁ পল সার্ত্রের কথা।

বেনোয়া জোরে হেসে ওঠে, আমি ভাবলাম তুমি বুঝি তোমাদের দরিদ্র কৃষকের কথা ভাবছ।

নীলা অনেকক্ষণ চুপ থেকে বলে, সার্ত্র বলেছেন জীবনের কোনও অর্থ নেই, কিন্তু একে অর্থময় করে তুলতে হবে। কী করে অর্থময় করতে হয় বলো তো? কোনও দরিদ্র দেশে দরিদ্র পরিবারে দরিদ্র ছেলে বা মেয়ের জন্ম হল, লেখাপড়া করার সুযোগ জোটেনি, অনাহারে অভাবে অসুখে কষ্ট পাচ্ছে, চব্বিশ ঘণ্টা তার পরিশ্রম করতে হয় এক থালা ভাত জোটাতে, তার হয়তো বিরাট প্রতিভা ছিল বড় একজন বিজ্ঞানী হবার, বা বড় একজন লেখক হবার, বা বড় একজন দার্শনিক হবার। কিন্তু প্রতিভাকে সে কাজে লাগাবে কী করে, বলো? জীবনকে অর্থময় করার তার সুযোগ কোথায়? পেটে যার খাবার নেই, গায়ে যার কাপড় নেই, মাথা গোঁজার যার ঠাঁই নেই, তার কাছে জীবন মানে কি কেবলই যন্ত্রণা নয়?

নীলা মলিনার কথা ভাবে, মলিনার কি কোনও সাধ্য ছিল তাঁর নিজের জীবনকে কোনও অর্থ দেবার? স্বামীর সংসারে বন্দি ছিলেন মলিনা, অদৃশ্য শেকল ছিল মলিনার শরীরে মনে, সামাজিক শেকল, সেই শেকল ছেঁড়ার নিয়ম তাঁর জানা ছিল না। এরকম লক্ষ লক্ষ মলিনা ধুঁকে মরছে সংসারে, জানে না কী করে বাঁধন ছিঁড়তে হয়।

বেনোয়া আবারও হেসে ওঠে, বলে, কী সব আবোল তাবোল বকছ? সবাই তো আর একরকম করে জীবনের অর্থ তৈরি করে না। আমার জীবনের অর্থ হচ্ছে জ্যাকলিন। আমার বাবা মা ধনী ঘরের সন্তান ছিলেন না, তাঁরাও প্রচুর সংগ্রাম করেছেন। সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, আমি তাঁদের জীবনকে পূর্ণতা দিয়েছি, অর্থ দিয়েছি। আর তা ছাড়া পরকালে কৃতকর্মের ফল তো ভোগ করতেই হবে। জীবন অর্থহীন হবে কেন?

নীলা জোরে হেসে ওঠে।

কী হাসছ যে?

নীলা হাসতে হাসতেই বলে, তুমি পরকালে বিশ্বাস কর?

নিশ্চয়ই। তুমি কর না?

না।

কেন তোমাদের ধর্মে তো স্বর্গ নরক আছে! বেনোয়া বলে।

বহুকাল আগে এক বাঙালি লেখক লিখে গেছেন স্বর্গ নরক নিয়ে, কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদুর, মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর। নীলা হাসতে হাসতে বলে।

বেনোয়া সোজা হয়ে বসে, গম্ভীর কণ্ঠ তার, তুমি কি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর না।

নীলা স্পষ্ট স্বরে বলে, না।

আশ্চর্য। বেনোয়া গা ছেড়ে দেয় আরাম চেয়ারে।

ভারতবর্ষের খ্যাতিই হচ্ছে এর অধ্যাত্মবাদ। ভারতে আদিকাল থেকে এরই চর্চা হয়েছে, এখনও এরই চর্চা হচ্ছে, এ সে ইস্কুলের বইয়েই পড়েছে জানাল।

নীলা বলে, প্রাচীন ভারতের চার্বাক দার্শনিকের কথা তোমার ইস্কুলের বইয়ে লেখেনি? তখনকার জনপ্রিয় দর্শনের নাম ছিল লোকায়ত। লোকায়িতরা আত্মা মানত না, ঈশ্বর মানত না, স্বর্গ নয়, নরক নয়। বহুকাল ধরে ভারতবর্ষ ইংরেজদের শাসনে থেকেছে। ইংরেজরা আমাদের বোঝাতে চেয়েছে যে আমরা ভারতবাসীরা, নেহাত খাটো ধরনের মানুষ। সভ্যতার শিক্ষায় জ্ঞানে বুদ্ধিতে কোনওদিক থেকেই ওদের সমান নই, তাই আমাদের পক্ষে দাসত্বটাই স্বাভাবিক। অবশ্যই এ সব মিথ্যে। ভারতবাসীকে ঠকাবার জন্যই এ সব বলা হচ্ছে। এ কারণেই, ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতাসংগ্রাম শুরু হল, কিছু কিছু জাতীয়তাবাদী পণ্ডিত দেশের অতীত গৌরবটাকে খুব বড় করে দেখাবার চেষ্টা করলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস খুঁড়ে প্রমাণ দেখাতে লাগলেন কত মহান, কত উচ্চ আমাদের সভ্যতা। পশ্চিমের বিজ্ঞানবাদ বা বস্তুবাদের বিপরীত ভাববাদ দেখিয়ে বলতে লাগলেন, অতীতে মুনি ঋষিরা বলে গেছেন সংসারটা হচ্ছে অনিত্য, মায়া, মিথ্যা। সংসারের কিছু স্থূল সুখভোগকেই পুরুষার্থ মনে করা নেহাত স্থূলবুদ্ধির লক্ষণ। এ সব হচ্ছে আত্মমর্যাদার কারণে আর একেই পশ্চিমিরা ভেবে নিয়েছে, ভারতের সত্যিকার পরিচয়।

এটুকু বলে নীলার আশঙ্কা হয় এই বুঝি বেনোয়া এখন প্রশ্ন করবে, এতই যদি বস্তুবাদের কদর ভারতবর্ষে, কই, দেশ তো এখনও দরিদ্রই রয়ে গেছে। অর্থনীতির অবস্থা এমন করুণ কেন? মানুষ কেন দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে? নীলা সম্ভাব্য প্রশ্নটির একটি উত্তর দাঁড় করায়, কারণ দুশো বছরের ইংরেজ শাসন অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। প্রশ্ন, ইংরেজ তো গেছে, পঞ্চাশ বছরের বেশি হয়ে গেল। উত্তর, পঞ্চাশ বছর খুব কম সময় দেশকে গড়ার জন্য। বেনোয়া যুক্তি দেখাতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানিতেও কিচ্ছু ছিল না, পঞ্চাশ বছরে ইয়োরোপের সবচেয়ে ধনী দেশ জার্মানি। নীলা তখন আমেরিকার মার্শাল প্ল্যানের কারণটি দেখাবে।

ধ্যুত। মাথা ঝিমঝিম করে নীলার। মাথায় বেনোয়ার ভয় ঘাপটি মেরে আছে। সব কেমন এলোমেলো লাগছে। মনে হচ্ছে কোথাও যেন কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে। মলিনার রোগে ভোগা মলিন শরীরের মতো দেশটি তার পড়ে আছে একা, শুশ্রূষা করার কেউ নেই, নীলা মনে মনে পাখি হয়ে উড়ে যায় দেশটিতে, মনে মনে সে বৃষ্টি হয়ে ঝরে দেশটির খরায় পোড়া শরীরে। নীলার মনে হতে থাকে শেকলে সেও বাঁধা, যদি সে পারত সকল বন্ধন থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে মাথা নত করতে তার দেশটির সামনে! এই নিষ্ঠুর বিদেশ সে কেন

অযথা পড়ে আছে, সে জানে না। এই দেশটিকে যত সে দেখছে, তত তার অচেনা মনে হচ্ছে, এই দেশ তাকে কী দেবে, নিরাপত্তা? কীসের নিরাপত্তা? সুখের, নাকি বেঁচে থাকার! নীলার মাঝে মাঝে মনে হয় বেঁচে থেকে কী লাভ। সুখী হয়েই বা কী লাভ।

নীলার হাতদুটিতে আঙুল বুলিয়ে দিতে দিতে বেনোয়া বলে, তা হলে তুমি কি বলতে চাও তুমি বিশ্বাস করো না যে ঈশ্বর আমাদের গড়েছেন পরস্পরের জন্য?

নীলা জানালা থেকে চোখ না ফিরিয়ে বলে, না।

এখানেই শেষ নয়

সপ্তাহটি নীলার কেটে যায় সংসারী গৃহবধূর মতো। সকাল সাতটায় রেডিয়োর খবর প্রতিদিন বেনোয়াকে ঘুম থেকে জাগায়, সঙ্গে নীলাকেও। একবার সে বলেছিল, রেডিয়োটা এমন বোমার মতো বেজে ওঠে, যে আঁতকে উঠি। ঘুম পুরো হয় না। বেনোয়া বলেছে, খুব বেশি ঘুমোও তুমি, বেশি ঘুমোলে শরীর ভারী হয়ে যায়। শরীর ভারী হয়ে যাবার ভয়ে, নীলা ঘুম থেকে উঠতে থাকে রেডিয়োর শব্দে। উঠে বেনোয়ার জন্য সকালের খাবার তৈরি করতে রান্নাঘরে ঢোকে। এক একদিন একেক রকম প্রাতরাশের ব্যবস্থা করে সে, বেনোয়ার রুচি পরিবর্তনের জন্য। ঠোঁটে চুমু খেয়ে ও আপিসে চলে গেলে নীলা ঘরদোর গোছায়, কাছের দোকান থেকে বেনোয়া যা যা ভালবাসে তা কিনে এনে রান্না করে, আর ঘড়ি দেখে বেনোয়ার ফিরে আসার, ফোনের শব্দ হলে লাফিয়ে যায় ফোন ধরতে। বেনোয়া জিজ্ঞেস করে কী কী করেছে নীলা সারাদিন, নীলা বিস্তারিত বর্ণনা করে। শেষে জিজ্ঞেস করে, আমাকে ভালবাসো? নীলা বলে, হ্যাঁ বাসে। দিনে বেশ কয়েকবার বেনোয়ার এই নিশ্চিতি দরকার হয়। সন্ধেয় ঘরে ফিরে বেনোয়া প্রথম নীলাকে জড়িয়ে চুমু খেয়ে নেয়, তারপর টেলিভিশন খুলে বসে, খাবার ডাক পড়লে খেতে আসে। টেলিভিশনে এর মধ্যে একদিন ভারতের ওপর একটি তথ্যচিত্র দেখিয়েছে, বেনোয়া লাফিয়ে উঠেছে, এসো এসো ভারত ভারত। নীলাকে দেখতে হয়েছে সোনাগাছির মেয়েদের মিছিল। ওদের অধিকার আন্দোলন নিয়ে মূলত তথ্যচিত্রটি। বেনোয়া দেখেছে আর বলেছে, ইস তোমাদের দেশে এত বেশ্যা! নীলা অন্য কথা পেড়েছে বেনোয়ার মন ফেরাতে, আজ তোমার জন্য শামুক কিনেছি। চেখে দেখার আগেই বেনোয়া উমমম উমমম করেছে। ভারতীয় ধ্রুপদী সংগীত শুনিয়ে বেনোয়াকে চমকিত করতে হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়ার বাঁশি চাপিয়ে দিয়ে বেনোয়ার উল্লসিত হওয়া দেখতে তাকিয়ে থেকেছে নির্নিমেষ, বেনোয়া বলেছে, নীলা তুমি কিছু মনে কোরো না, আমি এটা পালটে দিচ্ছি, বলে ফরাসি গানের একটি সি ডি চাপিয়েছে, কেন তুমি চৌরাশিয়ার এমন ভাল বাঁশি পছন্দ করলে না? বেনোয়া দুঃখিত স্বরে শুধু বলেছে, ওয়েল নীলা, ইটস নট মাই কাপ অব টি। বেনোয়া তার ফরাসি কাপ অব টি একাই পান করেছে, একাই পান করে। নীলাকে একদিন হাতে খেতে দেখে বেনোয়া বড় বড় চোখ করে যেন আফ্রিকার জঙ্গল দেখছে তাকিয়েছিল বলে নীলা হাত ধুয়ে কাঁটা আর ছুরিতে খেতে শুরু করে, দেখে বেনোয়া সান্ত্বনা দিয়ে বলেছে, হাতেই খাও না, লজ্জা কীসের, আমরা আর কবে থেকে কাঁটা ছুরিতে খাই! আমাদের আদি পুরুষেরা তো হাতেই খেত। ধরো এক হাজার বছর আগে, তখন কি আর কাঁটা ছুরি ছিল? বেনোয়ার পছন্দের খাবার সাজিয়ে দেয় নীলা টেবিলে, প্রতি রাতেই। বেনোয়া খেতে খেতে মন্তব্য করে, কোন খাবারটি কেমন হয়েছে। কাল যেটা করেছিলে সেটা বেশ স্বাদ হয়েছিল। কোনটা? ওই মাংসের কালিয়াটা? হ্যাঁ।

নীলা পরদিন আবার মাংসের কালিয়া করে। রাতে বিছানায় ঘুমোতে গিয়ে নীলার শরীর নিয়ে বেনোয়া মেতে ওঠে। বেনোয়ার নতুন একটি আগ্রহ জন্মেছে, মৈথুনের পুরোটা সময় জুড়ে সে নীলার কণ্ঠে বাংলা শুনতে চায়, তোমাকে ভালবাসি থেকে শুরু করে তোমাকে আরও চাই, আরও গভীরে, এরকম যত যৌনআবদার বা সুখার্তনাদ আছে, সব। বেনোয়া মানে বুঝবে না, কিন্তু তার শুনতে অন্যরকম লাগবে, অন্যরকম আনন্দ নাকি সে পায়ও এতে। বেনোয়াকে আনন্দ দিতে নীলা তাই করতে শুরু করে, এবং নিজের কাছে নিজের কণ্ঠকে অদ্ভুত লাগে তার, কারণ বাংলায় এ সব বাক্য বলার অভ্যেস তার নেই। নীলা অভ্যেস ঝেড়ে ফেলার চর্চা শুরু করে, রান্না করতে করতে, কাপড় ধুতে ধুতে, ঘর ঝাড়ু দিতে দিতে, জানালার কাচ মুছতে মুছতে। প্রায়ই বেনোয়া বলে ভারতীয় মেয়ের শরীরের আনাচে কানাচে অন্যরকম রহস্য, এই স্বাদই অন্য। এই অন্যরকমটি বেশ লাগে বেনোয়ার। পাসকালের সঙ্গে মিলনে ঠিক যেন এরকম হয় না। নীলার পুলক হয় শুনে যে অন্যরকম এক আনন্দ সে বেনোয়াকে দিতে পারছে, পাসকাল যে অন্যরকমটি দিতে পারে না। তারপর ঝড়ো রতি শেষে শুভরাত বলে চুমু খেয়ে ঘুমিয়ে যাওয়া। রেডিয়োর খবরে আঁতকে উঠে ভোরের চোখ খুলে সুপ্রভাত বলে আরও একটি চুমু খাওয়া। বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন চুমুগুলো রপ্ত করতে নীলার যদিও সময় লেগেছে, এ সপ্তাহে সে নিষ্ঠার সঙ্গে ফরাসি চুমু সংস্কৃতি পালন করেছে, যত হোক ফরাসি প্রেমিক নিয়ে সংসার করতে গেলে এটি না করলে যে চলে না সে জ্ঞান তার আছে। সপ্তাহের একটি বিকেল কাটে পিকাসো জাদুঘরে আর পমপিডুতে। পিকাসোর আঁকা ছবি দেখে নীলা কোনওরকম উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। বেনোয়া জিজ্ঞেস করলে শুধু বলে, দুটো মেয়ে সমুদ্রপাড়ে দৌড়োচ্ছে, ওটি ছাড়া আর কোনও ছবিই তার ভাল লাগেনি। শুনে বেনোয়া বলেছে, বুঝতে গেলে শিল্পবোদ্ধা হতে হয়। নীলা শিল্পবোদ্ধা নয়, তাই সে পিকাসোর দড়ি, ছেঁড়া কাপড় আর পেরেক বসানো শিল্পগুলো দেখে মূর্খের মতো তাকিয়ে থেকেছে।

এত নামী শিল্পী, এত বড় মাপের মানুষ পিকাসো...

নীলা বলে, বড় শিল্পী হয়তো, মানুষ হিসেবে অত্যন্ত ছোট ছিলেন. ফ্রাসোয়াজ তো লিখে গেছে জীবন কেমন ছিল পিকাসোর। স্পেনের গৃহযুদ্ধ নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন, আর নিজের গৃহেই যুদ্ধ বাধিয়ে রেখেছিলেন। অলগা, মারি তেরেস, ডোরা, ফ্রাসোয়াজ, জ্যাকলিন কাকে না ঠকিয়েছেন!

বাহ তুমি তো আমাদের পিকাসো সম্পর্কে বেশ ভাল জানো।

পিকাসো তোমাদের নয়, পিকাসো স্প্যানিশদের।

ওই একই, পশ্চিমের তো!

নীলা পুবের, পশ্চিমের একবারে উলটোদিকে, নীলার স্মরণ হয়েছে।

পমপিডুর আধুনিক শিল্পকলা দেখতে গিয়ে নীলার বিশ্বাস হয়নি এগুলো আদৌ কোনও শিল্প। প্রথম যে শিল্পের সামনে এসে সে থমকায় সে একটি গোরুর মাংসের জামা, পাতলা করে মাংস কেটে মাংসগুলোকে সেলাই করে একটি জামা বানানো হয়েছে, সেই জামা একটি মেয়েকে পরিয়ে ছবিও তোলা হয়েছে। কেবল এই নয়, একটি ছেঁড়া কাগজে পেনসিলে হাবিজাবি লেখা, ব্যাস এটিকে বাঁধিয়ে রাখা হয়েছে, এ নাকি শিল্প। পুরনো ছেঁড়া

কাপড়, ভাঙা রেডিয়ো, ফাটা টায়ার, সিগারেটের খালি প্যাকেট, মোটকথা আবর্জনার স্তূপ থেকে জিনিসপত্র কুড়িয়ে এনে জড়ো করে বলা হচ্ছে এ নাকি শিল্প। একটি নীল ক্যানভাসের সামনে দাঁড়িয়ে নীলা অনেকক্ষণ খোঁজার চেষ্টা করেছে, কোনও একটি দাগ আছে কিনা ওতে, কোনও একটি বিন্দু অন্তত, নেই, এটি নাকি শিল্প! বেনোয়াকে জিজ্ঞেস করেছে, ক্যানভাসে তো আঁকা নেই কিচ্ছু, এটি শিল্প হয় কী করে। বেনোয়া বলেছে, নিশ্চয়ই শিল্প, তা না হলে এখানে রাখা হত না! নীলা যুক্তি খুঁজে পায় না। রাখা হলেই কি শিল্প হয়? আধুনিক শিল্পের ওপর আস্থা হারিয়ে তার বরং অনাধুনিক শিল্প দেখতে ল্যুভরেই ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। পরদিন ল্যুভরে চোখ এবং মন জুড়োতে গিয়ে মিশরের, গ্রিসের আফ্রিকার প্রাচীন শিল্পকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে নীলা বলে, এখন তো আর উপনিবেশ নেই, এই লুটের মালগুলো এখন ফেরত দিয়ে দিলেই তো হয়! যে দেশের শিল্পকর্ম সে দেশেই থাকুক।

বেনোয়ার উত্তর, আমরা রক্ষা করেছি বলে জিনিসগুলো আছে, ও সব দেশে হলে জিনিসগুলো থাকত না

কী হত থাকলে? পোকায় খেত? নীলা বলে।

নীলা ভাবে, সম্ভব হলে এরা মাটি খুঁড়ে পিরামিডও তুলে আনত মিশর থেকে।

সপ্তাহের একটি সন্ধ্যা বেনোয়াকে নিয়ে মরুনির বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে আসে নীলা, ধনী এলাকার এভিন্যু দ্য প্রেসিডেন্ট উইলসনে মরুনির বাড়ি, বাড়িটি মরুনি তার ফরাসি বাবার কাছ থেকে উপহার পেয়েছে।

নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পথে বেনোয়া যখন বলেছে, মরুনির ভাগ্য খুব ভাল।

নীলা বলেছে, কেবল ভাগ্যটাই কি সব, ওর প্রতিভা ছিল বলেই ও বড় হয়েছে।

প্রতি সন্ধেতেই পাসকাল বাড়িতে ফোন করেছে, নীলা হ্যালো বলতেই বলেছে, আমি পাসকাল, বেনোয়া আছে? নীলা বেনোয়াকে ফোন দিয়েছে কথা বলতে, বৃহস্পতিবার রাতে পাসকালের ফোন পাবার পর বেনোয়া রু দ্য রেন-এ চলে গেছে থাকতে, ওখান থেকে ফোনে জানিয়ে দিয়েছে, রাতে সে আর বাড়ি ফিরছে না।

পরদিন বাড়ি ফিরে এলে নীলা দু একটি মামুলি কথার পর বলেছে, কী পাসকালের সঙ্গে শোওনি কাল রাতে?

না।

কেন?

কেন মানে?

ওকে তুমি ভালবাসো, ওর সঙ্গে শুতে তোমার আপত্তি কী?

যেদিন থেকে তোমাকে ভালবেসেছি, সেদিন থেকে কেবল তোমার সঙ্গেই শুই, ওর সঙ্গে নয়। সেই সমুদ্র পাড় থেকে আসার পর ওর সঙ্গে শুইনি।

সমুদ্র পাড়ে যখন ছিলে, তখনও তো তুমি বলতে যে আমাকে ভালবাসো!

আচ্ছা নীলা তুমি এত পেঁচাচ্ছ কেন এ সব নিয়ে। তুমি কি চাও না জ্যাকলিনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক থাক।

নিশ্চয়ই চাই। আমি কেবল জানতে চাইছি, দুজনের সঙ্গে যৌনসম্পর্কে যেতে তোমার অসুবিধে কী? ভালবাসলে যৌনসম্পর্কে যাওয়াটা তো যৌক্তিক মনে করো, আমার সঙ্গে তাই ওই সম্পর্কে গেছ।

আমি পাসকালের সঙ্গে শুইনি, তোমার ভাল লাগবে না বলে।

আমার ভাল লাগবে না বলে তুমি নিজের ইচ্ছেকে দাবিয়ে রেখেছ? নীলা জিভে চুক চুক শব্দ করে দুঃখ করে।

আর তা ছাড়া পাসকালও চায় না আমার সঙ্গে ও সম্পর্কে যেতে।

কী করে জানো পাসকাল চায়নি? ওকে জিজ্ঞেস করেছিলে? তুমি চেয়েছিলে আর ও না বলেছে, এই তো?

নীলা তুমি অতিরিক্ত কথা বলছ।

অতিরিক্ত নয়, আমার কথার উত্তর দাও, পাসকাল যদি চাইত, কী করতে?

মানে?

মানে পাসকাল যদি চাইত তোমার সঙ্গে যৌনসম্পর্ক করতে! তা হলে কী করতে? পাসকাল চায়নি বলে নিজের ইচ্ছেকে দমন করেছ, চাইলে তো সম্পর্কটি করতে, তাই না?

না করতাম না। কারণ আমি জানি তুমি ওর সঙ্গে শোয়াটা পছন্দ করো না।

ধরো আমি যদি পছন্দ করি?

মানে?

মানে হল আমি খুব পছন্দ করব, তুমি যদি আজ রাতে পাসকালের সঙ্গে ঘুমোও। ওকে ভোগ করো।

হঠাৎ এ ব্যাপারটা পছন্দ করছ কেন? তুমি তো ওকে সহ্যই করতে পারো না। হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরো।

আমি হিংসায় জ্বলছি ভেবে তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ। আমি এখন ভারতীয় মেয়েদের তুমি যেমন জানো, ঠিক তেমন, সহনশীল, তেমন নিষ্ঠ, কর্মঠ, এবং অস্বাভাবিক রকমের উদার।

বেনোয়া গুম হয়ে অনেকক্ষণ বসে থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ফিরল দু বোতল ওয়াইন আর এক থোকা গোলাপ হাতে নিয়ে। নীলার হাতে দিয়ে নরম স্বরে বলল, তোমাকে আমি ভালবাসি, এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।

নীলা ফুলগুলো শুঁকে বলল, এ দেশের ফুলে দেখেছি একেবারে কোনও ঘ্রাণ নেই। কেবল দেখতেই যা। আমাদের দেশে যে গোলাপ ফোটে, তাতে কী সুন্দর ঘ্রাণ থাকে।

এ সব তো কৃত্রিম ভাবে ফলানো, তাই। ঘ্রাণ যা আছে, কৃত্রিমতা সব শুষে নেয়। বলে নীলার চুলে আঙুল বুলিয়ে বেনোয়া বলে, তোমার ভেতরে কোনও কৃত্রিম কিছু নেই। তাই তোমাকে আমি প্রতিদিনই আরও বেশি করে ভালবাসছি।

তারপর খুব ধীরে ধীরে নীলাকে পাশে বসিয়ে পাশে শুইয়ে সে বলে যায় গত রাতে পাসকালের সঙ্গে তার কী কথা হয়েছে। ওর জন্য বেনোয়ার যে ভালবাসা, অনেক ভেবে সে দেখেছে এটি নেহাত বন্ধুত্বের, আর হৃদয়ের দুকূল উপচে ওঠা ভালবাসাটি নীলার জন্য। ও বাড়িতে রাত কাটানোটা তার উচিত হয়নি, এ সে বুঝেছে। নীলাকে কষ্ট দেওয়ার কোনও

অধিকার তার নেই। পাসকাল তাকে বলেছে কোনওরকম দোদুল্যমানতার ভেতরে না থেকে যে কোনও একটি সম্পর্ক বেছে নিতে। যদিও এটি খুবই কঠিন একটি সিদ্ধান্ত এমন সাজানো সুন্দর সংসার জন্মের মতো ছেড়ে দেওয়া, তারপরও বেনোয়া নীলাকেই বেছে নিয়েছে। এখন পাসকালের সঙ্গে একটি সমঝোতার ডিভোর্সে যেতে হবে, ডিভোর্স এ দেশে হুট করে হয় না, ধীরে ধীরে এর মীমাংসা হবে, এ নিয়ে দুজনই উকিলের সঙ্গে কথা বলতে যাবে। জিনিসপত্র ভাগাভাগির ব্যাপারটিও মিটিয়ে ফেলবে, কঠিন নয় তেমন। মাঝে মাঝে বেনোয়া এবং পাসকালের যে কথা হবে তা জ্যাকলিনের ব্যাপারেই হবে। অন্য কোনও ব্যাপারে নয়। পাসকাল বলেছে সে একটা চাকরি জোগাড় করে নেবে, যতদিন না নতুন চাকরির ব্যবস্থা হয়, ততদিন বেনোয়ার ওপর নির্ভর করতে না চাইলেও করতে হবে। আর জ্যাকলিনের জন্য পিতার কর্তব্য তার পালন করতেই হবে যেহেতু এদেশে এরকমই নিয়ম। এ আর কদিনই বা, যেভাবে বড় হচ্ছে, খুব শিগরি চৌদ্দ পনেরোয় পড়বে, তারপর তো বাড়ি ছেড়েই দেবে, নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নেবে।

বেনোয়া শুধু বলেই ক্ষান্ত হয়নি, ফ্রেমে বাঁধানো পাসকালের ছবিটি টেবিল থেকে সরিয়ে খালি সুটকেসে ফেলে রাখে, যার ছবি তাকে একসময় ফেরত পাঠিয়ে দেবে, বলে।

সেদিনই সেই শুক্রবারে নীলার কাছে রেজেস্ট্রি ডাকে কিষানলালের উকিলের পাঠানো চিঠি আসে। নীলার সঙ্গে কিষানলালের বিচ্ছেদের প্রক্রিয়া শুরুর বার্তা। চিঠিটি হাতে নিয়ে বসে সে নিজের বুকের ধুকপুকির শব্দ শোনে অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ চোখের সামনের আলোগুলো ঝাপসা হয়ে হয়ে নিবে আসে। বেনোয়া সেই অন্ধকারে ফস করে আলো জ্বেলে দেয়, আমার ওপর তোমার বুঝি আস্থা নেই?

নীলার হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে বেনোয়া আবার বলে, আমার মতো করে তোমাকে এত ভাল কেউ বাসবে না নীলা। কেউ না। বেনোয়ার হাত দুটোয় নিজের হাত দুটো বড় কালো দেখায়।

আমি তোমাকে সর্বস্ব দিয়েছি নীলা। এই আমাকে দিয়েছি। আর কী চাও তুমি বলো! বেনোয়ার নীল চোখ দুটোয় অতলান্তিকের উতল ঢেউ।

বুকের ধুকপুকুনি কেটে যায়। নীলার মুখটি বেনোয়া নিজের দিকে ফেরায়। বিমুগ্ধ নয়নে মহীরুহ দর্শন করে তুচ্ছ তৃণ।

কলকাতা থেকে ফেরার পর প্রথম কলকাতার বাড়িতে নীলা ফোন করে, চিঠি পাওয়ার রাতে। উদ্দেশ্য ডিভোর্সের কথা জানানো, অনির্বাণ আর নিখিলের চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করা, নীলা যে বেঁচে আছে, এবং ভালই বেঁচে আছে, সে খবরটি দেওয়া।

তুই? পশ্চিম দিকে সূর্য উঠল নাকি আজ? নীলার কণ্ঠ শুনে নিখিল বলে।

সূর্য পুবেও ওঠে না, পশ্চিমেও ওঠে না। সূর্য যে জায়গায় আছে, সেই জায়গায়ই থাকে, অন্যদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায়। বলে নীলা।

তা বল, আছিস কেমন। শুনেছি তুই নাকি এক সাহেবের সঙ্গে থাকছিস!

সুনীল বলল তো! ও আমার ফোন নম্বর বা ঠিকানাও দিয়েছে নিশ্চয়ই।

নীলা জানাল, কিষানলালের সঙ্গে তার কাগজপত্রে বিচ্ছেদের ব্যবস্থার কথা। সাহেবকে নিয়ে সে সুখে আছে, শিগরি তাদের বিয়ে হবে। সুতরাং কলকাতায় কেউ যেন রটিয়ে না বেড়ায়, নীলা পতিতা হয়ে গেছে।

তোমার খবর কী দাদা? বিয়ে করছ নাকি? নীলা জিজ্ঞেস করে।

মেয়ে দেখছি। গত মাসে পাঁচটি মেয়ে দেখেছি।

পছন্দ হয়েছে কাউকে?

আরে না।

কেন?

পাঁচটিই কালো। হা কপাল।

পাঁচটি মেয়েই কালো বলে নিখিলের বিয়ে করা হয়নি। কোনও ফরসা মেয়ে পেলে তবেই নিখিল বিয়ে করবে, তার আগে নয়।

নীলা বলে, তুমি তো কালো।

পুরুষেরা কালো হলে কিছু যায় আসে না।

নীলা মনে মনে বলে, তা ঠিক পুরুষেরা কালো হলে, কুৎসিত হলে, কদাকার হলে, অসৎ হলে, নিকৃষ্ট হলে, বদমাশ হলে, দুশ্চরিত্র হলে, দানব হলে, অমানুষ হলে, লম্পট হলে, লোচ্চা হলেও কিছু যায় আসে না।

উৎসবের দিন

বেনোয়ার ছাব্বিশতম জন্মদিন পালন করা হবে ঘটা করে, নীলার ইচ্ছে ভোজ উৎসবে কাকে কাকে নেমন্তন্ন করবে তার একটি লিস্টি তৈরি করে প্রথম।

১. মরুনি
২. ফ্রেডেরিক
৩. দানিয়েল
৪. নাতালি
৫. নিকল
৬. মিশেল কজ
৭. রিতা
৮. মোজাম্মেল
৯. মোজাম্মেলের বন্ধুরা (৩ অথবা ৪)
১০. সানাল এডামারুকু
১১. বাবু গোগিনি
১২. বাবু গোগিনির বউ
১৩. তারিক
১৪. অডিল
১৫. চৈতালি
১৬. সুনীল

মরুনি আর ফ্রেডেরিক জানিয়ে দেয়, তারা আসছে। দানিয়েল জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে তার ইস্কুলে যেতে হবে, সুতরাং আসা হবে না। সম্প্রতি সে নতুন একটি ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে, ওখানে সপ্তাহে তিন দিন 'কী করিয়া সাহিত্য রচনা করিতে হয়'-এর ক্লাস করে। আর নাতালি যাচ্ছে সোলারিয়ামে, ওরও আসা হবে না।

সোলারিয়ামটা কী জিনিস? এ হল কৃত্রিম সূর্যরশ্মি গায়ে ফেলা, রং বাদামি করার জন্য। নিকল মিশেল রিতা এই তিনজনের দুজন প্যারিসে নেই, একজন জানাল, ঠিক এই দিনটিতে কোনও এক বন্ধুর সঙ্গে তার কফি খাবার কথা আছে, আর এ ব্যাপারটি পাকা হয়ে আছে গত চার মাস থেকে, সুতরাং হচ্ছে না। মোজাম্মেলকে নেমন্তন্ন করলে ও লাফিয়ে ওঠে খুশিতে, দিদি এতদিন কোথায় ছিলেন? কত ভেবেছি আপনার কথা। ওই বাক্সবন্দির কারখানায় খুঁজেও এসেছি দুদিন। মোজাম্মেলের উচ্ছ্বাসকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে নীলা বলে,

মোজাম্মেল তার বন্ধুদেরও নিয়ে আসতে পারে। সানাল জানাল সে আসছে। সানালের কাছ থেকে জানল বাবু গোগিনি আর তার বউ হায়দ্রাবাদ গেছে। তারিকের নম্বর নিয়ে জানল, তারিক আর অডিল আসতে চেষ্টা করবে। চৈতালি আর সুনীলকে নেমন্তন্ন করার কথা প্রথম যদিও ভেবেছিল, দ্বিতীয়বার ভেবে, নামদুটো কেটে দেয়। মোট তার অতিথির সংখ্যা দাঁড়ায় সাত। বেনোয়া তার বন্ধু বা আত্মীয় কাকে কাকে নেমন্তন্ন করতে চায় জিজ্ঞেস করলে, বলে, এই আগস্ট মাসে কেউ কি প্যারিসে থাকে নাকি! প্যারিস খালি হয়ে গেছে, পাসকালও আগস্ট কাটাতে চলে যাচ্ছে ক্যানারি দ্বীপে। বেনোয়ার ক্যানারি দ্বীপ দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, এবার নীলার কারণেই তার যাওয়া হচ্ছে না।

উৎসবের আয়োজনে বিষম ব্যস্ত নীলা। মোজাম্মেল খবর নিয়ে জানিয়েছে বাজার সদাই করা আর রান্নায় সাহায্য করতে সে আগে ভাগেই চলে আসতে পারে। নীলা সায় দিল।

উৎসবের দিন দুপুরবেলাতেই মোজাম্মেল জুয়েলকে নিয়ে আসে, জুয়েলকে নীলা দেখেছে কিষানের রেস্তোরাঁয়, বাচ্চা বাচ্চা মুখের ছেলে, মেট্রোয় ফল বিক্রি করা পুলিশের জ্বালায় যার হয়ে ওঠেনি। জুয়েল পেঁয়াজ কাটায় লেগে গেল। ঘরে তো আদা নেই, মোজাম্মেল আদা কিনতে দৌড়োল, আদা নিয়ে আর বেনোয়ার জন্য একটি উপহারের প্যাকেট নিয়ে ফিরল। ছোটখাটো ফরসা মুখের বাইশ কি তেইশ বছর হবে বয়স জুয়েলের, মন দিয়ে পেঁয়াজ কাটল, রসুনও, জিজ্ঞেস করল মাংসটা কি সেই রেঁধে ফেলবে নাকি। রেস্তোরাঁয় কাজ করছে, রান্না শিখেছে, জুয়েলই মাংস রাঁধে। নীলা রুই মাছ ভাজে কড়াইয়ে। সপ্ত ব্যঞ্জন নয়, আয়োজন সপ্তদশ ব্যঞ্জনের। রান্নাঘরেই বনভোজনীয় উৎসব শুরু হয় তিন বাঙালির। রবীন্দ্রসংগীতে দোল খেতে খেতে রান্না শেষ হয়, সন্ধেও পেরিয়ে যায়। সন্ধের মুখে তারিক ফোন করে বলে, পুত্রধনের সিজোফ্রেনিয়া রোগ হঠাৎ মাথাচাড়া দিয়েছে, মন মেজাজ ভাল নেই, আসা হচ্ছে না।

প্রচুর খাবার নষ্ট হবে গো! নীলা ফোন রেখে বলে।

মোজাম্মেল জিজ্ঞেস করে, একটি ছেলের সঙ্গে তার নতুন পরিচয় হয়েছে, নাম মডিবো, ওকে ডাকবে কি না। মাথা চুলকে বলে, ও কিন্তু কালো। মডিবো মালি থেকে খুব বেশিদিন হয়নি এসেছে। বেচারা পুলিশের ভয়ে পালিয়ে পালিয়ে থাকে, টাকা পয়সা নেই, ভাল খেতে পায় না।

নীলা আজ উদারহস্ত। মডিবো কেন, পারলে জডিবো সডিবো, সবাইকে ডাকুন।

বেনোয়া বিকেল হতেই নীলার দেওয়া নতুন প্যান্ট শার্ট পরে, টাই লাগিয়ে তৈরি হয়। নীলা নতুন একটি বালুচরি পরে।

অতিথিরা এসে গেলে শ্যাম্পেনের ফোয়ারা ওঠে ঘরে। ট্রেসি চ্যাপমেনের রেভুলশন নেপথ্যে। উৎসবের মধ্যমণি বেনোয়া। উপহার এদেশে হাতে পড়ামাত্র খোলার নিয়ম, সানাল তার জন্য এনেছে ভারতীয় মৃত্তিকাশিল্প, ইলোরা অজন্তার মিথুনমূর্তি আদলে। আর মোজাম্মেলের প্যাকেট থেকে বের হয় ব্রুট, বেনোয়া প্রত্যেককে বাহ্ বেশ সুন্দর তো, বেশ ভাল তো, বলে বলে ধন্যবাদ দেয়। যদিও নীলা জানে, অন্তত অডি তয়লেত ব্রুট বেনোয়ার কাপ অব টি নয়। নীলার উপহারটি একবারে ছোট্ট, লাল কাগজে মোড়া। ওটি ঠিক এক্ষুনি

না খোলার অনুরোধ করে নীলা। হো হো হাসির রোল, সানালের এক চোখ স্বভাবতই ছোট হয়। নীলা বেনোয়াকে ভরা আসরে ঠিক ফরাসি নয়, এই চুমুটি বাঙালি বলে শুকনো একটি চুমু খেয়ে বলে, এই চুমুতে লালা আর লালসা খানিকটা কম।

জন্মদিন বিষয়ে সানাল তার মত প্রকাশ করে, এই দিনটি খুব দুঃখের একটি দিন, এই দিনটি মনে করিয়ে দেয় মৃত্যুর দিকে একটি বছর এগিয়ে যাওয়া হল। সানাল নিজের জন্মদিনে শোক উৎসবের আয়োজন করে, নিজেই নিজেকে নিমন্ত্রণ করে, একা ঘরে দরজা জানালা সেঁটে অন্ধকারে বসে থাকে, উৎসবের নিয়ম হচ্ছে, সারাদিন উপোস থাকতে হবে, টেলিফোনের প্লাগ খুলে নিতে হবে, টেলিভিশনের রিমোট কন্ট্রোল হারিয়ে ফেলতে হবে। মডিবো, নিকষ কালো অবৈধ ইমিগ্রেন্ট বড় বড় কালো চোখ আর ভোঁতা নাক নিয়ে ট্রেসি চ্যাপমেনের মতো নেপথ্যে থেকে যায়। হাতে গেলাস বটে, গেলাসের শ্যাম্পেন শেষ হয়ে গেলেও মুখ বুজে থাকে। নীলা লক্ষ করে মডিবোকে। সানাল চোস্ত হিন্দিতে বলে, এই হনুমানটাকে এখানে কে নেমন্তন্ন করেছে? সানালের মন্তব্যে মোজাম্মেল আর জুয়েল হেসে কুটিকুটি। নীলা মডিবোর গেলাসে শ্যাম্পেন ঢেলে দিয়ে বলে, আমি।

বাঙালি মশলার খাবারে বরদো নাকি ভাল যায়, বেনোয়ার তাই মত। একটি পর একটি বরদো শেষ হতে থাকে। উৎসব উৎসবের মতোই মাতাল ও রঙিন হয়ে ওঠে। রাত বারোটায় দিকে মরুনি, ফ্রেডেরিক আর সানাল চলে যায়। যাবার আগে, সানাল নীলাকে অভিনন্দন জানায় কারণ নীলার ফরাসি জ্যাকুয়েস লিভস ইন বরদুয়েক্স-এর পর্যায় থেকে যথেষ্ট ওপরে উঠেছে।

সানালের অভিনন্দনের জবাব দেয় নীলা মেরসি বিয়াকুপ বলে।

উৎসবে তুমুল হর্ষধ্বনি।

বেনোয়া শোবার ঘরে চলে যাবার পরও নীলা মোজাম্মেল, জুয়েল আর মডিবোকে নিয়ে আরও রাত পার করতে থাকে। মোজাম্মেল সেই রাঁধুনি বাচ্চুর খবর দেয়, ফ্রান্সে কাগজ পায়নি, তাই ইতালি যাচ্ছিল, দালালকে প্রচুর টাকা দিয়ে ইতালি যাবার ব্যবস্থা করেছিল, দালালই বলে দিয়েছিল কী করে যেতে হবে, কখন দৌড়োতে হবে, কখন লাফিয়ে পড়তে হবে, সব। ইতালির সীমানায় পৌঁছোনোর আগে ট্রেন থেকে অন্ধকারে লাফ দিয়েছিল বাচ্চু, যা নিয়ম। তারপর ট্রেন চলে গেলে লাইনের ওপর দৌড়োনো, পেছনে কোনও ট্রেন এলে, আবার ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়া। এই করে যা হোক, কিছুটা এগিয়েছিল, পেছন থেকে বেমক্কা ধাক্কা দিয়েছে একটি ট্রেন, বাচ্চু ওখানেই শেষ।

নীলার বুকের ভেতর হু হু করে ওঠে।

জুয়েলের এ দেশে আসার গল্পটি শুনতে শুনতে নীলা গেলাসে আরও ওয়াইন ঢালে।

জুয়েল ঢাকা থেকে মস্কো গিয়েছিল, মস্কো থেকে সবজির ট্রাকে করে পৌঁছেছে রুমানিয়ার এক শহরে, ওখান থেকে সীমানা পার হয়ে চেক রিপাবলিকের দিকে, তারপর ওখান থেকেই বরফের পথে সীমানা পার হয়ে জার্মানি। জুয়েলের ভাই রুবেল ছিল জুয়েলের সঙ্গে। জীবনে এর আগে কখনও কখনই বরফই দেখেনি, না জুয়েল, না রুবেল। দ্রুত দৌড়োতে পারবে ভেবে জুতো খুলে দৌড়েছিল রুবেল, বরফের কামড়ে মুখ থুবড়ে পড়ে ওখানেই...

নীলার মনোযোগ ভাঙে বেনোয়ার ডাকে।

শোবার ঘরে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বেনোয়া, চোখে আর কপালে পনোরোটির জায়গায় ষোলোটি ভাঁজ, বাড়তিটি ছাব্বিশে পড়ার।

কারা এরা? কী এত কথা বলছ এদের সঙ্গে? দেখছ না এখানে একা বসে আছি!

বেনোয়ার বুকের ওপর ওয়ান্ডা বসা। নীলা বলে, একা নও তো, ওয়ান্ডা আছে।

বেনোয়া কটমট চোখে তাকায় নীলার দিকে। নীলা বলে, ও ঘরে চলো।

ও ঘরে যাব কেন? কী ভাষায় কথা বলছ ও সব!

বাংলায়। অনেকদিন বাংলা বলি না। বলতে ভাল লাগছে।

আমি যখন তোমাকে বাংলা শোনাতে বলি, তখন তো বলো না।

তুমি তো বাংলা বোঝো না বেনোয়া। তুমি তো বাঙালি নও।

তা আগে বলতে আমাকে যে বাঙালির আড্ডার আয়োজন করেছ।

বাঙালির আড্ডার আয়োজন করলে মরুনি, ফ্রেডেরিক আর সানালকে ডাকতাম না। মডিবোর তো প্রশ্ন ওঠে না। ও জানেই না, বাংলা বলে জগতে কোনও ভাষা আছে।

তোমার বন্ধুদের তুমি খাওয়াবে, ওদের সঙ্গে আড্ডা দেবে, আসল উদ্দেশ্য তো এটাই ছিল। খামোকা আমার জন্মদিনের উৎসব করছ, তা বলার কী দরকার ছিল?

নীলা কোনও উত্তর না দিয়ে ও ঘরে জুয়েলের বাকি গল্প শুনতে যায়। পুলিশ এসে রুবেলকে তুলে নিয়ে যায়, রুবেলের পা কেটে ফেলতে হয়, দু পা-ই। রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়ে পা পচে যাচ্ছিল। চিকিৎসার পর রুবেলকে দেশে পাঠিয়ে দিয়েছে জার্মান সরকার। জমি জিরেত বিক্রি করে লক্ষ টাকা খরচ করে ভবিষ্যৎ নির্মাণ করার স্বপ্ন দেখে ঢাকা ছেড়েছিল রুবেল, আর তাকে ঢাকায় পৌঁছোতে হল অর্থনৈতিক, শারীরিক, আর মানসিক পঙ্গুত্ব নিয়ে।

কুড়ি বছর বয়স ছিল রুবেলের। মোজাম্মেল বলে।

জুয়েল জুতো পরে দৌড়েছিল বলে বরফের কামড় থেকে বেঁচেছে, পুলিশের চোখ থেকেও। জার্মানি থেকে পালিয়ে ফ্রান্সে এসেছে। পুলিশ যে কোনও দিন ঘাড় ধরে পাঠিয়ে দিতে পারে দেশে, অনিশ্চয়তা প্রতি মুহূর্তে। ফেরতই যদি যেতে হয় দেশে, একটিই স্বপ্ন তার, যেন পঙ্গু না হয়ে ফেরত যেতে পারে।

মডিবোও ভবিষ্যৎ গড়তে এদেশে এসেছে, তমবকটু শহরে স্রোতস্বিনী নাইজেরের তীরে শৈশব কৈশোর ফেলে। মডিবো সোনকনোর পুরু ঠোঁট ঝুলে থাকে তার ভবিষ্যতের মতো। পুলিশ থেকে পালিয়ে, বাতিল বাড়ির অন্ধকার কোঠায় ঘুমিয়ে, গির্জার দাতব্য খাবার খেয়ে মডিবো বেঁচে থাকছে। গায়ে শক্তি আছে, মনে সাহস, এ দুটোও দিন দিন ঠোঁটের মতো ঝুলে পড়ছে।

এ সময় সবাইকে হতবাক করে বেনোয়া বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়, কোথায় যাচ্ছ এত রাতে? কী হল-কী? বলতে বলতে নীলা পেছনে পেছনে দৌড়েছিল। নাগাল পায়নি, কনকর্ডের চেয়েও দ্রুত গতি ছিল বেনোয়ার প্রস্থানের।

মডিবোর গল্প মাঝপথে থামাতে হয়। ওদের চলে যেতে হয়। বেনোয়ার গতি এক গুমোট

হাওয়া ফেলে গেছে পেছনে, এ হাওয়া সবাইকেই, নীলাকেও উদ্বিগ্ন করে।

বেনোয়া মিনিট পনেরো পর ফোন করে লোকগুলো গেছে কি না জিজ্ঞেস করে, গেছে নিশ্চিত হয়ে, বাড়ি ফেরে।

ওরা সারারাত থেকে যেতে চেয়েছিল নাকি? তোমার আড্ডাবাজির উৎসব তো শেষ হতেই চাইছিল না। দিনটাই মাটি হল। পাসকাল চেয়েছিল আমাকে রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে যাইনি। জ্যাকলিন জন্মে প্রথম দেখল, আমার জন্মদিনের দিন আমি ওর কাছে নেই। পাসকাল আজ সারাদিন আমাকে মনে করে কেঁদেছে। আর আমাকে তোমার এই রঙ্গ দেখতে হল।

নীলা বলে, তোমাকে তো আমি না করিনি ও বাড়িতে যেতে।

না করোনি, কিন্তু চাও না তো! গেলেই তুমি জিজ্ঞেস করবে পাসকালের সঙ্গে শুয়েছি কি না। তোমার তো শোয়া ছাড়া আর কিছু মাথায় নেই।

গেলাসে ওয়াইন নিয়ে বিছানার সামনের সোফায় বেনোয়া ষোলো ভাঁজ নিয়ে বসে পান করে।

তুমি যে কী করো, তার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝি না, কী দিয়েছ আমাকে এটা কাগজে মুড়িয়ে? কীসের চাবি এটি। চাবিটি নীলার দিকে ছুড়ে দেয় বেনোয়া।

বেনোয়ার হাতে রেনো, মডেল অথেনটিক ১৪, ১৩৯ জি/কিলোমিটার, পাঁচ দরজা লেখা ডিলারের কাগজখানা দিয়ে নীলা বলে, কাল যে কোনও সময় গিয়ে গাড়িটি নিয়ে এসো।

নীলা শুতে যায়। ক্লান্ত সে।

অভিমান

কী জানো তুমি গাড়ির? একা একা গাড়ি কিনতে গেলে কেন? আমাকে বললেই পারতে? পুরো সকাল বেনোয়া চেঁচাল।

কেন গাড়িটি কি কাপুত হয়ে আছে? চলে না?

এ টাকায় আরও ভাল পাওয়া যেত। তুমি ঠকেছ।

নীলা হেসে বলে, আমি সারাজীবন ঠকেছি বেনোয়া। ঠকে আমার অভ্যেস আছে।

বেনোয়ার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, তুমি খুশি হওনি?

নীলার বাহুদুটো ছাড়িয়ে বেনোয়া দূরে গিয়ে বসে বলে, শোনো এরকম আর করবে না, আমাকে না জানিয়ে অচেনা লোককে বাড়িতে ডাকবে না। আজকাল প্যারিসে অনেক চুরি ডাকাতি হচ্ছে।

দেড় সপ্তাহের ছুটি পেয়েছে বেনোয়া। এই ছুটিতে সে কী করবে, জানে না। ফোনে স্ত্রী কন্যার খবর নেয় সকাল বিকাল। ওরা দ্বীপে পৌঁছেছে, সমুদ্রে সাঁতার কাটছে, ভাল হোটেলে আছে।

প্যারিস খাঁ খাঁ করে, বেনোয়ার মনও খাঁ খাঁ করে। সে কখনও আগস্টের ছুটিতে প্যারিসে কাটায়নি।

নীলা বলে চলো মিউচুয়ালিতে তে যাই, ওখানে একটা অনুষ্ঠান হচ্ছে।

ছোঃ নারীবাদীদের অনুষ্ঠান। ওখানে খামোখা চিকন গলায় দাবি করবে এই চাই সেই চাই, এরা তুষ্ট হয় না কখনও। যতসব সমকামী আর কুৎসিত দেখতে মেয়েদের জমায়েত ওখানটায়।

বিজ্ঞাপনে মেয়েদের শরীর ব্যবহার করা যাবে না, কোনও যৌন ইঙ্গিত চলবে না, যে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সুড়সুড়ি জাগানো বিজ্ঞাপন দেবে তাদের দ্রব্যসামগ্রী বর্জনের পক্ষে জোর হাততালি পড়বে আজ মিউচুয়ালিতেতে, আজকের অনুষ্ঠানটিই এ নিয়ে। যৌন ব্যাপারটি নীলার কাছে মোটে অনাকর্ষণীয় মনে হয় না। ভারতে যৌনতা হচ্ছে নিষিদ্ধ জিনিস, ইয়োরোপে নয়, শরীর এবং মনের এই স্বাধীনতা ইয়োরোপে আছে বলেই নীলার মনে হয় যৌন কেলেঙ্কারি এখানে কম ঘটে, যে স্বচ্ছন্দে এ দেশে মেয়েরা স্বল্প পোশাকে হেঁটে বেড়ায়, তা ভারতে সম্ভব নয়। নীলার ইচ্ছে করে যেমন ইচ্ছে তেমন পোশাক পরতে। উলঙ্গ হতে ইচ্ছে করলে উলঙ্গ হবার অধিকার তার থাকবে না কেন! মেয়েরা গা ঢেকে রাখলেও, বিজ্ঞাপন যৌনহীন হলেও পুরুষের মনে যৌনকামনা জাগবে। বড় ব্যাপার হচ্ছে মানুষের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা, সেটি থাকলে কোনও কিছুতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে না। নীলা ভাবে, যদি মিঠুর নিশ্চল শরীরটি নিয়ে আজ

মিউচুয়ালিতেতে রাখা যেত! যদি মলিনার পুরো জীবনের গল্প শোনানো যেত শ্রোতাদের! মলিনাকে বা মিঠুকে কেউ যৌনসামগ্রী হিসেবে বিবেচনা করেনি। কেউ ওদের দিকে লোভের হাত বাড়ায়নি! অথচ এক অব্যক্ত যন্ত্রণা নিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে হয়েছে মলিনাকে, মিঠুকেও। যৌনতাকে একরকম সম্পদ বলে মনে হয় নীলার, যৌনবোধ আছে বলেই, নীলা যৌনসুখ দিতে পারে বলেই বেনোয়া তাকে ভালবাসছে। তা না হলে, দুর্বিষহ একাকিত্ব নিয়ে মলিনার মতো জীবন পার করতে হত, অথবা করতে হত মিঠুর মতো আত্মহত্যা। কীটের মূল্যও সম্ভবত জুটত না নীলার, বেড়াল কুকুরের মূল্যও নয়। ওয়ান্ডাকে যেভাবে আদর করে বেনোয়া, নীলাকে করত না, যদি না নীলার স্তন এবং জঙ্ঘায়, নীলার যোনিরসে, যোনিদেশে অপার আনন্দের খোঁজ না পেত। ভালবাসার বড় কাঙাল সে, ভালবাসা পাওয়ার জন্য যৌনতার যদি প্রয়োজন হয় হোক।

হঠাৎ সুনীলের মুখটি চোখের সামনে ভাসে নীলার, গা গুলিয়ে ওঠে।

আমার কিন্তু ও অনুষ্ঠানে যাওয়ার কথা। তুমি না গেলে বরং আমি একা যাই।

তুমি একা যেতে চাচ্ছ? আর আমি ঘরে একা বসে থেকে আমার ছুটিগুলো নষ্ট করব?

নীলার মিউচুয়ালিতেতে যাওয়া হয় না।

থমথমে দিন পেরোয়, পরদিনও। তার পরদিন বেনোয়া তার রু দ্য রেনের বাড়ি যায় কিছু নাকি কাগজপত্র আছে, গোছাতে। বাড়িতে নীলার একা লাগে খুব, সে বেরিয়ে যায়, বেরিয়ে এদিক ওদিক হেঁটে ঢোকে ক্যাটাকম্বে। মানুষের হাড়ে সাজানো পাতাল। মাটির তলে অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে দুপাশে রাখা কোটি কোটি মানুষের হাড়, খুলি দেখতে দেখতে সে নিশ্বাসের শব্দ শোনে, মৃত্যুর, মৃত্যু যেন তার কাঁধে এসে বসেছে, যেন তার পিঠের ওপর চড়েছে, নীলার হঠাৎ মনে হয় সে বেঁচে নেই। বুঝি সে ওখানেই মুখ থুবড়ে পড়ে হাড় হয়ে গেছে, লক্ষ লক্ষ অচেনা হাড়ের সঙ্গে তার হাড়ও মিশে গেছে। দ্রুত সে পাতাল ছাড়ে। বাড়ি ফেরে। স্নান করে গা থেকে হাড়ের গন্ধ দূর করে আলোর দিকে মুখ করে বসে থাকে বারান্দায়, ট্রেসির ভারী গলায় গাওয়া গানটি তাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, ইফ ইউ থিঙ্ক অব মি, ইফ ইউ মিস মি ওয়ান্স ইন এ হোয়াইল, দেন আই উইল রিটার্ন টু ইউ, আই উইল রিটার্ন অ্যান্ড ফিল দেট স্পেস ইন ইওর হার্ট, রিমেমবারিং ইওর টাচ ইওর কিস ইওর ওয়ার্ম এমব্রেস আই উইল ফাইন্ড মাই ওয়ে ব্যাক টু ইউ. ইট উড ফিল সো গুড টু বি ইন ইওর আর্মস হোয়ার অল মাই জার্নিস এন্ড...

বেনোয়া ফিরে এলে, ওর মন খারাপ করা মুখের দিকে তাকিয়ে নীলা বলে, চলো ইতালি থেকে ঘুরে আসি। এ মুহূর্তে দেশের বাইরে যাওয়ার মতো কোনও টাকা নেই বেনোয়ার, জানায়। স্ত্রী কন্যাকে ক্যানারি দ্বীপে পাঠানোয় অনেক টাকা বেরিয়ে গেছে।

এ কোনও ব্যাপার হল, আমার কাছে আছে তো।

তা হলে তুমি যাও।

আমি একা যাব তুমি ভাবলে কী করে?

বেনোয়া বিষণ্ণ গলায় বলে, আমার যে দিন টাকা হবে সে দিন যাব।

সে তো আর একসঙ্গে যাওয়া হল না!

এ আমার স্বপ্ন, জানো নীলা, আমরা দুজন কোথাও দূর দেশে হারিয়ে যাব, কেবল

দুজন আমরা, চেনা কেউ নেই আশেপাশে, আমরা দুজন দুজনে ডুবে থাকব দিন রাত, এর চেয়ে কাঙ্ক্ষিত কিছু নেই আমার জীবনে, কিন্তু স্বপ্ন অনেক সময় স্বপ্নই থাকে।

বেনোয়ার স্বপ্নালু চোখে তাকিয়ে নীলা বলে, আমাকে কি তুমি আপন ভাবো না? এ তোমার টাকা ও আমার টাকা, এমন করে ভাবো কেন? আমি তো ভাবতে পারি না। আমি তো হিসেব করি না এ ভাবে।

বেনোয়া ম্লান হেসে বলে, ঠিক আছে তুমি এত যখন চাচ্ছ যেতে, চলো।

পত্রিকায় ডগসিটারের বিজ্ঞাপন খুঁজে ওয়ান্ডাকে রু দালেসিয়ায় এক ডগসিটারের কাছে দিনে পঞ্চাশ ফ্রাঁ দরে রাখা হল। এই পুরো মাসটি প্যারিসে কুকুর বেড়াল সিটারের ব্যবসা রীতিমতো রমরমা হয়ে ওঠে।

নীলার হাতে কার্তে ব্লু। বাড়ির পাশে ম্যাগিক্লার্ব। বেনোয়ার দুপাটি হলুদ দাঁত বিকশিত হয় হাতে যখন প্যারিস রোম ফ্লোরেন্স ভেনিসের টিকিট পড়ে।

ইতালি ইতালি ব্লু ব্লু।

ও নীলা, তুমি আমাকে সত্যিই এত ভালবাসো। এ আমার সৌভাগ্য যে আমি তোমার ভালবাসা পেয়েছি।

ফরাসি চুমুর ধকল যায় নীলার ওপর।

বিমানবন্দর থেকে পুরনো রোমের পাঁচতারা হোটেল গালিওর স্যুট। কুজিনো ইতালিয়ানোতে খেয়ে, কলুসিয়ামে ঘুরে, রোমান সভ্যতা বা অসভ্যতার নিদর্শন দেখে, ফন্তানা দ্য ত্রেভির জলে পয়সা ছুড়ে, স্প্যানিশ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছোটবেলার সেই দাঁড়িয়ে থাকাটি এই সিঁড়ির কাছে কি না ভেবে, ভ্যাটিকেন সিটির গির্জায় মাথা নত করে বুকে ক্রশ করে বেনোয়া। সিসটিন চ্যাপেল থেকে বিমোহিত নীলাকে সরিয়ে নিয়ে শহরের আরও কিছু ভেঙে পড়া রোমান সভ্যতা দেখে চোখ জুড়িয়ে হোটেলে ফিরে শাতো মার্গোর স্বাদগন্ধসৌন্দর্য পান করতে করতে সদ্যস্নাত স্নিগ্ধ নীলাকে বলে, তোমাকে মনে হচ্ছে স্বর্গ থেকে নেমে আসা এক অক্ষতযোনি সুন্দরী।

নীলা বলে, আমি এই মর্তলোকের এক ক্ষতযোনি অসুন্দরী।

বেনোয়া নীলাকে নিজের কোলে বসিয়ে বলে, ও রূপসি মেয়ে, তুমি কি একটু পান করবে না এই স্বর্গীয় সুধা। তুমি যে কী হারাচ্ছ, সে যদি বুঝতে।

শাতো মার্গো হারালে আমার কিছু যায় আসে না, তোমাকে যেন না হারাই।

মদির নীল চোখের সুধা পান করতে করতে বলে নীলা।

বেনোয়া চুমু খায় নীলার ঠোঁটে চিবুকে, স্তনে, স্তনবৃন্তে। এক হাতে শাতো মার্গোর গেলাস, আরেক হাতে নীলা। অসম্ভব সুখী দেখায় বেনোয়াকে।

রোম থেকে ফ্লোরেন্সে গিয়ে নীলা বিষম উত্তেজিত। ডেভিডকে সাধ মিটিয়ে দেখবে সে, তার স্বপ্নের ডেভিড।

মিউজি উফিজি সেরে, মিকেলেঞ্জেলোর ডেভিডের চারপাশ ঘোরে নীলা, ঘণ্টা পার করে ডেভিডে।

এত কী দেখো! চলো বেরোই। বেনোয়া তাড়া দেয়।

একটা ব্যাপার লক্ষ করেছ, ডেভিড কিন্তু নিখুঁত নয়। ডান হাতটা দেখো, অতিরিক্ত বড়। নীলা ডেভিড থেকে চোখ না সরিয়ে বলে।

বেনোয়া বলে, এ থাকেই কারও কারও, আমার পুরুষাঙ্গও তো তুলনায় বড়। তুমি তো বলো, ওটির কারণে আমাকে নাকি সাংঘাতিক ভাল লাগে তোমার!

নীলা হেসে বলে, বলেছিলাম।

জাদুঘর থেকে বেরিয়ে বেনোয়া বলে, তুমি খামোকাই এখানে সারা দিনটাই নষ্ট করলে।

ভাড়া গাড়ির চালকের গদিতে বসে, বেনোয়া শব্দ করে শ্বাস ছাড়ে, তা মাদাম কোথায় যাবেন এখন?

তুমি চলো, যেখানে খুশি।

আমার খুশিমতো কিছু কি আর হয়? তুমি বলো।

তোমার খুশিমতো কিছু হয় না? তুমি কি জাদুঘরে যাওয়া পছন্দ করোনি।

আমার এ সব জাদুঘর টাদুঘর ভাল লাগে না। তুমি পছন্দ করো, তাই গিয়েছি।

তা হলে কোথায় যেতে চাও, চলো।

না সময় নেই।

সময় থাকলে কোথায় যেতে?

সে আর বলে লাভ কী? আচ্ছা নীলা তুমি গাড়ি চালাও না কেন?

আমি চালাতে জানি না।

তুমি না বলেছ, কলকাতায় তোমাদের গাড়ি আছে।

আছে, সে ড্রাইভার চালায়।

বেশ ধনী তোমরা, তাই না?

গরিব দেশ, যাদের গাড়ি আছে, প্রায় সবাই চালক রাখে। খুব একটা খরচ না।

তুমি বলেছিলে, কাজের লোকও আছে তোমাদের বাড়িতে। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক ধনী।

ওই একই উত্তর। কাজের লোক রাখতে খুব একটা পয়সা খরচ হয় না। ওখানে সবই সস্তায় পাওয়া যায়।

মানুষও সম্ভবত! আচ্ছা ওখানে ক্রীতদাসপ্রথা আছে, তাই না?

না।

গাড়িচালকের চাকরি দিয়েছ আমাকে। কোথায় যেতে হবে বলো, নিয়ে যাই। ম্যাপ আছে হাতের কাছে, দেখে খুঁজে বার করব ঠিকানা।

নীলা উত্তর দেয় না।

তুমি টাকা দিয়ে ভালবাসা কিনতে চাও নীলা। বেনোয়া উদ্দেশ্যহীন গাড়ি চালাতে চালাতে বলল।

কী জানি! হয়তো আমি তোমাকে জিগোলো ভাবছি!

অসভ্যের মতো কথা বলো না।

টাকা খরচা করছি তোমাকে ভালবেসে। তুমি কি ভয় পাচ্ছ ভেবে যে তোমার হয়তো কোনও বিনিময় দিতে হবে? ভয় পেও না, তোমার কিচ্ছু দিতে হবে না।

বেনোয়া চোয়াল শক্ত করে বলে, তুমি খুব স্বার্থপর। ইতালিতে বেড়াতে এসেছ, আমাকে এনেছ তোমার স্বার্থে। আমাকে তোমায় গাড়ির চালক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এনেছ। তুমি আমাকে ভালবাসো না নীলা, তুমি আমাকে ব্যবহার করছ। কেবল আমিই তোমাকে ভালবাসি, উন্মাদের মতো ভালবাসি।

ফ্লোরেন্সে বাকি দুদিন থমথমে সময় কাটিয়ে ভেনিসে গেল দুজন। ভেনিসে কোনও গাড়ি ভাড়া করল না নীলা। দরকারও নেই। জলে থইথই করছে সব, গাড়িঘোড়া যা চলে, জলের ওপর চলে। নীলা স্বস্তি পায় এই ভেবে যে অন্তত বেনোয়া একরকম মুক্তি পেল চালক হওয়ার অপমান থেকে। এবার কী করবে, চলো গণ্ডোলায় ঘুরে বেড়াই। গণ্ডোলায় করে ভেনিসের প্রাসাদ দেখা, আস্তর খসে পড়া কদাকার বাড়ি দেখা, কারাগার দেখা সবই হল। ভেনেসিয়ানরা আর ভেনিসে থাকে না, চলে গেছে পাদোবায়, বা আশেপাশের গ্রামে, ভেনিসে এত চড়া দামে জীবনযাপন সম্ভব নয় ওদের। আমেরিকান আর জাপানের ধনীরা এসে ভেনেসিয়ানদের বাড়িঘর কিনে নিয়েছে, সারাবছর জানালা বন্ধ থাকে বাড়িগুলোর, বছরে একবার জানালা খোলে, ধনীদের যখন গণ্ডোলায় ভেসে বেড়াবার শখ হয়।

দীর্ঘশ্বাসের সেতুতে হাঁটতে গিয়ে নীলা দাঁড়ায়। জানো ওয়ার্ডসওয়ার্থ কবিতা লিখেছেন এই দীর্ঘশ্বাসের সেতু নিয়ে। প্রাসাদ থেকে বন্দিরা কারাগারে ঢুকতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত এই সেতুতে দাঁড়িয়ে, শেষবারের মতো দেখে নিত নীল লেগুন। আহা।

নীলা আহা বলল একশো কবুতরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে প্রাসাদের পেছনের চত্তরে, উড়িয়ে দিয়ে ঝাঁক ঝাঁক কবুতর।

কী ব্যাপার, কবুতরদের ওড়াচ্ছ কেন এভাবে? ওরা খাচ্ছে খাক।

উড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ আমার হিংসে হয় ওদের। তাই।

কবুতরকেও হিংসে করো?

হ্যাঁ করি।

কেন?

ওদের মতো উড়তে পারি না বলে।

বেনোয়া একা হেঁটে গেল একটি ক্যাফের দিকে। নীলা দাঁড়িয়ে রইল ঝাঁক ঝাঁক নেমে আসা কবুতরের সঙ্গে। একা।

রাতে হোটেলের ঘরে শুয়ে নীলা জিজ্ঞেস করে, অভিমান বলে চমৎকার একটি বাংলা শব্দ আছে। অন্য কোনও ভাষায় এই শব্দটির ঠিক অনুবাদ হয় না। ফরাসি ভাষায় কি এই শব্দটির অনুরূপ কোনও শব্দ আছে?

উত্তর দেবার সময় হয় না বেনোয়ার, কারণ ওর মোবাইল বেজে ওঠে। পাসকালের ফোন।

ফোনে কথা শেষ করে এসে প্রায় ঘুমিয়ে পড়া নীলাকে জাগিয়ে অন্যরকম তরলের স্বাদ নেয় বেনোয়া। অন্যরকম শরীরের, অন্যরকম রঙের, অন্যরকম ভঙ্গিমার, অন্যরকম দোলের।

বেনোয়া তার না-নিখুঁত শরীর দিয়ে নীলার শরীর ঢেকে দিতে দিতে, নীলার অন্যরকম রহস্যের ভেতরে, ঢুকি কি ঢুকি না, ঢুকি কি ঢুকি না ধরনের খেলা খেলতে খেলতে বিষম বেগে নিজেকে ঠেলে দেয় ভেতরে।

আমাকে টের পাও? আমাকে অনুভব করো?

নীলার মুখের কাছে মুখ নিয়ে বেনোয়া বলে যায়, বলো, বলো আমাকে ভালবাসো। বলো খুব ভালবাসো আমাকে। বলো আমাকে পাগলের মতো ভালবাসো। বলো জ তেম আলা ফলি। বলো আলা ফলি। বলো, আমি তোমার সব। বলো যে আমাকে ছাড়া বাঁচবে না তুমি। বলো যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে ভালবাসবে না। বলো নীলা বলো।

নীলা মুখ সরিয়ে নেয়, বেনোয়ার মুখ থেকে মরা ইঁদুরের গন্ধ বেরোচ্ছে। এ গন্ধ বেনোয়ার মুখ থেকে প্রায়ই বেরোয়, নীলার কেবল একে গন্ধ বলে কোনওদিন মনে হয়নি। অথবা, কী জানি, নীলা ভাবে, হয়তো সুগন্ধ বলেই মনে হয়েছে।

এখানেই শেষ

এ মাসে ঋতুর দেখা পায়নি বলে নীলা ডাক্তারের কাছে যায়। ডাক্তার পরীক্ষা করে জানায়, নীলার পেটে বাচ্চা। ডি এন এ পরীক্ষা করে বেনোয়া দুপঁ হচ্ছে বাচ্চার বাবা, তাও বলে কশঁ হাসপাতালের ডাক্তার।

বেনোয়া বিপুল উল্লাসে মেতে ওঠে। হাসপাতালের করিডোরে একশো লোকের মধ্যে নীলাকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে চুমু খায়। সারা পথ চুমু খেতে খেতে, আমার জীবন সার্থক হল, আমার স্বপ্ন পূর্ণ হল বলতে বলতে বাড়ি ফিরে নীলাকে কোলে তুলে দোল খায়, নীলাকে বুকের মধ্যে নিয়ে প্রচণ্ড আবেগে বলে, বারবার বলে জ তেম জ তেম জ তেম। জ তেম আলা ফলি।

এই পৃথিবীতে আমার মতো সুখী আর কেউ নেই নীলা, আমার মতো ভাগ্যবান আর কেউ নেই।

নীলার উদাস দুটো চোখ জানালায়।

উদাস মুখটি বেনোয়া নিজের দিকে ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করে, কী ভাবছ এত! আমাদের ছেলের নাম কী দেবে তাই নিয়ে? বাংলা নাম দিতে চাচ্ছ তো।

নীলা বলে, ভাবছি আমার একটা চাকরি জোগাড় করতে হবে। টাকা পয়সা যা ছিল, সব ফুরিয়েছে।

ও ভেবো না, সে আমি দেখব। নীলার পেটের মসৃণ বাদামি ত্বকে চুমু খেতে খেতে বলে বেনোয়া।

এ বাড়িটা আর পোষাতে পারব না, ছেড়ে দিতে হবে পরের মাসে।

কী জানো, বেনোয়া উঠে বসে, মুখে তৃপ্তির হাসি, তোমাকে আমি আমার বাড়িতে ওঠাব। পাসকাল অন্য এলাকায় বাড়ি ভাড়া নেবে। বেশ হবে, তাই না?

বেনোয়ার চোখের ওপর নেমে আসা কটি সোনালি চুল সরিয়ে দিয়ে নীলা বলে, ও বাড়িতে তুমি পাসকালের সঙ্গে থেকো।

বেনোয়া লাফিয়ে বিছানা থেকে নামে। কী বলছ তুমি? তুমি কি ভাবো পাসকালকে আমি তোমার চেয়ে বেশি ভালবাসি?

নীলা বলে, না, এটা আমি ভাবছি না।

তা হলে তুমি জানো যে তোমাকে আমি কী ভীষণ রকম ভালবাসি।

না বেনোয়া তুমি আমাকে ভালবাসো না। অদ্ভুত শান্ত স্বর নীলার।

নীলাকে এক ঝটকায় শোয়া থেকে ওঠায় বেনোয়া, কী বলছ কী তুমি?

বেনোয়ার হাত সরিয়ে নিজের বাহু থেকে, নীলা বলে, আমি ঠিকই বলছি।

তা হলে ওই হিংসেটা এখনও যায়নি তোমার, পাসকালের সঙ্গে আমার দুটো কথা

বলাও তুমি সহ্য করতে পারো না! ভাবো যে পাসকালকে আমি ভালবাসি!

নীলা বেনোয়ার চোখে কালো গভীর শান্ত চোখ রেখে বলে, বেনোয়া তুমি পাসকালকে ভালবাসো না।

বেনোয়ার চোখ, চোখের পাতা কাঁপে, তা হলে কাকে বাসি।

তুমি তোমাকে ভালবাসো। তোমার নিজেকে। আর কাউকে না।

বোকার মতো কথা বোলো না নীলা। বেনোয়া ধমকে ওঠে।

নীলা হাসে। সত্য কথা বললে বুঝি রাগ হয় তোমার? কী জানো বেনোয়া, এতদিনে আমি একটি জিনিস জানতে পেরেছি, আমার বাবা অনির্বাণ, আমার সেই প্রেমিক সুশান্ত, স্বামী কিষানলাল, আর ওই সুনীল এদের চেয়ে তুমি মোটেও আলাদা নও। বাইরেটা দেখলে অবশ্য আলাদা মনে হয়, সুন্দর সুন্দর প্রেমের বাক্য আওড়াও, যখন তখন চুমু খাও, লেডিস ফার্স্ট বলে লেডিসদের আগে যেতে দাও, বা ফুল বাড়িয়ে দাও, বা রান্নাঘরে এটা সেটা করতে সাহায্য করো, বা রাস্তায় প্যারামবুলেটর ঠেলো, তোমাদের মধ্যে খুব ভেতরে, অদ্ভুত এক মিল আছে।

নীলাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বেনোয়া বলে, তোমার পেটে আমার বাচ্চা নীলা। তুমি দেখতে পাচ্ছ না আমার কত আনন্দ হচ্ছে এ কারণে!

বেনোয়ার বাহু থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নীলা বলে, একজন মাদাম বাটারফ্লাইয়ের দরকার তোমার বেনোয়া, তাই না? কিন্তু আমার কোনও শখ নেই তা হওয়ার।

কেন একথা বলছ? বেনোয়ার সারা গা থরথর কাঁপে, ভয়ে কি রাগে নীলা ঠিক বুঝতে পারে না।

আমি তোমাকে অনেকদিন অন্যরকম স্বাদ দিয়েছি, একজোটিক সামগ্রীর স্বাদ গন্ধ সবই তোমার পাওয়া হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে। নিজের প্রতি আমার এতটুকু বিশ্বাস, এতটুকু শ্রদ্ধাবোধ ছিল না বলে তোমার ভালবাসার মোহে আমি এতদূর এসেছি। এবার মুক্তি দাও, মাদাম বাটারফ্লাইয়ের মতো বাকি জীবন কেঁদে কাটানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অন্তত এ সুখ তোমাকে আমি দিতে চাই না! তুমি তো দেখে মজা পেতে চাও প্রাচ্যের বোকা সোকা মেয়ের প্রেম এবং বিরহ। শেষ অব্দি আত্মহত্যা! না। ওটি আমি করছি না।

বেনোয়া ঘন ঘন শ্বাস নেয়, বলে, আমি তোমাকে বিয়ে করব নীলা। তুমি আমার বউ হবে নীলা। পাসকালকে আমি কালই ডিভোর্স দেব। কালই। চলো বিয়ে করি। বিশ্বাস করো আমাকে, আমি তোমাকে বিয়ে করব। তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।

নীলা বেনোয়ার কাঁধে হাত রেখে থরথর কাঁপুনি থামায়।

আমি তোমাকে বিশ্বাস করছি যে তুমি আমাকে বিয়ে করবে। কিন্তু আমি তোমাকে বিয়ে করব না।

নীলা, তোমার বাচ্চা হবে। আমরা একসঙ্গে থাকব। আমাদের ছেলে নিয়ে আমরা সুখের সংসার করব। সারাজীবনের সুখের সংসার।

না এ বাচ্চা হবে না।

মানে?

হবে না মানে হবে না। আমি অ্যাবরশন করব।

বেনোয়া হাউ মাউ করে কেঁদে ওঠে। নীলার পাদুটির ওপর মাথা রেখে কাঁদে। বেনোয়ার চোখের জলে নীলার পা ভিজে যেতে থাকে। অস্ফুট ভেজা কণ্ঠে বেনোয়া বলতে থাকে, ন মে কিত পাঁ। ন মে কিত পাঁ। আমাকে ছেড়ো না।

এত নিষ্ঠুর হয়ো না তুমি, বলে বলে বেনোয়া কাঁদে আরও। বাড়ি কাঁপিয়ে কাঁদে। মাথা দেয়ালে ঠোকে। একবার দুবার তিনবার। কপাল কেটে রক্ত বের হয়। চিৎকার করে বলতে থাকে, এ কথা তুমি ফিরিয়ে নাও। সেই ফাটা কপাল মেঝেতে ঠোকে, বলতে বলতে তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না নীলা। নিষ্ঠুর হওয়া তোমাকে মানায় না।

নিষ্ঠুর হওয়া বুঝি কেবল তোমাকে মানায়?

বেনোয়াকে মেঝে থেকে তুলে বিছানায় বসিয়ে নীলা বলে, এমন পাগলামো করার কোনও মানে হয় না।

বেনোয়া নীলাকে জড়িয়ে ধরে বলে, তুমি আমার, তুমি আমার। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারো না। আমি তোমাকে সব দিয়েছি, যত ভালবাসা আছে সব দিয়েছি। ভালবাসা কাকে বলে আবেগ কাকে বলে আমি তোমাকে ভালবেসে বুঝেছি, এত গভীর করে জীবনে কাউকে আমি ভালবাসিনি, আমাকে তুমি কষ্ট দিয়ো না। তুমি আমাকে ভুল বুঝছ নীলা। তুমি বুঝতে পারছ না, তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও আমার এ জীবনের কোনও মানে হয় না, আমি আত্মহত্যা করব। পৃথিবীতে অনেক মেয়ে দেখেছি, তোমার মতো কাউকে দেখিনি, তোমার মতো এত ভাল, এত সৎ, এত উদার, এত মায়াময়ী, এত সহিষ্ণু, এত নিঃস্বার্থ কাউকে দেখিনি, কেউ হয় না তোমার মতো। তুমি এই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ মানবী। তোমার মতো হওয়ার কারও সাধ্য নেই। তোমার কোনও তুলনা হয় না। তুমি যে কত বড়, কত মহান এ তুমি নিজেও জানো না, আমি জানি। আমার এই তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অন্ধকার জীবন তুমি আলোকিত করেছ, তোমাকে আমি হারাতে পারব না। যত ভালবাসা আছে আমার, আমি সব দেব, আর কাউকে না। আমাকে তুমি তোমার পায়ের তলায় রাখো। তবু ছেড়ো না।

নীলা হো হো করে হেসে ওঠে।

বেনোয়া তুমি পাগল হয়ে গেছ। আবোল তাবোল বকছ।

বেনোয়া ঝটিতে উঠে হাতের সোনার আংটিটি আঙুল থেকে খুলে নীলাকে দেখিয়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে দেয় বাইরে। তুমি আমার বউ হবে, নীলা, বলো, বউ হবে আমার।

নীলা মাথা নাড়ে। সে হবে না।

কেন আমাকে ভুল বুঝেছ? কী করেছি আমি? কোথায় আমার ভুল হয়েছে বলো? বলো শুধরে নিই। যদি হয়ে থাকে আমাকে ক্ষমা করো।

নীলা বলে বেনোয়ার কোনও ভুল হয়নি, ক্ষমা করার কিছু নেই। শোধরানোর কিছু নেই।

তা হলে কেন?

তা হলে কেন, বেনোয়া বলে যায়, হাতের আঙুল গুনে গুনে, সেই প্রথম দিন থেকে আমি তোমার জন্য করেছি। প্রথম দিন গার দ্য নর্দে পৌঁছে দিয়েছি আমার গাড়ি করে। তোমাকে আমি প্যারিসের বিভিন্ন জায়গা চিনিয়েছি। নিজের জন্য সময় দিইনি, তোমার জন্য সমস্ত সময় খরচা করেছি আমি। বাড়ি ভাড়া নেবে বলে তোমার আমি বিভিন্ন জায়গায় বাড়ি দেখতে নিয়ে গেছি। যখনই ডেকেছ, আপিসের কাজ ফেলে তোমার কাছে চলে এসেছি। এত বিশ্বাস করেছি তোমাকে, প্রথম থেকে তোমার সঙ্গে আমি কনডম ব্যবহার করিনি। তোমাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছি। আমি নিজে হাতে রান্না করেছি, টেবিলে খাবার দিয়েছি। বাড়ি পরিষ্কার করেছি। ভ্যাকুয়াম করেছি। জল চাইলে জল এনে দিয়েছি। চা করে দিয়েছি। তোমার ওই বদমাশ বাঙালি বন্ধু তোমাকে ধর্ষণ করে গেলে আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিয়েছি। আমি তোমার ভয় দূর করেছি।

নীলা মাঝপথে বলে, আঙুল গুনো না, এই তোমাদের একটি বিচিত্র স্বভাব, আঙুলে গোনা। এত হিসেবি তোমরা, এটা জানো না কেন? নীলা দু হাত চোখের সামনে তুলে বলে, আঙুলে গুনলে মাত্র দশটি সুযোগ পাবে, আর কড়ায় গুনলে দু হাতে চল্লিশটি পাবে। তোমাদের হিসেবে সুবিধে হবে।

বেনোয়া ধমকে থামায় নীলাকে, তোমাকে আমি আমার বাবা মার বাড়িতে নিয়ে গেছি। তোমার জন্য পাসকালকে ছেড়ে আমার ছোট্ট সুন্দরের আদরের বাচ্চাকে ফেলে তোমার সঙ্গে জীবনযাপন শুরু করেছি। পাসকালকে ডিভোর্স দিয়ে তোমাকে বিয়ে করার কথা ভেবেছি। পাসকালকে আঘাত দিয়েছি, জ্যাকলিনকে বাবার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত করেছি। ইতালি যেতে ইচ্ছে করেছ, ইতালি গেছি। যেখানে যেখানে যেতে চেয়েছ, নিয়ে গেছি।

নীলা বলে, আমি জানি, বেনোয়া তুমি আমার জন্য অনেক করেছ।

তা হলে কেন স্বীকার করতে চাও না যে আমি তোমাকে ভালবাসি!

নীলা হাসে।

তুমি কি অন্য কারও প্রেমে পড়েছ?

নীলা আবারও হাসে।

বলো সেই দিনের ওই লোকগুলোর সঙ্গে যে সারারাত ফুসুর ফুসুর করলে, ওদের কারও সঙ্গে কি তোমার কিছু হয়েছে? বলো, কাউকে কি ভাল লেগেছে?

নীলা হেসে বলে, ওই মডিবোকে লেগেছে ভাল।

ও তুমি ভেবেছ কালো লোকদের শিশ্ন তো বেশ বড় হয়, তাই আরও বড় পাবার লোভ করছ? ও ব্যাটার ওটা ধরে দেখেছ নাকি? নীলার হাত টেনে নিজের উরুর মাঝখানে রেখে বলে, দেখো তো এর চেয়ে বড়। আমারটির চেয়ে বড়? এর দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ, আট ইঞ্চি ঘের, এটির চেয়ে বড়? আমি যত সুখ দিই তোমাকে, ও ব্যাটা কোথাকার কোন জঙ্গল থেকে আসা, ও দিতে পারবে? ওই বনমানুষটি কোনও শিল্প জানে?

নীলা হাত টেনে নেয় বেনোয়ার শক্ত মুঠো থেকে।

ধীর শান্ত কণ্ঠে বলে, বেনোয়া, এ বাড়িতে তোমায় যা কিছু আছে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও।

তুমি মন থেকে বলছ এ কথা?

হ্যাঁ। মন থেকে বলছি।

তুমি খুব বড় একটি ভুল করছ তা জানো?

আমি কোনও ভুল করছি না।

আমাকে ভালবাসো না?

না।

ভেবে বলছ? বুঝে বলছ?

হ্যাঁ।

আমাদের সম্পর্ক তুমি আজ এখানে শেষ করে দিচ্ছ?

দিচ্ছি।

বেনোয়া উঠে দাঁড়ায়। ঘৃণা উপচে পড়ে তার দুচোখে।

নীলা পিঠের পেছনে দুটো বালিশ দিয়ে হাঁটু তুলে বসে।

তুমি আমার সঙ্গে এতদিন খেলেছ নীলা। আমাকে নিয়ে তুমি মজা করেছ। তুমি আমাকে বোকা বানিয়েছ। তুমি এই করে বেড়াও। তুমি একটা লোভী, একটা স্বার্থপর, একটা ইতর, নীচ, নষ্ট, নিকৃষ্ট মেয়েমানুষ। তুমি পাসকালের কথা বলো, পাসকালের নখের যোগ্য হওয়ার যোগ্যতা তোমার নেই। তুমি আগাগোড়া শুন্য, একটা ফাঁকা, ফাঁপা জিনিস। পৃথিবীতে অনেক মানুষ দেখেছি, এত জঘন্য কাউকে দেখিনি। তুমি আমাকে সর্বস্বান্ত করেছ। তুমি জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করেছ। আমাকে ধ্বংস করেছ। আমার সংসার ধ্বংস করেছ। আমি কী ভীষণ বোকা ছিলাম, তোমার মতো একটা বাজে মেয়েকে আমি ভালবাসতে গেছি ছি ছি। তুমি অধমেরও অধম। তোমার মুখের দিকে তাকাতে আমার ঘৃণা হচ্ছে। তুমি একটা কুৎসিৎ কুশ্রী মেয়ে। নিকৃষ্টেরও নিকৃষ্ট। তোমাকে ভালবাসা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় পাপ। আমার নিজের ওপরই ঘেন্না হচ্ছে আমার। তুমি একটা খুনি, তুমি আমার বাচ্চাকে খুন করছ। তুমি একটা নিষ্পাপ শিশুকে খুন করছ। তোমার মতো এত বড় খুনি আমি সচক্ষে দেখিনি।

বেনোয়া থুতু ছোড়ে নীলার দিকে।

নীলা হাসে। বলে, আবারও বলছি আঙুলের কড়া গুনে হিসেব করো। এতে সুবিধে হবে। লম্বা লিস্টি তো।

বেনোয়া বলে যায়, মিমিজাঁতে লাথি খেয়েছিলে না, বেশ করেছিল ওরা, এ দেশের সহজ সরল মানুষদের তোমার নিশ্বাসের বিষে মারতে চাচ্ছ, তোমার লাথি খাওয়াই উচিত। নিজেকে কী ভাবো? সবজান্তা কিছু একটা হয়ে গেছ। কিচ্ছু জানো না তুমি। কিচ্ছু না। তোমার কীসের এত অহংকার? অহংকারের কিচ্ছু নেই তোমার। আমার জ্যাকলিনও তোমার চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখে। তোমার মাথায় থাক থাক পচা গোবর ছাড়া আর কিছু নেই। আমি তোমাকে করুণা করেছি, তা না হলে কে তোমার দিকে ফিরে তাকাত! কেউ না। নর্দমার কোনও কীটও না। তুমি ভাবো যে তুমি বিছানায় বেশ ভাল।

হা। তাও তো জানো না। তুমি একটা মরা কাঠ, তুমি একটা হাস্যকর বস্তু নীলা, স্রেফ একটা হাস্যকর বস্তু। তুমি একটা সমকামী। বাজে চরিত্রের মেয়ে। তোমাকে নিয়ে কেউ সংসার করতে পারবে না, তোমার স্বামী তোমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে, তুমি যোগ্য নও কারও সঙ্গে বাস করার, তাই। সুনীল তোমাকে ধর্ষণ করেছিল? মিথ্যে কথা, তুমিই সুনীলের সঙ্গে শুয়েছ, আমাকে মিথ্যে বলেছ। আমার মতিভ্রম হয়েছিল, তাই তোমার আসল চেহারা দেখতে পারিনি। তোমার জগৎ হচ্ছে ওই তলপেটের নীচে তিন ইঞ্চি জায়গা। ও ছাড়া আর কিচ্ছু জানো না তুমি, একটা বেশ্যা তুমি, আমার আর কত বড় ক্ষতি তুমি করেছ জানি না। সম্ভবত এইডস ছড়িয়েছ আমার শরীরে। কে জানে। কত মানুষকে তোমার যৌনরোগ ছড়িয়েছ এ অব্দি, বলো। আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিয়ে করার ফন্দি এঁটেছিলে। ভাগ্যিস তোমার মুখোশখানা আগেই খুলতে পেরেছি।

নীলা কোনও শব্দ উচ্চারণ করে না। বেনোয়া তার কাপড়চোপড় জুতো, ছবির ফ্রেম, উপহারসামগ্রী সুটকেসে ভরে নিল, এরামিস, কাপ অব টি। ব্রুট, নট কাপ অব টি। দুটোই।

দরজার দিকে যেতে নিলে নীলা বলে, বাড়ির চাবিটা রেখে যাও।

বেনোয়া ঘুরে দাঁড়ায়। আমাকে ছুটি দিয়ে নিজে সুখে থাকতে চাইছ, বলে সুটকেস নামিয়ে রেখে, ঘরের জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলতে থাকে দু হাতে। বুটের তলায় চেপে ভেঙে ফেলে সিডিগুলো। গানের যন্ত্রটি আছাড় দিয়ে ভাঙে। ভাঙে ঘরের ফুলদানিগুলো। টেলিভিশন লাথি লাগিয়ে ভাঙে। হাতুড়ি নিয়ে কম্পিউটার ভেঙে গুঁড়ো করে। লাইব্রেরির বইগুলো ছিড়ে জানালা দিয়ে ছুড়ে ফেলে। রান্নাঘর থেকে দৌড়ে ছুরি নিয়ে এসে সোফার মাঝখানে চিরে দেয়। বিছানা টেনে নামিয়ে লেপ তোশক বালিশ কেটে ছিন্ন করে। আলমারি খুলে নীলার কাপড়চোপড় ছুরিতে কাটে। বিশাল তাণ্ডব বয়ে যায় ঘরের ওপর। নীলা নিঃশব্দে তাকিয়ে দেখে।

এরপর নীলার গলা চেপে ধরে দুহাতে বেনোয়া। বদমাশ বেটি, আমি তোকে খুন করব।

নীলার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে থাকে। দুহাতে সমস্ত শক্তি দিয়ে সে বেনোয়ার হাত ছাড়ায়।

বেনোয়া ধাক্কা দিয়ে নীলাকে মেঝেয় ফেলে । মেঝেতে থুবড়ে পড়লে, পিঠে সেই শক্ত বুটের লাথি, ঠিক মিমির্জঁর সমুদ্রপাড়ের লাথির মতো। মাংস কাটার বড় ছুরিটি হাতে নিয়ে নীলার বুক বরাবর উঁচু করে।

সারা গা হিম হয়ে থাকে নীলার। চোখ বুজে থেকে সে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনে।

ছুরিটি নীলার পিঠের পেছনে থুবড়ে পড়েছে। তোর মতো কীটকে মেরে, আমার হাত নোংরা করতে চাই না। তুই এমনিতেই পচে মরবি।

বেনোয়া বেরিয়ে যায়। নীলার ফরাসি প্রেমিক বেরিয়ে যায়। নীলার সুদর্শন সুপুরুষ বেরিয়ে যায়, নীল চোখ বেরিয়ে যায়, সোনালি চুল বেরিয়ে যায়। অনেকক্ষণ ওভাবেই পড়ে থাকে নীলা মেঝেয়। অনেকক্ষণ নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনে না সে। উঠতে গেলেই সারা গায়ে যন্ত্রণা হয়।

উঠে যখন দাঁড়ায়, চারটে কাজ করে সে।

এক, ফুসফুস ভরে শুদ্ধ বাতাস নেয়। জানালায় দাঁড়িয়ে দেখে সবুজে লালে হলুদে ছেয়ে আছে প্রকৃতি। আকাশের নীলের তলে, মেঘের সাদার তলে, পত্রপুষ্পাবলীর বর্ণিল উৎসব। নীলা আগে কখনও শরতের এমন আশ্চর্য রূপ দেখেনি, প্রকৃতিকে এমন অপরূপ সাজে সাজতে দেখেনি।

এই দেশ কি তার দেশ? নীলা জানে, শরতের বিচিত্র সাজে সাজা অনিন্দ্যসুন্দর এই দেশটি তার নয়।

দুই, দানিয়েলকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে যে তার গর্ভপাত করাতে হবে, ও কোনও সাহায্য করতে পারবে কিনা। দানিয়েল সোৎসাহে বলে, নিশ্চয়ই। তা ঘটনা কী?

ঘটনা ছোট্ট, প্রেমের ফাঁদে পড়েছিলাম, ফাঁদ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছি।

জানতাম। দানিয়েল দেখলে তো ধরনের হাসি হেসে বলে, আগেই সতর্ক করেছিলাম। আগেই বলেছিলাম, খামোখা এই লোকের পেছনে সময় নষ্ট করো না।

নীলা বলে, সময় কখনও নষ্ট হয় না দানিয়েল। এ সময়টা অভিজ্ঞতা অর্জনে গেছে। এর প্রয়োজন ছিল। না হলে সারাজীবন একটা ভুল বিশ্বাস নিয়ে থাকতাম। আমার মনে হচ্ছে, পুরুষেরা যে দেশেরই হোক না কেন, যে সমাজেরই, সব এক।

দানিয়েলের কৌতূহল টগবগ ফুটছে, তা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা কী তোমার? দেশে ফিরে যাচ্ছ?

কোন দেশে? নীলা জিজ্ঞেস করে।

কোন দেশে আবার? তোমার নিজের দেশে?

আমার কি নিজের বলে কোনও দেশ আছে? দেশ মানে যদি আশ্রয় হয়, নিরাপত্তা হয়, সুখ স্বস্তির নাম হয়, ভারত আমার দেশ নয়।

দানিয়েল বলে, তা হলে এখানেই থেকে যাও। তুমি তো একবার বলেছিলে, প্রতিটি মানুষের দুটি মাতৃভূমি, একটি তার নিজের, অন্যটি ফ্রান্স।

মেয়েদের কি আসলেই কোনও দেশ বা মাতৃভূমি থাকে দানিয়েল? আমার কিন্তু মনে হয় না।

এই প্যারিস শহরে পঞ্চাশের দশকে সিমোন দ্য বোভোয়া গর্ভপাতের পক্ষে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। এই শহরের ছয় এরনদিসমোয় একটি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে মেয়েদের অবৈধভাবে গর্ভপাত করাতেন। গর্ভপাত বৈধ করা হয়েছে ওই আন্দোলনের ফলে। নীলার আনন্দ হয় ভেবে যে এই শহরে ওই আন্দোলনের ফসল সে ভোগ করতে যাচ্ছে।

তিন, মোজাম্মেলকে ফোন করে জিজ্ঞেস করে মডিবো কেমন আছে? মডিবোর কোনও ফোন নম্বর আছে কি না। ওর বাড়ির ঠিকানাই বা কী?

মোজাম্মেল যতটুকু জানে মডিবোর খবর তা জানায়। শেষে বলে, ও হন্যে হয়ে একটা ফরাসি মেয়ে খুঁজছিল যেন প্রেমে পড়িয়ে বিয়ে করতে পারে, এ দেশে থাকার অনুমতি পাওয়ার জন্য। সুখবর, মডিবো সাদা এক ফরাসি মেয়ে পেয়ে গেছে।

প্রায় চার হাজার বছর আগে মধ্য এশিয়া থেকে গৌরবর্ণ আর্য এসে কালো দ্রাবিড়দের তাড়িয়ে দিয়েছিল ভারতের আরও দক্ষিণে। গৌরের জয় গেয়েছিল আর্যরা, গৌর উত্তম, কালো অধম, গৌর প্রভু, কালো দাস, গৌর বড়, কালো ছোট, বড় জাত, ছোট জাত, ওই ছিল ধর্ম ওদের, ওই ছিল সমাজ । রক্তের কণায় কণায় ঢুকে গেছে ওই বিশ্বাস। দুশো বছরের ইংরেজ শাসনকাল ওই বিশ্বাসকে আরও পোক্ত করেছে, সাদা ভাল, সাদা জ্ঞানী, সাদা প্রভু। নীলার রক্তকণিকাতেও ছিল ওই বিশ্বাস, মস্তিষ্কের কোষে কোষে ছিল, ঝেড়ে বিদেয় করলেও কোথায় যেন সামান্য থেকে যায়, ওই সামান্যটুকুর শেষ কণা নিশ্চিহ্ন করা সহজ নয়, সে জানে, তবে সে কঠিন কাজটিই করে তৃপ্তি পেয়েছে।

চার, মরুনিকে বলে বাড়ি গোছানোর কাজে সাহায্য করার জন্য কাউকে পাঠাতে।

ঘণ্টায় পঞ্চাশ ফ্রাঁ করে নেয় এক ফিলিপিনো মেয়ে, মারিলু, নীলার বাড়িতে চলে আসে বিকেলেই। ঘরের ভাঙা জিনিসগুলো বড় বড় কালো ব্যাগে ঢুকিয়ে নীচে ফেলে দিয়ে আসে ও। ঘণ্টা তিন লাগে ওর এ কাজ করতে।

এরপর মারিলুকে কাছে বসিয়ে ওর জীবনের গল্প শোনে নীলা।

মারিলু ফিলিপিন থেকে বছর ছয় আগে এ শহরে এসেছে। ওর আরও আত্মীয় থাকে এ শহরে। ওরাই এনেছে মারিলুকে। ও ম্যানিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। সমাজবিজ্ঞান ছিল ওর বিষয়। লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে, জন্মের শহর ছেড়ে ফ্রান্সে এসেছে, আসাতক ধনীদের বাড়িতে কাজ করে জীবন চালাচ্ছে। ওর আত্মীয়দের অনেকে কাপড়ের কারখানায় কাজ করে। মারিলু কাপড় সেলাই শিখছে সানদানিতে তার আত্মীয়দের বাড়িতে। শিগরি কাজ নেবে কারখানায়।

নীলা জিজ্ঞেস করে, সানদানিতে কোনও ছোটখাটো ঘর পাওয়া যাবে অল্প দামে? ভাড়া নেব।

তা পাওয়া যাবে।

মারিলু নীলাকে আগে থেকেই সাবধান করে অবশ্য, সানদানি তো খুব খারাপ জায়গা।

কীরকম খারাপ?

লোক বেকার, চুরি ডাকাতি হয়, ছিনতাই হয়, লোকে নেশা করে, খুন করে, কালো লোকে ভর্তি।

আমার রংটা দেখো? এ কি খুব সাদা নাকি? এক রকম কালোই তো। বেকার লোকেরাই বুঝি চুরি ডাকাতি করে? যারা, বেকার নয়, মোটা টাকা কামাচ্ছে, তারা করে না? কালো লোকে ভর্তি, তাতে কী? সাদা লোকেরা বুঝি নেশা করে না? খুন করে না?

পৃথিবীর কোন জায়গাটা ভাল বলো তো? কোথায় তুমি বলতে পারো নিরাপত্তা আছে? ম্যানিলায় লোকে নেশা করে না? ডাকাতি করে না? খুন করে না? করে। ওখানে দারিদ্র্য আছে, কষ্ট আছে, কুসংস্কার আছে, এখানেও আছে। এ দেশে বর্ণবাদী আছে, ভারতবর্ষে নেই? কলকাতায় ধর্ষণ হয়, এখানে হয় না? হয়। এই যে রু দ্য ভুইয়ে, এই এলাকায় সাদাবা থাকে বেশি, এখানে কি খুন হয না? হয়। আজই হতে পারত একটি।